AN ACCOUNT OF THE JAINTIA KINGDOM

ASIF AJHAR

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিবৃত্ত

আসিফ আযহার

(মূল বইয়ের বাংলা অনুবাদ)

নারী রাজবংশ
কৃষক রাজবংশ
পুরোহিত রাজবংশ
সিন্টেং রাজবংশ

অধ্যায় আটাশ

বিজয়নারায়ণের শাসনামল

অধ্যায় ঊনত্রিশ

ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে জৈন্তিয়ার মদদ

অধ্যায় ত্রিশ

চতুলের সোনাধনের কবিতার গদ্যরূপ

অধ্যায় একত্রিশ

সোনাধনের গীতের মূলকথা

অধ্যায় বত্রিশ

দ্বিতীয় রামসিংহের শাসনামল

ভূমিকা

কয়েক হাজার বছরের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের এক দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া শেষে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা আজকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সভ্যতার এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিটি যুগের ইতিহাসকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এর আগের যুগের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান। মানুষের অগ্রযাত্রায় অতীতের প্রভাব খুবই গভীর। অতীতের সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র ও জাতিসত্তার বিভিন্ন উপাদান যেমন- অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয় মিলেই ভবিষ্যতের গতিপথ নির্ধারণ করে। এসব বিষয়ের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশই হল মানুষের ইতিহাস। ইতিহাসের বিচিত্র ও জটিল গতিপথকে অনুধাবন করা বেশ কঠিন। বেশিরভাগ জ্ঞানী মানুষের এতে আগ্রহ নেই। কিন্তু কাজটি বেশ প্রয়োজনীয়। বর্তমান ছায়া-ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র ও জাতিসত্তাসমূহের স্বরূপ সন্ধানের কাজটি অত্যাবশ্যক।

সাবেক ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহের বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতিগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিসরে নানান বিভাজন, বিদ্বেষ, অস্থিরতা ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে। এসব সমস্যার শেকড় প্রোথিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে যা এখন ক্রমশ মহীরুহ আকার ধারণ করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরকে যদি ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত (বিউপনিবেশায়ন) করা না যায় তাহলে এসব সমস্যা দূর হবে না। কিন্তু বিউপনিবেশায়নের প্রক্রিয়াটি অনেক ধীর ও জটিল একটি প্রক্রিয়া। এর কারণ, ঔপনিবেশিক আমলে প্রাচীন সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্রসমূহের হাজার হাজার বছরের অর্জন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আগের কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। তাই প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর দেখা গেল, আগের কোন কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় আপাত স্বাধীন দেশসমূহে অনেকাংশেই ঔপনিবেশিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোই বহাল রাখা হয়; কোথাও কোন ‘রেনেসাঁ’ বা ‘নবজাগরণ’ হয়নি। তাই বিউপনিবেশায়নেরও কোন অগ্রগতি হয়নি।

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারত উপমহাদেশে শত শত ছোট রাজ্য ও বিভিন্ন বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলে আসছিল। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। কয়েক হাজার বছরের ধারাবাহিক বিভিন্ন সভ্যতার অর্জনসমূহ ভারত উপমহাদেশকে এতোটাই সমৃদ্ধ করেছিল যে, এই অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এই অঞ্চলের সম্পদ ও সমৃদ্ধির দিকে তখন সারা পৃথিবী তাকিয়ে থাকতো। একসময় এই ধনী ও সমৃদ্ধ উপমহাদেশটি চলে যায় ব্রিটিশদের দখলে। তাদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এখানকার চিরায়ত সভ্যতার উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে থমকে দেয়। ক্রমশ এই অঞ্চলটি ব্রিটিশ সভ্যতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আজও এই অঞ্চলটি পশ্চিমা-নির্ভর হয়েই আছে।

ভারত উপমহাদেশের এই পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি তথা বিউপনিবেশায়ন ও নবজাগরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগবে। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার স্বরূপ সন্ধানের কাজটি এই প্রক্রিয়ারই অংশ। জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের এই গ্রন্থটিতে উপমহাদেশের এক সুপ্রাচীন সভ্যতার স্বরূপ তোলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটি মূলত প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের ভারত উপমহাদেশের এক অনন্য মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। এই সভ্যতার লীলাভূমি হিসেবে প্রসিদ্ধ জৈন্তিয়া রাজ্য বা নারীরাজ্যটি ছিল বর্তমান উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশ ও বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের কিছু ভূখণ্ডজুড়ে বিস্তৃত। এই অঞ্চলের ইতিহাস গবেষণায় আজ অবধি কোন মৌলিক অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ায় এখানকার ইতিহাস অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অভাবে জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস আজ এক জটিল গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছে। এই জটিল গোলকধাঁধা থেকে এর তাৎপর্যময় সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে বের করার কাজটি খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস মূলত এমন এক সমৃদ্ধ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস যার সাথে পুরো সিলেট অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। তাই রাজ্যটির ইতিহাস লিখতে গিয়ে একটি বিশাল অঞ্চলের পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত যতো ঐতিহাসিক উপাদান (বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক) আছে তার সবই সংগ্রহ করতে হয়েছে। এসব

উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজটি ছিল আরও জটিল; পরস্পরবিরোধী, অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর নানান তথ্য থেকে সঠিক তথ্য উদ্ধারের কাজটি ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। ইতিহাস লেখার চেয়ে আনুসঙ্গিক কাজই ছিল বেশি। যেমন- ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, রীতিনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন; বিভিন্ন অঞ্চলের আদি ইতিহাসের নিজস্ব পরিভাষা অনুধাবন; আদিযুগের ধর্ম ও মাতৃপ্রধান সংস্কৃতির জটিল দিকগুলো অনুধাবন; প্নার, অসমীয়া, সিলেটি, রাজবংশী (কামতাপুরী) ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত দলিলসমূহের পাঠোদ্ধার; তাম্রলিপি, শিলালিপি ও মুদ্রার অনুসন্ধান; বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত পুরানো দলিলসমূহের অনুসন্ধান; মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ; বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র পর্যবেক্ষণ; ব্রিটিশ আমলের দলিলপত্রের বিভিন্ন ভুল তথ্য সংশোধন; সকল স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ; বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ ইত্যাদি কাজেই বেশি সময় ব্যয় হয়েছে।

এই কাজটি কোন প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ছিল না। নিজের কৌতূহল থেকেই কাজটির সূচনা। তথ্য অনুসন্ধান, গবেষণা ও পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে সময় লেগেছে মোট ষোল বছর। এই দীর্ঘ সময়টিতে আমি বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। বেশ কিছুদিন ব্রিটিশ সরকারের চাকুরীও করেছি। এমনকি বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের ওপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইও লিখেছি যা বাংলাদেশের মূল ধারার প্রকাশনীগুলো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এসকল কাজের মধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারত ও সিলেট অঞ্চলের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা বজায় রেখেছি। ২০১৮ সালে মনে হল- সিলেট, মেঘালয় ও আসাম অঞ্চলের 'প্রতিনিধিত্বশীল সভ্যতা' জৈন্তিয়ার ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি রচনার কাজে হাত দেওয়া উচিত। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম, এই কাজটি চাইলেও করে ফেলা সম্ভব নয়। প্রথম পাণ্ডুলিপিটি রচনার পর অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ল। আবার নতুন করে পাণ্ডুলিপি লিখলাম। আবারও অসঙ্গতি চোখে পড়ল। আবারও লিখলাম। গত আট বছরে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের মোট তেইশটি পাণ্ডুলিপি লিখেছি। বর্তমান পাণ্ডুলিপিটিই শেষ ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি। যদি বৃহত্তর সিলেট ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসের পাঠক ও গবেষকরা এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উপকৃত হন তাহলে এর পেছনের সকল পরিশ্রম সার্থক হবে।

- আসিফ আযহার, জুন, ২০২৬

অধ্যায় এক
জৈন্তিয়া রাজ্যের পরিচিতি

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে মানবসভ্যতার সূচনা হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে। এই অঞ্চলের ইতিহাস ভারত উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ডের ইতিহাস থেকে বেশ আলাদা। এর কারণ, ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো এই অঞ্চলকে গ্রাস করতে পারেনি। ১৩০৩ সালে প্রথমবারের মতো সিলেটের কিছু অংশ মূল ভারতীয় অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়। এর পরবর্তীতে পাঠান ও মোগল শাসকরা সিলেটের আরও কিছু অংশ জয় করলেও পুরো সিলেট কখনোই তাদের অধীনস্থ হয়নি। ১৬৬১-৬৩ সালে বাংলার মোগল সুবাদার মীর জুমলা আসামে (তখন এটি 'আহোম রাজ্য' নামে পরিচিত ছিল) অভিযান চালিয়ে সফল হতে পারেননি। এর ফলে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত আসাম অঞ্চলে আহোম রাজবংশের শাসন বজায় ছিল। উত্তর সিলেট ও পূর্ব মেঘালয়জুড়ে বিস্তৃত জৈন্তিয়া রাজ্যটিও ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। সিলেটের পূর্ববর্তী কাছাড়ি রাজ্যটিও ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। কোচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুর অঞ্চলও ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল।

এক. প্রথম সহস্রাব্দের উত্তর-পূর্ব ভারতীয় সভ্যতা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারত ও বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলকে অনেক গবেষক 'ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী' এক স্বতন্ত্র ধারার সভ্য জনপদ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অনেকে আবার এর সাথে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করে ভারত উপমহাদেশ হতে আলাদা 'গঙ্গারিদাই' সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। 'গঙ্গারিদাই' নামটি এসেছে গ্রিক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বর্ণনা থেকে। আনুমানিকভাবে ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে তিনি ভারতে এসেছিলেন। তখনকার ভারত উপমহাদেশে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু 'গঙ্গারিদাই' অঞ্চলটি তাঁর সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না। মেগাস্থিনিস তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত *ইন্ডিকা*-তে এই অঞ্চলটিকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সাম্রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চল গঙ্গারিদাই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। ওই সময়কার (৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়) সিলেট ও আসামের কথা কোথাও বর্ণিত হয়নি।

তবে ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যে এরও বহু আগের যে কিরাতদেশ বা প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের কথা বলা হয়েছে তা বৃহত্তর আসাম ও সিলেট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য ছিল বলেই ঐতিহাসিকরা মত দিয়েছেন। পৌরাণিক সাহিত্যে জয়ন্তী নামের একটি স্বাধীন নারী রাজ্যের অস্তিত্বের কথাও এসেছে (এটি হয়তো প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রতিবেশী ছিল অথবা এই সাম্রাজ্যেরই একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ছিল)। পৌরাণিক যুগ পরবর্তী তান্ত্রিক সাহিত্যে প্রাগজ্যোতিষপুরের মূল অংশকে ‘কামরূপ’ নামে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পৌরাণিক, অর্ধ-পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য বিশ্লেষণ করে এবং কিছু ঐতিহাসিক দলিলের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের আদি যুগের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে, প্রথম সহস্রাব্দে (১ সাল - ১০০০ সাল) কিরাতদেশ বা প্রাগজ্যোতিষপুর সাম্রাজ্যটি পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এ পাঁচটি অঞ্চল নিম্নরূপ।

এক. প্রথম সহস্রাব্দে সাবেক প্রাগজ্যোতিষপুরের (মহাভারতের যুগে এটি আয়তনে বেশ বড় ছিল) কিছু অংশ নিয়ে প্রাগজ্যোতিষপুর নামেই একটি অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল বলে ধারণা করা যায়। *হট্টনাথের পাঁচালী* নামক একটি অর্ধ-পৌরাণিক কাব্যগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। এই ‘খণ্ডিত প্রাগজ্যোতিষপুর’ অঞ্চলটি আসামের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা অঞ্চল কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায় না।

দুই. প্রথম সহস্রাব্দে সাবেক প্রাগজ্যোতিষপুরের বেশিরভাগ অঞ্চল নিয়ে কামরূপ রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্তমান আসামের প্রায় পুরোটাই এর ভেতরে ছিল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কিছ অঞ্চল (কোচবিহার) ও বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলও (বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল ও পূর্ব সিলেট অঞ্চল) এর ভেতরে ছিল। কামরূপে সনাতনবৈদিক ধর্মমতের ব্যাপক চর্চা হতো এবং কামাখ্যা মন্দির ছিল এই রাজ্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দির।

তিন. প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে সাবেক প্রাগজ্যোতিষপুরের দক্ষিণাঞ্চল (বৃহত্তর সিলেট) ছিল নারী রাজ্য বা স্ত্রী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই রাজ্যের নাম ছিল জয়ন্তী বা জয়ন্তা। নারীশাসিত হওয়ায় একে নারী রাজ্য বলা হতো। প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে বৃহত্তর সিলেটের পূর্বাঞ্চল ছাড়া বাকি অঞ্চলসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। মেঘালয়ের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে অনুমেয়। জৈন্তিয়া পাহাড়ের নামের সাথে জয়ন্তী বা জয়ন্তা রাজ্যের যোগসূত্র বেশ পরিস্কার। এখানকার অধিবাসীরা সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠী

নামে পরিচিত। নারী রাজ্যের শাসকরা এই জনগোষ্ঠীরই আদি গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে (৬০০ সাল থেকে ৬৫০ সালের মধ্যে) এই রাজ্যটি ভেঙ্গে তিনটি আলাদা রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে- নারী রাজ্যের মূল অংশ নিয়ে গঠিত জৈন্তিয়া রাজ্য, মধ্য সিলেটের গৌড় রাজ্য এবং পশ্চিম সিলেটের লাউড় রাজ্য।

চার. বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলটি প্রথম সহস্রাব্দে কামরূপ থেকে পৃথক একটি অঞ্চল ছিল। এই অঞ্চলটি কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রথম সহস্রাব্দে এটি ‘কিরাতদেশ’ নামে পরিচিত ছিল। পৌরাণিক যুগের বৃহত্তর কিরাতদেশের নামটি কেন ত্রিপুরা অঞ্চলে টিকে ছিল তার কারণ কিছুটা অনুমেয়। কিরাত জনগোষ্ঠীর লোকজন হয়তো অন্যদের হাতে কোনঠাসা হয়ে এই অঞ্চলেই আশ্রয় নিয়েছিল এবং এখানেই নিজেদের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই ত্রিপুরা অঞ্চলটি কামরূপের উত্থানের যুগেও ‘কিরাতদেশ’ নামে পরিচিত ছিল।

পাঁচ. বর্তমান মণিপুর অঞ্চলটি কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রথম সহস্রাব্দে এই অঞ্চলটি ‘কাংলেইপাক’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল (‘মণিপুর’ নামটি প্রসিদ্ধ হয়েছে অষ্টাদশ শতকে)। নিংথৌজা রাজবংশের রাজারা তখন এই অঞ্চলটিকে শাসন করতেন। একই রাজবংশের রাজারা দ্বিতীয় সহস্রাব্দেও এই অঞ্চলটিকে শাসন করতেন। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত রাজ্যটির অস্তিত্ব বজায় ছিল।

প্রথম সহস্রাব্দে এসব অঞ্চলের বাইরে এবং ভেতরে বিভিন্ন স্বাধীন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলেরও অস্তিত্ব ছিল। পাহাড়ি অঞ্চলসমূহে সমতলের শাসকদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলেই মনে হয়। তবে মেঘালয়ের কিছু অংশ নারী রাজ্যের অধীনস্থ ছিল বলে ধারণা করা যায়।

দুই. দ্বিতীয় সহস্রাব্দের উত্তর-পূর্ব ভারতীয় সভ্যতা

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের (১০০০ – ২০০০ সাল) প্রথমদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় সভ্যতা এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে এই অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয় এবং এসব রাজবংশের অধীনে বিভিন্ন শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে। কামরূপ অঞ্চলে গড়ে ওঠা চারটি রাজ্য এর মধ্যে অন্যতম। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে (১১০১ – ১২০০ সাল ও ১২০১ – ১৩০০

সাল) কামরূপ অঞ্চলে চুতিয়া রাজ্য, কামতা রাজ্য, আহোম রাজ্য ও দিমাসা বা কাছাড়ি রাজ্য নামে চারটি উল্লেখযোগ্য রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এর পরবর্তীতে চুতিয়া রাজ্য ও কামতা রাজ্যের একাংশ (কোচ হাজো) আহোমের অন্তর্ভুক্ত হলেও কামতা রাজ্যের অপর অংশ কোচবিহার নামে স্বাধীন ছিল। দ্বিতীয় সহস্রাব্দে কামরূপ অঞ্চলের বাইরের ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যেও সভ্য রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চদশ শতকের (১৪০১ – ১৫০০ সাল) প্রথম দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে 'মাণিক্য রাজবংশ' নামে একটি শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। আর মণিপুরে প্রথম সহস্রাব্দের পুরানো রাজবংশেরই শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৩০০ সালের কিছু আগে সিলেট অঞ্চলের (তখন অবশ্য 'সিলেট' নামটি ছিল না) গৌড় রাজ্যটি পুনিবিলের রাজা গোবিন্দের হস্তগত হয়েছিল। ১৩০৩ সালে তা হযরত শাহজালাল (রাহ.) ও নাসির গাজীর নেতৃত্বে দিল্লী সালতানাতের অধীনস্থ হয়। এরপর ক্রমশ লাউড় ও পূর্ব সিলেটেও দিল্লি বা বাংলার শাসকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।[1] সিলেট অঞ্চলের স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে তখন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্য। এছাড়াও প্রতাপগড়, তরফ, ইটা, ব্রহ্মাচল, মনুকূল প্রভৃতি নামে সিলেটে বিভিন্ন ছোট-বড় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বৃহত্তর সিলেট, কামরূপ, ত্রিপুরা ও মণিপুর অঞ্চলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বড় রাজ্য, মুসলমানশাসিত সিলেট

---

[1] সিলেটের এসব অঞ্চলের রাজস্বব্যবস্থা ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ভিন্ন ছিল। বাংলার স্বাধীন শাসক কিংবা দিল্লীর অধীনস্থ বাংলার শাসক– কেউই সিলেট অঞ্চলকে রাজস্ব আয়ের বড় উৎস হিসেবে বিবেচনা করেননি। এর কারণ ছিল, বাংলার মূল অংশ থেকে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রজা ও জমিদারদের সমর্থন ছিল অপরিহার্য। বাংলার শাসকরা জানতেন, সমুদ্রসম জলরাশি দ্বারা বিচ্ছিন্ন সিলেট অঞ্চলের অপর প্রান্তে যেসব স্বাধীন রাজ্য ও জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিলেটিরা নিজস্ব সালতানাত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। তাই বাংলার শাসকরা এই অঞ্চলের মানুষের ওপর রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দেননি; রাজস্বের বেলায় প্রচুর ছাড় দিয়ে তারা সিলেটিদেরকে নিজেদের অনুগত রাখতে পেরেছিলেন। এসব কারণে দিল্লি বা বাংলার অধীনস্থ সিলেট ছিল এক প্রকার আধা-স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল। এই অঞ্চলের আমিল, দেওয়ান, ফৌজদার প্রভৃতি শাসনকর্তারা প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন।

অঞ্চল এবং বিভিন্ন স্বাধীন জনগোষ্ঠীসমূহ যে সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টি করেছিল তা মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি।

তিন. জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রাচীনত্ব ও অবস্থান

উত্তর-পূর্ব ভারত ও বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের সভ্যতা বেশ প্রাচীন। পৌরাণিক যুগ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশ ও জনগোষ্ঠীর হাতে এই অঞ্চলের বিভিন্ন ভূখণ্ড শাসিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই অঞ্চলে যেসব রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন রাজ্য ছিল জৈন্তিয়া। ঋষি জৈমিনি কর্তৃক রচিত *জৈমিনি মহাভারতের* (*জৈমিনি অশ্বমেধ পর্ব* নামেও পরিচিত) বর্ণনা অনুযায়ী, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; তখন রাজ্যটি শাসন করতেন বীর রানী প্রমীলা। আনুমানিকভাবে, ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রমীলা জৈন্তিয়ার শাসক ছিলেন। তখন থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি আদি রাজ্য ভেঙ্গে নতুন রাজ্য বা রাজ্যসমূহের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু জৈন্তিয়ার ক্ষেত্রে তা ভিন্ন। অন্য কোন রাজ্য থেকে এটি উদ্ভূত হয়নি। যখন থেকে এই অঞ্চলে মানববসতির সূচনা হয় তখন থেকে এই রাজ্যটিরও উদ্ভব হয়।

কয়েক হাজার বছর ধরে এক অনন্য সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে টিকে থাকার পর ১৮৩৫ সালে এটি ব্রিটিশদের হস্তগত হয়। বর্তমানে এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভক্ত। বাংলাদেশের সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল ছিল সাবেক জৈন্তিয়া রাজ্যের সমভূমি। আর ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড় ও পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড় জেলাদ্বয় ছিল সাবেক জৈন্তিয়া রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চল। সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট উপজেলাজুড়ে জৈন্তিয়া সমভূমি বিস্তৃত ছিল। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার কিছু অংশও জৈন্তিয়া সমভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অংশটি হল- দক্ষিণ রনিখাই ইউনিয়ন ও উত্তর রনিখাই ইউনিয়ন। চার উপজেলার এই সমভূমি অঞ্চলে জৈন্তিয়ার ১৮টি রাজ বা পরগণার অস্তিত্ব ছিল। অন্যদিকে মেঘালয়ের জৈন্তিয়া পাহাড়ে এই রাজ্যের আরও ১২টি রাজ বা এলাকার (প্নার শব্দ এলাকা অর্থ হল পার্বত্য পুঞ্জি) অস্তিত্ব ছিল।

পৌরাণিক যুগে এই রাজ্যটির আয়তন কতটুকু ছিল তা জানা যায় না। *জৈমিনি মহাভারতে* রাজ্যটির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে শুধু এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তখন এটি একটি নারীশাসিত রাজ্য ছিল। কয়েক হাজার বছর ধরে এই নারীশাসন চালু ছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এখানে পুরুষ রাজাদের শাসন শুরু হয়। হাটক নামক এক যুবক ছিলেন জৈন্তিয়ার প্রথম পুরুষ রাজা। তাঁর আমলে বৃহত্তর সিলেটের পূর্বাঞ্চল ছাড়া বাকি অংশ ছিল জৈন্তিয়ার অধীনে। হাটকের পুত্র গুহক ছিলেন এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শেষ একক শাসক। তাঁর পরে এই অঞ্চলটি ভেঙ্গে তিনটি আলাদা রাজ্যে পরিণত হয়। যথা- লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া। পশ্চিম সিলেট ছিল লাউড়ের অন্তর্ভুক্ত। মধ্য সিলেট ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। আর উত্তর সিলেট ছিল জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব সিলেট আগে থেকেই কামরূপের অধীনে ছিল।

লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া রাজ্যের মধ্যে সিলেট সমতলের ভাগাভাগি হয় আনুমানিকভাবে ৬০০ সাল থেকে ৬৫০ সালের মধ্যে। তখন জৈন্তিয়ার ভাগে যে অংশটুকু পড়েছিল তা ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত জৈন্তিয়ার সমভূমি হিসেবে সার্বভৌম ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্যের মূল অংশ ছিল এই সমভূমি। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জৈন্তিয়ার শাসকদের আনুগত্য করেননি। এর কারণ, জৈন্তিয়ার প্রথম পুরুষ রাজা হাটক ছিলেন একজন তিব্বতীয়। তাঁর মাতা ছিলেন কামরূপের রাজকন্যা। ভিন্ন জাতির হওয়ায় জৈন্তিয়া পাহাড়ের আদি জনগোষ্ঠী হাটকের বংশধরদের আনুগত্য করেনি। এই রাজবংশের আগের শাসকরা অর্থাৎ নারী শাসকরা জৈন্তিয়া পাহাড়ের মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীরই সরদার ছিলেন বলে অনুমেয়। স্বজাতীয়দের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তারা সিলেট সমতলেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

রাজা হাটকের বংশধররা জৈন্তিয়া সমতলের অধিপতি হলেও জৈন্তিয়া পাহাড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ অতি দূর্বল ছিল অথবা ছিল না বলেই অনুমেয়। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে (১৫০০ সালের দিকে) জৈন্তিয়া সমতলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর শাসকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে আবারও পাহাড় ও সমতল একীভূত হয়ে যায়। পাহাড় ও সমতলের এই ঐক্য রাজ্যটিকে বেশ সুরক্ষা দিয়েছিল। অপ্রতিরোধ্য ও স্বাধীনচেতা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর কারণেই শক্তিশালী মোগলরা জৈন্তিয়া দখল করতে চাননি। ব্রিটিশরাও প্রথমদিকে জৈন্তিয়া দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। জৈন্তিয়া পাহাড়ের বর্তমান অধিবাসীরা নিজেদেরকে

‘সিন্টেং’ বা ‘জৈন্তিয়া’ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দেন। নারী রাজ্যের যুগে এই জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিবেশী খাসিয়া জনগোষ্ঠী একই আদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। নারী শাসিত আদি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত খাসিয়া ও সিন্টেং জনগোষ্ঠী আজও মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিত।

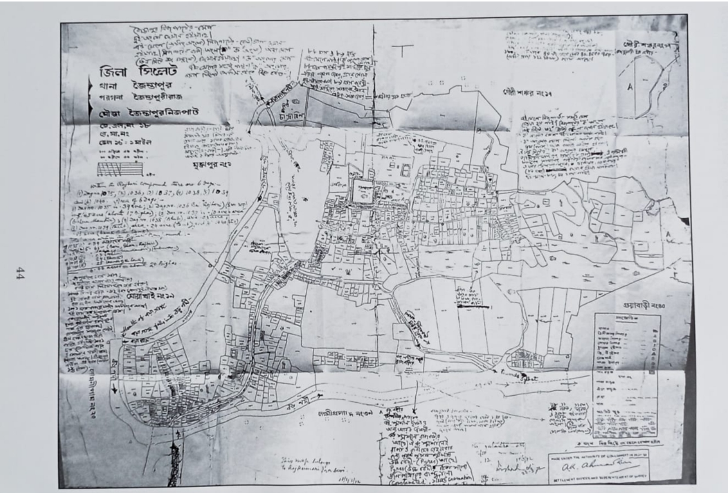
চার. জৈন্তিয়া রাজ্যের নাম ও রাজধানীর নাম

জৈন্তিয়া রাজ্যের আদি নাম ছিল ‘জয়ন্তী’। *জৈমিনি মহাভারতে* এই নামটিই উল্লিখিত হয়েছে। সনাতন ধর্মের একজন দেবীর নামও ‘জয়ন্তী’। এই দেবী জৈন্তিয়া অঞ্চলের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে স্বীকৃত। ধারণা করা হয় যে, জয়ন্তী ছিলেন জৈন্তিয়া রাজ্যের আদি শাসক। তিনিই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নামে রাজ্যটির নামকরণ হয়েছিল নাকি রাজ্যটির নামে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন তা নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। যদি আগে থেকেই এই অঞ্চলের নাম ‘জয়ন্তী’ হয়ে থাকে তাহলে এর অধীশ্বরী হিসেবে তিনি এই নাম ধারণ করে থাকতে পারেন (আবার উল্টোটাও হতে পারে)। তিনি ছিলেন জৈমিনি মহাভারতে বর্ণিত রানী প্রমীলার আগের যুগের শাসক। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

শুধু এটুকু অনুমান যেতে পারে যে, তিনি ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে ‘জয়ন্তী’ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গবেষকদের মতে, মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আনুমানিক ৩১০২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে; এর কয়েক বছর পরেই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। তখন প্রমলা ছিলেন জৈন্তিয়ার রানী। তাঁর শাসনামলের অনির্দিষ্টকাল আগে রানী জয়ন্তীর হাতে রাজ্যটি শাসিত হয়েছিল। এই আদি নারী শাসক একসময় জৈন্তিয়া সমতলের সনাতনবৈদিক ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। জয়ন্তী দেবী বা জয়ন্তেশ্বরী দেবী হিসেবে তিনি আজও বেশ প্রসিদ্ধ। তান্ত্রিক সাহিত্যে এই দেবীর নাম এবং জৈন্তিয়া রাজ্যের নাম ‘জয়ন্তী’ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। *কামাখ্যাতন্ত্র*, *তন্ত্রচূড়ামণি*, *কালিকাপুরাণ* ও *ভবিষ্যপুরাণে* ‘জয়ন্তী’ বা ‘জয়ন্ত্যাং’ শব্দের বার বার উল্লেখ দেখা যায়।

দ্বাদশ শতকে (১১০১ – ১২০০ সাল) রচিত *রাঘবপাণ্ডবীয়* কাব্যগ্রন্থে ‘জয়ন্তীপুর’ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালীণ জৈন্তিয়ার রাজা কামদেবের রাজধানী ছিল জয়ন্তীপুর। যতদিন পর্যন্ত জৈন্তিয়া রাজ্য টিকে ছিল ততোদিন পর্যন্ত রাজধানী এই নামেই ছিল। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের আমলের যেসব

তাম্রফলক উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোতে ‘জয়ন্তীপুর পুরন্দর’ কথাটির উল্লেখ রয়েছে। ‘জয়ন্তীপুর পুরন্দর’ কথাটির মানে হল ‘জয়ন্তীপুরের শাসক বা রাজা’। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের চালু করা মুদ্রাগুলোতেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বানানে এই কথাটির উল্লেখ রয়েছে। সিন্টেং রাজাদের আমলের দুই ধরণের মুদ্রা পাওয়া যায়- পূর্ণমুদ্রা ও সিকিমুদ্রা। সিকিমুদ্রাগুলোতে রাজার (যিনি মুদ্রা চালু করেছেন) নাম উল্লিখিত থাকলেও পূর্ণমুদ্রাগুলোতে রাজার নামের বদলে ‘জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য’ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। ‘জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য’ কথাটির মানে হল ‘জয়ন্তাপুরের শাসক বা রাজা’। জৈন্তিয়ার মুদ্রা ও তাম্রফলকে ‘জয়ন্তীপুর’ বা ‘জয়ন্তাপুর’ শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, এই শব্দটি দ্বারা রাজ্য এবং রাজধানী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।



চিত্র: ব্রিটিশ আমলে জয়ন্তীপুর নগরীর নাম ছিল ‘নিজপাট মৌজা’

জৈন্তিয়া রাজ্য সম্পর্কে এর প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাস থেকে অনেক কিছু জানা যায়। সেসব দলিলে জৈন্তিয়া রাজ্যকে ‘জয়ন্তীয়া’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোচবিহারের ইতিহাস *বংশাবলি*, শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত *ত্রিপুরার ইতিহাস (রাজমালা)*, শ্রী পদ্মনাথ বরুয়া সম্পাদিত *অসমৰ বুৰঞ্জী*, রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া রচিত *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থে

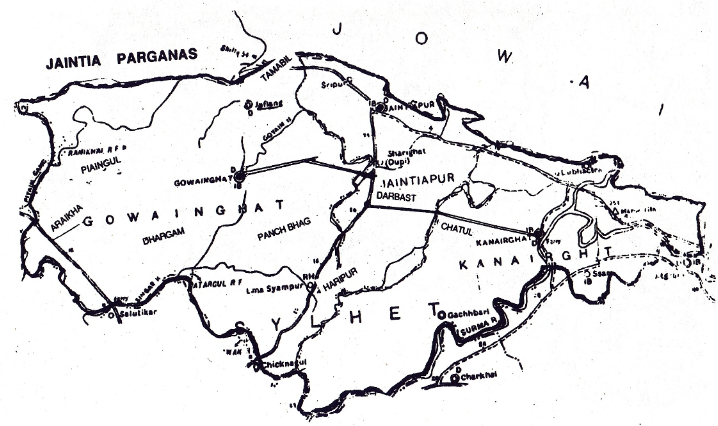
জৈন্তিয়া রাজ্যকে ‘জয়ন্তীয়া’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মোগলানের (সিলেটের যেসব অংশ মোগলদের অধীনস্থ ছিল) ইতিহাসেও ‘জয়ন্তিয়া’ বা ‘জয়ন্তীয়া’ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ‘জয়ন্তীয়া’ শব্দটির স্থলে ‘জৈন্তিয়া’ শব্দটির প্রচলন হয়। এর কারণ, ব্রিটিশরা বিভিন্ন ইংরেজি দলিলপত্রে এই অঞ্চলের জন্য ‘Jaintia’ শব্দটি ব্যবহার করতো। স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে এই শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে এই শব্দটি আরও সংক্ষেপিত হয়ে ‘জৈন্তা’ শব্দেও উচ্চারিত হয়। বর্তমান ‘জৈন্তাপুর’ উপজেলার নাম এর অন্যতম উদাহরণ। সাবেক রাজধানীর নামে এই উপজেলাটির নামকরণ করা হয়েছে। সাবেক রাজধানীটি বর্তমানে ‘জৈন্তাপুর সদর’ বা ‘নিজপাট’ নামে পরিচিত।

পাঁচ. জৈন্তিয়া সমভূমির ১৮ রাজ

সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর রাজাদের শাসনামলে জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রদেশগুলোকে বলা হতো ‘রাজ’। আকৃতির বিচারে এগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এগুলো প্রদেশের মতোই ছিল। জৈন্তিয়া সমতলে এমন ১৮টি রাজের অস্তিত্ব ছিল। তবে এগুলো সমমর্যাদাসম্পন্ন বা সমগুরুত্বসম্পন্ন ছিল না। মূলত দশটি রাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাকিগুলো এগুলোর অধীনেই ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দশটি রাজ আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা- খেলুরাজ ও হাজারকি রাজ। খেলুরাজের সংখ্যা ছিল চার। এগুলো হল- জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং রাজ, চারিকাটা রাজ ও ফালজুর রাজ। জৈন্তিয়া সমভূমির সবচেয়ে প্রাচীন জনপদসমূহ ছিল এই চারটি খেলুরাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন জনপদসমূহ ছিল ছয়টি হাজারকি রাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হল- ধরগাম রাজ, চতুল রাজ, খরিল রাজ, পাঁচভাগ রাজ, আড়াইখা রাজ ও চাউরা রাজ।

খেলুরাজ ও হাজারকি রাজগুলোতে সিন্টেং রাজবংশের উদ্ভবের আগে থেকেই জনবসতি ছিল। সিন্টেং রাজাদের শাসনামলে জৈন্তিয়ার কিছু নিম্নভূমি বা হাওর এলাকা পলিমাটি দ্বারা ভরাট হয়ে জনবসতিতে রূপান্তরিত হয়। রাজারা এসব জনপদকে বিভিন্ন হাজারকি রাজের অধীনে ‘জুলাই রাজ’ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এসব জুলাই রাজের সংখ্যা ছিল আট। এর মধ্যে সাতটির অবস্থান বর্তমান কানাইঘাট উপজেলায় এবং একটির অবস্থান কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায়। এগুলোর নাম হচ্ছে- মুলাগুল রাজ, সাতবাক রাজ, বাজেরাজ, পশ্চিমভাগ রাজ,

বড়দেশ রাজ, বাউরভাগ রাজ, বর্ণফৌদ রাজ ও পিয়াইনগুল রাজ। এসব রাজের কোন প্রতিনিধি সরাসরি জৈন্তিয়ার রাজদরবারে অংশ নিতেন না। যেসব হাজারকি রাজের অধীনে এগুলো পরিচালিত হতো সেসব হাজারকি রাজের প্রধানরাই রাজদরবারে এগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতেন।



চিত্র: জৈন্তিয়া সমভূমির ১৮ রাজ (বর্তমান সিলেট জেলার একাংশ)

জৈন্তিয়া রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী মোট বাইশ জন 'রাজ-প্রতিনিধি' দরবারে অংশ নিতে পারতেন; সমতল থেকে অংশ নিতেন দশ জন (খেলুরাজ ও হাজারকি রাজের প্রতিনিধি) আর পার্বত্য অঞ্চল থেকে অংশ নিতেন বারো জন (পুঞ্জি বা এলাকা রাজের প্রতিনিধি)। ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়ায় ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে 'রাজ-ব্যবস্থা' বিলুপ্তি লাভ করে। ব্রিটিশরা এখানকার ১৮ রাজকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসনের আওতাধীন ১৮ পরগনায় রূপান্তরিত করে। ১৮৫৬ সালের চতুর্থ বন্দোবস্তের সময় পশ্চিমভাগ পরগনাটিকে বাজেরাজের সাথে যুক্ত করা হলে জৈন্তিয়ার পরগনার সংখ্যা হয়ে যায় ১৭। তখন থেকে জৈন্তিয়া সমভূমি 'জৈন্তিয়া ১৭ পরগনা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আমলে 'পরগনা-ব্যবস্থা' বিলুপ্ত হলেও এখনও 'জৈন্তিয়া ১৭ পরগনা' নামটি বেশ প্রসিদ্ধ। নিচে জৈন্তিয়া সমভূমির ১৮টি রাজের আয়তন ও বর্তমান অবস্থানসহ একটি তালিকা দেওয়া হল।

খেলুরাজ
জয়ন্তাপুরী রাজ (৫৯.১৫ বর্গমাইল), জৈন্তাপুর উপজেলা
জাফলং (৪০.০৭ বর্গমাইল), গোয়াইনঘাট উপজেলা
চারিকাটা (৩৭.৮৮ বর্গমাইল), জৈন্তাপুর উপজেলা
ফালজুর (৩১.৮৪ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা

হাজারকি রাজ
ধরগাম (১০৫.৭৮ বর্গমাইল), গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা
চতুল (৩৩.৯৫ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
খরিল (৪৬.৯৫ বর্গমাইল), জৈন্তাপুর উপজেলা
পাঁচভাগ (৭৩.৪৯ বর্গমাইল), গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলা
আড়াইখা (৬৩.৪১ বর্গমাইল), গোয়াইনঘাট উপজেলা
চাউরা (৯.৯২ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা

জুলাই রাজ
মুলাগুল (৫৯.১৪ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
সাতবাক (৩৬.৮৫ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
বাজেরাজ (১২.১৫ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
পশ্চিমভাগ (৪.৫৪ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
বড়দেশ (৩.০৯ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
বাউরভাগ (১৯.৬৩ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
বর্ণফৌদ (৬৬.৮৩ বর্গমাইল), কানাইঘাট উপজেলা
পিয়াইনগুল (৭৪.০৬ বর্গমাইল), কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা

ছয়. জৈন্তিয়া পাহাড়ের ১২ রাজ

পুরাতত্ত্ববিদ রাজমোহন নাথের মতে, জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসী সিন্টেংরা আদি সিন (Tsin) বংশের লোক। তাদের আদি বাসভূমির নাম ছিল টেইং (Teing)। Tsin ও Teing শব্দটি মিলে Tsinteing বা Synteng শব্দটির উদ্ভব। আর সেখান থেকেই এসেছে 'জৈন্তিয়া', 'জয়ন্তীয়া' বা 'জৈন্তা' শব্দটি। সুদূর অতীতে জৈন্তিয়া পাহাড়ে সিন্টেংদের বসতি ছিল অল্প এবং তাদের সমাজটাও ছিল বেশ সরল। প্রতিটি বসতি একেকজন সিন্টেং প্রধানের অধীনে পরিচালিত হতো। এসব বসতি প্রধানকে বলা হতো 'লাংদহ'। একজন লাংদহ একাধারে ধর্মযাজক, বিচারক এবং প্রশাসকের ভূমিকা পালন করতেন। তাকে

বসতির সবাই মেনে চলতো এবং পছন্দ করতো। বসতিগুলো পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ায় লাংদহদের ওপরে আর কারও কর্তৃত্ব ছিল না। কালক্রমে সিন্টেং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সমাজব্যবস্থাও বদলে যেতে থাকে।



চিত্র: জৈন্তিয়া পাহাড়ের ১২ রাজ (বর্তমান মেঘালয়ের একাংশ)

বিভিন্ন গোষ্ঠীর (প্নার ভাষায় এসব গোষ্ঠী বা ক্ল্যানকে ‘কুর’ বলা হতো) সিন্টেং পরিবারসমূহের সমন্বয়ে বড় বড় ‘ক্লং’ নামক বসতি গড়ে উঠতে থাকে। এসব বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সিন্টেংরা আরও বড় সামাজিক সংগঠনের জন্ম দেয়। এর নাম ‘রাইদ’। কয়েকটি ক্লং মিলে একটি রাইদ গঠন হতো। আবার কয়েকটি রাইদ মিলে গঠন হতো একটি ‘এলাকা’। বাংলা ভাষায় এলাকা বোঝাতে পুঞ্জি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সিন্টেংদের এলাকা বা পুঞ্জি ছিল মোট ১২টি। একেকটি পুঞ্জির প্রধান বা সরদারকে বলা হতো ‘দলই’। সিন্টেং সমাজে দলইরা ছিলেন খুবই প্রভাবশালী। পুরো সিন্টেং সমাজকে মাত্র ১২ জন দলই নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের ওপরে আর কারও কোন কর্তৃত্ব ছিল না। সিন্টেং সমাজকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই দলইরা নিজেদের মধ্যে একজনকে প্রধান দলই হিসেবে সাব্যস্ত করতেন। তাঁর উপাধী ছিল ‘সিয়েম’।

সিয়েমের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ১২টি পুঞ্জিকে বলা হতো ‘হিমা’। সাধারণত সুতংগা পুঞ্জির দলইকে হিমার সিয়েম নির্বাচিত করা হতো।



চিত্র: সিন্টেংদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সুতংগা পুঞ্জির দলই তথা হিমার সিয়েমের হাতে জৈন্তিয়া সমভূমির কর্তৃত্ব চলে আসে। এই সিয়েমের নাম ছিল মানগোসাঁই বা বড়গোসাঁই। ঘটনাচক্রে তিনি সমতলের রাজা হয়েছিলেন এবং সেখানে একটি নতুন রাজবংশের (সিন্টেং রাজবংশ) সূচনা করেছিলেন। হিমার সিয়েম আর সমতলের রাজা একই ব্যক্তি হওয়ায় তখন থেকে জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমভূমির মধ্যে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য সিন্টেং রাজবংশের প্রথমদিকের রাজারা সিন্টেংদের কাছে শুধুমাত্র হিমার সিয়েম হিসেবেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন; সিন্টেংরা তাদেরকে ‘রাজা’ মনে করতো না। খুব সম্ভবত রাজা যশোমাণিকের সময় থেকে সিন্টেং দলইরা রাজদরবারে অংশ

নিতে শুরু করেন। তখন থেকে হিমার সিয়েম সিন্টেংদের কাছে রাজা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। দলইরা সিয়েমকে রাজা হিসেবে মেনে নেওয়ায় ১২টি পার্বত্য পুঞ্জি বা এলাকা জৈন্তিয়ার 'রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

হিমার এলাকাসমূহ জৈন্তিয়ার রাজ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও এগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল। সিন্টেং দলইরা স্বাধীন সরদার হিসেবেই নিজেদের এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাদের নিজস্ব অর্থবল এবং লোকবল ছিল। তাঁরা শুধু মৌখিকভাবেই রাজার আনুগত্য করতেন এবং রাজ্যের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাজাকে সহায়তা করতেন। তারা রাজাকে কোনো কর দিতেন না; রাজার প্রতি আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিবছর একটি করে বলির পাঠা উপহার দিতেন। প্রতিবছর শারদীয় উৎসবের সময় ১২টি এলাকা থেকে রাজার কাছে ১২টি বলির পাঁঠা পৌঁছানো হতো। এই প্রতীকী আনুগত্যের তাৎপর্য ছিল অনেক গভীর। রাজাকে বহিরাগত শক্তির হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে সিন্টেং দলইগণই মূল ভূমিকা পালন করতেন। তাদের কারণেই কোন বহিরাগত শক্তির পক্ষে জৈন্তিয়া দখল করা সম্ভব হতো না। বর্তমান ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড় ও পশ্চিম জৈন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যে তাদের এলাকসমূহ বিস্তৃত ছিল। এলাকাসমূহের তালিকা নিম্নরূপ (একাধিক সূত্র থেকে সংগৃহীত তালিকাসমূহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে)।

জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের তালিকা	অধ্যাপক রাভি পুভাইয়া কর্তৃক প্রণীত তালিকা তথ্যসূত্র: *Ka History ka Ri Jaintia ha shwa ki Phareng,* End News, Khliehriat, 26 August 2023	*হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর তালিকা
সুতংগা নারতিয়াং নাথেলাং নারপুহ নংজিনি নংবারেহ	Sutnga Nartiang Nongtalang Nangphyllut Nongjngi Nangbah	Suhtnga Nartiang Natelang Norpuh Nongjhini Nongbare

লখডং সাংপুং ময়সু জোয়াই রাম্ভাই গোভা	Lakadong Shangpung Mynso Jowai Raliang Amwi	Lakhdong Shangpung Myuso Jawai Raliang Rambhai

অধ্যায় দুই
পৌরাণিক যুগের কাহিনী

পৌরাণিক সাহিত্য (Mythological Literature) হলো প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত লোককাহিনী, দেবতা, বীর যোদ্ধা বা অলৌকিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত কাহিনীর সংকলন। পৌরাণিক সাহিত্যকে সরাসরি ইতিহাসের দলিল বলা না গেলেও এগুলোকে প্রাচীন ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। পুরাণ, মহাকাব্য (রামায়ণ, মহাভারত) এবং অন্যান্য লোককাহিনীতে কল্পনার আধিক্য এবং অলৌকিকতা থাকলেও এসবের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মানুষের জীবনধারা সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য। রামায়ণ ও মহাভারত হল প্রাচীন ভারতের প্রধান দুটি মহাকাব্য (Epics) যা এখানকার প্রাচীন যুগের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অমূল্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলিতে বর্ণিত ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে প্রাচীন যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

এক. আর্যাবর্ত ও অনার্যাবর্ত

রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাসমূহ এমন এক যুগের চিত্র তোলে ধরে যখন ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যেসব অঞ্চল আর্যদের দখলে চলে গিয়েছিল সেগুলোকে বলা হতো আর্যাবর্ত। আর যেসব অঞ্চল আর্যদের দখলে যায়নি সেগুলোকে বলা হতো অনার্যাবর্ত। ভারত উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ডসমূহে আর্যদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে এসে তাদেরকে বেশ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল। এজন্য আর্যরা এই অঞ্চলের মানুষকে রাক্ষস-খোক্ষস-অসুর প্রভৃতি নামে ডাকতো। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম অঞ্চলের মূল অধিবাসীরাই হলেন মহাকাব্যে বর্ণিত রাক্ষস-খোক্ষস ও অসুর জাতির লোক। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীদেরকেও এই শ্রেণিতে ফেলা যায়। এর কারণ, এই অঞ্চলেও অনার্যদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্জুন এখানে এসে বেশ বাধার মুখে পড়েছিলেন।

দুই. অনার্যাবর্তের প্রাগজ্যোতিষপুর

মহাভারতের যুগে বৃহত্তর সিলেট এবং আসাম মূলত একই অঞ্চল ছিল। তবে 'সিলেট' কিংবা 'আসাম' নামের কোন অস্তিত্ব তখন ছিল না। পুরো অঞ্চলকে তখন বলা হতো প্রাগজ্যোতিষপুর। সিলেটের ইতিহাস গবেষক অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থে লিখেছেন, প্রাগজ্যোতিষপুর ছিল আর্যাবর্তেরই অংশ। কিন্তু এর সত্যতা নিয়ে তিনি নিজেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। এর কারণ, পৌরাণিক কাহিনীগুলোর ভিত্তিতে প্রাগজ্যোতিষপুরকে একটি আর্য জনপদ হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। তাই অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রাগজ্যোতিষপুরকে একটি 'সম্ভাব্য আর্য জনপদ' হিসেবেই দেখেছেন। তিনি মনে করতেন, পৌরাণিক কাহিনীগুলোতে যে সময়কালের কথা বর্ণিত হয়েছে তার পরবর্তীতে কোন এক অজানা সময়ে হয়তো প্রাগজ্যোতিষপুর আর্যদের পদানত হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে কোন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দলিল না থাকায় অন্যান্য ঐতিহাসিকরা প্রাগজ্যোতিষপুরকে অনার্যাবর্তের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন।

মহারাজা ভগদত্তের শাসনামলে প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যটি বিশাল আকার ধারণ করেছিল। বর্তমান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ, বাংলাদেশের বৃহত্তর কুমিল্লা-সিলেট-ময়মনসিংহ-রংপুর অঞ্চল এবং নেপালের কিছু অংশ তখন প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত উপহাদেশে আর্যাবর্তের বাইরে প্রাগজ্যোতিষপুরই ছিল সবচেয়ে বড় রাজ্য। আয়তনের দিক বিবেচনায় এটি ছিল রীতিমতো একটি সাম্রাজ্য। তাই পৌরাণিক সাহিত্যে ভগদত্তকে 'মহারাজা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তর দিকে ছিল হিমালয়। দক্ষিণ দিকে ছিল সাগর (বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল তখন সাগরে নিমজ্জিত ছিল)। পূর্বদিকে ছিল চীনা বা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর এলাকা। পশ্চিমদিকে ছিল আর্যদের কিংবা আর্যদের সাথে বিবদমান বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এলাকা।

তিন. নরকদত্তের প্রাগজ্যোতিষপুর বিজয়

প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের কথা একাধিক পৌরাণিক সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। *মহাভারত, কালিকা পুরাণ, ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণসহ*

বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মহারাজা ভগদত্তের পূর্বপুরুষরা প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসী ছিলেন না। তারা ছিলেন পৌরাণিক রাজ্য বিদেহ বা অঙ্গদেশের অধিবাসী। বর্তমান ভারতের বিহার ও নেপালের কিছু অংশ পুরাকালে বিদেহ বা অঙ্গদেশ নামে খ্যাত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ বা চতুর্দশ শতকে বিদেহের শাসক ছিলেন মহারাজ সিরধ্বজ। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল মিথিলা। মিথিলার রাজাদের উপাধি ছিল 'জনক'। তাই বিভিন্ন পুরাকাব্যে মহারাজ সিরধ্বজকে 'রাজর্ষি জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[2] মহারাজ সিরধ্বজ বা রাজর্ষি জনকের পুত্রের নাম ছিল নরকদত্ত বা নরকাসুর। তিনি অত্যন্ত অল্পবয়সেই সমরবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সেই তিনি পিতার নির্দেশে বিদেহের প্রতিবেশী রাজ্য প্রাগজ্যোতিষপুর জয় করেছিলেন।

ইতোপূর্বে এই রাজ্যটি ছিল বিভিন্ন মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি রাজ্য। 'কিরাত' নামক একটি মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী এখানে বেশ প্রভাবশালী ছিল। এই জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস ছিল চীনের হোয়াংহো নদীর অববাহিকায়। সেখান থেকে প্রাগজ্যোতিষপুরে এসে তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সময়ের পরিক্রমায় একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। এই জনগোষ্ঠীর সরদার বা রাজারাই প্রাগজ্যোতিষপুর শাসন করতেন। রাজর্ষি জনকের পুত্র নরকদত্ত এই জনগোষ্ঠীরই একজন রাজার হাত থেকে প্রাগজ্যোতিষপুর দখল করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল ঘটক। ঘটকের পূর্বে কিরাত জনগোষ্ঠীর আরও কয়েকজন রাজা প্রাগজ্যোতিষপুর শাসন করেছিলেন বলে পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ছিলেন রাজা মহীরাং। পৌরাণিক কাহিনীতে তাকে 'মহীরাং দানব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পরবর্তী রাজা ছিলেন তাঁর পুত্র হাটক। হাটকের পরে রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র সম্বর। সম্বরের পরে রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র রত্ন।

পৌরাণিক কাহিনীতে তাদের সকলকে 'অসুর' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের নামের সাথে এই শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পুরাণের বর্ণনা

---

[2] মিথিলার অধিকাংশ অঞ্চল বর্তমানে নেপালের অন্তর্ভুক্ত। নেপালের জনকপুর শহরের নামকরণ করা হয়েছে রাজা জনকের নামে। বিদেহ রাজ্যটির পশ্চিমের সীমানা ছিল গণ্ডকী নদী; পূর্বের সীমানা ছিল মহানন্দা নদী। উত্তরের সীমানা ছিল হিমালয় আর আর দক্ষিণের সীমানা ছিল গঙ্গা নদী।

অনুযায়ী, মহীরাং দানবের পরে তাঁর পুত্র হাটকাসুর প্রাগজ্যোতিষপুর বা কিরাতদেশের রাজা হয়েছিলেন (পুরাণে প্রাগজ্যোতিষপুরকে 'কিরাতদেশ' বা 'কিরাত রাজ্য' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে)। এরপর উত্তরাধিকারসূত্রে সম্বরাসুর ও রত্নাসুর রাজা হয়েছিলেন। রত্নাসুরের কোন উত্তরাধিকারী ছিলেন না (সম্ভবত)। তাই তাঁর পরে প্রাগজ্যোতিষপুরের সিংহাসনে বসেছিলেন সেনাপতি ঘটক। পৌরাণিক কাহিনীতে তাকে 'অসুররাজ ঘটকাসুর' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাজর্ষি জনকের পুত্র নরকদত্ত এই ঘটকাসুরের কাছ থেকেই রাজ্যটি দখল করেছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল, প্রাগজ্যোতিষপুর দখলের কিছুদিন পরে নরকদত্ত নিজেও হয়ে গেলেন একজন অসুর (আর্যদের দৃষ্টিতে)। প্রাগজ্যোতিষপুরে নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর তিনি সেখানকার ধর্মমতের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসীরা ছিল সনাতনবৈদিক ধর্মমতের অনুসারী। তারা সর্বেশ্বর ব্রহ্মা ও ধর্মাবতার শিবের (শিব একজন অনার্য অবতার) উপাসনা করতো। তাই আর্যদের চোখে তারা ছিল মহাপাপী। আর্যরা তখন ইন্দ্র, বরুণ ও অগ্নি দেবতার উপাসনা করতো। তারা ছিল আর্যবৈদিক ধর্মমতের অনুসারী। নরকদত্ত আর্যবৈদিক ধর্মমত ছেড়ে সনাতনবৈদিক ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি আর্যদের চোখে একজন অসুর হয়ে উঠেছিলেন। সনাতনবৈদিক ধর্মমতের অনুসারী হওয়ায় আর্যরা তাকে নরকাসুর নামে ডাকতো। আর্যদের চোখে পাপী হলেও প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসীদের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এই অঞ্চলের লোকজন তাকে নিজেদের রাজা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। এই অঞ্চলে প্রচুর স্বাধীন সামন্ত রাজা বা সরদারের অস্তিত্ব ছিল। এরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন এবং এদের সমর্থন ছাড়া প্রাগজ্যোতিষপুরকে নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় ছিল না।

নরকদত্ত বা নরকাসুর এদের সমর্থন লাভ করেছিলেন। তাই রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে তাকে খুব বেশি বাধার মুখে পড়তে হয়নি। পৌরাণিক সাহিত্য থেকে জানা যায়, প্রাগজ্যোতিষপুরে শোণিতপুর নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল। কিরাত জনগোষ্ঠীর একজন রাজা বা সরদার এই অঞ্চল শাসন করতেন। তাঁর নাম ছিল বাণাসুর। তিনি নরকদত্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন এবং নরকদত্তকে সনাতনবৈদিক ধর্মমত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। নরকদত্ত এই প্রভাবশালী সামন্ত রাজার পরামর্শ গ্রহণ করে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন

(এরপর থেকে তিনি আর্যবৈদিক সাহিত্য বা পৌরাণিক সাহিত্যে নরকাসুর নামে অভিহিত হয়েছিলেন)। প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত আরেকটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ছিল কামরূপ। সনাতনবৈদিক ধর্মাবলম্বীদের কাছে কামরূপের রানী কামাখ্যা দেবী ছিলেন এক পূজনীয় চরিত্র। নরকদত্ত বা নরকাসুর এই রানীর বাড়ির সিঁড়ি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। নরকদত্তের স্ত্রীর নাম ছিল মায়াদেবী। মায়াদেবী চারটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এদের নাম ছিল ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মন্দবান ও সুমালী।

চার. মহারাজা ভগদত্তের শাসনামল

রাজা নরকদত্ত বা নরকাসুরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ভগদত্ত প্রাগজ্যোতিষপুরের সিংহাসনে বসেন। যোগ্যতায় তিনি পিতার চেয়েও এগিয়ে ছিলেন। পিতার রাজ্যের সীমানাকে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। যতদূর অনুমান করা যায়, মহারাজা ভগদত্ত শক্তির জোরে এই রাজ্যবিস্তার করেননি। আর্যদের হাত থেকে পূর্ব ভারতকে রক্ষার জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের আশেপাশের সকল জনগোষ্ঠীর সরদার বা রাজাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সবাই তাঁর বশ্যতা মেনে নিয়ে এক সুবৃহৎ ও ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেছিলেন। এই বর্ধিত প্রাগজ্যোতিষপুরের মধ্যে বহু ভাষাভাষী বিচিত্র জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। আর্যদের হাত থেকে মাতৃভূমি রক্ষার প্রয়োজনেই তারা মহারাজা ভগদত্তের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন।

মহাভারতের যুগে আর্যদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপরাজ্য ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। এই ইন্দ্রপ্রস্থের প্রথম রাজা ছিলেন যুধিষ্ঠির। *মহাভারতের* কাহিনী অনুযায়ী, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠির নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বা অদ্বিতীয় সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ‘রাজসূয় যজ্ঞ’ নামে একটি বিশেষ অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন (প্রাচীনকালে কোনো রাজা বা সম্রাট নিজেকে অদ্বিতীয় প্রমাণ করতে এই যজ্ঞ করতেন)। যজ্ঞের আগে যুধিষ্ঠিরের চার ভাই (ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব) চারদিকে দিগ্বিজয়ে বের হন এবং বিভিন্ন রাজাকে পরাজিত করে কিংবা মৈত্রী স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য কর আদায় করেন। যারা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য কর দিয়েছিলেন তারা তাঁর আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এভাবে বিভিন্ন স্থানীয়

শাসক বা রাজাদের আনুগত্য আদায় করে যুধিষ্ঠির নিজেকে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্য আর্যদের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেও পূর্ব ভারতের চিত্র ছিল ভিন্ন। পূর্ব ভারতের সকল ছোটবড় রাজা ও সরদাররা তখন মহারাজা ভগদত্তের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আর্যদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে পাণ্ডব সৈন্যরা (যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভাইদেরকে পাণ্ডব বলা হতো) বিভিন্ন রাজ্য জয়ের পর প্রাগজ্যোতিষপুরের সীমানায় এসে উপনীত হয়। তারা মহারাজা ভগদত্তের কাছে যজ্ঞের জন্য কর দাবি করে। কিন্তু ভগদত্ত তা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের অধীনতা মেনে নিলেন না। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। টানা আটদিন ধরে এই যুদ্ধ চলে। পাণ্ডব সৈন্যরা ভাবতেও পারেনি মহাবীর ভগদত্তের রণকৌশলের কাছে তাদেরকে এভাবে নাস্তানুবাদ হতে হবে। ভগদত্তের সৈন্যদের আক্রমণের মুখে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে উত্তরের গভীর বনে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

এমতাবস্থায় পাণ্ডব সেনাপতি অর্জুন সমঝোতার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভগদত্তের সাথে দেখা করে বললেন, "হে মহামত্ত বীর। এবার রণে নিবৃত্ত হও। তোমার শক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল না। এতোদিনে তোমার যোগ্যতা জেনে খুশি হচ্ছি।" এরপর তিনি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য কিছু উপহারের (কর নয়) আবদার করলেন। ভগদত্ত অর্জুনের এই সমঝোতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিনি খুশি মনে অর্জুনের হাতে বেশ কিছু উপহার তোলে দিলেন। অর্জুন ভগদত্তকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলেন। এরপর ভগদত্ত আর্যাবর্তের বাইরের একজন স্বাধীন সম্রাট হিসেবেই প্রাগজ্যোতিষপুর শাসন করতে থাকলেন। পৌরাণিক কাহিনী থেকে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আন্দাজ করা যায় না। যতদূর অনুমান করা যায়, পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০০ সালের কাছাকাছি সময়ে।

পাঁচ. প্রাগজ্যোতিষপুরের বিভিন্ন উপ-রাজ্য

আগেই বলা হয়েছে, মহারাজা ভগদত্তের সাম্রাজ্য বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর্য হুমকি মোকাবিলার জন্য পূর্ব ভারতের বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর রাজা বা সরদাররা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। প্রাগজ্যোতিষপুর ছিল মূলত অসংখ্য স্বায়ত্তশাসিত খণ্ড-রাজ্য বা উপ-রাজ্যের সমষ্টি। কামরূপ বা 'কামারূপা' ছিল এর কেন্দ্রীয় অঞ্চল। ভগদত্তের রাজধানী কামরূপেই ছিল। তিনি কিছু উপ-রাজধানীও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকেই ঐতিহাসিকরা এমন অনুমান করেছেন। পণ্ডিতবর রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর *ভারতের ইতিহাস* (১৮৮৭ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে লিখেছেন যে, মহারাজা ভগদত্তের শাসনামলে বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লাউড় পাহাড়ে তাঁর একটি উপ-রাজধানী ছিল। এর ভগ্নাবশেষ আজও এসব অঞ্চলে বিদ্যমান। মহারাজা ভগদত্ত দিনারপুর থেকে লাউড়, লাউড় থেকে গৌড় পর্যন্ত খেয়া নৌকায় চলাফেরা করতেন। তাঁর সময়ে প্রাচীন সিলেটের এসব অঞ্চলের নিম্নভূমি পানিতে নিমজ্জিত থাকতো।

লাউড় ছিল মূলত মহারাজা ভগদত্তের একটি উপ-রাজ্য। গৌড়ের ক্ষেত্রেও এই অনুমানটি খাটে। এই অঞ্চলের আরেকটি প্রাচীন রাজ্য হল জয়ন্তী বা জয়ন্তীয়া (ব্রিটিশ আমল থেকে জৈন্তিয়া নামে প্রসিদ্ধ)। লাউড় এবং গৌড়ের মতো এরও প্রাচীন ইতিহাস বেশ অস্পষ্ট। পৌরাণিক যুগে এই রাজ্যটি নারী-রাজ্য বা স্ত্রী-রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এটিও মহারাজা ভগদত্তের অনুগত একটি উপ-রাজ্য ছিল বলেই মনে হয়। পৌরাণিক কাহিনী থেকে এই রাজ্যটি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয় যে, ভগদত্ত এই রাজ্যটিকে প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতাই দিয়েছিলেন; এখানে তাঁর কোন হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এর কারণ, রাজ্যটি ছিল একটি স্বাধীনচেতা জনগোষ্ঠীর নারী শাসক বা সরদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি দুর্গম ও সুরক্ষিত অঞ্চল। এখানে বাইরের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত।

মহারাজা ভগদত্তের পরবর্তী যুগে প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসীদের মধ্যে যেসব দেব দেবীর ধারণা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তাদের মধ্যে কামাখ্যা দেবী এবং জয়ন্তী বা জয়ন্তেশ্বরী দেবীই ছিলেন প্রধান। এরা উভয়েই ছিলেন খাঁটি অনার্য দেবী। পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায়, এক যুগে যারা রাজা বা রানী ছিলেন তারাই অন্য যুগে দেব-দেবীতে পরিণত হয়েছেন। এই সত্যটি অনার্যাবর্তের দেব-দেবীদের ক্ষেত্রেও খাটে। একথাটি নিশ্চিতভাবে দাবি করা

যেতে পারে যে, কামাখ্যা দেবী এবং জয়ন্তী বা জয়ন্তেশ্বরী দেবী একদা সশরীরে এই মর্ত্যলোকে রাজত্ব করেছিলেন। যোগ্যতায় এবং গুণে অনন্য হওয়ার কারণেই তারা পরবর্তী যুগে দেবী হয়ে উঠেছিলেন। পুরাকালে কামাখ্যা দেবী ছিলেন কামরূপের রানী (কামাখ্যা দেবী কামরূপেশ্বরী হিসেবে পরিচিত) আর জয়ন্তী ছিলেন জয়ন্তীয়ার রানী (জয়ন্তী দেবী জয়ন্তেশ্বরী হিসেবে পরিচিত)। এরা উভয়েই মূলত স্ব-শাসিত অঞ্চল বা উপ-রাজ্যের স্বাধীন নারী শাসক ছিলেন।

কিছু লোক-কাহিনী থেকেও এমন ধারণার স্বপক্ষে প্রমাণ মিলে। কামাখ্যা মন্দিরের অসমাপ্ত সিঁড়ি (মেখেলা-উজোয়া পথ) এবং আসামের দরং জেলার 'কুক্কুটকাটরা' নামক স্থানের সাথে জড়িত লোক-কাহিনী থেকে জানা যায়, মহারাজা ভগদত্তের পিতা নরকদত্ত যখন প্রাগজ্যোতিষপুর জয় করেছিলেন তখন কামরূপের অধিশ্বরী ছিলেন কামাখ্যা দেবী। এই রানীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে নরকদত্ত তাকে বিয়ে করতে চান (যদিও তখন নরকদত্ত বিবাহিতই ছিলেন)। এই প্রস্তাব পেয়ে কামাখ্যা দেবী শংকিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বুদ্ধিমান এই রানী নরকদত্তের প্রস্তাবকে সরাসরি ফিরিয়ে দেওয়ার সাহস দেখালেন না। তিনি এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি রাজা নরকদত্তকে একটি শর্ত দিলেন। শর্তটি হল, যদি রাজা এক রাতের মধ্যেই নীলাচল পাহাড়ের তলা থেকে কামাখ্যা দেবীর বাসস্থান (বর্তমান কামাখ্যা মন্দির) পর্যন্ত একটি সিঁড়ি বানিয়ে দিতে পারেন তাহলে তিনি রাজার সাথে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন।

রাজা এই শর্ত পূরণের চেষ্টা করলেন। এক রাতের মধ্যেই সিঁড়ি নির্মাণের জন্য তিনি নিজের লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। তারা নীলাচল পাহাড়ের তলা থেকে সিঁড়ি বানাতে বানাতে রাত পোহাবার আগেই কামাখ্যা দেবীর বাসস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এমতাবস্থায় দেবী একটি মোরগ বা কুক্কুটকে চেপে ধরলেন। মোরগ ডাক দিল। সবাই বুঝল, রাত শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু অল্পের জন্য সিঁড়ি নির্মাণ শেষ হয়নি। রাজা হেরে গেলেন। পরবর্তীতে রাজা আসল সত্য জানতে পেরে মোরগ বা কুক্কুটটিকে ধাওয়া করলেন। বর্তমান 'কুক্কুটকাটরা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মোরগটিকে ধরে ফেললেন এবং হত্যা করলেন। এই উপাখ্যান থেকে প্রমাণিত হয় যে, কামাখ্যা দেবী ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের একটি অঞ্চলের স্বাধীন নারী শাসক।

নরকদত্ত প্রাগজ্যোতিষপুর বিজয়ের পরে এই নারী শাসকের অঞ্চলেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এতে কামাখ্যা দেবীর রাজ্যটি বিলুপ্তি লাভ করেছিল (তবে রানী আমৃত্যু নিজের বাসস্থানেই ছিলেন বলে অনুমান করা যায়)। তবে জয়ন্তীয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটেনি। একটি স্বায়ত্বশাসিত নারী-রাজ্য বা স্ত্রী-রাজ্য হিসেবে এটি দীর্ঘদিন ধরে টিকে ছিল। এমনকি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের (রাজসূয় যজ্ঞের অনেকদিন পরে আয়োজিত আরেকটি যজ্ঞ) সময়ে মহাবীর অর্জুন এসে এই রাজ্যটি দখল করতে পারেননি। মহারাজা ভগদত্তের বাহিনীর কাছে তিনি অতীতে যেমন নাস্তানুবাদ হয়েছিলেন তেমনি নারী-রাজ্যের নারী যোদ্ধাদের হাতেও তিনি নাস্তানুবাদ হয়েছিলেন। *মহাভারতের* যুগের এই নারী-রাজ্যের অধিবাসীরা একটি মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীরই সদস্য ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। তাদেরই বংশধররা বর্তমানে খাসিয়া ও সিন্টেং (জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠী নামেও পরিচিত) জনগোষ্ঠী হিসেবে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে বসবাস করছেন।

ছয়. নারী-রাজ্য বা স্ত্রী-রাজ্যের উপাখ্যান

'নারী রাজ্য' বা নারীদের দ্বারা শাসিত রাজ্যের ধারণাটি ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে খুবই আকর্ষণীয়। বর্তমান পৃথিবীতে যেসব মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের কারও কারও পূর্ববর্তীরা 'নারী রাজ্য' বা নারীদের দ্বারা শাসিত রাজ্য গড়ে তোলেছিলেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো রাষ্ট্রীয় সমাজ ছিল না; এগুলো ছিল মূলত সরল সমাজ কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত এক ধরণের 'নারী সরদারতন্ত্র' বা Matriarchy. আগের আমলের দুনিয়ায় সত্যিকারের নারী শাসিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল একটি বিরল ব্যাপার। জয়ন্তীয়া ছিল এমনই একটি রাজ্য। বহিঃশক্তিকে মোকাবিলা করে টিকে থাকার মতো শক্তি এই রাজ্যের ছিল। জয়ন্তীয়ার নারী যোদ্ধারা তৎকালীন যুগের সমরকৌশলে পুরোপুরি পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তারা আর্য মহাবীর অর্জুনের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।

মহাভারতের যুগে জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন রানী প্রমীলা। তিনি নিজেই জয়ন্তী দেবী বা জয়ন্তেশ্বরী ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। তিনি মহারাজা ভগদত্তের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। ভগদত্তের মৃত্যুর পর প্রাগজ্যোতিষপুরের শক্তি কিছুটা ক্ষয় হয়েছিল। এমতাবস্থায় আর্যরা আবারও এই অঞ্চলে ঢুকে

পড়ে। পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির তখন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। এই যজ্ঞের নিয়ম ছিল যুধিষ্ঠিরের অশ্ব বা ঘোড়া যেসব রাজ্যে প্রবেশ করবে সেসব রাজ্য যুধিষ্ঠিরের অধীনস্থ বলে গণ্য হবে। মহাবীর অর্জুন ছিলেন এই যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক। যেসব রাজারা যুধিষ্ঠিরের অধীনতা অস্বীকার করে যজ্ঞের ঘোড়া আটক করবেন তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য অর্জুন একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বের হলেন। ঘোড়াটি আর্য সীমানা পেরিয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরে প্রবেশ করল এবং গারো পাহাড়ের পাদদেশ হয়ে পূর্বদিকের নারী রাজ্য জয়ন্তীয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

তৎকালীন সময়ে খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড় এবং এর পাদদেশের সমতল অঞ্চল (উত্তর সিলেট) ছিল নারী রাজ্য জয়ন্তীয়ার অন্তর্ভুক্ত। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়া ক্রমশ এগিয়ে গিয়ে এই রাজ্যেই প্রবেশ করল। কিন্তু এরপর যা ঘটল তা ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য! নারী রাজ্যের অধীশ্বরী প্রমীলা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়া আটক করে ফেললেন। এসব ঘটনার কথা জানা যায় বিভিন্ন লোককথা ও *জৈমিনি মহাভারতের* বর্ণনা থেকে। *জৈমিনি মহাভারত* রচনা করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঋষি জৈমিনি। তিনি ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনীতে অর্জুন ও প্রমীলার যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অর্জুন ও প্রমীলার এই উপাখ্যানটি বৃহত্তর বাংলা অঞ্চলের লোককথা ও যাত্রাপালায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রেমের জয়ের এক অনবদ্য কাহিনী এটি।

জৈমিনি মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াটি যখন অর্জুনের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্য জয় করে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন তা প্রমীলা নামের এক রানীর রাজ্যে প্রবেশ করে। প্রমীলা ছিলেন একটি অভিশপ্ত নারী রাজ্যের শাসক (আর্যদের দৃষ্টিতে), যেখানে বাইরের কোনো পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। রানী প্রমীলা ছিলেন একজন অসামান্য সুন্দরী ও পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তিনি যখন দেখলেন যে, একজন পুরুষ (অর্জুন) সদলবলে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেছে তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। অর্জুন এসব নারী সৈন্যদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রমীলা অর্জুনকে পরাজিত ও বন্দী করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। প্রমীলা এবং তার নারী বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অর্জুনের

বাহিনীর সাথে লড়াই করে। কিছু লোককাহিনী অনুযায়ী, প্রমীলা তাঁর জাদুকরী ও আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে অর্জুনকে মুগ্ধ বা পরাজিত করেছিলেন। আবার কিছু বর্ণনায় আছে, প্রমীলা অর্জুনের ধনুক ও অস্ত্রশস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে তাকে বশ করেছিলেন।

মহাবীর অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। অন্যদিকে প্রমীলাও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত (আর্যদের এই দাবি কতোটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে সংশয় আছে)। প্রমীলা যখন অর্জুনকে কাবু করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মূলত শ্রীকৃষ্ণই তাঁর দৈব ক্ষমতাবলে প্রমীলার মনে এমন ইচ্ছা জাগিয়েছিলেন। তাঁর হস্তক্ষেপেই অর্জুন ও প্রমীলার যুদ্ধের ঘটনাটি একটি মধুর মিলনের ঘটনায় মোড় নিল। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তারা উভয়ে যুদ্ধের পরিবর্তে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। জৈমিনি ভারত অনুসারে, অর্জুন প্রমীলাকে বিবাহ করে নিজের দেশ হস্তিনাপুরে নিয়ে যান। তবে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এর কারণ, খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীগুলোর রীতি অনুযায়ী বিয়ের পরে কন্যার ঘরেই বরকে আসতে হয়। তাদেরই আদি জনগোষ্ঠীর রানী নিজের রাজ্য ছেড়ে স্বামীর দেশে চলে যাবেন- এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জৈমিনি মহাভারতে জয়ন্তীয়া রাজ্যের নামটি সরাসরিই উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রমীলাকে এর অধিশ্বরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সংকান্ত শ্লোকটি নিম্নরূপ।

জয়ন্তী নাম তত্রাস্তি নারীরাজ্যং মহৎ প্রিয়ম
যত্র প্রমীলা নাম রাজ্ঞী বীর্যবতী স্থিতা
(অর্থ: সেখানে জয়ন্তী নামে এক মহান ও প্রিয় নারীরাজ্য রয়েছে
যেখানে অত্যন্ত বীর্যবতী রানী প্রমীলা রাজত্ব করতেন।)

বিভিন্ন প্রবাদ ও লোককাহিনীতেও জয়ন্তীয়ার নারী শাসকদের কথা বার বার উঠে এসেছে। জয়ন্তীয়া অঞ্চলে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ হল 'পান, পানি, নারী—এই তিনে জৈন্তাপুরী'। এখানে 'নারী' বলতে সুদূর অতীতের নারী শাসকদের উপাখ্যান এবং বর্তমান মাতৃপ্রধান খাসি-সিন্টেং জনগোষ্ঠীর নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। *জৈমিনি মহাভারতে* বর্ণিত নারী রাজ্য সম্পর্কিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।

প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয়।
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে লক্ষ চারি।
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে।
পুরুষ নাহিক তাহে কহিনু বিশেষে।
ভ্রমিতে ঘোড়া গেল তাহারই পুরে।
ধরিল রমণীগণ পাইয়া ঘোড়ারে।

অধ্যায় তিন
তান্ত্রিক যুগের কথা
(৫০০ সাল – ১২০০ সাল)

বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যুগ (ইতিহাসের আগের যুগ) সম্পর্কে জানার অন্যতম সূত্র হল তন্ত্রসাহিত্য বা তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্র হল খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রচলিত এক বিশেষ ধরণের উপাসনা ও সাধনপদ্ধতির নাম যা দ্বাদশ শতকের মধ্যে কামরূপ (সিলেট ও আসাম অঞ্চল), বাংলা ও কাশ্মীরের মানুষের ধর্মীয় জীবনের অংশে পরিণত হয়েছিল। তন্ত্রসাধনার সাথে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সাহিত্য বা গ্রন্থসমূহকে বলা হয় তন্ত্রশাস্ত্র বা আগম। এই শাস্ত্রটি কোন নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এর চর্চা রয়েছে। এই শাস্ত্রে মূলত যোগ, মন্ত্র, জপ, আচার-অনুষ্ঠান এবং গূঢ় সাধনার মাধ্যমে মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের উপায়সমূহ আলোচিত হয়েছে। মূলত অবৈদিক বা লোকায়ত বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই এই শাস্ত্রটি গড়ে উঠেছে যা সময়ের পরিক্রমায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাশ্রিত সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে তন্ত্রসাধনার উৎপত্তি ঘটে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে। কামরূপ (সিলেট ও আসাম অঞ্চল), বাংলা ও কাশ্মীর অঞ্চল ছিল এর উৎপত্তিস্থল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে এসব অঞ্চলে তন্ত্রসাধনা একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনে রূপ নেয়। এই সময়টিতে তন্ত্রের চর্চা ও এর উপাদানগুলো যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করেছিল। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তান্ত্রিক মতবাদের এই প্রচার ও প্রসার অব্যাহত ছিল। দ্বাদশ শতকে তন্ত্রসাধনা বা তন্ত্রচর্চা এর বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল এবং সাধক সমাজের গণ্ডী পেরিয়ে তা জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তন্ত্রসাধনার বিকাশের এই সময়কালকে বলা হয় তান্ত্রিক যুগ। এই সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ তন্ত্রসাহিত্য রচিত হয়েছিল।

এক. তন্ত্রসাহিত্যে বিভিন্ন প্রাচীন জনপদের কথা

পৌরাণিক সাহিত্যে দেখা যায়, আদিযুগে বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল সেটি ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। কিন্তু তান্ত্রিক সাহিত্যে দেখা যায়, আদিযুগে সিলেট ও আসাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজ্যের নাম ছিল কামরূপ বা কামারূপা। গবেষকদের মতে, প্রাগজ্যোতিষপুর আর কামরূপ মূলত একই রাজ্য। সময়ের ব্যবধানে প্রাগজ্যোতিষপুরই 'কামরূপ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল (তান্ত্রিক যুগে 'প্রাগজ্যোতিষপুর' নামটি প্রচলিত ছিল না; এর স্থলে কামরূপ নামটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল)। তবে প্রাগজ্যোতিষপুরের চেয়ে কামরূপের আয়তন ছিল কম। মহারাজা ভগদত্তের পরবর্তী শত-সহস্র বছরের ব্যবধানে প্রাগজ্যোতিষপুরের মূল অংশটি কামরূপ নামে টিকে ছিল আর অন্যান্য অংশগুলি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তন্ত্রসাহিত্য থেকে জানা যায়, হরিকেল, সমতট, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অঞ্চল ছিল কামরূপের প্রতিবেশী। শ্রীহট্ট ছিল কামরূপের অংশ। তবে জয়ন্তিয়া কামরূপের অংশ ছিল কিনা তা নিয়ে বেশ অস্পষ্টতা আছে। এর কারণ, তন্ত্রসাহিত্যে এ ব্যাপারে বিশদ কোন বর্ণনা নেই।

দুই. তন্ত্রসাহিত্যে জয়ন্তীয়ার কথা

তন্ত্রশাস্ত্রে কামরূপের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হিসেবে এবং জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থান হিসেবে শ্রীহট্টের জয়ন্তিয়ার কথা এসেছে। এছাড়াও একটি জনপদ বা একটি পাহাড়ি অঞ্চল হিসেবেও জয়ন্তীয়ার কথা এসেছে। একাধিক তন্ত্রগ্রন্থে জয়ন্তিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল *কামাখ্যাতন্ত্র*। *কামাখ্যাতন্ত্রে* প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী জনপদ হিসেবে শ্রীহট্টের কথা এসেছে। এই শ্রীহট্টে 'জয়ন্তী দেবী এবং জনার্দন অবস্থান করছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হল, শ্রীহট্টে জয়ন্তী দেবীর মহাপীঠ বা পীঠস্থান রয়েছে এবং জনার্দন বা শিবের কোন একটি প্রাচীন মন্দিরও রয়েছে। শিবমন্দিরটি শ্রীহট্টের অন্যত্র হলেও জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থান জয়ন্তীয়াতেই রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক যুগে জয়ন্তী ছিলেন জয়ন্তীয়ার একজন নারী শাসক বা রানী; সময়ের পরিক্রমায় তিনি স্থানীয়দের কাছে দেবীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তান্ত্রিক যুগেই তিনি জয়ন্তীয়ার অধিশ্বরী বা জয়ন্তেশ্বরী হিসেবে এক দৈব চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। *কামাখ্যাতন্ত্রে* শ্রীহট্ট নিয়ে যে শ্লোক রয়েছে তার দুটি পঙক্তি নিম্নরূপ।

কামরূপস্য দক্ষিণে শ্রীহট্টো নাম নামতঃ
তত্র জয়ন্তী দেবী চ লিঙ্গরূপী জনার্দনঃ
(অর্থ: কামরূপের দক্ষিণ ভাগে শ্রীহট্ট নামক স্থান অবস্থিত।
সেখানে জয়ন্তী দেবী এবং লিঙ্গরূপে জনার্দন অবস্থান করছেন।)

কামাখ্যাতন্ত্রের আরেকটি শ্লোকেও জয়ন্তীয়ার কথা এসেছে। এতে প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সাতটি প্রধান পর্বত ও দেবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রীহট্ট (সিলেট) ও এর প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনায় এই শ্লোকটি ব্যবহৃত হয়। প্রথম সহস্রাব্দে ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যেসব রাজ্য ও জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব ছিল তাদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না বললেই চলে। তাদের সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে যেসব নামমাত্র সূত্র রয়েছে তার মধ্যে আলোচ্য শ্লোকটি অন্যতম। এই শ্লোকের দুটি পঙক্তিতে প্রথম সহস্রাব্দের ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান প্রধান স্বাধীন রাজ্য, জাতিসত্তা এবং তাদের ভৌগোলিক সীমানার কথা একসাথে প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য মধ্যযুগীয় বিভিন্ন গ্রন্থে এই শ্লোকের ব্যবহার দেখা যায় (অতীত ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে)। ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস *রাজমালাতেও* এই শ্লোকের ব্যবহার দেখা যায়। শ্লোকটির বহুল আলোচিত দুটি পঙক্তি নিম্নরূপ।

ত্রিপুরা কৈকিকা চৈব জয়ন্তী মণি চন্দ্রিকা
কাছাড়ী মাগধী দেবী অশ্মনি সপ্ত পর্বত।

এই পঙক্তিদ্বয়ে উল্লিখিত ত্রিপুরা হচ্ছে প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য বা প্রদ্যোত রাজবংশের শাসনাধীন অঞ্চল। কৈকিকা (কৈকিক) হচ্ছে প্রাচীন 'কৈকেয়' বা এর সংলগ্ন কোনো অঞ্চলের অপভ্রংশ। এটি ছিল জয়ন্তীয়া বা কাছাড়ের পার্শ্ববর্তী একটি প্রাচীন জনপদ। জয়ন্তী হচ্ছে প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্য। মণি হচ্ছে মণিপুর রাজ্য, যা মহাভারতের যুগ থেকেই একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। চন্দ্রিকা হচ্ছে প্রাচীন চন্দ্রপুর। চন্দ্রপুর ছিল শ্রীহট্টের অংশবিশেষ। কাছাড়ী হচ্ছে বর্তমান আসামের কাছাড় জেলা বা প্রাচীন ডিমাসা বা কাছাড়ি রাজ্য। মাগধী দেবী বলতে প্রাচীন মগধ রাজ্যের প্রভাব বলয়ে থাকা পূর্বাঞ্চলীয় কোনো পবিত্র স্থান বা দেবীপীঠকে বোঝানো হয়েছে (অনেকে একে কামাখ্যা বা প্রাচীন কামরূপের সীমানার সাথেও তুলনা করেন)। 'অশ্মনি সপ্ত পর্বত'

বলতে বোঝানো হয়েছে যে, এ সমস্ত অঞ্চল সাতটি পর্বতমালা বা গিরিধারা দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত।

কামাখ্যাতন্ত্র ছাড়াও তন্ত্রশাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *তন্ত্রচূড়ামণিতে* জয়ন্তীয়ার কথা এসেছে। এই গ্রন্থে মূলত সনাতন ধর্মের ৫২টি (বা ৫১টি) সতীপীঠের বিশদ বিবরণ, অবস্থান এবং দেব-দেবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। সনাতন পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, দেবী সতীর মৃতদেহ নিয়ে মহাদেব যখন প্রলয় নৃত্য করছিলেন, তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এই স্থানগুলোই পবিত্র 'সতীপীঠ' হিসেবে পরিচিত। সতীর দেহের কোন অংশ কোথায় পড়েছিল তার বিবরণ *তন্ত্রচূড়ামণিতে* দেওয়া আছে। এছাড়াও প্রতিটি পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং তাঁর সঙ্গী ভৈরবের নামও এতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সতীপীঠগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণ এবং আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে *তন্ত্রচূড়ামণিই* প্রধান হিন্দুশাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, সতীদেবীর বাম জঙ্ঘা বা বাম উরু পতিত হয়েছিল জয়ন্তীয়ায়। *তন্ত্রচূড়ামণিতে* উল্লিখিত জয়ন্তীয়া সংক্রান্ত কিছু পঙক্তি নিম্নরূপ।

জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর।
(অর্থ: জয়ন্তী নামক স্থানে দেবীর বাম জঙ্ঘা পতিত হয়েছিল। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম জয়ন্তী। এখানকার ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর।)

বামজঙ্ঘা জয়ন্ত্যাং তু জয়ন্তী ভৈরবস্তথা
ক্রমদীশ্বরস্তত্র দেবী জাগ্রতী সর্বদা।
(অর্থ: জয়ন্তী নামক স্থানে দেবীর বাম জঙ্ঘা পতিত হয়েছিল।
এখানকার দেবী জয়ন্তী এবং ভৈরব ক্রমদীশ্বর সর্বদাই জাগ্রত থাকেন।)

কৈলাশে দশ লক্ষ্যেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চ লক্ষত।
(অর্থ: কৈলাস পর্বতে দশ লক্ষ বার মন্ত্র পাঠে যে পূণ্য বা সিদ্ধি লাভ হয় জয়ন্তী তীর্থে পাঁচ লক্ষ বার মন্ত্র পাঠে সেই একই পূণ্য বা সিদ্ধি লাভ হয়।)

কামাখ্যাতন্ত্র ও *তন্ত্রচূড়ামণির* পাশাপাশি *কালিকাপুরাণেও* জয়ন্তী দেবীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। *কালিকাপুরাণ* মূলত একটি শাক্ত উপপুরাণ হলেও এতে তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর প্রভাব রয়েছে। তাই একে শাক্ত-তান্ত্রিক সাহিত্য বা তন্ত্রসাহিত্য হিসেবেও গণ্য করা হয়। এই উপপুরাণের ৬১তম অধ্যায়ের ৩৯ তম শ্লোকের অংশবিশেষ নিম্নরূপ।

ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে।
(অর্থ: হে দেবী, তুমি জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী,
দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা। তোমাকে প্রণাম।)

তিন. জয়ন্তীয়ার পীঠস্থানের কথা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, সত্যযুগের দেবী সতী ছিলেন মহাদেব শিবের প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন খুবই পতিভক্ত একজন নারী। কিন্তু তাঁর পিতা দক্ষ প্রজাপতি মহাদেব শিবকে মোটেও পছন্দ করতেন না। তাই দক্ষযজ্ঞের সময়ে তিনি প্রকাশ্যে শিবের নিন্দা করেন। পিতা কর্তৃক পতি অপমানের এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে সতী প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তখন ক্রোধে উন্মত্ত শিব সতীর নিথর দেহ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয়নৃত্য শুরু করেন। এতে জগৎ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হলে সকল দেবতার অনুরোধে জগৎপালক বিষ্ণু জগৎ রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তিনি নিজ সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেন। সনাতন ধর্মের শাক্তরা বিশ্বাস করেন, সতীদেহের এসব খণ্ডিত অংশ ভারতবর্ষের মোট ৫১টি জায়গায় পড়েছিল। এসব স্থানকে 'শক্তিপীঠ' বা 'পীঠস্থান' বলা হয়। শাক্তদের কাছে এসব পীঠস্থান পবিত্র তীর্থস্থানরূপে গণ্য হয়ে থাকে।

শাক্তদের বিশ্বাস, প্রতিটি পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবী এবং এর পাশাপাশি একজন রক্ষাকর্তা দেবও আছেন। পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলা হয় 'ভৈরবী' এবং রক্ষাকর্তা দেবকে বলা হয় 'ভৈরব'। জয়ন্তী দেবী হলেন এমন একটি পীঠস্থানের ভৈরবী যেখানে সতী দেবীর বাম জঙ্ঘা বা বাম উরু পতিত হয়েছিল। এই পীঠস্থানের ভৈরব হলেন ক্রমদীশ্বর। পীঠস্থানটির অবস্থান জয়ন্তীয়ায়। কিন্তু জয়ন্তীয়ার ঠিক কোথায় এই পীঠস্থানটি অবস্থিত তা নিয়ে দু'ধরণের বিশ্বাস প্রচলিত আছে। জয়ন্তীয়া সমতল এবং সিলেটের সনাতনীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, পীঠস্থানটির অবস্থান সমতলেই। বর্তমান সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার লক্ষ্মীপ্রাসাদ পশ্চিম ইউনিয়নের বাউরভাগ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে এটি অবস্থিত (এলাকাটি সুরইঘাটের সনাতনপুঞ্জি নামেও পরিচিত)। এই এলাকাটি অতীতে জয়ন্তীয়ার ফালজুর রাজ বা পরগনার অন্তর্গত ছিল। তখন এই পীঠস্থানটি 'ফালজুরের বামজঙ্ঘা মহাপীঠ' নামেই পরিচিত ছিল।



চিত্র: ফালজুরের বামজঙ্ঘা মহাপীঠ

আরেকদল লোকের বিশ্বাস, জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থান অর্থাৎ 'সতীদেবীর বামজঙ্ঘা পতিত হওয়ার' স্থানটি জয়ন্তীয়া পাহাড়ের নারতিয়াং পুঞ্জিতে অবস্থিত। সেখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, বর্তমান নারতিয়াং দূর্গা মন্দিরটিই হচ্ছে জয়ন্তী দেবীর শক্তিপীঠ বা সতীদেবীর বামজঙ্ঘা পতিত হওয়ার স্থান। উভয় পীঠস্থানই আবিষ্কৃত হয়েছে জৈন্তিয়ার (ব্রিটিশ আমল থেকে জয়ন্তীয়ার স্থলে 'জৈন্তিয়া' উচ্চারণটির প্রচলন হয়) সিন্টেং রাজবংশের রাজাদের শাসনামলে। সিন্টেং রাজা প্রথম বড়গোসাঁইয়ের আমলে (আনুমানিক ১৫৫০ সালের আগে) রূপনাথ নামক এক ধর্মযাজক ফালজুরের বামজঙ্ঘা পীঠটি শনাক্ত করেছিলেন। এর পরবর্তীতে (আনুমানিক ১৬০৭-০৮ সালে) রাজা যশোমাণিক স্বপ্নালোকে আদিষ্ট হয়ে নারতিয়াং পুঞ্জির পীঠস্থানটিকে চিহ্নিত করেছিলেন। উভয় পীঠস্থানই বর্তমানে সনাতনীদের কাছে তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ) গ্রন্থের লেখক অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে, জয়ন্তী দেবীর নামেই এই অঞ্চলের নাম 'জয়ন্তীয়া' এবং এর সংলগ্ন পাহাড়ের নাম 'জয়ন্তীয়া পাহাড়' হয়েছে। তবে এর উল্টোটাও হওয়া বিচিত্র নয়। এমন হতে পারে যে, জয়ন্তী দেবীর আগেই এই অঞ্চলের নাম জয়ন্তী বা জয়ন্তীয়া ছিল এবং এখানকার রানী হিসেবে তিনি স্ব-নামের পরিবর্তে জয়ন্তী বা জয়ন্তেশ্বরী (জয়ন্তীয়ার অধিশ্বরী) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। জয়ন্তীয়া পাহাড় বা জৈন্তিয়া পাহাড়ের (বর্তমানে জয়ন্তীয়ার স্থলে জৈন্তিয়া শব্দটি উচ্চারিত হয়) অধিবাসীরা সিন্টেং জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই জনগোষ্ঠীটি 'জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠী' নামেও পরিচিত। আনুমানিকভাবে, সুদূর অতীতে জয়ন্তী দেবী ছিলেন এই জনগোষ্ঠীরই আদি জনগোষ্ঠীর একজন সরদার বা রানী। সময়ের পরিক্রমায় (তান্ত্রিক যুগে) তিনি হয়ে উঠেছিলেন সনাতনবৈদিক ধর্মের একজন দেবী। একপর্যায়ে তিনি একটি পীঠস্থানের ভৈরবী হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু পীঠস্থানটি চিহ্নিত ছিল না। অবশেষে সিন্টেং জনগোষ্ঠীর দুজন রাজা জৈন্তিয়ার দুটি স্থানকে পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত করে তোলেন।



চিত্র: নারতিয়াং মন্দিরের বেদি

সিন্টেং জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা মূলত নিয়েমত্রে বা নিয়েমট্যানরাই ধর্মের অনুসারী ছিলেন। এই ধর্মের সাথে সনাতনবৈদিক বা আর্যবৈদিক ধর্মের তেমন কোন মিল নেই। নিয়েমত্রে বা নিয়েমট্যানরাই ধর্মের সাথে জয়ন্তী দেবীর পীঠস্থানেরও কোন যোগসূত্র নেই। কিন্তু জয়ন্তী দেবী তাদেরই আদি জনগোষ্ঠীর রানী বা সরদার হিসেবে অনুমেয়। এই গোলযোগের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, পুরাকালে জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতলে সিন্টেংদের আদি জনগোষ্ঠীর যে রাজ্য ছিল তা একসময় (তান্ত্রিক যুগে) সংকুচিত হয়ে কেবল পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন জৈন্তিয়া সমতলের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় শ্রীহট্ট বা কামরূপের অধিবাসীদের হাতে। এরা ছিলেন সনাতনবৈদিক ধর্মমতের অনুসারী। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে তারা এখানকার আদি শাসক জয়ন্তী দেবীকে একজন দেবী-সত্তা জ্ঞান করতেন।

তাদের দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবনের চর্চায় জয়ন্তী দেবী একজন মাতৃরূপী শক্তি দেবী হিসেবে উপাস্য হয়ে উঠেছিলেন। আর মূল সিন্টেং জনগোষ্ঠী তাদের আদি ধর্মের রীতিনীতিই পালন করে যাচ্ছিল। অবশেষে ১৫০০ সালের পর থেকে যখন এই জনগোষ্ঠীর রাজারা জৈন্তিয়া সমতলের শাসক হয়ে উঠলেন তখন থেকে রাজপরিবারের মধ্যে সনাতনী ধর্মবিশ্বাসের চর্চা শুরু হয়। কিন্তু পাহাড়ি সিন্টেংদের মধ্যে এর কোন প্রভাব ছিল না। আনুমানিক ১৬০৭-০৮ সালের দিকে সিন্টেং রাজা যশোমাণিক নারতিয়াং মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করলে সেখানকার লোকজন সনাতনী জয়ন্তী দেবীর সাথে পরিচিত হয়। মন্দিরটি মূলত নিয়েমত্রে এবং সনাতন- উভয় ধর্মেরই মন্দির। সিন্টেংদের মধ্যে এই মন্দির খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি। সিন্টেং রাজপরিবারের সদস্যরা নিয়েমত্রে ধর্মের অনেক রীতিনীতি পালনের পাশাপাশি সনাতন ধর্মের চর্চা করলেও সাধারণ সিন্টেংরা তাদের আদি ধর্মই পালন করতো। ব্রিটিশ আমলে তাদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে। বর্তমানে তাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী।

অধ্যায় চার

হট্টনাথের পাঁচালী ও রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্য

বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে মূলত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়। ইতিহাসের দলিলের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এগুলোকেই সিলেট ও আসামের আদিযুগের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। *হট্টনাথের পাঁচালী* হচ্ছে এমনই একটি সূত্র যা থেকে সিলেট অঞ্চলের আদিযুগ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এটি মূলত একটি অর্ধ-পৌরাণিক কাহিনী বা কাব্যগ্রন্থ যা শত-শত বছর ধরে মানুষের মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। আদিযুগের সিলেটের বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপাখ্যানই ছিল এর বিষয়বস্তু। অষ্টাদশ শতকের কবি (সিলেট নগরীর আখালিয়া অঞ্চলের অধিবাসী) গণেশ রাম শিরোমণি সিলেটের এসব মৌখিক উপাখ্যানকে একটি কাব্য-কাহিনীতে রূপ দিয়ে এর নাম দিয়েছিলেন *হট্টনাথের পাঁচালী*। প্রায় ৩৬,০০০ শ্লোকের এই কাব্য-কাহিনীতে দেবতার অলৌকিক উপাখ্যানের পাশাপাশি শ্রীহট্ট বা সিলেটের প্রাচীন ইতিহাসের কিছু ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে।

হট্টনাথের পাঁচালীর বর্ণনা থেকে বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চলের প্রথম সহস্রাব্দের (মাঝামাঝি সময়ের) একটি ভৌগলিক চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্র অনুযায়ী, বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চল তখন তিনটি প্রধান রাজ্য বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। যথা-প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্য, কামরূপ রাজ্য ও নারী রাজ্য বা জৈন্তিয়া রাজ্য। গবেষকদের মতে, মহারাজা ভগদত্তের সময়কার (পঞ্চদশ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যটিই পরে কামরূপ রাজ্য হয়েছিল। কিন্তু *হট্টনাথের পাঁচালীতে* উভয় রাজ্যকে পাশাপাশি রাজ্য হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মনে হয় যে, প্রথম সহস্রাব্দে প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চল নিয়ে কামরূপ রাজ্যটি গড়ে উঠলেও মূল রাজ্যটির কিছু অংশ কোথাও টিকে ছিল এবং সেই অংশটিই প্রাগজ্যোতিষপুর নামে পরিচিত ছিল। *হট্টনাথের পাঁচালীতে* নারী রাজ্য বা জৈন্তিয়া রাজ্যের আয়তনের যে ধারণা দেওয়া হয়েছে সেটিও মহারাজা ভগদত্তের উপ-রাজ্য বা উপ-রাজধানীর ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক।

কিছু গবেষকের ধারণা, বৃহত্তর সিলেটের লাউড়, গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের অস্তিত্ব মহারাজা ভগদত্তের আমলেই ছিল। এগুলো তাঁর উপ-রাজ্য ছিল। কিন্তু *হট্টনাথের পাঁচালীর* বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এগুলো ছিল নারী রাজ্যেরই অংশ; নারী রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে লাউড় ও গৌড় রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। এই গোলযোগের সমাধানও অসম্ভব নয়। মহারাজা ভগদত্তের শাসনকাল ছিল আনুমানিকভাবে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এর দীর্ঘদিন পরে কোন এক সময়ে হয়তো লাউড়, গৌড় প্রভৃতি অঞ্চল নারী রাজ্য বা জৈন্তিয়ার অধীনস্থ হয়েছিল এবং প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এগুলো আবারও নারী রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। *হট্টনাথের পাঁচালীর* বর্ণনা অনুযায়ী, 'লাউড়' ও 'গৌড়' নামের প্রচলনও তখন থেকেই হয়েছিল। যদি এই বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, এসব অঞ্চল ইতোপূর্বে অন্য কোন নামে পরিচিত ছিল যা কালের আবর্তে চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে (লাউড়ে যখন মহারাজা ভগদত্তের উপ-রাজধানী ছিল তখন হয়তো লাউড় অঞ্চল অন্য কোন নামে পরিচিত ছিল)।

হট্টনাথের পাঁচালীতে বলা হয়েছে, প্রাচীনকালের কামরূপ রাজ্যে কামসিন্ধু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর মহিষী রানী উর্মি। কামসিন্ধুর মৃত্যুর পর প্রতিবেশী রাজা কামরূপ আক্রমণ করে বসলে নিরুপায় ও অসহায় রানী রাজধানী ত্যাগ করে নিজ রাজ্যের পশ্চিমাংশে চলে যান এবং সেখানকার নারী-রাজ্য দখল করে আবারও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। নারী-শাসক হিসেবে রানী উর্মি বেশ সফলতার সঙ্গেই তাঁর রাজ্য চালাতে থাকেন। এদিকে তিব্বতের হাটক রাজ্যের যুবরাজ কৃষক ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে রানী উর্মির রাজ্যে উপস্থিত হন। ঘটনাচক্রে যুবরাজ কৃষক রানী উর্মির সুন্দরী কন্যা উর্বরার প্রেমে পড়ে যান। এরপর তাদের প্রণয় ঘটে। রানী উর্মিও কৃষকের নানাগুণে মুগ্ধ হয়ে এ বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন। কালক্রমে কৃষকের ঔরসে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর নাম দেওয়া হয় 'হাটক'। হাটক বড় হয়ে তাঁর মাতামহীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে একটি রাজবংশের সূচনা হয়ে যায়। হাটকের পিতা কৃষকের নামানুসারে এ রাজবংশের নাম হয় কৃষক রাজবংশ। হাটকের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর পুত্র গুহক। গুহকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগাভাগি হয়ে যায়। এ ভাগাভাগিতে রাজ্যের মূল অংশটি পান জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্তক। আর অপর দুই পুত্র গুড়ক ও লড্ডুক পান গৌড় ও লাউড় অঞ্চল।

এক. *হট্টনাথের পাঁচালী* সংকলনের ইতিহাস

১৯৯১ সালে প্রকাশিত *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে *হট্টনাথের পাঁচালী* সংকলনের ইতিহাস তোলে ধরেছেন। প্রথম অধ্যায়ে (প্রাচীন কাল) তিনি লিখেছেন, “রাজা গৌড়গোবিন্দ সিলেটের শেষ স্বাধীন নরপতি। হযরত শাহজালাল ও সিকন্দর গাজীর নিকট তিনি ১৩০৩ সালে পরাজয়বরণ করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে তিনি রাজত্ব করেছিলেন। গৌড় রাজবংশের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গৌড় রাজবংশের ইতিহাসের প্রধান উৎস *‘হট্টনাথের পাঁচালী’*। হট্টনাথ গৌড়রাজ্যের কুলদেবতা। পাঁচালী মূলত স্তুতিগাঁথা। তাছাড়া এতে রয়েছে রাজবংশের ইতিহাস ও হট্টনাথের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী। প্রখ্যাত পণ্ডিত বৃহস্পতি ছিলেন গৌড়ের রাজসভা পণ্ডিত। সম্ভবত তিনি দ্বিজ নিধিপতির প্রপৌত্র। বৃহস্পতি দ্বিজ রাজসভায় গৌড়ের ইতিহাস কীর্তন করতেন। এই ইতিহাস মুখে মুখে বহু পণ্ডিতের স্মৃতি বয়ে পণ্ডিত রঘুনন্দন পর্যন্ত চলে আসে।

রঘুনন্দনের প্রপৌত্র গণেশ রাম শিরোমণি এসব ইতিহাস ‘হট্টনাথের পাঁচালী’ গ্রন্থ আকারে সংকলন করেন। এই পাঁচালিটি ৩৬,০০০ শ্লোক সমন্বিত ও সাত খণ্ডে বিভক্ত। সংক্ষিপ্ত, কামরূপ, গৌড়, ছিরিচত্বল, ব্রহ্মাচল, গোবিন্দ ও শ্রীহট্ট সাত খণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। ভাট পাড়ার জাহ্নবী ভট্টাচার্য্য প্রায় একশত বছর পূর্বে আখালিয়ার কুলচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে *হট্টনাথের পাঁচালীর* ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন। *হট্টনাথের পাঁচালী* সত্য ইতিহাস ভিত্তিক বলে মনে হয়। ত্রিপুরার *রাজমালা* ও ভাটেরার তাম্রফলকের বিষয়বস্তুর সহিত পাঁচালীর বর্ণিত বিষয়াদি সঙ্গতিপূর্ণ। বাবু কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী ১৯৪০ সালে *হট্টনাথের পাঁচালীর* উপর ভিত্তি করে *শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস* নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।”

দুই. রাজা কামসিন্ধু, রানী উর্মি ও রাজকন্যা উর্বরা

হট্টনাথের পাঁচালীর বর্ণনামতে, সুদূর অতীতে কামরূপ রাজ্যে কামসিন্ধু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর রানী উর্মি রাজ্যের হাল ধরেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। কামরূপের পার্শ্ববর্তী প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা কামরূপের দুর্বলতার সুযোগ নিলেন। তিনি হঠাৎ করে রানী উর্মির রাজ্যে আক্রমণ করে বসেন। দুর্বল রানী এই আক্রমণ প্রতিহত

করতে পারেননি। তিনি রাজধানী ছেড়ে রাজ্যের পশ্চিমাংশে আশ্রয় নিলেন এবং সেখানেই একটি রাজ্য স্থাপনে মনোযোগী হয়ে উঠলেন। পশ্চিমের নারী-রাজ্যটিও তিনি আংশিক অথবা পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছিলেন। এতে তাঁর রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এ প্রসঙ্গে *সিলেটের মাটি, সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, "কামসিন্ধুর মৃত্যুর পর প্রাগজ্যোতিষপুররাজ কামরূপ আক্রমণ করেন। রাণী উর্মি উপায়ান্তর না দেখে রাজধানী পরিত্যাগ করেন এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দিকে পলায়ন করেন। তথায় তিনি নিজ রাজ্যের পশ্চিম অংশে এবং জয়ন্তিয়ার নারী রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।"

রানী উর্মির কন্যার নাম ছিল উর্বরা। উর্বরার পতির নাম ছিল কৃষক। এই কৃষকের পরিচয় নিয়ে দুটো ধারণা প্রচলিত রয়েছে। কিছু সূত্রমতে, কৃষক ছিলেন পৌরাণিক চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা এবং বৈদিক যুগের কুরু রাজা পরিক্ষিতের বংশধর। আবার আরেকটি সূত্রমতে, তিনি ছিলেন তিব্বতের হাটক রাজ্যের যুবরাজ। *হট্টনাথের পাঁচালীতে* বর্ণিত আছে যে, যুবরাজ কৃষক ভারত-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে চলতে চলতে একদা হঠাৎ করেই উপস্থিত হন রানী উর্মির রাজ্যে। সেখানে তিনি উর্বরার সাক্ষাৎ লাভ করেন। এ রাজকন্যার সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করে ফেলে। উর্বরার প্রেমে পড়ে তিনি ভুলে যান তাঁর নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়ার কথা। রানী উর্মি কৃষকের এই প্রেমের কথা জানতেন। এতে তিনি মোটেও বিরূপ না হয়ে উলটো কৃষকের সঙ্গে উর্বরার বিয়ে দিয়ে দেন। কৃষকের গুণের কারণেই তিনি এ বিয়েতে রাজি ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে *সিলেটের মাটি, সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, "হাটকের যুবরাজ কৃষক তিব্বত হতে ভারত ভ্রমণে ব্যাপদেশে আগমন করেন। তিনি জয়ন্তিয়া পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। জয়ন্তিয়ার পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রোমাঞ্চকর ভ্রমণকালে একবার ঘটনাক্রমে রাণী উর্মির কন্যা উর্বরা তাঁর দৃষ্টি পথে পতিত হন। রাজকুমারী উর্বরার অসাধারণ লাবন্য এবং অনুপম সৌন্দর্য্য তাকে আকৃষ্ট করে। যুবরাজ কৃষক পিতৃরাজ্য হাটকে প্রত্যাবর্তনের কথা বিস্মৃত হয়ে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে রাজকুমারী উর্বরার প্রেমে পতিত হন। রাণী উর্মি আগন্তক রাজকুমার কৃষকের বহুবিধ গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। জাঁকজমক ও জৌলুসের সঙ্গে রাজকুমারী উর্বরা এবং যুবরাজ কৃষকের পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়। রাজকুমার কৃষকের তিব্বতীয় অনুসঙ্গীগণও রাণী

উর্মির রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন। শীঘ্রই কৃষকের ঔরসে রাজকুমারী উর্বরা এক পুত্রসন্তান লাভ করেন।”

তিন. রাজা হাটক ও রাজা গুহক

উর্বরা ও কৃষকের ঘরে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় ‘হাটক’। কৃষকের পিতার রাজ্যের নামানুসারেই এই নাম রাখা হয়েছিল। পরিণত বয়সে রাজকুমার হাটক তাঁর মাতামহীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন। কথিত আছে যে, রানী উর্মি নারী রাজ্যের চিরায়ত প্রথা অনুযায়ী ‘রানীর পর রাজকন্যার’ হাতেই রাজ্যের শাসনভার চলে যাওয়ার নিয়মটি কার্যকর রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জামাতা কৃষক চেয়েছিলেন, তিব্বতীয়দের মতো পুরুষরাই জৈন্তিয়া শাসন করুক। তিনি নারী রাজ্যের নিয়ম পরিবর্তনের জন্য তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রানী উর্বরাকে রাজি করিয়েছিলেন। তাই উর্বরা তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর নিজে শাসনভার গ্রহণ না করে রাজকুমার হাটককেই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এতে জৈন্তিয়ায় প্রচলিত হাজার-দেড় হাজার বছরের নারী শাসনের অবসান ঘটে। *হট্টনাথের পাঁচালীর* বর্ণনা সঠিক হলে, তিব্বতীয় রাজকুমার কৃষক এবং কামরূপী রাজকন্যা উর্বরার পুত্র হাটকই জৈন্তিয়ার প্রথম পুরুষ রাজা। রাজা হাটক থেকে শুরু হওয়া এ রাজবংশটিকে কোন কোন ঐতিহাসিক ‘জৈন্তিয়ার কৃষক রাজবংশ’ বলে অভিহিত করেছেন (একইভাবে তারা গৌড়ের রাজবংশকেও ‘কৃষক রাজবংশ’ বলে অভিহিত করেছেন)।

এ প্রসঙ্গে *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, “শীঘ্রই কৃষকের ঔরসে রাজকুমারী উর্বরা এক পুত্রসন্তান লাভ করেন। পিতামহের রাজধানী হাটকের নামানুসারে নবজাতকের নামকরণ হয় হাটক। ইতিমধ্যে হাটকরাজ মৃত্যুবরণ করেন। খবর শুনে কৃষক পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। যুবরাজ হাটক এদিকে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মাতামহীর রাজ-সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজা কৃষক পরবর্তীকালে দু’তিন বার শাশুড়ীর রাজ্যে আগমন করেছিলেন। তিব্বতের যুবরাজ কৃষকের নামানুসারে গৌড়-রাজবংশের অপর নাম কৃষক রাজবংশ এবং রাজবংশের কুলদেবতার নাম হয় হাটকেশ্বর বা হাটকরাজ্যের ইশ্বর।”

রাজা হাটকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুহক জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। এই রাজা গুহক হচ্ছেন বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজা। তিনি অনেকদূর পর্যন্ত জৈন্তিয়া রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের

ধারণা, কামরূপের সীমান্তবর্তী পঞ্চখণ্ড এবং ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী কিছু সামন্ত রাজ্য ছাড়া বর্তমান সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ অঞ্চল রাজা গুহকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আনুমানিকভাবে, ৬০০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে তিনি জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। রাজ-সিংহাসন লাভের পর তিনি কামরুপের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন (ততোদিনে কামরূপ প্রতিবেশী রাজার হাত থেকে মুক্ত হয়েছে এবং সেখানে নতুন কোন রাজবংশের সূচনা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়)। গুহক সনাতনবৈদিক ধর্মমতের প্রতি উৎসাহী ছিলেন এবং সনাতনবৈদিক দেবতা শিবের ভক্ত ছিলেন। তাঁর শাসনামলে কামরুপের অনেক ধর্মযাজক জৈন্তিয়া তথা শ্রীহট্ট (এই নামটির প্রচলন হয়েছে আরও পরে) অঞ্চলে চলে এসেছিলেন।

চার. রাজকন্যা শিলা ও চটলা

রাজা গুহকের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম লড্ডুক, গুড়ক ও জয়ন্তক এবং দুই কন্যার নাম শিলা ও চটলা। দুই কন্যার মধ্যে শিলা ছিলেন বয়সে বড়। তিনি অল্পবয়সেই বেশ ধার্মিক হয়ে উঠেছিলেন। কথিত আছে, রাজকন্যা শিলা তাঁর ছোটবেলায় একবার কংস নিশুধান পর্বতের দক্ষিণের হ্রদে স্নান করতে নেমেছিলেন। রহস্যজনকভাবে তিনি সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর রাজা গুহক অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে উদ্ধার করেন। তখন থেকে শিলা খুবই ধার্মিক হয়ে ওঠেন এবং পুরোপুরিভাবে তপস্যায় মগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। অল্পবয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। রাজা গুহক তাঁর এই প্রিয় কন্যার নামে শীলাহাট বা শীলাহট্ট নামে একটি উপ-রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। গবেষকদের মতে, বর্তমান সিলেট শহরই হচ্ছে এই শিলাহাট বা শিলাহট্ট। রাজার অপর কন্যা চটলা পিতার মন জয় করতে পারেননি। তিনি এক রাজভৃত্যের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ হলে তিনি রাজরোষের শিকার হয়েছিলেন।

ধর্মপ্রাণ রাজা গুহক তাঁর এই অবাধ্য কন্যাকে বিশাল জলরাশি বেষ্টিত একটি দ্বীপে নির্বাসন দিয়েছিলেন। রাজকন্যা চটলা এই দ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ‘শিলা-চটল’ নামে পরিচিত হয়েছিল। পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনায় এই শিলা-চটলের কথা পাওয়া যায়। শিলা-চটল উপরাজ্যটি ঠিক কোথায় ছিল তা অনুমান করা যায় না। এ প্রসঙ্গে *সিলেটের মাটি সিলেটের*

মানুষ গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, "দ্বিতীয় কন্যা চটলা রাজভৃত্যের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হন। তাদের প্রণয়লীলা প্রকাশিত হওয়ায় কন্যা চটলা রাজরোষে পতিত হন। তাকে সমুদ্র মধ্যস্থিত এক দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। কথিত আছে, সমুদ্রটি ছিল দুহাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিরাট হ্রদ।" আদিকালে সিলেট অঞ্চলের হাওরগুলো ছিল অনেক গভীর ও বড়। রাজা হয়তো সিলেট বা সুনামগঞ্জ জেলার কোন হাওরবেষ্টিত অঞ্চলেই চটলাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পাঁচ. লড্ডুক, গুড়ক ও জয়ন্তক

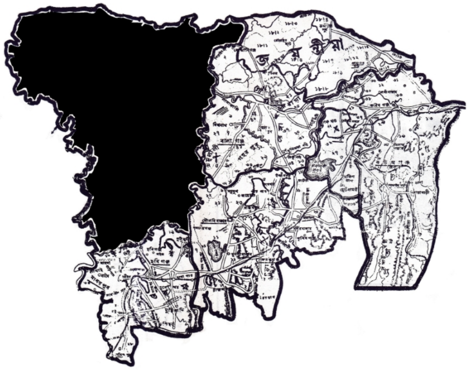
রাজা গুহক মৃত্যুবরণ করেছিলেন আনুমানিকভাবে ৬৩০ এর দশকে। তখন তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্তক পান রাজ্যের মূল অংশ (এই অংশটি ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্য হিসেবে টিকে ছিল)। অপর দুই পুত্র রাজ্যের আরও দুটি অংশ লাভ করেন। লড্ডুকের ভাগে পড়ে রাজ্যের পশ্চিমাংশ। এই অংশটি লাউড় রাজ্য নামে পরিচিত হয়েছিল। লড্ডুক ও জয়ন্তকের রাজ্যের মধ্যবর্তী অংশ পেয়েছিলেন গুড়ক। তাঁর রাজ্যটি গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত হয়েছিল। গবেষকদের ধারণা, লড্ডুক ও গুড়কের নামেই লাউড় ও গৌড় রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। যদি এই ধারণাটি সঠিক হয় তাহলে বলতে হয়, এসব অঞ্চল হয়তো ইতোপূর্বে অন্য নামে পরিচিত ছিল। কেউ কেউ বলেন, রাজা জয়ন্তকের নামে জৈন্তিয়া রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল (কিন্তু *জৈমিনি মহাভারতের* বর্ণনায় 'জয়ন্তী' নামের অস্তিত্ব এই ধারণাকে বাতিল করে দেয়)।

এ প্রসঙ্গে *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, "রাজা গুহকের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিমাংশ পড়ে রাজপুত্র লড্ডুকের ভাগে। তাঁরই নামানুসারে সে অঞ্চলের নাম হয় লাউড়। মধ্যম অঞ্চলের উত্তরাধিকারী হন যুবরাজ গুড়ক। তাঁর নামানুসারে রাজ্যের নাম হয় গৌড়। পূর্ব অঞ্চলের মালিক হন রাজকুমার জয়ন্তক এবং তাঁর রাজ্যের নাম হয় জয়ন্তিয়া। লাউড় রাজ্যের বিস্তার ছিল সমগ্র সুনামগঞ্জ মহকুমা, ময়মনসিংহ জেলার এবং হবিগঞ্জ মহকুমার কিয়দংশ। রাজা লড্ডুকের পর লাউড় রাজ্যের পরবর্তী নরপতিগণ হলেন সমুক আদিত্ব, দেবদত্ত, ভগদত্ত, নবার্যুন, মাধব দত্ত, প্রমর্দ্ধন প্রমুখ। এই বংশের শেষ নরপতি ছিলেন রাজা প্রমর্দ্ধন। জৈন্তার রাজা জয়ন্তকের মৃত্যুর পর মহাবল, বানছারু,

রংবীর ও ভীমবল পর পর সিংহাসন অলংকৃত করেন। ইহারও অনেক পর পার্বত্য রাজগণ এক নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন।



চিত্র: বৃহত্তর সিলেটের মানচিত্রে গৌড় রাজ্যের আনুমানিক সীমানা



চিত্র: বৃহত্তর সিলেটের মানচিত্রে লাউড় রাজ্যের আনুমানিক সীমানা

ছয়. জয়মল্ল, বানচুড়দেব, কামদেব ও ভীমবলদেব

হট্টনাথের পাঁচালী এবং অন্যান্য সূত্র থেকে কৃষক রাজবংশের কয়েকজন রাজা সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তারা কোন সময়ের রাজা ছিলেন সে ব্যাপারে অবশ্য কোন স্পষ্ট ধারণা মিলে না; শুধু তাদের নাম এবং অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমেই আসে রাজা জয়মল্লের কথা। তিনি একজন মল্লবিদ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একটি হাতিকে তাঁর বুকে পাঁ রাখতে দিয়েছিলেন; তবুও তাঁর কিছুই হয়নি। কিন্তু একটি গন্ডারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন। আরেক রাজা বানচুড়দেব একজন কৃষিপ্রেমিক রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যে প্রচুর বৃক্ষরোপণ হয়। এতে রাজ্যজুড়ে মধু, তেঁজপাতা, কমলা ও আগরের ফলন বেড়ে যায়। তাঁর সময়ে জৈন্তিয়ায় বৌদ্ধ বণিকদের আগমন ঘটেছিল। এই বণিকরা নৌ-পথে শিলাহাট হয়ে জৈন্তিয়ায় এসেছিলন। তারা জৈন্তিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাদের প্রভাবে রাজা বানচুড়দেব বৌদ্ধধর্মের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

কৃষক রাজবংশের শেষের দিকের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন রাজা কামদেব। কামদেবের শাসনামলকে কৃষক রাজবংশের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ধরা হয়। যতদূর জানা যায়, রাজা কামদেব সংস্কৃতচর্চায় খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে মালব দেশের রাজধানী ধারানগর থেকে বিখ্যাত এক পণ্ডিত ও কবি জৈন্তিয়ায় আসেন। তাঁর নাম ছিল কবিরাজ। *রাঘবপান্ডবীয়* নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য এই কবি বেশ বিখ্যাত। এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকেই রাজা কামদেবের কথা জানা যায়। কামদেবের পর তাঁর ছেলে ভীমবলদেব রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু ভীমবলদেব ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। পার্বত্য গোত্রনেতারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, ভীমবলদেব একটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হয় নিহত হয়েছিলেন অথবা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কৃষক রাজবংশের শেষ রাজা তিনিই। আনুমানিকভাবে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন।

সাত. কবিরাজের *রাঘবপাণ্ডবীয়* কাব্যগ্রন্থ

হট্টনাথের পাঁচালী ছাড়া অন্য যেসব সূত্র থেকে জৈন্তিয়ার কৃষক রাজবংশ সম্পর্কে অল্প-বিস্তর তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ *রাঘবপাণ্ডবীয়* অন্যতম। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'কবিরাজ' নামক একজন সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিত এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এটি একটি শ্লেষাত্মক ও দ্ব্যর্থবোধক মহাকাব্য (এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোক বা পঙ্ক্তি এমন চাতুর্যের সাথে রচিত যে, এগুলোর একই সাথে দুটি অর্থ বের হয়ে আসে)। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনন্য নিদর্শন এই সংস্কৃত দ্ব্যর্থক মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল জৈন্তিয়ার রাজা কামদেবের পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনি কবিরাজকে জয়ন্তীপুর বা জৈন্তিয়া রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন (কামদেবের সময়কালে জৈন্তিয়া রাজ্যের নাম ছিল জয়ন্তীপুর)।

কবিরাজ ছিলেন মালব দেশের রাজধানী ধারানগরের অধিবাসী। তিনি বিদ্যাধনঞ্জয় বা ধনঞ্জয় নামেও পরিচিত ছিলেন। দ্বাদশ শতকের (১১০১ সাল থেকে ১২০০ সাল) কোন এক সময়ে রাজা কামদেবের আমন্ত্রণে সাঁড়া দিয়ে তিনি জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন এবং রাজসভার কবি হয়েছিলেন। রাজা কামদেবের উৎসাহেই তিনি *রাঘবপাণ্ডবীয়* কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইতিহাসবিদদের মতে, এই কাব্যগ্রন্থটি আনুমানিক একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে (১১৭০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হতে পারে বলে অনেকের অভিমত) রচিত হয়েছিল। এই কাব্যগ্রন্থের সূত্র ধরেই রাজা কামদেবের রাজত্ব এবং মধ্যদেশ থেকে জৈন্তিয়ায় ব্রাহ্মণদের আগমনের ঐতিহাসিক তথ্য ও কালানুক্রম জানা যায়।

রাজশাহীর শ্রীকৃষ্ণ দাস কর্তৃক সম্পাদিত *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকার ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "*রাঘবপাণ্ডবীয়ে* লিখিত আছে, কবিরাজ কাদম্ব বংশকুলতিলক জয়ন্তীপুররাজ কামদেব কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া *রাঘবপাণ্ডবীয়* প্রণয়ন করেন (১)। এতন্নিবন্ধন কবি স্ব-প্রণীত কাব্যের প্রথম সর্গের কয়েকটি শ্লোকে উক্ত রাজার গুণগান করিয়াছেন। ইহার অন্যতম শ্লোকে ধারানগরাধিপতি মহারাজ মুঞ্জের নাম দৃষ্ট হয়। কবি এই শ্লোকে অধঃকৃত করিয়া কামদেবের মহিমা বর্দ্ধিত করিয়াছেন (২)। ইহাতে বোধ হয়, কামদেব মুঞ্জের সময় জয়ন্তীপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, অন্যথা তদাশ্রিত কবিরাজ মুঞ্জের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সহিত কামদেবের

তারতম্য করিতেন না। এতদ্দারা কবিরাজ মুঞ্জের সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। এক্ষণে এই বাকপতি এই কবিরাজের উপাধি হইলে বাকপতিরাজ ও মুঞ্জ সমসাময়িক হইয়া উঠেন। কিন্তু আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, বাকপতিরাজ যশোবর্ম্মা নৃপতির সভাসদ ও ভবভূতির সতীর্থ, এবং মুঞ্জ অপেক্ষা প্রায় একশতাব্দী পূর্ব্ববর্তী। সুতরাং *রাঘবপাণ্ডবীয়* প্রণেতার 'কবিরাজ' উপাধির সহিত বাকপতির কোন সংশ্রব লক্ষিত হইতেছে না।

(১) *রাঘবপাণ্ডবীয়ের* সমাপ্তিতে 'ইতি শ্রীধরণীধরপ্রমৃত কাদম্বকুলতিলক চক্রবর্ত্তি বীর-কামদেব-প্রোৎসাহিত শ্রীকবিরাজ পণ্ডিত বিরচিতে' ইত্যাদি বাক্য।

(২) শ্রীবিদ্যাশোভিনো যস্য শ্রীমুঞ্জাদিয়তী ভিদা। ধারাপতিরসাবাসীদয়ং তাবন্ধরাপতি। রাঘবপাণ্ডবীয় ১৮।"

রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, "রাজা কামদেব অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে মালব দেশের রাজধানী ধারানগর হতে বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি কবিরাজ জৈন্তার রাজসভায় আগমন করেন। জৈন্তাপতির উৎসাহে তিনি *'রাঘবপাণ্ডবীয়'* গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ১ম সর্গের ২৫ তম শ্লোক-

আনেতা মধ্য দেশাৎ প্রবচন বিদুষাৎ সোমপাং ব্রাহ্মনানা,
মারোঢ়া মর্ত্যামূর্তা সুরপতি সদসোমন্ডলং মালবত্যাঃ।
জেতাভুমের্জয়ন্তীপুর পুর মথন শ্রী পাদাম্বুজ ভৃঙ্গঃ
সোহ শিক্ষা পালনেতুঃ স্বকুল কুলগিরিং যোহনুলেভেত শোভঃ।

রাঘবপাণ্ডবীয় গ্রন্থে মঞ্জুরাজের উল্লেখ আছে। মঞ্জুরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজরাজ। মঞ্জুরাজ ও ভোজরাজ একাদশ শতকের লোক। এতে অনুমান করা যায় যে, কামদেব একাদশ শতকের লোক ছিলেন। তিনি গৌড়ের রাজা গোবিন্দ রণকেশবের সমসাময়িক। এই সময়ে গৌড়ের ও জৈন্তার স্বর্ণযুগ ছিল বলে অনুমান করা যায়।"

আট. ১১০৭ শকাব্দের কালীমন্দির

জৈন্তিয়ার সিন্টেং রাজাদের আমলে (১৫০০ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত) জৈন্তিয়ার রাজধানীতে একটি প্রসিদ্ধ কালীমন্দির ছিল। ১৭৬৯ সালে সিন্টেং রাজবংশের একজন রাজা এই কালীমন্দিরের স্থলে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন যা দেখতে বেশ রাজকীয় ছিল। এই রাজার নাম বড়গোসাঁই।

জৈন্তিয়ার ইতিহাসে তিনি ‘দ্বিতীয় বড়গোসাঁই’ নামে পরিচিত। তাঁর শাসনকাল ছিল ১৭৩১ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত। সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার আগের বছর অর্থাৎ ১৭৬৯ সালে তিনি রাজবাড়ির পশ্চিম দিকে অবস্থিত পুরানো কালীমন্দিরের স্থলে একটি নতুন রাজকীয় মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন যা আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন লীলাপুরী সন্ন্যাসী। মূলত লীলাপুরীর অনুরোধেই রাজা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজা লীলাপুরীকে ১৯২ কেদার ভূমিও দান করেছিলেন।

এই ভূমিদানের দলিল (তাম্রফলক) থেকে জানা যায় যে, রাজা বড়গোসাঁই ১৬৯২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭০ সালে ১৯২ কেদার ভূমিসহ নবনির্মিত মন্দিরের দায়িত্ব তোলে দিয়েছিলেন লীলাপুরী সন্ন্যাসীর হাতে। কিছুদিন আগেও এই মন্দিরটির প্রবেশমুখে একটি পাথরের ফলক ছিল। অজ্ঞাত কারণে কেউ এটি সরিয়ে ফেলেছে। ফলকটির গায়ে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল ‘কালীমন্দির, স্থাপিত ১১০৭ শক’। শক মানে হল শকাব্দ। ফলকের গায়ের লেখা অনুযায়ী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১১০৭ শকাব্দ বা ১১৮৫ সালে (খৃষ্টীয়)। এর মানে হচ্ছে, রাজা বড়গোসাঁইয়ের আমলের বহু আগেই কোন সাধু-সন্ন্যাসী এই মন্দিরে উপাসনার প্রচলন করেছিলেন। *রাঘবপাণ্ডবীয়* কাব্যগ্রন্থের সময়কাল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১১০৭ শকাব্দ বা ১১৮৫ সালে জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন কৃষক রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কামদেব। কালীমন্দিরটি তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খুব সম্ভবত, কামদেবের আমন্ত্রণে মালব বা অন্য কোন দেশের কোন একজন সন্ন্যাসী জৈন্তিয়ায় এসে ওই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে কালী পূজার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। ১৭৬৯-৭০ সালে রাজা বড়গোসাঁই এটিকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, বড়গোসাঁইয়ের আমল পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানেই কালী পূজা হতো। তিনিই প্রথম একটি মন্দির নির্মাণ করে এর ভেতরে কালীমূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

অধ্যায় পাঁচ
পুরোহিত রাজবংশের কথা

ঐতিহাসিকদের মতে, জৈন্তিয়ার কৃষক রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন কামদেবের পুত্র ভীমবলদেব। তিনি ত্রয়োদশ শতকের (১২০১ সাল – ১৩০০ সাল) প্রথমদিকে জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর পরে জৈন্তিয়ায় একটি নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। এই রাজবংশের ইতিহাসের কোন দলিল উদ্ধার হয়নি। কোন কাব্য-কাহিনীতেও এই রাজবংশের কথা নেই। সিন্টেং রাজবংশের উদ্ভবের আগ পর্যন্ত এই রাজবংশটি জৈন্তিয়া শাসন করলেও তখনকার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি থেকে ঐতিহাসিকরা এই রাজবংশের শেষ চারজন রাজার নাম উদ্ধার করেছেন। এরা হলেন- কেদারেশ্বর রায়, ধনেশ্বর রায়, কন্দর্প রায় ও জয়ন্ত রায়। এডওয়ার্ড গেইট, রাজমোহন নাথ, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই চারজন রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। এসব রাজাদের নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। তবে রাজমোহন নাথ এই রাজবংশটির উদ্ভবের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। আর মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ বিংশ শতকের প্রথম দিককার জনশ্রুতি থেকে রাজা জয়ন্ত রায় ও তাঁর কন্যা জয়ন্তী দেবী সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

এক. রাজমোহন নাথের তথ্য

প্রাচীন মিসরের ইতিহাসে দেখা যায়, মাঝেমধ্যে দেশের ক্ষমতা রাজাদের হাত থেকে পুরোহিতদের কাছে চলে গেছে। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ রাজমোহন নাথের মতে, এমন ঘটনা জৈন্তিয়া রাজ্যেও ঘটেছিল। এই বরেণ্য গবেষক তাঁর *THE ANTIQUITIES OF KACHAR (1942), THE BACKGROUND OF ASSAMESE CULTURE (1948)* প্রভৃতি গ্রন্থে জৈন্তিয়া রাজ্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, জৈন্তিয়ার কৃষক রাজবংশের শেষ রাজা ভীমবলদেবকে কৌশলে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করে নিয়েছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর মূল বাড়ি জৈন্তিয়ায় ছিল না। তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গের অধুনা ফরিদপুর অঞ্চল (ফরিদপুর নামটি তখন ছিল না) থেকে জৈন্তিয়ায় এসে তিনি প্রথমে ধর্মযাজক ও পরে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে ভীমবলদেবকে সরিয়ে

তিনি এখানকার রাজা হয়েছিলেন। আনুমানিকভাবে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের (১২০০-১২৫০ সাল) কোন এক সময়ে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। তাঁর বংশধররা প্রায় ১৫০০ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। রাজমোহন নাথ এই রাজবংশটিকে 'পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজবংশ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান একই রাজবংশকে 'পুরোহিত রাজবংশ' নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, এই রাজবংশের রাজারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ আনুমানিকভাবে ১২৫০ সাল থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন।

দুই. পুরোহিত রাজবংশের উদ্ভবের সম্ভাব্য কারণ

ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, রাজা ভীমবলদেবের সময়ে বঙ্গদেশ থেকে অনেক ব্রাহ্মণ পুরোহিত জৈন্তিয়ায় চলে এসেছিলেন। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে- বঙ্গদেশ পর্যন্ত ঘুরি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। ১২০৩-০৪ সালে ঘুরি সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সেনাপতি মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বিহার ও বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ জয় করে লখনৌতি বা লক্ষণাবতী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই নতুন রাজ্যে ব্রাহ্মণদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লোপ পেয়েছিল। পূর্ববঙ্গ ঘুরি সাম্রাজ্যের বাইরে থাকলেও সেখানকার পরিস্থিতি ছিল এলোমেলো। তাই সেখানেও ব্রাহ্মণদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লোপ পেয়েছিল। এমতাবস্থায় বঙ্গদেশের (পূর্ব ও পশ্চিম) ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বিভিন্ন সমৃদ্ধ রাজ্যে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করবেন- এটিই স্বাভাবিক। জৈন্তিয়ায় ব্রাহ্মণদের আগমনের সম্ভাব্য কারণ এটিই।

কৃষক রাজবংশের শেষের দিকের শাসকরা অর্থাৎ কামদেব, ভীমবলদেব প্রমুখ রাজারা গুণী (ধর্মীয় পাণ্ডিত্য বা সাহিত্যিক যোগ্যতার বিচারে) লোকদের কদর করতেন। তাদের আমলে জৈন্তিয়ায় আগত কবি ও ব্রাহ্মণরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। এই রাজকীয় আনুকূল্য বঙ্গদেশের আরও অনেক ব্রাহ্মণকে এখানে চলে আসতে উৎসাহিত করেছিল বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণদের হাতে জৈন্তিয়ার ক্ষমতা চলে যাওয়ার বিষয়টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভীমবলদেবের আমলে তারা এখানে বেশ শক্তিশালী একটি অবস্থান তৈরী করে ফেলেছিলেন এবং সুযোগমতো রাজ্যক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন। তাদের শাসনামলে এই রাজ্যে সনাতনবৈদিক ধর্মমত ও আর্যবৈদিক ধর্মমতের সংমিশ্রণ

ঘটেছিল। সনাতনবৈদিক ধর্মমতের অনুসারীদের দেবী জয়ন্তী দেবী পুরোহিত রাজাদের শাসনামলেই সতীপীঠের ভৈরবীর স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়।

তিন. গৌড়গোবিন্দের জৈন্তিয়া আক্রমণ

সিলেট অঞ্চলের কিছু কাব্য-কাহিনীতে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের (১০০১-২০০০ সাল) প্রথমদিকের কথা পাওয়া যায়। এসব কাব্য-কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- *হট্টনাথের পাঁচালী*, *পাগলা ঠাকুরের ছড়া*, *ভবানী প্রসাদ দত্তের লিপি*, *শান্তিরানীর বারমাসী* এবং সাতগাঁওয়ের গোপীনাথ দত্ত রচিত *দত্ত বংশাবলী* প্রভৃতি। এসব কাহিনীতে ত্রয়োদশ শতকের (১২০১-১৩০০ সাল) শেষের দিকের একজন রাজার কথা পাওয়া যায় যিনি বাইরে থেকে এসে গৌড় রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিলেন এবং ক্রমশ বরবক্র অববাহিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজা হয়ে উঠেছিলেন (বরাক নদীর পূর্বনাম ছিল বরবক্র)। তাঁর নাম ছিল গৌড়গোবিন্দ। তাকে গৌড়ের শেষ রাজা ধরা হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি গৌড়ের বৈধ রাজা ছিলেন না। তিনি উত্তরাধিকারের নিয়মে গৌড়ের রাজা হননি; জোর করে এই রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন। যে রাজাকে সরিয়ে তিনি গৌড়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন সেই রাজাই ছিলেন গৌড়ের শেষ বৈধ রাজা। সেই রাজার নাম জানা যায়নি। গোবিন্দের প্রকৃত নাম কী ছিল তা নিয়েও সংশয় আছে। গোবিন্দ নিজেকে ‘সমুদ্রতনয়’ নামে পরিচিত করিয়েছিলেন। কাব্য-কাহিনীতে তাকে ‘গড়ুল রাজা’ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃত নাম যা-ই হোক, গৌড়গোবিন্দ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত, আলোচিত এবং নিন্দিতও বটে। *পাগলা ঠাকুরের ছড়া* থেকে জানা যায়, এই গোবিন্দ ছিলেন একজন ‘পিতৃপরিচয়হীন’ ব্যক্তি। প্রথম জীবনে তিনি পুনিবিল এলাকার রাজা বা সরদার ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি গৌড় রাজ্য দখল করে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন (তখন অবশ্য সিলেট বা শ্রীহট্ট নামে এই অঞ্চলের পরিচিতি ছিল না। শ্রীহট্ট ছিল শুধুমাত্র গৌড়ের রাজধানী শহরের নাম)। গৌড় রাজ্য দখলের পাশাপাশি তিনি লাউড় ও জৈন্তিয়া রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এমনকি খাসিয়া সরদারদের উপরেও তাঁর আধিপত্য ছিল।

পাগলা ঠাকুরের ছড়ার ‘অর্পণার বিলাপ’ অংশে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার রাজা সমুদ্র সেনের বেশ কয়েকজন পত্নী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যা অর্পণা ছিলেন তাদের

একজন। এই রানী সমুদ্র দেব বরুণের পূজা করতেন। এতে সমুদ্র দেব তাঁর প্রতি বেশ সন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একদা মানুষের রূপ ধারণ করে রানীর সাথে দেখা করেন এবং দৈহিকভাবে মিলিত হন। এতে রানী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। কিন্তু ত্রিপুরার রাজা এই দৈব ঘটনা বিশ্বাস করলেন না। তিনি রানীকে চরিত্রহীনা ভেবে পরিত্যাগ করলেন এবং রাজ্যের বাইরে এক গহীন জলাভূমিতে নির্বাসন দিলেন। জায়গাটির নাম পুনিবিল। এখানেই এক দ্বীপে রানী অর্পণাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। রানী এখানে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন (যে বড় হয়ে 'গৌড়গোবিন্দ' নামে পরিচিত হয়েছিল)। এই পুত্রটির প্রতি সমুদ্র দেবের সুদৃষ্টি ছিল। সে যখন বড় হয় তখন পুনিবিলে অনেকগুলো চর জেগে ওঠে এবং মানববসতিরও বিস্তার ঘটে। রানী অর্পণার পুত্র গোবিন্দ এই চরবাসীদেরকে নিয়ে ক্রমশ একটি রাজ্য গড়ে তোলেন এবং একজন প্রভাবশালী সরদার বা রাজা হয়ে ওঠেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল গড়গাঁও। *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের লেখক স্যার এডওয়ার্ড গেইটের মতে, গোবিন্দের অনুগত লোকজন ছিলেন গারো জনগোষ্ঠীর 'গোয়ার' শাখার অন্তর্ভুক্ত। রানী অর্পণা ত্রিপুরা থেকে নির্বাসিত হয়ে গোয়ারদের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। গোবিন্দ এদের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং বড় হয়ে এদেরকে নিয়ে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোয়ারদের রাজা হওয়ার কারণেই তাকে 'গোয়ার গোবিন্দ' বলা হতো বলে গেইট সাহেব মত দিয়েছেন।

পাগলা ঠাকুরের ছড়ায় গৌড়গোবিন্দের জন্মের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর নিজেরই সৃষ্টি বলে মনে হয়। গৌড় বিজয়ের পরবর্তীতে নিজের পিতৃপরিচয়হীনতা ঢাকতেই তিনি রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে এই দৈব ঘটনার কথা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সমুদ্র সেন তাঁর মায়ের পতি হলেও তিনি সমুদ্র সেনের সন্তান ছিলেন না। এই শূন্যতা পূরণের জন্যই তিনি সমুদ্র দেবের কাহিনী সাজিয়ে নিজেকে 'সমুদ্রপুত্র' বা 'সমুদ্রতনয়' নামেই পরিচিত করে তোলেছিলেন। যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে অবশেষে *পাগলা ঠাকুরের ছড়ায়* তা সংকলিত হয়েছে। এই ছড়ায় বর্ণিত বাদবাকি ঘটনাসমূহ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। গৌড় দখলের পূর্বে পুনিবিল এলাকাটিই ছিল গোবিন্দের শক্ত ঘাঁটি। পুনিবিলের সরদার হয়ে ওঠার পর তিনি গড়গাঁও গ্রামে নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন (স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী, সেখানে তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল এবং প্রাসাদের পূর্বপাশে কয়েকটি দীঘিও ছিল)। গড়গাঁওয়ে নিজের শক্তিবৃদ্ধির এক পর্যায়ে তিনি প্রতিবেশী গৌড়ের রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত

হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, পুনিবিলের যুদ্ধে গৌড়ের সিংহ বংশীয় রাজা গোবিন্দের কাছে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। এরপর গোবিন্দ গৌড়ে প্রবেশ করে রাজধানী শহর শ্রীহট্ট দখল করে নেন। তিনি গড়গাঁও থেকে শ্রীহট্টে রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন। শ্রীহট্ট শহরে শ্রীহট্টনাথের মন্দির ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মন্দির। এই মন্দিরে পূজা দিয়েই গোবিন্দ নিজেকে গৌড়ের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন। এরপর তিনি রাজধানীকে সুরক্ষিত করার জন্য রায়গড়, পেচাগড়, টিলাগড় প্রভৃতি নামে দুর্গ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বাসস্থানও ছিল একটি গড় বা দুর্গ। এর অবস্থান ছিল বর্তমান সিলেট নগরীর মজুমদারী (গড়দুয়ার) এলাকায়। তাঁর একটি নৌবাহিনীও ছিল। এই বাহিনীর সাহায্যে তিনি দূরবর্তী অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

গৌড় রাজ্যের উত্তর সীমান্তে খাসিয়া সরদারদের নেতৃত্বে প্রায়ই আক্রমণ হতো। গোবিন্দ তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। কোন একজন খাসিয়া সরদারকে তিনি বন্দীও করেছিলেন। মুক্তিপণের বিনিময়ে ওই সরদার নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। এরপর গোবিন্দ হাত বাড়িয়েছিলেন লাউড় ও জৈন্তিয়া রাজ্যের দিকে। পুনিবিলের জলাভূমিতে বেড়ে ওঠা এই রাজা নৌ-যুদ্ধে বেশ পারদর্শী ছিলেন। লাউড় ও জৈন্তিয়ার রাজাকে তিনি নৌ-যুদ্ধেই পরাভূত করেছিলেন বলে মনে হয়। জৈন্তিয়ায় তখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শাসন চলছে। গোবিন্দ এই রাজবংশের কোন্ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন তা কোন কাব্য-কাহিনীতে বলা হয়নি। তাই তাঁর হাতে পরাজিত জৈন্তিয়াপতির নাম অজানা। এই অজানা রাজা গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করে রাজ্য রক্ষা করেছিলেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ত্রয়োদশ শতকের (১২০১ – ১৩০০ সাল) শেষের দিকে। গোবিন্দের শাসনকাল থেকেই তা অনুমেয়। গোবিন্দ ১৩০৩ সাল পর্যন্ত গৌড়ের রাজা ছিলেন। ওই বছর লখনৌতির সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ শ্রীহট্ট জয় করেছিলেন। ফিরোজ শাহের ভাতিজা সিকান্দার খান গাজী ছিলেন এই অভিযানের প্রধান সেনাপতি। বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহজালাল (রাহ.) এবং সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহসালার প্রমুখ এই অভিযানে জড়িত ছিলেন। কথিত আছে যে, হযরত শাহজালালের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলেই শ্রীহট্ট জয় হয়েছিল। এরপর গৌড়গোবিন্দের কী হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। তাকে নিয়ে রচিত *পাগলা ঠাকুরের ছড়ার* দুটি অংশ নিম্নরূপ।

(১) শ্রীহট্টের পূর্বদেশ নাম গোয়ার

একখানি দেশ সেই বড়ই বিস্তার।
একদিকে জৈন্তা, হেড়ম্ব* একদিকে,
মধ্যদেশে মুকুন্দ আকাঙ্ক্ষা কৈলা তাকে।
সমুদ্র তনয় গৌড়গোবিন্দ নামেতে
শ্রীহট্ট দেশের রাজা ছিলেন পর্বতে।
* হেড়ম্ব কাছাড়ি রাজ্যের পূর্বনাম।

(২) গড়ুল রাজার কথা শোনো মন দিয়া
সিংহের লগে যুদ্ধ করে তলোয়ার লইয়া।
বিদেশিয়া রাজার যত লোক লশকর ছিল
পুনি বিলের মধ্যে গড়ুল সবই ডুবাইল।
পুনির বিল ছাড়িয়া রাজা ছিলটেতে গেল
হট্টনাথের পূজা দিয়া ঠাকুরালী পাইল।
যুদ্ধ করি খাই রাজারে* বান্ধিয়া আনিল
পণ দিয়া খাই রাজা ফিরিয়া দেশে গেল।
জৈন্তা আর লাউড় গেলা আগে আগে ভাগি
শত্রুশূন্য হৈল দেশ ডরাইব কার লাগি?
*খাই রাজা মানে খাসিয়া সরদার

চার. জয়ন্ত রায় ও জয়ন্তী দেবীর কথা

পুরোহিত রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন জয়ন্ত রায়। কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল থেকে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী থেকে ঐতিহাসিকরা এই রাজা এবং তাঁর কন্যা জয়ন্তী দেবী সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনেছেন। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হল, বিভিন্ন জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীতে রাজা জয়ন্ত রায় ও তাঁর কন্যা জয়ন্তী দেবী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের তথ্য রয়েছে। কোন তথ্যটি সঠিক তা নিরূপণ করার কোন উপায় নেই। সকল ঐতিহাসিকের বর্ণনাকে একত্র করলে জৈন্তিয়ার রাজা জয়ন্ত রায় ও তাঁর কন্যা জয়ন্তী দেবীর শাসনামল সম্পর্কে মোটামোটিভাবে একটি চিত্র পাওয়া যায়। রাজা জয়ন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা জয়ন্তী দেবী পিতার সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন এবং বেশ শক্তহাতে এই রাজ্যটি শাসন করেছিলেন। এজন্য তাকে ‘রানী সিংহ’ নামেও ডাকা হতো (সম্ভবত, পুরোহিত রাজাদের আমলে জৈন্তিয়ার শাসকের উপাধি হিসেবে ‘সিংহ’ শব্দটির প্রচলন হয়েছিল)।

জয়ন্তী দেবীর স্বামী ছিলেন একজন পাহাড়ি সরদার বা সরদারপুত্র। তাঁর নাম ছিল লন্ডবর। তিনি সিন্টেং জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জৈন্তিয়া পাহাড়ের সুতংগা পুঞ্জিতে বসবাস করতেন। প্নার ভাষায় পুঞ্জিকে বলা হতো 'এলাকা'। আর এলাকার প্রধানকে বলা হতো 'দলই'। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর লোকজন বারো জন দলইয়ের অধীনে বারোটি পুঞ্জি বা এলাকায় বসবাস করতো। বারো জন দলইয়ের মধ্যে একজনকে বাকি দলইরা মান্য করতেন। তাঁর উপাধী ছিল 'সিয়েম'। সুতংগা পুঞ্জির দলই ছিলেন সিয়েম। জয়ন্তী দেবীর স্বামী লন্ডবর ছিলেন জৈন্তিয়া পাহাড়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী দলই বা সিয়েম। তাঁর ঔরসে জয়ন্তী দেবীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছিল। এই পুত্রসন্তানের নাম ছিল মানগোসাঁই বা বড়গোসাঁই। পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সুতংগা পুঞ্জির দলই বা সিয়েম বিবেচিত হয়েছিলেন। একই সাথে তিনি মায়ের সুবাধে পিতামহ জয়ন্ত রায়ের রাজ্যেরও উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। পাহাড় ও সমতলের মিলিত এই জৈন্তিয়া রাজ্য তিনি কতদিন শাসন করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে তাঁর বংশধররা ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত এই মিলিত রাজ্যটি শাসন করেছিলেন।

অধ্যায় ছয়
জৈন্তিয়ার তিনটি উপরাজ্য

জৈন্তিয়ার ইতিহাসের কিছু বিষয় আজও রহস্যাবৃত। এর মধ্যে অন্যতম হল জৈন্তিয়ার মূল রাজধানী জয়ন্তীপুরের (বর্তমান নিজপাট) বাইরে আরও তিনটি রাজধানী বা রাজবাড়ির অস্তিত্ব। এসব রাজধানী বা রাজবাড়ি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন দালিলিক ইতিহাস নেই। জনশ্রুতি ও অনুমানের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা এসব রাজবাড়ির ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। রাজবাড়িগুলোর অবস্থান ছিল জয়ন্তাপুরী রাজের প্রতিবেশী জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর পরগনায় (ব্রিটিশ আমলে রাজকে পরগনা বলা হতো)। বর্তমানে শুধু জাফলং রাজবাড়ির কিছু অংশ টিকে আছে; বাকি দুটোর কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে দূরবর্তী এই রাজবাড়িগুলোর অস্তিত্ব ব্রিটিশ আমলে পুরোপুরিভাবে দৃশ্যমান ছিল। তখন মানুষের মধ্যে এসব রাজবাড়ি নিয়ে বেশ কৌতুহল ছিল। এসব রাজবাড়ির আদি বাসিন্দা অর্থাৎ রাজাদেরকে নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। এসব কিংবদন্তী থেকে ঐতিহাসিকরা কিছু রাজাদের নাম ও তাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উদ্ধার করেছেন।

এক. ঐতিহাসিকদের মত

ব্রিটিশ লেখক কর্নেল গর্ডন, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়ার জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুরের রাজবাড়িসমূহকে স্বাধীন রাজাদের রাজধানী বলেই মত দিয়েছেন। কিন্তু জৈন্তিয়ার ভেতরে এসব রাজাদের স্বাধীন খণ্ডরাজ্য বা উপরাজ্যসমূহ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এ নিয়ে তারা কোন স্পষ্ট মতামত দিতে পারেননি। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের মতে, পুরোহিত রাজবংশের শেষ রাজা জয়ন্ত রায় নিজেই এসব খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। এগুলোর নাম ছিল ‘খেলুরাজ’। জয়ন্তাপুরী রাজও একটি খেলুরাজ ছিল। জয়ন্ত রায়ের আমলে জৈন্তিয়া রাজ্য অনেক ক্ষুদ্র ছিল। জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুরের মধ্যেই রাজ্যটি সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি তাঁর কন্যা জয়ন্তী দেবী ও তিন পুত্রের মধ্যে এ চারটি অঞ্চল ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এতে জৈন্তিয়া রাজ্য ভেঙ্গে চারটি খণ্ডরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পরে অবশ্য জয়ন্তী দেবী তাঁর তিন ভাইকে হত্যা করে

খণ্ডরাজ্যগুলোকে একত্র করেছিলেন। এতে রাজ্যটির আকার-আয়তন আবারও আগের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল।

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের এই ব্যাখ্যাটি বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। এর কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, জয়ন্তী দেবীকে নিয়ে অন্যান্য ঐতিহাসিকরা যেসব উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন তাতে জয়ন্তী দেবীর ভাইদের কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রিটিশ লেখক ডক্টর জে. এইচ. হাটন, ডক্টর ওয়েড এবং অসমীয়া ইতিহাসবিদ রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া জয়ন্তী দেবীর যেসব উপাখ্যান বা কিংবদন্তী বর্ণনা করেছেন তাতে দেখা যায়, তিনি পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়ত, জয়ন্তাপুরী রাজের প্রতিবেশী তিনটি খণ্ডরাজ্যের রাজাদের যেসব নাম পাওয়া যায় তাতে তাদেরকে পাহাড়ি খাসিয়া-সিন্টেং জনগোষ্ঠীর সদস্য বলেই মনে হয়। নামগুলো শুনতে মোটেও কোন হিন্দু রাজকুমারের নাম মনে হয় না। তৃতীয়ত, জাফলং রাজবাড়ি নিয়ে প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, একজন মাত্র রাজা এই খণ্ডরাজ্যটি শাসন করেছিলেন। চতুর্থত, কিছু ঐতিহাসিকের মতে, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুরকে জৈন্তিয়ার সাথে যুক্ত করেছিলেন সিন্টেং রাজবংশের প্রথমদিকের রাজা বিজয় মাণিক। এই ব্যাখ্যায় জয়ন্ত রায় ও জয়ন্তী দেবীর কথা অনুপস্থিত।

দুই. জাফলং রাজবাড়ির কথা (মাইলং রাজার বাড়ি)

জাফলং নদীর তীরবর্তী বল্লাপুঞ্জি-জুমপার এলাকায় নির্মিত জাফলং রাজবাড়ির কিছু অংশ আজও টিকে আছে। এটি কবে নির্মিত হয়েছিল তা কেউ সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। স্থানীয়দের কাছে এটি 'মাইলং রাজার বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। বাড়ির দুটি ফটক ও দুটি দেয়ালের কিছু অংশ এখনও অক্ষত। দেয়ালের পুরুত্ব ও ফটকগুলোর গঠনশৈলী দেখে মনে হয় জৈন্তিয়ার অন্যান্য স্থাপনার তুলনায় এগুলো বয়স বেশি। ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের মতে, মাইলং রাজা ছিলেন রাজা জয়ন্ত রায়ের পুত্র। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের (১৪৫০-১৫০০ সাল) কোন এক সময়ে রাজা জয়ন্ত রায় জাফলং খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি করে তা মাইলং রাজাকে দিয়েছিলেন। এই খণ্ডরাজ্যের রাজধানী ছিল জাফলং নদীর তীরে। রাজবাড়িটি এই রাজধানীরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। বর্তমানে এই রাজবাড়িতে যা যা টিকে আছে তা আসল

রাজবাড়ির সামান্য অংশমাত্র। রাজধানী ও রাজবাড়ির মূল স্থাপনাসমূহ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।



চিত্র: জাফলং রাজবাড়ির প্রধান ফটক

অন্যান্য ঐতিহাসিকরা এই রাজবাড়ি সম্পর্কে ভিন্ন ধরণের তথ্য দিয়েছেন। তাদের মতে, এই বাড়িটি ছিল প্রাচীন মালনিয়াং রাজ্যের রাজবাড়ি। মালনিয়াং রাজ্যের রাজধানী ছিল জাফলংয়ের বল্লাপুঞ্জি এলাকায়; এই রাজধানীর বেশিরভাগ স্থাপনা বিলীন হয়ে গেলেও রাজবাড়ির একটি অংশ টিকে আছে। এই মালনিয়াং রাজ্যটি একটি রহস্যময় রাজ্য। এর কোন স্পষ্ট ইতিহাস নেই। জৈন্তিয়ার ভেতরে এই রাজ্যটি কী করে সৃষ্টি হল তা কেউ ব্যাখ্যা করেননি। ২০০৫ সালে প্রকাশিত *খাসিয়া জনগোষ্ঠী: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* গ্রন্থের লেখক রুশ পতাম দাবি করেছেন, মালনিয়াং রাজ্যের রাজধানী প্রথমে অন্যত্র ছিল। তখন রাজ্যটি অনেক বড় ছিল। একসময় এর দু'পাশের গৌড় ও জৈন্তিয়ার রাজারা প্রভাবশালী হয়ে উঠলে রাজ্যটির আয়তন কমে যায়। তখন 'বালা' নামক স্থানে রাজ্যটির রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই 'বালা' স্থানটিই বর্তমানের বল্লাপুঞ্জি বা বল্লাঘাট এলাকা। 'বালা'-র নিকটে রাজারা কিছু প্রস্তর

ফলক স্থাপন করেছিলেন। রাজাদের মতৃভাষায় এসব প্রস্তর ফলককে বলা হতো ‘ফ্লং’। এই ‘ফ্লং’ শব্দটি থেকেই প্রথমে ‘ইয়াওফ্লাং’ ও পরে ‘জাফলং’ শব্দটির উৎপত্তি হয়। রুশ পতাম আরও দাবি করেছেন যে, মালনিয়াং রাজ্যটি ত্রয়োদশ শতকের (১২০১-১৩০০ সাল) আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।



চিত্র: জাফলং রাজবাড়ির প্রধান ফটক

রাজ্যটি সম্পর্কে আরও কিছু গ্রন্থ থেকে ভাসা ভাসা তথ্য পাওয়া যায়। এইচ. এম. বারেহ রচিত *ENCYCLOPEDIA OF NORTH EAST INDIA*, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী রচিত *THE KHASI CANVAS: A CULTURAL AND POLITICAL HISTORY* ও *KI KHUM KHASI-KHARA (THE KHASI PEOPLE)* গ্রন্থদ্বয় এবং ডক্টর হোমিওয়েল লিংদহ রচিত *KI SYIEM KHASI BAD SYNTENG* গ্রন্থে মালনিয়াং রাজ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে। ডক্টর হোমিওয়েল লিংদহ রাজ্যটি সম্পর্কে বলেছেন, “The Malyangiang Syiems or Madur Maskut Syiems were great and powerful Syiems of these hills. The people used to call them ‘God Kings’; and their kingdom tradition holds, touched Damer (Dimarua) in Nowgong is Assam to the north, running along

the Khasi and Jaintia Hills up to Kuwain (Sylhet) in the south. Tradition affirms that at one time the kingdom included the whole of Jaintia Hills. After Kyllong Raja was killed, the Synteng (Jaintia) succeeded in conquering and annexing the Kingdom of Madur Maskut. From that time, the Malyangiang people were scattered throughout Khasi and Jaintia Hills. According to tradition, from the time that disappearance of the Malyangiang kingdom till the advent of the British, seven generations have passed by. If you allow 25 years for a generation and if you take 1826 as the year when the East India Company first came to these Hills, the Kingdom of Maskut came to an end in 1651 i.e. at the time of Jasamanta Roy, the Syiem of the Synteng people and Jaintapur." (খাসিয়া ভাষায় রচিত মূল বই থেকে এই অংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন *THE KHASI PEOPLE* গ্রন্থের লেখক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী)



চিত্র: জাফলং রাজবাড়ির দ্বিতীয় ফটক

ডক্টর লিংদহ এর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, মালনিয়াং রাজ্যটি ‘মাদুর মাস্কুট’ নামেও পরিচিত ছিল এবং এর রাজাদের উপাধি ছিল ‘সিয়েম’। তাদের শাসনাধীন এলাকা সিলেটের গোয়াইনঘাট অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আসামের নগাঁও জেলার ডিমারুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বর্ণনা অনুযায়ী, মালনিয়াং রাজ্যটি ছিল উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লম্বাকৃতির একটি রাজ্য। এর দক্ষিণপ্রান্ত ছিল সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকায়, উত্তরপ্রান্ত ছিল আসামের নগাঁও জেলার সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত আর মধ্যবর্তী অংশ ছিল খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত (খাসিয়া পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তবর্তী কিছু অংশ এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তবর্তী কিছু অংশ মালনিয়াং রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। জনশ্রুতি অনুযায়ী, একসময় জৈন্তিয়া পাহাড়ের পুরোটাই মালনিয়াং রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিল্লং রাজা নিহত হওয়ার পরে সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর হাতে মালনিয়াং বা মাদুর মাস্কুট রাজ্যটির পতন হয়। তখন থেকে মালনিয়াং জনগোষ্ঠীর লোকজন খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে (এই জনগোষ্ঠীর লোকজন খাসিয়াদের একটি শাখা অর্থাৎ ‘কুর’ হিসেবে স্বীকৃত ছিল)। সিন্টেংদের হাতে মাদুর মাস্কুটের পতনের সাত প্রজন্ম পরে এই অঞ্চলে ব্রিটশদের আগমন হয়েছিল।

ডক্টর লিংদহ বলেছেন, যদি একটি প্রজন্মের সময়কালকে ২৫ বছর বিবেচনা করা হয় তাহলে ১৬৫১ সালকে মালনিয়াং বা মাদুর মাস্কুট রাজ্যের পতনের সময়কাল ধরতে হবে। এই সময়ে সিন্টেংদের সিয়েম বা জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন যশোমন্ত রায়। হয়তো তিনিই কিল্লং রাজাকে হত্যা করে মালনিয়াং রাজ্যটিকে জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, এর বহু আগেই জাফলং খণ্ডরাজ্যটি (মালনিয়াং রাজ্য) জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৫৬৪ সালের আগের কোন এক সময়ে এই রাজ্যটি দখল করেছিলেন জৈন্তিয়ার রাজা বিজয় মাণিক। রাজ্যটির শেষ রাজার নাম নিয়েও সংশয় আছে। ডক্টর লিংদহ কিল্লং রাজাকে শেষ রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যদের মতে, মাইলং রাজাই ছিলেন শেষ রাজা। গবেষক রুশ পতাম এই রাজ্যের আরও দুজন রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। এরা হলেন- নিয়াং রাজা ও কন্দুর রাজা। এদেরকে নিয়ে মালনিয়াং রাজ্যের মোট চারজন রাজার নাম জানা সম্ভব হয়েছে। এই রাজ্যটির অস্তিত্ব নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ

নেই। সিন্টেং রাজাদের আমলে এটি জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের আগে এটি একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল।



চিত্রঃ জাফলং রাজবাড়ির দ্বিতীয় ফটক

মালনিয়াং ও জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, রুশ পতামের অনুমান অনুযায়ী ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে মালনিয়াং রাজ্যটি বিলুপ্ত হয়নি। বরং ওই সময়েই খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের কেন্দ্রিয় অঞ্চলে রাজ্যটির উদ্ভব হয়েছিল এবং একসময় জৈন্তিয়া সমতলের কিছু অংশ (জাফলং অঞ্চল) এর অধীনে চলে গিয়েছিল। জৈন্তিয়ার কৃষক রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কামদেব। আনুমানিকভাবে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর পরেই রাজ্যটির অধঃপতন শুরু হয় এবং ক্রমশ এর আয়তন সংকুচিত হয়ে আসে। সীমানা সংকুচনের এই পর্বে জৈন্তিয়ার কিছু ভূখণ্ড পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর কিছু রাজা বা সরদারের অধীনে চলে যায়। ওই সময়ে পাহাড়ি রাজা বা সরদাররা যেসব স্বাধীন রাজ্য বা খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মধ্যে মালনিয়াং ছিল সবচেয়ে বড়। জৈন্তিয়ার ফালজুর ও চারিকাটা অঞ্চলে আরও দুটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জৈন্তিয়া রাজ্যটি তখন কেবলমাত্র জয়ন্তাপুরী রাজ ও এর আশেপাশের কিছু অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ষোড়শ শতকের সূচনার দিকে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। কিন্তু এতে জৈন্তিয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটেনি; বরং এর উল্টোটাই ঘটেছিল। পাহাড়ি সিন্টেং জনগোষ্ঠীর সিয়েমের হাতে জৈন্তিয়ার পুরোহিত রাজবংশের অবসান হলে রাজ্যটি নতুন শক্তিতে ঘুরে দাঁড়ায়। সিন্টেং রাজবংশের হাতে রাজ্যটির সম্প্রসারণ ঘটে। মালনিয়াং রাজ্য বা জাফলং খণ্ডরাজ্য, চারিকাটা খণ্ডরাজ্য এবং ফালজুর খণ্ডরাজ্য ছাড়াও অনেক নতুন অঞ্চলকে সিন্টেং রাজারা তাদের অধীনস্ত করেছিলেন। এসব অঞ্চল জৈন্তিয়ার প্রশাসনিক অঞ্চল বা 'রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাদের শাসনামলে জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর ছিল জৈন্তিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি রাজ (খেলুরাজ)।



চিত্র: মানবসৃষ্ট কারণে ধ্বংসের মুখে জাফলং রাজবাড়ি

তিন. চারিকাটা রাজবাড়ির কথা (দুধরাজার বাড়ি)

চারিকাটার ভিত্রিখেল গ্রামে অবস্থিত 'দুধরাজার বাড়ি' নামে কথিত রাজবাড়িটির অস্তিত্ব এখন প্রায় বিলীন হয়ে গেলেও একসময় এর ভগ্নাবশেষের পাশাপাশি কিছু অক্ষত স্থাপনাও দৃশ্যমান ছিল। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বাড়িটির দু-একটি দালান, মন্দির, ফটক ও ইন্দারা প্রায় অক্ষত অবস্থায় ছিল বলে অনুমেয়। তৎকালীন লেখকদের বর্ণনা থেকে এমন ধারণাই মিলে। স্থানীয় প্রবীণদের কাছ থেকেও এমন তথ্য পাওয়া যায়। তাদের দাবি, কয়েক দশক পূর্বেও বাড়িটিতে বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনার অস্তিত্ব দৃশ্যমান ছিল। গুপ্তধনের লোভে চোরেরা কিছু স্থাপনা ধ্বংস করেছে। রাজবাড়ির একাংশে বসতবাড়ি স্থাপিত হওয়ার কারণেও প্রাচীন স্থাপনার ক্ষতি হয়েছে। কিছু স্থাপনা অরণ্য ও আবর্জনার নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে বলেও তাদের অভিমত। বাড়িটিতে কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দৃশ্যমান না থাকলেও স্থানীয়দের কাছে এটি এখনও একটি 'রাজবাড়ি' হিসেবেই পরিচিত। বাড়িটির অবস্থান একটি টিলার ওপরে। স্থানীয়দের কাছে এটি 'রাজবাড়ির টিলা' নামে পরিচিত।

টিলাটি এখন ঘোর অরণ্যে আচ্ছাদিত। অরণ্যের মধ্যে কিছু উঁচু উঁচু স্তুপ রয়েছে। এসব স্তুপের মধ্যে প্রাচীন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে বলেই মনে হয়। বর্তমানে বাড়িটির একাংশে বসবাসরত বাসিন্দারাও এমন মত ব্যক্ত করেন। তারা জানান, আগে রাজবাড়ির চারপাশে প্রাচীন ইট ও চুন-সুরকির ছড়াছড়ি দেখা যেতো। গুপ্তধন শিকারীরাই অরণ্যের ভেতর থেকে এসব ইট ও চুন-সুরকি বের করে আনতো বলে তাদের ধারণা। অযত্নে-অবহেলায় এই বাড়ির বিভিন্ন মূল্যবান প্রাচীন নিদর্শন হারিয়ে গেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননের মাধ্যমে এখনও এখান থেকে অনেক তথ্য উদ্ধারের সুযোগ রয়েছে। সরকারি খতিয়ানে আগে এই বাড়িটি একটি রাজবাড়ি হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাড়ির জায়গা এখানকার বাসিন্দাদের নামেই রেকর্ডভুক্ত আছে। চারিকাটা ইউনিয়নের ভিত্রিখেল পশ্চিম মৌজার অন্তর্গত এই বাড়িটি সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তামাবিল মহাসড়কের দরবস্ত বাজার থেকে দরবস্ত-চারিকাটা রাস্তা ধরে তিন-চার কিলোমিটার অগ্রসর হলে রাস্তার পাশেই বাড়িটির দেখা পাওয়া যায়।

চারিকাটার এই রাজবাড়ি কে কবে নির্মাণ করেছিলেন তা জানার কোন সূত্র নেই। কেবল অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৫০০ সালের আগের কোন এক

সময়ে জৈন্তিয়ার রাজার দুর্বলতার সুযোগে জনৈক পাহাড়ি সরদার চারিকাটায় একটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর রাজধানী হিসেবে রাজবাড়িটিও নির্মাণ করেছিলেন। বাড়ির পাশের প্রাচীন পুকুরটিও তিনিই খনন করেছিলেন। অনির্দিষ্টকাল ধরে সেই সরদার এবং উত্তরাধিকারীরা স্বাধীনভাবে চারিকাটা শাসন করেছিলেন (সেখানে জৈন্তিয়ার রাজার কোন কর্তৃত্ব ছিল না)। ১৫০০ সালের পরবর্তী সময়ে জৈন্তিয়ায় সিন্টেং রাজাদের শাসন শুরু হলে জৈন্তিয়া আবারও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন চারিকাটাসহ বিভিন্ন স্বাধীন খণ্ডরাজ্য আবারও জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এসব অঞ্চল জৈন্তিয়ার 'রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। চারিকাটার শেষ রাজা অর্থাৎ দুধরাজার প্রকৃত নাম কী ছিল তা-ও জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার রাজা বিজয় মাণিকের হাতে চারিকাটার পতন ঘটে। এই ঘটনা ১৫৫০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে ঘটেছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে।

চার. ফালজুর রাজবাড়ির কথা (ইয়াং রাজার বাড়ি)

জৈন্তাপুর উপজেলার লালাখালের নিকটবর্তী বালিদাড়া গ্রামের একটি সুউচ্চ টিলার নাম 'ইয়াং রাজার টিলা'। টিলাটির এমন নামকরণের কারণ হল, যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে এই টিলার উপরের একটি প্রাচীন রাজবাড়ির কথা প্রচলিত রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এই বাড়িটির কিছু ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট ছিল বলে জানা যায়। তবে বর্তমানে বাড়িটির কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। কয়েক দশক আগেও এখানে সামান্য কিছু ইট ও চুন-সুরকির নিদর্শন দেখা যেতো; এখন প্রায় কিছুই দেখা যায় না। টিলার মাথায় যখন রাজবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন এর সাথে একটি পুকুরও খনন করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং স্থানীয় প্রবীণদের মুখ থেকে পাহাড়ের উপরস্থ এই পুকুরটির কথা জানা গেলেও বর্তমানে এর চিহ্ন প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভূমি থেকে কয়েকশ' মিটার উঁচুতে নির্মিত এই বাড়িতে উঠার জন্য একটি পাথরের সিঁড়িও ছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে এই সিঁড়ির কোন চিহ্ন আর নেই। ভূমি থেকে এতো উঁচুতে, টিলার একদম মাথায় এই রাজবাড়ি নির্মাণের কারণ কিছুটা অনুমেয়।

যে রাজা এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন তিনি একজন স্থানীয় পাহাড়ি সরদার ছিলেন। ১৫০০ সালের আগের কোন এক সময়ে তিনি পাহাড় ও সমতলের কিছু অংশ নিয়ে একটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অধীনস্ত সমতল অঞ্চল ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের অংশ। কিন্তু জৈন্তিয়ায় তখন একটি দুর্বল

রাজবংশের শাসন চলছিল। তাই জৈন্তিয়ার রাজা এই স্বাধীন সরদারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। তবে এই সরদার জৈন্তিয়ার রাজার পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় একেবারে উড়িয়ে দেননি। তাই তিনি অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি জায়গায় রাজধানী বা রাজবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। বাড়িটি ছিল মূলত একটি দুর্গ। দূর থেকে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে যাতে আগাম প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সেজন্যই এতো উঁচুতে এই দুর্গ বা রাজবাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। একই সাথে এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, পাহাড় ও সমতলে সমান প্রভাব বজায় রাখার জন্যই ওই সরদার পাহাড় ও সমতলের ঠিক মিলনস্থলে এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। যখন বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল তখন টিলার মাথা কেটে সমান করা হয়েছিল। আজও তা অনেকটাই সমতল রয়েছে।

জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এই বাড়ির দুজন রাজার নাম জানা যায়। এরা হলেন ইয়াং রাজা ও লং রাজা। জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি অনুযায়ী, এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন ইয়াং রাজা। আর ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই বাড়ির শেষ রাজা ছিলেন লং রাজা। ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, লং রাজা ছিলেন সিন্টেং জনগোষ্ঠীর মানুষ। তাঁর অধীনস্ত সমতল অঞ্চলের নাম ছিল 'ফালজুর'। এই অঞ্চলটি বর্তমানে জৈন্তাপুর ও কানাইঘাট উপজেলার অন্তর্গত। জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশের লালাখাল থেকে মুলাগুল পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের শেষ স্বাধীন সরদার বা রাজা ছিলেন লং রাজা। ১৫৫০ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়ে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা বিজয় মাণিকের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তখন থেকে ফালজুর জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এই রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'রাজ' বা প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ব্রিটিশ লেখক কর্নেল গর্ডনও ফালজুরকে সিন্টেংদের একটি প্রভাবশালী রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ফালজুরের লং রাজাকে 'জৈন্তিয়ার রাজা' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন (এই দাবিটি অতিরঞ্জিত)।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে ফালজুর খণ্ডরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াং রাজার কথাও জানা যায়। তাকে নিয়ে কিছু অদ্ভূত কাহিনী বা কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। এসব কাহিনী পুরোপুরি অবাস্তব ও অলৌকিক গল্পের পর্যায়েই পড়ে। একসময় এসব গল্প ফালজুর অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এসব গল্পের নায়ক ইয়াং রাজা বাস্তবের কোন রাজা নন; তিনি একজন রূপকথার রাজা। বালিদাড়া গ্রামের মানুষের মধ্যে এখনও এসব গল্প প্রচলিত

আছে। এসব গল্প থেকে জানা যায়, ফালজুরের ইয়াং রাজা ছিলেন অত্যন্ত রহস্যময় এক ব্যক্তি। তিনি সুউচ্চ পাহাড়ের মাথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় নির্মিত রাজপ্রাসাদে তাঁর মন বসতো না। তিনি প্রায়ই রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের নিচে চলে যেতেন এবং কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ থাকতেন। প্রতি সপ্তাহেই এই ঘটনা ঘটতো; সপ্তাহের দু-তিন দিন তিনি প্রাসাদের বাইরের কোনো এক অজানা জায়গায় কাটাতেন। এ নিয়ে একদিন রানীর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। কৌতূহলী রানী রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর এই ঘন ঘন অন্তর্ধানের রহস্যটা কী? কিন্তু রাজা এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। তিনি রানীকে এ ব্যাপারে কৌতূহল নিবারণের পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বললেন যে, রানীর এই অযাচিত কৌতূহল তাদের উভয়ের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু রানী রাজার এই উপদেশ মানলেন না। তিনি আরও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। একদিন গভীর রাতে রাজা প্রাসাদ ছেড়ে বের হওয়ার পর রানীও লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর পিঁছু নিলেন। রাজা চললেন পাহাড়ের নিচের একটি ঝর্ণার দিকে। রানী অবাক হয়ে দেখলেন, রাজা ঝর্ণার কাছে পৌঁছে নিজের পেটের ভেতরের নাড়িভুঁড়ি বের করে আনলেন। এরপর তা ঝর্ণার পানিতে ধুয়ে নিতে শুরু করলেন। এমন ভয়ংকর দৃশ্য দেখে রানী আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। এই চিৎকারের শব্দে রাজা পেছনে ফিরে তাকালেন। নিজের নাড়িভুঁড়ি তখনও তাঁর হাতেই! এমতাবস্থায় রানীকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি রানীকে একটি কঠিন অভিশাপ দিলেন। এই অভিশাপে রানী একটি পেঁচায় পরিণত হয়ে গেলেন। আর রাজাও তখন ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। বালিদাড়া গ্রামের অনেকে আজও বিশ্বাস করেন যে, পেঁচারূপী সেই রানী ইয়াং রাজার টিলার আশেপাশেই বসবাস করেন এবং মাঝে মাঝে তিনি ওই ঝরনাস্থলে এসে মানুষের রূপ ধরে বসে থাকেন। তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, অভিশপ্ত এই পেঁচা কারও বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করলে সেই বাড়ির লোকজনের অমঙ্গল হয়।

সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচলিত এসব গল্পের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। তবে তা সুদূর অতীতের ইয়াং রাজা ও তাঁর রাজ্যের অস্তিত্বের পক্ষে এক জোরালো প্রমাণ বটে। তাঁর উপাখ্যান থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি জৈন্তিয়ার কোন রাজার হাতে নিহত হননি। তিনি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত, রাতের বেলায় ঝর্ণার পানিতে স্নানের সময়

তিনি কোন এক ভয়ংকর প্রাণীর খপ্পরে পড়েছিলেন। মানুষখেকো এই প্রাণীটি তাকে হত্যা করে খেয়ে ফেলেছিল। পরদিন মানুষ সেখানে তাঁর নাড়িভুঁড়ির কিছু অংশ খুঁজে পেয়েছিল। এই ঘটনাটিই অতিরঞ্জিত হয়ে একসময় রূপকথার গল্পে রূপ নিয়েছিল। তাঁর পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা ফালজুর শাসন করেছিলেন। লং রাজা ছিলেন তাঁর শেষ উত্তরাধিকারী। (ঐতিহাসিক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের মতে, ইয়াং রাজাকে হত্যা করে জয়ন্তী দেবী ফালজুর দখল করেছিলেন। কিন্তু ইয়াং রাজার উপাখ্যানে এমন কোন ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কর্নেল গর্ডন ও সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মত অনুযায়ী লং রাজাকেই ফালজুরের শেষ রাজা মনে করাই শ্রেয়। একই সাথে ইয়াং রাজাকে ফালজুরের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা মনে করাই শ্রেয়।)

পাঁচ. ফালজুর-শ্রীহট্ট সীমান্ত যুদ্ধ

জৈন্তিয়ার পূর্বাঞ্চল যখন ফালজুরের রাজাদের অধীনস্ত ছিল তখন জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে সুরমা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা তাদেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে এই এলাকার বেশিরভাগই ছিল জলাভূমি; স্থলভাগ ছিল খুবই কম। জৈন্তাপুর উপজেলার লালাখাল থেকে কানাইঘাট উপজেলার মুলাগুল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সরু আকৃতির ভূখণ্ডই ছিল তখনকার পূর্ব-জৈন্তিয়ার মূল জনপদ। এই জনপদের সীমান্তবর্তী সাতবাক অঞ্চলটি তখন পলিমাটি দ্বারা ভরাট হয়ে আবাদ ও বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠছিল। খুব সম্ভবত, এই নতুন চরাঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েই পঞ্চদশ শতকের মাঝামঝি সময়ে ফালজুরের রাজার সাথে শ্রীহট্টের (তখন সিলেটের নাম ছিল 'সরকার-ই-শ্রীহট্ট') শাসকদের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। আনুমানিকভাবে ১৪৪৫ সালে এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা তখন ফালজুরের রাজার পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

এই যুদ্ধে শ্রীহট্টের সৈন্যদের ব্যাপক প্রাণহানী হয়েছিল। তাদের সেনাপতি রূপচন্দ্র নারায়ণ দত্তও পাহাড়িদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। রূপচন্দ্র নারায়ণ দত্ত ছিলেন বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর উপাধি ছিল 'সর-ই-লস্কর'। তিনি বাংলা সালতানাতের আওতাধীন শ্রীহট্ট অঞ্চল রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের আক্রমণ থেকে 'সরকার-ই-শ্রীহট্ট' এর অধীনস্ত অঞ্চলসমূহ রক্ষার জন্য বাংলার সুলতান তাকে সেনাপতি নিযুক্ত

করেছিলেন।[3] এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর বংশধরদের কাছে রক্ষিত পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৪৪০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জৈন্তিয়ার সাথে শ্রীহট্টের সীমান্ত বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজার (প্রকৃতপক্ষে ফালজুরের রাজা) হাত থেকে পূর্ব-শ্রীহট্টের একটি অঞ্চলকে রক্ষার জন্য রূপচন্দ্র সেখানে একটি সৈন্য-শিবির স্থাপন করেছিলেন।

শিবিরটির অবস্থান ছিল জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে। একদিন রাতে জৈন্তিয়ার পাহাড়ি যোদ্ধারা এই শিবিরের ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই হামলায় রূপচন্দ্র এবং তাঁর কয়েকশ সৈন্যের প্রাণহানী ঘটে। যারা বেঁচেছিলেন তারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে বিরশ্রীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে রূপচন্দ্রের স্ত্রী-ও ছিলেন। তিনি তাঁর দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে স্বামীর সাথে সৈন্য-শিবিরেই ছিলেন। পাহাড়িদের হামলার পর তিনি দুই শিশুকে নিয়ে অন্যদের সাথে বীরশ্রীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাংলার সুলতান এই পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

---

[3] During the reign of Sultan Nasiruddin Mahmud Shah of Bengal (1433-1459 CE), Rupchandra Narayan Dutta was appointed as Sar-i-Lashkar of Sarkar-i-Shrihatta for the defense of the northeastern frontier of the Bengal Sultanate. He held the highest military rank of Sar-i-Lashkar, a Persian title meaning ‘Commander-in-Chief of the Army’. As Sar-i-Lashkar of Shrihatta, he was entrusted with guarding the northeastern borders of the Sultanate against incursions from the Khasi and Jaintia hills. The title Sar-i-Lashkar placed him among the most senior officers of the Bengal Sultanate, directly under the Sultan. Although the civil administration of Shrihatta remained under the Faujdar or Sarkar, the Sar-i-Lashkar wielded considerable administrative influence in the frontier region due to the demands of war and maintenance of law and order. As a local chieftain and frontier guardian, he played a key role in protecting the life and property of the people. His appointment of Shrihatta marks the strategic importance of the northeastern border and the continued trust placed on local Bengali chieftains in the administration and defense of medieval Sylhet. (Ramananda Chatterjee, *Dutta Chowdhury Family Records, The Modern Review*, Calcutta, 1940)

পাহাড়িদের হাতে রূপচন্দ্রের নির্মম মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সন্তানদের প্রতি বাংলার সুলতানের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। রূপচন্দ্রের পুত্র সর্বানন্দ দত্তচৌধুরী বড় হয়ে সিলেটের শাসনকর্তা (কানুনগো) হয়েছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নবাব সরওয়ার খাঁ নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর ঘটনাটি বিভিন্ন ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বাংলার শক্তি* পত্রিকার *পল্লীস্মৃতি* প্রবন্ধে এই ঘটনার কথা আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী।

ছয়. খেল ও খেলুরাজের উৎপত্তি

ঐতিহাসিকদের মতে, জৈন্তিয়ায় যখন সিন্টেং রাজাদের শাসন শুরু হয় (১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে) তখন জয়ন্তাপুরী রাজ ছাড়া অন্য কোন সমতল অঞ্চল তাদের হাতে ছিল না। জৈন্তিয়া সমতলের এই একটিমাত্র 'রাজ' বা প্রদেশ নিয়েই সিন্টেং রাজবংশের শাসন শুরু হয়েছিল। এর কয়েক দশক পরে জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর জৈন্তিয়ার অধীনস্ত হয়। এক পর্যায়ে জৈন্তিয়া সমতলের রাজের সংখ্যা আঠারোতে পৌঁছায়। কিন্তু প্রথমদিকের রাজগুলোর গুরুত্ব আর পরের রাজগুলোর গুরুত্ব কখনোই সমান হয়নি। মর্যাদা ও গুরুত্বের বিচারে জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর ছিল অন্যান্য রাজের চেয়ে আলাদা। এগুলোকে জৈন্তিয়ার শ্রেষ্ঠ চারটি রাজ বিবেচনা করা হতো। এসব রাজের অধিবাসীরা রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নিতো এবং ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার বিচারেও এগুলো অন্যান্য রাজ থেকে আলাদা ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্যে এই চারটি রাজকে বলা হতো 'খেলুরাজ'। প্রতিটি খেলুরাজ ছিল কিছু ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। এই অংশগুলোকে বলা হতো 'খেল'। ঐতিহাসিকদের মতে, 'খেল' থেকেই 'খেলুরাজ' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

জৈন্তিয়ার সিন্টেং রাজারা প্রতিটি খেলুরাজকে একই সংখ্যাক খেল-এ বিভক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি খেলুরাজকে তারা একই নামের খেল-এ ভাগ করেছিলেন। এর মানে হচ্ছে, জয়ন্তাপুরী রাজের খেলগুলোর জন্য যেসব নাম নির্ধারিত হয়েছিল জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুরের খেলগুলোর জন্যও সেসব নামই নির্ধারিত হয়েছিল। যেমন- বাউরভাগখেল, ভিত্রিখেল, চৈলাখেল, পাঁচসেউতীখেল, নয়াখেল, লক্ষ্মীপ্রসাদখেল, হুরুখেল বা সরুখেল ইত্যাদি। ব্রিটিশ আমলে এগুলোকে বলা হতো 'খেলুরাজ পরগনার মৌজা'। বর্তমানে এসব মৌজার বিভিন্ন গ্রামের নামের সাথে 'খেল' শব্দটি পাওয়া যায়। বর্তমানে

জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় এই শব্দযুক্ত একই নামের একাধিক গ্রামের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, অতীতে জৈন্তিয়া রাজারা একাধিক স্থানে একই নামের খেল সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমানের খেল শব্দযুক্ত গ্রামসমূহের তালিকা নিম্নরূপ।

জৈন্তাপুর উপজেলা:
১নং নিজপাট ইউনিয়ন: চৈলাখেল, বাইরাখেল, নয়াখেল, কামরাঙ্গীখেল
২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন: ভিত্রিখেল
৩ নং চারিকাটা ইউনিয়ন: সরুখেল, ভিত্রিখেল, কামরাঙ্গিখেল, নয়াখেল
৪নং দরবস্ত ইউনিয়ন: শ্রীখেল

গোয়াইনঘাট উপজেলা
২নং পশ্চিম জাফলং ইউনিয়ন: দ্বারীখেল, ছোটখেল
৩নং পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন: চাউরাখেল, পাঁচহাতিরখেল, চৈলাখেল, ভিত্রিখেল
৫নং পূর্ব আলীরগাও ইউনিয়ন: নয়াখেল
১১নং মধ্য জাফলং ইউনিয়ন: ভিত্রিখেল

কানাইঘাট উপজেলা
৫নং চতুলবাজার ইউনিয়ন: দাড়িখেল

এসব খেল শব্দযুক্ত গ্রামের নাম ছাড়াও বাউরভাগ, পাঁচসেউতি, লক্ষ্মীপ্রসাদ প্রভৃতি নামে একাধিক গ্রাম, মৌজা বা ইউনিয়নের অস্তিত্বও রয়েছে। এগুলোও অতীতের একই নামের একাধিক খেলের সাক্ষ্য বহন করে। যদি রাজ বা পরগনাকে জৈন্তিয়ার 'প্রদেশ' বিবেচনা করা হয় তাহলে খেলগুলোকে 'খেলুরাজ প্রদেশের জেলা' বিবেচনা করা যেতে পারে। খেলুরাজ ছাড়া জৈন্তিয়ার অন্যান্য রাজ বা গরগনায় খেল শব্দযুক্ত কোন গ্রামের নামের অস্তিত্ব নেই। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খেলগুলোর কারণেই জৈন্তিয়ার প্রধান চারটি রাজ বা পরগনাকে খেলুরাজ বলা হতো। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, খেল ও খেলুরাজের সৃষ্টি হয়েছিল সিন্টেং রাজবংশের সূচনার আগেই। *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এই মত পোষণ করতেন। তাঁর দাবি, সিন্টেং রাজাদের আগেই জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর জৈন্তিয়ার

অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরোহিত রাজবংশের শেষ রাজা জয়ন্ত রায় এই তিনটি অঞ্চলসহ জয়ন্তাপুরী রাজের শাসক ছিলেন।

তিনি শেষ বয়সে এসে নিজের রাজ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। তাঁর এক কন্যা ও তিন পুত্র এই চারটি খণ্ডরাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। জয়ন্ত রায়ের কন্যা জয়ন্তী দেবী পেয়েছিলেন জয়ন্তাপুরী রাজ। প্রথম পুত্র পেয়েছিলেন জাফলং। দ্বিতীয় পুত্র পেয়েছিলেন চারিকাটা। আর তৃতীয় পুত্র পেয়েছিলেন ফালজুর (ফালজুর প্রথমে লালাখাল থেকে মুলাগুল হয়ে সুরমা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে মুলাগুল আলাদা রাজ হলে ফালজুরের সীমানা লোভা নদীতে স্থির হয়েছিল)। রাজা জয়ন্ত রায় রাজ্যভাগের সময় সমসংখ্যাক ও সমনামবিশিষ্ট খেল নিয়ে একেকটি খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন (সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে)। কয়েকটি খেল মিলে একেকটি খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি হওয়ায় এগুলো বলা হতো 'খেলুরাজ'। জয়ন্ত রায়ের কন্যা জয়ন্তী দেবী খণ্ডরাজ্যগুলোকে একত্র করে অখণ্ড জৈন্তিয়া প্রতিষ্ঠার পরেও এগুলোকে খেলুরাজ বলা হতো। পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন অঞ্চল জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে সেসব অঞ্চল শুধু 'রাজ' নামে স্বীকৃতি পেয়েছিল (যেহেতু সেগুলো খেল- এর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়নি)।

সাত. জৈন্তিয়ার অন্যান্য অঞ্চল

সিন্টেং রাজবংশের সূচনার দিকে খেলুরাজগুলোর পাশাপাশি নতুন কিছু অঞ্চল জৈন্তিয়ার অধীনস্ত হয়। এগুলো হচ্ছে- ধরগাম, চতুল, খরিল, পাঁচভাগ, আড়াইখা ও চাউরা। এই নতুন ছয়টি অঞ্চল জৈন্তিয়ার সীমানাকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল। আনুমানিকভাবে ১৫৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে রাজা বিজয় মাণিক এসব অঞ্চলকে জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তখন থেকে এগুলো জৈন্তিয়ার মূল চারটি খেলুরাজের পাশাপাশি নতুন ছয়টি 'রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। খেলুরাজের শাসন কাঠামোর সাথে এই নতুন রাজগুলোর শাসন কাঠামোর কিছুটা ভিন্নতা ছিল। এই ভিন্নতার কারণে নতুন রাজগুলোকে বলা হতো 'হাজারকি রাজ'। খেলুরাজ ও হাজারকি রাজের প্রশাসকরা আঞ্চলিক রাজ-প্রতিনিধি হিসবে জৈন্তিয়ার রাজদরবারে অংশ নিতেন এবং রাজ্য পরিচালনায় সরাসরি ভূমিকা রাখতেন। একসময় 'জুলাই রাজ' নামে আরও আটটি অঞ্চল জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও এসব রাজের কোন প্রতিনিধি রাজদরবারে অংশ নিতেন না। এগুলো ছিল মূলত হাজারকি রাজগুলোরই অধীনস্ত কিছু 'দুর্বল রাজ'।

সিন্টেং রাজবংশের সূচনার দিকে জুলাই রাজগুলোতে মানুষের তেমন বসবাস ছিল না। তখন এগুলো ছিল মূলত বড়হাওরসহ বিভিন্ন হাওরের অংশ; বছরের অধিকাংশ সময় এগুলো পানিতে নিমজ্জিত থাকতো। একসময় সুরমা, লোভা, ও সারী নদী দ্বারা বাহিত পলি জমা হয়ে এসব অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু 'কান্দি জমি' সৃষ্ট হয়।[4] প্রথমদিকে পলি মাটি দ্বারা সৃষ্ট এসব কান্দি জমি ছিল ঘোর অরণ্যবেষ্টিত এবং বিভিন্ন প্রজাতির বাঘসহ অসংখ্য বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণস্থল। ক্রমশ জৈন্তিয়ার বিভিন্ন জনবহুল রাজের মানুষ এসে এসব কান্দি জমিতে বসতি গড়ে তোলে এবং হাওরের জমি আবাদ শুরু করে। মোগলান ও কাছাড়ি রাজ্য থেকেও কিছু মানুষ এসে জৈন্তিয়ার এসব দুর্গম অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেছিল এবং আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়েছিল। জনমানবহীন জঙ্গল ও হাওর আবাদ হতে হতে একসময় এসব অঞ্চল জনবহুল এলাকায় পরিণত হয়। তখন জৈন্তিয়ার সিন্টেং রাজারা এসব অঞ্চলকে বিভিন্ন হাজারকি রাজের অধীনস্ত করেন।

জৈন্তিয়ার আটটি জুলাই রাজের নাম হচ্ছে- মুলাগুল, সাতবাক, বাজেরাজ, পশ্চিমভাগ, বড়দেশ, বাউরভাগ, বর্ণফৌদ ও পিয়াইনগুল। আটটি জুলাই রাজের মধ্যে সাতটিই হচ্ছে সুরমা নদীর তীরবর্তী (পিয়াইনগুল ছাড়া)। এগুলো বর্তমানে কানাইঘাট উপজেলার অংশ। মাত্র কয়েকশ বছর আগে সুরমা নদীর বিপুল পলি মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে এসব অঞ্চল বাসযোগ্য হয়েছে। তবে মুলাগুল অঞ্চলটি হাজার বছর আগেই বাসযোগ্য হয়েছিল বলে মনে হয়। এটি প্রথমে ফালজুর খেলুরাজের অংশ ছিল। সিন্টেং রাজাদের আমলে ফালজুর থেকে আলাদা হয়ে মুলাগুল একটি স্বতন্ত্র রাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কানাইঘাট উপজেলার বর্তমান জনবহুল গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে এটি ভাবতেই অবাক লাগে যে, মাত্র কয়েকশ বছর আগেও এসব গ্রাম ছিল জনমানবহীন অরণ্য কিংবা গভীর জলাভূমি। তবে কানাইঘাটের সকল অঞ্চল এমন জনমানবহীন ছিল না। ফালজুর, চতুল ও চাউরা এর উদাহরণ। এসব অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই মানুষের বসবাস থাকায় এগুলো বেশ আগেই জৈন্তিয়ার মূল ভূখণ্ডে জায়গা করে নিয়েছিল।

---

[4] নদী বা খালের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসা পলিমাটি জমে স্থানে স্থানে যে ফালিসদৃশ উঁচু ভূমি সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে বৃহত্তর সিলেটে 'কান্দি জমি' বলা হয়ে থাকে। আসাম ও ত্রিপুরাতেও এই শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। জৈন্তিয়া সমতলের কিছু গ্রামের নামের সাথে এই শব্দটি যুক্ত রয়েছে।

[ব্রিটিশরা যখন জৈন্তিয়া দখল করে, তখন সমতলের প্রায় সকল এলাকাতেই সমানভাবে জনবসতির বিস্তার ঘটেছিল। তাই তারা এখানকার খেলুরাজ, হাজারকি ও জুলাইগুলোর মধ্যে আর কোনো তারতম্য রাখেনি। তারা এগুলোকে সমগুরুত্বসম্পন্ন ১৮টি পরগনায় পরিণত করেছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জৈন্তিয়া সমতলের পরগনার সংখ্যা হয়ে যায় ১৭টি। দুটি পরগনাকে এক করে ফেলায় এমন হয়েছিল। এ দুটি পরগনার নাম হলো—পশ্চিমবাগ ও বাজেরাজ পরগনা।]

অধ্যায় সাত
সিন্টেং রাজবংশের কথা

জৈন্তিয়ার ইতিহাসের বিভিন্ন লোকজ ও দালিলিক উপাদান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোট চারটি রাজবংশের হাতে রাজ্যটি শাসিত হয়েছে। এই চারটি রাজবংশ হল- নারী রাজবংশ, কৃষক রাজবংশ, পুরোহিত রাজবংশ এবং সিন্টেং রাজবংশ। আনুমনিকভাবে ৩১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় ৫৫০ সাল পর্যন্ত রাজ্যটি নারী শাসকদের হাতে শাসিত হয়েছে। আনুমানিকভাবে ৬০০ সাল থেকে ১২৫০ সাল পর্যন্ত রাজ্যটি কৃষক রাজবংশের হাতে শাসিত হয়েছে। আনুমানিকভাবে ১২৫০ সাল থেকে ১৫০০ সাল পর্যন্ত রাজ্যটি পুরোহিত রাজবংশের হাতে শাসিত হয়েছে। ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে রাজ্যটি সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের হস্তগত হয়। ১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীর রাজারা রাজ্যটি শাসন করেছিলেন। এই রাজবংশ ছাড়া অন্য রাজবংশগুলোর ইতিহাস পাওয়া যায় না বললেই চলে। তাই সিন্টেং পূর্ববর্তী যুগে জৈন্তিয়া একটি 'প্রাগৈতিহাসিক' বা 'প্রায়-ঐতিহাসিক' রাজ্য ছিল। সিন্টেং রাজাদের আমলে জৈন্তিয়া ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করে। বিভিন্ন উৎস থেকে এই আমলের যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে রাজ্যটির সমসাময়িক ইতিহাসের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। তাই সিন্টেং রাজাদের যুগকে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকিত যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগে জৈন্তিয়া ছিল একটি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় সভ্যতার লীলাভূমি।

এক. সিন্টেং রাজাদের ইতিহাসের দলিলসমূহ

জৈন্তিয়ার সিন্টেং রাজাদের সময়কার যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা দিয়ে রাজ্যটির কয়েক শতকের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন মুদ্রা, তাম্রফলক ও শিলালিপি থেকে সিন্টেং রাজাদের সময়কাল সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতলে প্রচলিত বিভিন্ন কিংবদন্তি, জনশ্রুতি, গীতিকবিতা এবং ধর্মীয় ও গোত্রীয় উপাখ্যান থেকেও ওই সময়ের কথা জানা যায়। কিছু পারিবারিক ইতিহাস থেকেও ওই সময়কার বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে এটি সত্য যে, সিন্টেং রাজাদের সময়কাল সম্পর্কে যতটা না জৈন্তিয়ার ভেতরের উৎসগুলো থেকে

জানা যায় তার চেয়ে বেশি জানা যায় জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাস থেকে। কামতা ও কোচবিহার রাজ্যের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইতিহাসে জৈন্তিয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে জৈন্তিয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। কাছাড়ি রাজ্যের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে জৈন্তিয়ার প্রসঙ্গ বার বার উঠে এসেছে। আহোম রাজ্যের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে জৈন্তিয়া রাজ্য খুবই প্রাসঙ্গিক। আহোমরাজ প্রতাপ সিংহ সুসেংফার সময়কাল (১৬০৩ সাল-১৬৪১ সাল) থেকে রুদ্র সিংহ সুখরুংফার সময়কাল (১৬৯৬ সাল-১৭১৪ সাল) পর্যন্ত জৈন্তিয়া ও আহোম রাজ্যের মধ্যে প্রচুর পত্র চালাচালি হয়েছিল। এগুলো উভয় রাজ্যেরই ইতিহাসের অংশ।

সিন্টেং রাজাদের সময়ে পাঠান, মোগল ও ব্রিটিশদের হাতে সিলেট শাসিত হয়েছিল। এদের ইতিহাসেও জৈন্তিয়া প্রাসঙ্গিক। সিলেটের কিছু মোগল ফৌজদারের শাসনকালের ইতিহাসে জৈন্তিয়ার কথা এসেছে। ১৭৭০ এর দশকে সিলেটে নিযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা অনেক সরকারি চিঠিতে জৈন্তিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসে তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে জৈন্তিয়া সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এটি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়া দখলের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে একটি শক্তিশালী রাজস্ব কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করে। তারা জৈন্তিয়া সমতলে ভূমি বন্দোবস্তের কাজ শুরু করে। সিলেটের ডেপুটি কালেক্টর জর্জ লক এই কাজের মূল দায়িত্বে ছিলেন। ১৮৩৯ সালে তিনি *জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্ট* প্রস্তুত করেন। লক সাহেব প্রণীত এই রিপোর্টে জৈন্তিয়ার শেষ ছয় রাজার একটি বিবরণ যুক্ত ছিল। তাই এই রিপোর্টটি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তা ও গবেষক বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সরকারি দলিলে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

ডক্টর জন পিটার ওয়েড রচিত *অ্যান অ্যাকাউন্ট অভ আসাম* (১৮০০), স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি রচিত *মেমোরেন্ডাম অন দ্য নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অভ বেঙ্গল* (১৮৬৯), স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার রচিত *স্ট্যাটিসটিক্যাল*

অ্যাকাউন্ট অভ আসাম, দ্বিতীয় ভলিউম (১৮৭৯), স্যার এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট গেইট রচিত *সাম নোটস অন জৈন্তিয়া হিস্টরি* (১৮৯৫), *রিপোর্ট অন দ্য প্রগ্রেস অভ হিস্টরিক্যাল রিসার্চ ইন আসাম* (১৮৯৭) এবং *অ্যা হিস্টরি অভ আসাম, দ্বিতীয় সংস্করণ* (১৯২৬), বি.সি. অ্যালেন প্রণীত *আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, দ্বিতীয় ভলিউম* (১৯০৫), এফ. বি. ব্রাডলি বার্ড রচিত *'সিলেট' থেকারে* (১৯১১), ওয়াল্টার কেলি ফার্মিংগার রচিত *সিলেট ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস, প্রথম ভলিউম* (১৯১৩) ও *সিলেট ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস, দ্বিতীয় ভলিউম* (১৯১৭), কর্নেল গর্ডন রচিত *দ্য খাসিজ* (১৯১৪), *জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল* (১৯২২ সাল, পৃষ্ঠা ৭৩), *জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল* (১৯২৩ সাল, পৃষ্ঠা ৩২৩), *জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল* (১৯২৩ সাল, পৃষ্ঠা ৩৩১) *জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল* (১৯২৬ সাল, পৃষ্ঠা ৩৩৩), *জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল* (১৯২৯ সাল, পৃষ্ঠা ১৬৫), *জার্নাল অভ দি আসাম রিসার্চ সোসাইটি, ভলিউম ১* (১৯৩৩ সাল, পৃষ্ঠা ৬), এ. ডব্লিউ. বথাম প্রণীত *ক্যাটালগ অভ দ্য প্রভিন্সিয়াল কয়েন ক্যাবিনেট অভ আসাম* (১৯৩০) গ্রন্থসহ আরও বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ ও দলিলে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের অনেক তথ্য রয়েছে।

জৈন্তিয়ার ইতিহাস সংরক্ষণে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের এদেশীয় কিছু কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন লেখক-গবেষকেরও বেশ অবদান রয়েছে। ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ববিদ কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত *রাজমালা* বা *ত্রিপুরার ইতিহাস* (১৮৯৬) গ্রন্থ, ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা বাবু চন্দ্র কান্ত সেন প্রণীত *সেটলমেন্ট রিপোর্ট অভ জৈন্তিয়া পরগনাস* (১৮৯৭), অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ* (১৯১০) ও *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ* (১৯১৭) গ্রন্থদ্বয়, জৈন্তাপুরী স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ রচিত *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* (১৯২৭) পুস্তিকা ও *চতুলের সোনাধনের কবিতা* (১৯২৬) নামক গীতিকবিতা, রায় সাহেব গোলাপ চন্দ্র বড়ূয়া সম্পাদিত আহম বুৰঞ্জী (১৯৩০) গ্রন্থ, অসমীয়া অধ্যাপক রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া সম্পাদিত *অসমৰ পদ্য বুৰঞ্জী* (১৯৩৩), *কছাৰী বুৰঞ্জী* (১৯৩৬) ও *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* (১৯৩৭) গ্রন্থত্রয়, ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন* (১৯৪২), রাজমোহন নাথ বি.ই. তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত *সোনাধনের গীত* (১৯৪৭), সৈয়দ মুর্তাজা আলী রচিত *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* (১৯৫৪) ও *হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (১৯৬৫) গ্রন্থদ্বয়, ডি. নাথ রচিত *হিস্টরি অভ দ্য কোচ*

কিংডম (১৯৮৯), ফজলুর রহমান রচিত *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* (১৯৯১) গ্রন্থ এবং জৈন্তিয়া ল্যান্ড হোল্ডার সমিতির স্থায়ী সভাপতি মৌলভী সিকান্দার আলী খন্দকারের পারিবারিক ডায়েরি ও টালি খাতাসমূহ জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্যের উৎস।

দুই. জৈন্তিয়ার অভ্যন্তরীণ দলিলের দুষ্প্রাপ্যতা

রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রয়োজনে জৈন্তিয়ায় কোন একক ভাষার ব্যবহার হতো না। এখানকার রাজদরবারের ভাষা ছিল বাংলা, সিলেটি ও প্নার ভাষা। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে সিন্টেং রাজাদের যোগাযোগের ভাষা ছিল বাংলা ও আহোম ভাষা। মোগলান থেকে জৈন্তিয়ায় আগত যেসব লোকজন সরকারি বা রাজকীয় কাজে কর্মরত ছিলেন তারা সাধারণত নিজেদের কাজে ফারসি ভাষার ব্যবহার করতেন। এছাড়াও ধর্মীয় প্রয়োজনে জৈন্তিয়ায় সংস্কৃত ও আরবী ভাষার চর্চা ছিল। এসব ভাষার কোনটিই সিন্টেং রাজাদের মাতৃভাষা ছিল না। রাজাদের মাতৃভাষা ছিল প্নার ভাষা। এই ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না। তাই এই ভাষায় কোন কিছু লেখা যেতো না। খুব সম্ভবত একারণেই সিন্টেং রাজারা নিজেদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেননি। মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় নিজেদের শাসনকালের কথা লিপিবদ্ধ করে যেতে তারা উৎসাহ বোধ করেননি। যদি রাজারা নিজেদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যেতেন তাহলে রাজ্যটির ইতিহাস রচনার কাজটি অনেক সহজ হয়ে যেতো। একই সাথে বলা যায়, সিন্টেং রাজাদের সময়কার প্রচুর সরকারি দলিলপত্র পাওয়া গেলে রাজ্যটির ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদেরকে এতো বেগ পেতে হতো না।

সমতলের নগর সংস্কৃতির সাথে পার্বত্র গোত্রীয় সংস্কৃতির বিচিত্র মেলবন্ধনে গড়া ওঠা এই রাজ্যটির শাসনপ্রণালী এর প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর শাসন প্রণালী থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিল। রাজারা খুবই অল্প রাজস্ব আদায় করতেন বিধায় এখানে কোন ব্যাপক-বিস্তৃত রাজস্ব প্রশাসন গড়ে ওঠেনি এবং রাজ্যের ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে খুব বেশি লিখিত দলিলেরও প্রয়োজন হয়নি। রাজ্যের বিচারিক কর্মকাণ্ডও ছিল পুরোপুরি মৌখিক। সিন্টেং রাজারা পাথরের আসনে বসে দরবার বা সভা পরিচালনা করতেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা এই দরবারে যোগ দিতেন এবং তাদের পরামর্শ, আলোচনা ও যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে রাজা অপরাধীর শাস্তি নির্ধারণ করতেন, বিভিন্ন দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতেন, রাজ্যের

বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন এবং নিরাপত্তা ও নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। দরবারে যেসব বিষয় চূড়ান্ত করা হতো তার কোন কিছুই লিপিবদ্ধ হতো না। এর কোন প্রয়োজনও ছিল না। সিন্টেং রাজাদের আমলের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং রাজদরবারের কার্যক্রমে লিখিত দলিলের ব্যবহার না থাকায় ঐতিহাসিকরা রাজ্যটির অভ্যন্তরীণ দলিল সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছেন।

জৈন্তিয়া অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন কিংবদন্তি, জনশ্রুতি, গীতিকবিতা, ধর্মীয় ও গোত্রীয় উপাখ্যান, কিছু পারিবারিক ইতিহাস, কিছু মুদ্রা ও তাম্রফলক এবং একটি শিলালিপি ছাড়া রাজ্যটির ইতিহাসের আর কোন অভ্যন্তরীণ দলিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ঐতিহাসিকরা প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাস থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের উপাদান খুঁজে বের করেছেন এবং সেগুলোর ভিত্তিতে সিন্টেং রাজাদের সময়কার ইতিহাস বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। বলাই বাহুল্য যে, ঐতিহাসিকদের এই প্রচেষ্টায় অনেক অসংগতি ও ত্রুটি থাকায় সিন্টেং রাজাদের সময়কালের ইতিহাসে বেশ কিছু অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে।

তিন. সিন্টেং রাজবংশের উৎপত্তি

ষোড়শ শতকের আগ পর্যন্ত জৈন্তিয়া সমতলে পাহাড়ি সিন্টেংদের শাসন ছিল না; জৈন্তিয়া সমতল ছিল একটি হিন্দুশাসিত রাজ্য। তখনকার রাজারা ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। কেদারেশ্বর রায়, ধনেশ্বর রায়, কন্দর্প রায়, জয়ন্ত রায় প্রমুখ ছিলেন জৈন্তিয়ার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ রাজা। বিশিষ্ট গবেষক রাজমোহন নাথের মতে, এই রাজবংশের আদিপুরুষ ফরিদপুর থেকে জৈন্তিয়ায় এসে পুরোহিত ও মন্ত্রী হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে এই মন্ত্রী হয়ে যান রাজা। তাঁর উত্তরাধিকারীরা দীর্ঘদিন জৈন্তিয়া সমতল শাসন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাদের এই রাজবংশটিকে বলা হয় পুরোহিত রাজবংশ। এ রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন জয়ন্ত রায়। তাঁর পলিত কন্যা ছিলেন জয়ন্তী দেবী। এই কন্যাকে নিয়ে নানান রূপকথা প্রচলিত আছে। এসব রূপকথা থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, জৈন্তিয়া সমতলের রাজকন্যা জয়ন্তী দেবীর বিবাহ হয়েছিল জৈন্তিয়া পাহাড়ের সুতংগা পুঞ্জির সরদারের পুত্রের সাথে। এই পুত্রের নাম লন্ডবর। জাতিতে তিনি একজন সিন্টেং ছিলেন। জয়ন্তী দেবী নিজেও একজন সিন্টেং ছিলেন। তিনি শৈশবে সুতংগা পুঞ্জিতে লালিত-পালিত

হয়েছিলেন এবং একারণেই তাকে সুতংগা পুঞ্জির সরদারের পুত্র লন্ডবরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

রাজা জয়ন্ত রায় বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর জয়ন্তী দেবী তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। অন্যদিকে লন্ডবরও তাঁর পিতার পরে উত্তরাধিকারসূত্রে সুতংগা পুঞ্জির সরদার হয়েছিলেন। এর ফলে জৈন্তিয়া সমতল ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের একক রাজ্য হয়ে ওঠার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। লন্ডবর ও জয়ন্তী দেবীর সন্তান একদিকে যেমন জৈন্তিয়া সমতলের উত্তরাধিকার লাভ করেন অন্যদিকে তেমনি জৈন্তিয়া পাহাড়ের সুতংগা পুঞ্জিরও উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। শত শত বছর ধরে উত্তরাধিকারের এই ধারা চালু ছিল। ক্রমশ সমতল আর পাহাড় মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। জয়ন্তী দেবী ও লন্ডবরের বংশধররা কয়েক শতক ধরে জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। এটিই সিন্টেং রাজবংশ। এই রাজবংশের রাজারা একদিকে যেমন ছিলেন সমতলের রাজা তেমনি অন্যদিকে ছিলেন ১২টি পার্বত্য পুঞ্জির প্রধান সরদার বা সিয়েম। জৈন্তিয়া পাহাড়ের ১২টি পার্বত্য পুঞ্জিকে একত্রে বলা হতো 'হিমা'। হিমার ১২ জন সরদারের মধ্যে সুতংগা পুঞ্জির সরদারকে প্রধান সরদার বা সিয়েম বিবেচনা করা হতো। যেহেতু সমতলের রাজা আর সুতংগা পুঞ্জির সরদার হতেন একই ব্যক্তি সেহেতু তিনি ১২টি পার্বত্য পুঞ্জির প্রধান সরদার বা সীয়েমও বিবেচিত হতেন।

তাই সিন্টেং রাজাদের সময়ে জৈন্তিয়া পাহাড় আর সমতল একসূত্রে গাথা পড়েছিল। পার্বত্য হিমার সিয়েম এবং সমতলের জৈন্তিয়ার অধিপতি একই ব্যক্তি হওয়ায় পাহাড় ও সমতলের মধ্যে এক নিবিড় রাজনৈতিক বন্ধন ও ঐক্য গড়ে উঠেছিল এবং জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রতিরক্ষাশক্তি আগের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। পাহাড় ও সমতলের বন্ধন জৈন্তিয়া রাজ্যকে যুগ যুগ ধরে বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা দিয়েছিল। সিন্টেং রাজারা ছিলেন পাহাড় ও সমতলে এই ঐক্যের প্রতীক। সমতলে বসবাস করলেও তারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে যাননি। নাম এবং ধর্ম ছাড়া বাদবাকী সবকিছুতেই তাঁরা পাহাড়ি রীতিনীতির অনুসরণ করতেন। তাদের মাতৃভাষা ছিল প্নার ভাষা এবং রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারের নিয়ম ছিল মাতৃকূলভিত্তিক। পাহাড়ি রীতি অনুযায়ী তারা পাথরের আসনে বসে দরবার পরিচালনা করতেন এবং বিলাসীতা থেকে দূরে থাকতেন। তাদের খাদ্যাভ্যাস

থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছুই ছিল পাহাড়িদের মতো। তবে সমতলের কিছু বিষয়কেও তারা গ্রহণ করেছিলেন। পাহাড়িদের মতো তারা প্নার নামের অধিকারী ছিলেন না।

পুরোহিত রাজবংশের রাজাদের মতোই তারা সংস্কৃত নামের অধিকারী ছিলেন। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তারা পাহাড়িদের থেকে কিছুটা আলাদা ছিলেন। প্রথমদিকের সিন্টেং রাজাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল মিশ্র। তারা সনাতন ধর্মের পাশাপাশি পার্বত্য সিন্টেংদের আদি ধর্মও (নিয়েমত্রে বা নিয়েমট্যানরাই) অনুসরণ করতেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সিন্টেং রাজারা সনাতন ধর্মের শাক্ত ধারার অনুসারী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের সিন্টেং রাজা বৈষ্ণব ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। শেষ রাজাও বৈষ্ণব ছিলেন।

চার. জয়ন্তী দেবীকে নিয়ে প্রচলিত উপাখ্যান

জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের বর্ণনা অনুযায়ী, জৈন্তিয়া সমতলের রাজকন্যা জয়ন্তী দেবী ও তাঁর স্বামী লন্ডবর ছিলেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মানুষ। তিনি লিখেছেন, "... রাজা জয়ন্ত রায়ের তিন পুত্র ও এক পোষ্যকন্যা ছিলেন। কন্যার নাম ছিল জৈন্তি। তাঁহাকে একটি বৃহৎ মাছের পেটে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া মাছের পেটের রানীও বলা হইত। উনি শৈশবে পর্ব্বতের হুতুঙ্গা পুঞ্জিতে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে সেই পুঞ্জিরই খাসিয়া সর্দ্দারের পুত্র লন্ডবরের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।"[5] এই বর্ণনা অনুযায়ী, লন্ডবর ছিলেন একজন পাহাড়ি সরদারের পুত্র। তাঁর পিতা ছিলেন জৈন্তিয়া পাহাড়ের সুতংগা পুঞ্জির সরদার। জয়ন্তী দেবীও ওই পুঞ্জিতেই জন্ম নিয়েছিলেন এবং শৈশবে সেখানেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পরে কোন এক উপায়ে তিনি সমতলের রাজার পালিত কন্যা হিসেবে গৃহীত হয়েছিলেন। জন্মগতভাবে পাহাড়ি সিন্টেং জাতিভুক্ত হওয়ার কারণেই জয়ন্তী দেবীকে পাহাড়ি সিন্টেং সরদারের পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই গল্পটি

---

[5] খাসিয়া ও সিন্টেং জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। তাই অনেকে এই দুটি জনগোষ্ঠীকে একই মনে করতেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর পুস্তকে সিন্টেং জনগোষ্ঠীকে খাসিয়া হিসেবেই অভিহিত করা হয়েছে। সুতংগা পুঞ্জির অধিবাসী লন্ডবর এবং তাঁর পিতা জাতিগতভাবে সিন্টেং হলেও মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ লন্ডবরকে 'খাসিয়া সরদারের পুত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশ্বাসযোগ্য। জয়ন্তী দেবীকে মাছের পেটে আবিষ্কারের ঘটনাটি ছাড়া এই গল্পের বাকি তথ্যগুলো বিশ্বাসযোগ্য।

জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল ১৯২৬ এর ৩৩৩ পৃষ্ঠায় জয়ন্তী দেবীকে নিয়ে প্রচলিত আরেকটি গল্পের বর্ণনা দিয়েছেন ডক্টর জে. এইচ. হাটন। তিনি ১৯২৫ সালে জয়ন্তীপুরে এসে এই গল্পটি শুনেছিলেন। এই গল্প অনুযায়ী, জৈন্তিয়ার সিন্টেং রাজাদের পূর্বপুরুষ বড়গোসাঁই ছিলেন পার্বত্য সরদার লন্ডবরের পুত্র। লন্ডবর একদা সমতলের সুলতানপুর নামক একটি অঞ্চলের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এই শাসনকর্তার নাম ছিল মোহাম্মদ সুলতান। তাকে পরাজিত করে লন্ডবর সুলতানপুর দখল করেছিলেন। কিন্তু এই বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পরে জহির বেগ এসে সুলতানপুর পুনরুদ্ধার করেন এবং লন্ডবরকে বন্দী করে রাখেন। এমতাবস্থায় একদিন বড়গোসাঁই তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে জৈন্তাপুরের কাছে শিকার করতে গিয়েছিলেন। কুকুরটি হঠাৎ পথভ্রষ্ট হয়ে সমতলে চলে যায়।

সমতলের লোকজন কুকুরটিকে রানী সিংহ অর্থাৎ জয়ন্তী দেবীর কাছে নিয়ে গেলে তিনি এটির গলায় একটি সোনার শেকল বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দেন। তাঁর গুপ্তচররা কুকুরটিকে অনুসরণ করার পর ফিরে এসে জানায় যে, কুকুরটি লন্ডবরের পুত্রের। রানী সিংহ বড়গোসাঁইকে আটক করে নিয়ে আসার জন্য তাঁর দুজন সেনাপতিকে আদেশ দেন। এরা হলেন ভীম সেনাপতি এবং রানা সিংহ। তারা বড়গোসাঁইকে আটক করে রানীর সামনে উপস্থাপন করলে সে রানীকে তার বাবা লন্ডবরের দুর্দশার কথা জানায়। এতে রানী বড়গোসাঁইয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। রানীর আদেশে রানা সিংহ জহির বেগকে হত্যা করে লন্ডবরকে উদ্ধার করেন এবং তাকে সুতংগা পুঞ্জির ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর রানী সিংহ বড়গোসাঁইকে নিজের দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নেন। রানী সিংহের মৃত্যুর পর এই বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। লন্ডবরের মৃত্যুর পর তিনি সুতংগা পুঞ্জিরও উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন।[6]

---

[6] কেউ কেউ মনে করেন, এই সুতংগা পুঞ্জির নাম থেকেই 'সিন্টেং' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা একসময় নিজেদেরকে সিন্টেং বলে পরিচয় দিতেন এবং জৈন্তিয়া পাহাড়কে 'কা রি সিন্টেং' বলে ডাকতেন। *দ্য খাসিজ* এর রচয়িতা কর্নেল গর্ডন লিখেছেন, তিনি সুতংগা পুঞ্জিতে একটি ৭৪ ফুট দীর্ঘ ঘর

পাঁচ. *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জীতে* জয়ন্তী দেবীর কথা

ব্রিটিশ লেখক ডক্টর ওয়েড এবং অসমীয়া ইতিহাসবিদ রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের কাছ থেকে জয়ন্তী দেবীকে নিয়ে প্রচলিত একটি রূপকথার গল্প শুনেছিলেন। তাঁরা উভয়েই এই রূপকথার গল্পটিকে তাদের বইয়ে স্থান দিয়েছেন। ডক্টর ওয়েড তাঁর *অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ আসাম* গ্রন্থে এই গল্পটির বর্ণনা দিয়েছেন। আবার রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া তাঁর *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থে একই গল্প বর্ণনা করেছেন। উভয় গ্রন্থের গল্পের বর্ণনা খুবই কাছাকাছি। গল্পটি নিম্নরূপ।

জৈন্তিয়া সমতলের রাজা জয়ন্ত রায় ছিলেন নিঃসন্তান; তাঁর রাজ্যের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।[7] তাই তিনি একদিন রাজ্যের প্রধান দেবীর কাছে একটি পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু দেবী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, তাঁর ঘরে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হবে। যথারীতি তাই হল। জয়ন্ত রায়ের ঘরে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হল এবং এই শিশুটির নাম রাখা হল জয়ন্তী দেবী। পরিণত বয়সে রাজ পুরোহিতের পুত্র লম্ভবরের সাথে জয়ন্তী দেবীর বিবাহ হয়। রাজা জয়ন্ত রায় বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়লে জয়ন্তী দেবীর হাতে রাজ্যক্ষমতা তোলে দেন। সিংহাসনে বসার পর জয়ন্তী দেবীর নতুন নাম হলো রানী সিংহ। রানী সিংহ ক্ষমতায় আসার পর সুখী হতে পারলেন না। কোনো এক তুচ্ছ কারণে তিনি তাঁর স্বামী লম্ভবরকে অবিশ্বাস করে বসেন। ফলে তাকে রাজ্য থেকে বের করে দেন। স্ত্রী-রাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর হতভাগা লম্ভবর বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকেন। দুর্গম পাহাড় ও বনজঙ্গল পেরিয়ে একসময় তিনি 'সুতংগা' নামক স্থানে পৌঁছান।

সেখানে এক পাহাড়ি রাজা বা সরদার বাস করতেন। লম্ভবরের দুঃখের কথা শুনে সেই পাহাড়ি সরদার তাকে আশ্রয় দেন এবং নিজের পালকপুত্র করে নেন। ওই পাহাড়ি সরদার মারা গেলে লম্ভবর সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।

দেখেছিলেন। এতো বড় ঘর জৈন্তিয়া পাহাড়ের আর কোথাও তিনি দেখেননি। এই ঘরটি এই পুঞ্জির শ্রেষ্ঠত্বের একটি নিদর্শন ছিল।

[7] *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের বর্ণনা অনুযায়ী, রাজা জয়ন্ত রায় নিঃসন্তান ছিলেন না। তাঁর তিনটি পুত্রসন্তান ছিল। জৈন্তি বা জয়ন্তী ছিলেন তাঁর পোষ্যকন্যা। এই কন্যার জন্ম হয়েছিল জৈন্তিয়া পাহাড়ের সুতংগা পুঞ্জিতে।

এদিকে রানী সিংহ ততদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হচ্ছিলেন। এই অনুশোচনা থেকে মুক্তির জন্য তিনি দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান। দেবী স্বপ্নে এসে তাকে দেখা দিয়ে বলেন, দৈব কৃপায় রানী সিংহের আরেকটি পৃথক সত্তা জন্ম নেবে এবং এক অভিনব উপায়ে সেই পৃথক সত্তাটি লন্ডবরের সঙ্গে মিলিত হবে। দেবী আরও বলেন যে, সেই পৃথক সত্তাটির নাম হবে 'মৎস্যদুয়ারী'। যেই কথা সেই কাজ। দৈবক্রমে রানী সিংহের ছায়া থেকে জন্ম নিল একটি কন্যাশিশু অর্থাৎ মৎস্যদুয়ারী। এ শিশুটি নিক্ষিপ্ত হলো পানিতে এবং বড় একটি মাছ এসে তাকে গ্রাস করে নিল। এর মধ্য দিয়ে মৎস্যদুয়ারী একটি মাছে পরিণত হয়ে গেল। এবার তার কাজ লন্ডবরকে খুঁজে বের করা।

এজন্য সে পাহাড়ি নদী দিয়ে চলতে শুরু করল। চলতে চলতে সে একদিন পৌঁছে গেল সুতংগা রাজ্যে। সেখানে সে ধরা পড়ল লন্ডবরের হাতে। লন্ডবর জানতেন না তিনি আসলে মৎস্যরূপী একজন তরুণীকেই ধরে নিয়ে এসেছেন। তিনি এটিকে নিজের ঘরের ভেতর একটি পাত্রের মধ্যে রেখে দিলেন। এবার শুরু হল অবাক কাণ্ড! দিনের বেলায় যখন লন্ডবর ঘরে থাকতেন না, তখন মৎসদুয়ারী মানুষের আকার ধারণ করে সেই ঘরটি পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। লন্ডবর দেখলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ এসে ঘরটি পরিপাটি করে রেখে যাচ্ছে। এতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকল না। তিনি এই অজানা মানুষটিকে বের করার জন্য একদিন বাইরে যাওয়ার ভাণ করে লুকিয়ে থাকলেন। এবার মৎসদুয়ারী ধরা পড়ল লন্ডবরের হাতে। এই দৈব-কন্যাটিকে লন্ডবরের ভালো লেগে গেল এবং তিনি তাকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে নিলেন। এর ফলে রানী সিংহের পৃথক দৈব সত্তা মিলিত হলো লন্ডবরের সঙ্গে। এরপর মৎস্যদুয়ারী ও লন্ডবরের ঘরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়।

এই রূপকথার গল্পটির তেমন কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। এর কারণ, গল্পটিতে একদিকে যেমন অতিপ্রাকৃত ও অসম্ভব ঘটনার কথা এসেছে তেমনি গল্পের চরিত্রগুলো নিয়েও ভুল তথ্য রয়েছে। গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী জয়ন্তী দেবী এবং লন্ডবরের জন্ম হয়েছিল সমতলে। যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, তাদের কেউই সিন্টেং ছিলেন না। কিন্তু এমন হওয়াটা অসম্ভব। সিন্টেং রাজাদের পূর্বপুরুষ ও পূর্বমাতা সিন্টেং জাতিভুক্ত ছিলেন না- এটি বিশ্বাসযোগ্য

নয়। প্রকৃত সত্য হল, জয়ন্তী দেবী ও লন্ডবর উভয়েই সিন্টেং ছিলেন এবং তাদের জন্ম হয়েছিল পাহাড়ে।

ছয়. ষোড়শ শতকের সিন্টেং রাজাদের কথা

ডক্টর জে. এইচ. হাটনের বর্ণনা অনুযায়ী, পার্বত্য সরদার লন্ডবরের পুত্র বড়গোসাঁই ছিলেন সিন্টেং রাজবংশের প্রথম রাজা। *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলীও এই মতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, বড়গোসাঁই ছিলেন একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জৈন্তিয়া অঞ্চলে তাকে 'মানগোসাঁই' নামেও ডাকা হতো। তাঁর পরের রাজা ছিলেন পর্বত রায় এবং এরও পরের রাজা ছিলেন বিজয় মাণিক। আর বিজয় মাণিকের পরের রাজা ছিলেন প্রতাপ নারায়ণ। ১৫৯৬ পর্যন্ত এসব রাজারা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, বড়গোসাঁই ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৫৫০ সালের আগে-পরে) জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর পরের রাজা বিজয় মাণিক ছিলেন ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্য (শাসনকাল: ১৫২৮-১৫৭৯ সাল) এবং কোচ রাজা নরনারায়ণের (শাসনকাল: ১৫৪০-১৫৮৭ সাল) সমসাময়িক একজন রাজা। জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস থেকে তাঁর কথা জানা যায়। সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বইতে এই রাজা ছাড়া বাকি তিনজনের ব্যাপারে কোন তথ্য নেই। তিনি প্রথম চার রাজার শাসনকালকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করেছেন।

বড়গোসাঁই বা মানগোসাঁই	: ১৫৫০ সালের আগে-পরে
পর্বত রায়	: কোন তথ্য নেই
বিজয় মাণিক	: ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত
প্রতাপ নারায়ণ	: ১৫৬৪ থেকে ১৫৯৬ সাল পর্যন্ত

স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে জৈন্তিয়ার রাজাদের যে তালিকাটি দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, ষোড়শ শতকে ছয়জন সিন্টেং রাজা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। গেইট সাহেবের মতে, এই ছয়জন রাজা ১৫০০ সাল থেকে ১৫৯৬ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ মুর্তাজা

আলীর মতো তিনিও এদের শাসনকালকে চিহ্নিত করতে পারেননি।[8] তিনি সিন্টেং রাজাদের যে তালিকাটি দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, প্রথম রাজার নাম পর্বত রায়। কিন্তু ইনি সিন্টেং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা তা নিয়ে গেইট সাহেব নিজেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এটি ধারণা করা যেতে পারে যে, পার্বত রায় রাজবংশটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। এটিও অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজ্যের পাদদেশে অবস্থিত সমতল অঞ্চলে জৈন্তিয়া রাজাদের প্রভাব বাড়িয়েছিলেন। তাঁর নাম পার্বত রায় (পাহাড়ের অধিপতি) এই অনুমানকে সমর্থন করে। অতএব, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, জৈন্তিয়া পাহাড়ের বাসিন্দারা ১৫০০ সালের আগেই একটি রাজ্য গড়ে তোলেছিলেন এবং ওই বছরের কাছাকাছি সময়েই তারা জৈন্তিয়া পরগনার মালিক হয়েছিলেন।" [9]

গেইট সাহেবের অনুমান অনুযায়ী, জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা মিলে সুদূর অতীতে একটি পার্বত্য রাজ্য গঠন করেছিল এবং ষোড়শ শতকের সূচনালগ্নে ওই রাজ্যের অধিপতি পর্বত রায় সমতল অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর পরের রাজা পাহাড় ও সমতলকে যুক্ত করে একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গেইট সাহেব জয়ন্তী দেবী ও লম্ভবরের বিবাহের উপাখ্যান জানতেন বলে মনে হয় না। তাই জৈন্তিয়া সমতলে পাহাড়ি রাজবংশের উদ্ভবের ব্যাপারটিকে তিনি 'পাহাড়িদের রাজ্য সম্প্রসারণের' ফসল বলেই মনে

---

[8] ষোড়শ শতকের সিন্টেং রাজাদের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের কেউই পর্যাপ্ত তথ্য খুঁজে পাননি। তাই নানান উপাখ্যান এবং ত্রিপুরা ও কামতা রাজ্যের ইতিহাসে জৈন্তিয়া সম্পর্কে উল্লিখিত কিছু তথ্য জড়ো করে তারা ষোড়শ শতকের সিন্টেং রাজাদের ইতিহাস বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

[9] "It may be inferred that Parbat Ray was not the founder of the dynasty. It may also be conjectured that it was he who extended the sway of the Janitia kings into the plains tract at the foot of his ancestral kingdom in the hills. His name Parbat Ray "the Lord of the Hills" seems to confirm this supposition. It may, therefore, perhaps be concluded that the inhabitants of the Jaintia hills already formed a single State in 1500 A.D., and that year may be taken roughly as the date when they became the masters of the Jaintia Parganas." – *A HISTORY OF ASSAM*, 2nd Edition, Page- 261

করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ে এমন কোন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। গেইট সাহেব লিখেছেন, পর্বত রায়ের পরের রাজার নাম মাঝগোসাঁই। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ইনিই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে ডক্টর জে. এইচ. হাটন এবং সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, পাহাড়ি সরদার লন্ডবরের পুত্র বড়গোসাঁই ছিলেন সিন্টেং রাজবংশের প্রথম রাজা। জৈন্তিয়া অঞ্চলে তাকে 'মানগোসাঁই' নামেও ডাকা হতো। এডওয়ার্ড গেইট হয়তো এই নামটিকেই ভুলক্রমে 'মাঝগোসাঁই' বলে উল্লেখ করেছেন। এমন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। গেইট সাহেব তাঁর তালিকায় মানসিংহ নামক অন্য এক রাজাকে বানসিংহ নামে উল্লেখ করেছেন। তাই মোটামোটিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মাঝগোসাঁই, মানগোসাঁই এবং বড়গোসাঁই ছিলেন একই ব্যক্তি।

গেইট সাহেবের তালিকায় মাঝগোসাঁইয়ের পরের রাজার নাম বুড়া পর্বত রায় আর সৈয়দ মুর্তাজা আলীর তালিকায় তা পর্বত রায়। এই দুজনও একই ব্যক্তি। গেইট সাহেবের তালিকায় তাঁর পরের রাজারা হলেন বড়গোসাঁই, বিজয় মাণিক ও প্রতাপ রায়। কিন্তু সৈয়দ মুর্তাজা আলীর তালিকায় পরের রাজারা হলেন বিজয় মাণিক ও প্রতাপ নারায়ণ। তিনি বিজয় মানিকের আগে বড়গোসাঁই নামে কোন রাজার নাম উল্লেখ করেননি। বিজয় মানিকের পরের রাজার নাম প্রতাপ রায় বা প্রতাপ নারায়ণ। উভয় লেখকের তালিকা মিলিয়ে ষোড়শ শতকের সিন্টেং রাজাদের নিম্নরূপ তালিকাই যৌক্তিক হবে।

রাজাদের নাম	**রাজাদের শাসনকাল**	
	সূচনা	সমাপ্তি
পর্বত রায় (ইনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নন। এই রাজার পরিচয় নিয়েও সংশয় আছে। হতে পারে যে, লন্ডবরের আরেক নাম ছিল পর্বত রায়)	আনুমানিকভাবে বলা যায়, ষোড়শ শতকের সূচনার দিকে ইনি পাহাড়িদের সরদার ছিলেন।	
মানগোসাঁই/ মাঝগোসাঁই/ বড়গোসাঁই	আনুমানিকভাবে বলা যায়, ষোড়শ শতকের প্রথম পাঁচ/ ছয় দশক এরা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন।	
পর্বত রায়/ বুড়া পর্বত রায়		
বড়গোসাঁই		
বিজয় মাণিক		১৫৬৪ সাল
প্রতাপ রায়/ প্রতাপ নারায়ণ	১৫৬৪ সাল	১৫৯৬ সাল

অধ্যায় আট
ষোড়শ শতকের সিন্টেং রাজাদের কথা

(১৫০০ সাল – ১৫৯৬ সাল)

জৈন্তিয়া রাজ্যের ষোড়শ শতকের ইতিহাস কিছুটা অস্পষ্ট। ঐতিহাসিকরা ষোড়শ শতকের সিন্টেং রাজাদের শাসনকাল নির্ধারণ করতে পারেননি। এমনকি ওই শতকের রাজাদের নাম ও সংখ্যা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিক ষোড়শ শতকের চারজন রাজার কথা বলেছেন। কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে ষোড়শ শতকের ছয়জন রাজার কথা বলেছেন। জৈন্তিয়ার ইতিহাস চর্চায় তাঁর এই তালিকাটি বহুল ব্যবহৃত। বেশিরভাগ লেখক ও ঐতিহাসিক তাঁর এই তালিকার উপর নির্ভর করেই জৈন্তিয়ার ইতিহাস তোলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই তালিকার সপ্তম রাজা ধনমাণিকের (শাসনকাল: ১৫৯৬—১৬০৫ সাল) সময় থেকে জৈন্তিয়ার ইতিহাস বেশ স্পষ্ট। ঐতিহাসিকরা ধনমাণিক ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের শাসনকাল নির্ধারণ করতে পারলেও তাঁর আগের রাজাদের শাসনকাল নির্ধারণ পারেননি। স্যার এডওয়ার্ড গেইটের মতে, সিন্টেং রাজবংশের উদ্ভব ১৫০০ সালে। এ হিসেবে রাজা ধনমাণিকের পূর্ববর্তী ছয়জন রাজার মোট শাসনকাল ৯৬ বছর। গেইট সাহেব এই সময়কালকে ছয়জন রাজার মধ্যে সমভাবে বন্টন করে (১৬ বছর করে) সেসময়কার ইতিহাসের একটি চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। এই সময়বন্টনটি নিম্নরূপ।

রাজাদের নাম	**রাজাদের শাসনকাল**		**মোট সময়**
	সূচনা	সমাপ্তি	
পর্বত রায়	১৫০০ সাল	১৫১৬ সাল	১৬ বছর
মাঝগোসাঁই	১৫১৬ সাল	১৫৩২ সাল	১৬ বছর
বুড়া পর্বত রায়	১৫৩২ সাল	১৫৪৮ সাল	১৬ বছর
প্রথম বড়গোসাঁই	১৫৪৮ সাল	১৫৬৪ সাল	১৬ বছর
বিজয় মাণিক	১৫৬৪ সাল	১৫৮০ সাল	১৬ বছর
প্রতাপ রায়	১৫৮০ সাল	১৫৯৬ সাল	১৬ বছর

এই ছয়জন রাজার মধ্যে প্রথম তিন রাজার সময়কার কোন ঘটনার কথা ইতিহাসে নেই। কেবল তাদের নামগুলোই পাওয়া যায়; এছাড়া আর কিছু জানা যায় না। এডওয়ার্ড গেইট লিখেছেন, পর্বত রায় নামের অর্থ হল 'পাহাড়ের অধিপতি।' *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের লেখক শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখেছেন, 'গোহাই' বা 'গোসাঁই' ছিল আসামের রাজপরিবারের মধ্যে ব্যবহৃত একটি উপাধী এবং মাঝগোসাঁই হয়তো আসামের রাজপরিবারের অনুকরণেই এই উপাধীটি ধারণ করেছিলেন। পরের দুই রাজার সময়কার কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। এর মধ্যে প্রথমেই আসে ফালজুরের বামজঙ্ঘা মহাপীঠ প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা। এই মহাপীঠের সাথে রূপনাথ শিবও আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরপরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ত্রিপুরার রাজার সাথে জৈন্তিয়ার রাজার মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল এর পরে। কামরূপ রাজ্যের সেনাপতি চিলারায় জৈন্তিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য শর্তসাপেক্ষে রাজ্যটি আবার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিল।

এক. বামজঙ্ঘা মহাপীঠ ও রূপনাথ শিব

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ হচ্ছে বৃহত্তর সিলেটের মধ্যে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। এই পীঠস্থানটি জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন একটি গ্রামে অবস্থিত। গ্রামটির নাম বাউরভাগ দ্বিতীয় খণ্ড। এটি বাংলাদেশের সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার লক্ষীপ্রাসাদ পশ্চিম ইউনিয়নের অন্তর্গত। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পীঠস্থানে সতী দেবীর বামজঙ্ঘা অর্থাৎ বাম উরু পতিত হয়েছিল। তন্ত্রচূড়ামণির একটি শ্লোকে জৈন্তিয়ার এই মহাপীঠটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণের কাছে এটি 'ফালজুরের কালীবাড়ী' নামেই পরিচিত।

মহাপীঠটি প্রকাশ লাভ করেছিল গেইট সাহেবের তালিকার চতুর্থ রাজা প্রথম বড়গোসাঁইয়ের আমলে। কথিত আছে যে, তাঁর আমলে কতিপয় রাখাল বালক এই পীঠস্থানে খেলাচ্ছলে পূজা করতে গিয়ে একটি দৈব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়। এই অদ্ভূত ঘটনার কথা রাজপুরুষগণ কর্তৃক রাজা বড়গোসাঁইয়ের শ্রুতিগোচর হয়। এতে রাজা কৌতূহল বোধ করেন এবং স্বীয় গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ফালজুর গমণ করেন। রাজগুরু একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও সিদ্ধপুরুষ

ছিলেন। তাঁর নাম ছিল রুপনাথ। তিনি আধ্যাত্মিক প্রমাণপ্রাপ্ত হয়ে বালকদের খেলাস্থলের রহস্যময় প্রস্তরখণ্ডকে বামজঙ্ঘা পীঠ বলে শনাক্ত করেন এবং জয়ন্তীদেবীকে এর ভৈরবী বলে প্রকাশ করেন। রাজা জয়ন্তীদেবীর এই পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন এবং পীঠস্থানের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। পীঠস্থানে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং পূজাও শুরু হল। প্রতি বছর এখানে নরবলি দেওয়ার প্রথাও চালু হল। জৈন্তিয়া রাজ্যের যেসব অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো তাদের মধ্য থেকেই নরবলির লোক বেছে নেওয়া হতো।



চিত্র: বামজঙ্ঘা মহাপীঠের পাঁচ শতক পুরানো প্রাচীরের একাংশ

বামজঙ্ঘা পীঠ প্রকাশিত হলে এর ভৈরবের অনুসন্ধানও শুরু হয়। এক্ষেত্রে দুটি মত চালু হয়। মহাপীঠকে আঁকড়ে ধরা প্রস্তরাংশকে কেউ কেউ ভৈরব বলে চিহ্নিত করেন। এর নাম ক্রমদীশ্বর। আবার কেউ কেউ মনে করলেন, মহাপীঠ থেকে অল্প উত্তরে আবিষ্কৃত শিবই হচ্ছেন এর ভৈরব। এই শিবের নাম 'রূপনাথ শিব'। পীঠ প্রকাশক রাজগুরু রূপনাথ কর্তৃক পূজিত হওয়ার কারণেই এই শিবের এমন নামকরণ হয়েছিল। রাজা বড়গোসাঁই এই শিবকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

এর দক্ষিণ পাশে একটি মন্দির নির্মাণ করলেন। কিন্তু শিবকে আর মন্দিরে নেওয়া হল না। তিনি যথাস্থানেই পড়ে রইলেন। কথিত আছে যে, শিবকে স্থানান্তরিত না করার জন্য রাজা স্বপ্নলোকে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজা তাই-ই করলেন। মন্দিরটি খালি পড়ে রইল। আর স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত রূপনাথের জন্য তৃণকুটির নির্মাণের প্রথা চালু হল। এই প্রথার একটি বৈশিষ্ট্য হল, সিন্টেং রমণীরা রূপনাথের কুটির বানিয়ে দিয়ে থাকেন। পুরুষদের এই কুটির নির্মাণের অধিকার নেই। রূপনাথের এই কুটির সমতলে নয়; এটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত।[10]



চিত্র: বামজঙ্ঘা মহাপীঠের পুরানো প্রাচীরের গায়ে বিভিন্ন নকশা

[10] রূপনাথ শিব বামজঙ্ঘা মহাপীঠ থেকে অল্পদূরে হলেও উভয়ের অবস্থান দুই দেশে। রূপনাথ শিবের অবস্থান ভারতের অন্তর্গত জৈন্তিয়া পাহাড়ে। পাহাড়ের পাদদেশে যে সমতল গ্রাম রয়েছে সেখানেই মহাপীঠের অবস্থান। কিন্তু পাহাড়ের ঠিক নিচেই দুই দেশের সীমান্ত থাকায় উভয়ের অবস্থান দুই দেশে।

দুই. জৈন্তিয়া–ত্রিপুরা মৈত্রীসম্পর্ক

রাজা বড়গোসাঁইয়ের পরে জৈন্তিয়ার সিংহাসন লাভ করেন রাজা বিজয় মাণিক। তাঁর সময়কাল জৈন্তিয়ার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে জৈন্তিয়া রাজ্য মৈত্রীতা ও সংঘাতের সম্পর্কে জড়িয়েছিল। রাজা বিজয় মাণিক হলেন প্রথম সিন্টেং রাজা যার কথা জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত *রাজমালা* গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জৈন্তিয়াপতি বিজয় মাণিক তাঁর সমসাময়িক ত্রিপুরাধিপতির সাথে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ত্রিপুরার সেই অধিপতির নাম বিজয় মাণিক্য; জৈন্তিয়াপতির নামের সাথে তাঁর নামের বেশ মিল রয়েছে।

তিনি ছিলেন ত্রৈপুর রাজবংশের একজন প্রভাবশালী রাজা এবং ওই রাজবংশের প্রখ্যাতকীর্তি রত্নমাণিক্যের ষষ্ঠপুরুষ। ১৫৩৫ সালে তিনি ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রবল পরাক্রমের কথা জৈন্তিয়াপতির কানে পৌঁছলে তিনি এই রাজার সাথে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে জৈন্তিয়াপতি নানাপ্রকার মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে দেন। এতে খুশী হয়ে মহারাজ বিজয় মাণিক্য প্রতিদানস্বরূপ জৈন্তিয়াপতিকে একটি হাতি উপহার দেন। কিন্তু পরে মহারাজ বিজয় মাণিক্যর কানে এমন সংবাদ গেল যে, জৈন্তিয়াপতি দাবি করেছেন- “বিজয় মাণিক্য ভীত হয়ে আমাকে একটি হাতি উপহার দিয়েছেন।” একথা শুনে তিনি জৈন্তিয়াপতিকে বন্দী করে আনার জন্য একটি বিরাট সৈন্যদল পাঠিয়ে দেন। এই সৈন্যদলের আগমনের সংবাদ পেয়ে জৈন্তিয়াপতি ভয়ে রাজধানী ত্যাগ করেন এবং তাঁর পক্ষে মধ্যস্থতার জন্য কাছাড়ি রাজার দ্বারস্থ হন। কাছাড়ি রাজার সুপারিশক্রমে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে বিজয় মাণিক্যর কাছে পত্র লিখলেন। পত্র পেয়ে বিজয় মাণিক্য তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং নিজ সৈন্যদেরকে ত্রিপুরায় ফিরে আসার জন্য আদেশ পাঠালেন। এরপর উভয় রাজ্যের মধ্যে মৈত্রীভঙ্গের আর কোন ঘটনা ঘটেনি; মহারাজ বিজয় মাণিক্যর সাথে জৈন্তিয়াপতির সুসম্পর্কের আর কোন অবনতি ঘটেনি।

তিন. জৈন্তিয়া রাজ্যের সম্প্রসারণ

হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া বইটির লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, বিজয় মাণিকের আগে জৈন্তিয়া রাজ্য কেবল জয়ন্তাপুরী রাজ পরগনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাফলং, চরিকাটা ও ফালজুর পরগনা তখন তিনটি পৃথক খণ্ডরাজ্য হিসেবে তিনজন স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল। বিজয় মাণিক এই খণ্ডরাজ্যগুলোকে নিজের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। জাফলং ও চরিকাটার অধিপতিদের মৃত্যুর পর তিনি এই খণ্ডরাজ্য দুটোর ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি ফালজুরের অধিপতিকে হত্যা করে সেটিকেও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, এসব খণ্ডরাজ্যের অধিপতিরা ছিলেন সিন্টেং জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন ফালজুরের লং রাজা (ব্রিটিশ লেখক কর্নেল গর্ডন লং রাজাকে জৈন্তিয়ার রাজা বলে অভিহিত করেছেন)। বিজয় মাণিকের আগের সিন্টেং রাজারা এসব স্বাধীন রাজা বা সরদারদেরকে পরাজিত করতে পারেননি।

কিন্তু এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একই মতামত দেননি। *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের বর্ণনা অনুযায়ী, পুরোহিত রাজবংশের শেষ রাজা জয়ন্ত রায় তাঁর রাজ্যকে চারটি অংশে ভাগ করেছিলেন। এগুলো হল- জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর চার সন্তানের মধ্যে খেলুরাজগুলোকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। পোষ্যকন্যা জয়ন্তী দেবীকে দিয়েছিলেন জয়ন্তাপুরী রাজ। প্রথম পুত্রকে দিয়েছিলেন জাফলং, দ্বিতীয় পুত্রকে দিয়েছিলেন চারিকাটা এবং তৃতীয় পুত্রকে দিয়েছিলেন ফালজুর। রাজা জয়ন্ত রায়ের রাজ্যের চারটি অংশকে আবার একত্রিত করেছিলেন জয়ন্তাপুরী রাজের অধীশ্বরী জয়ন্তী দেবী। তিনি কালক্রমে বেশ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেন এবং এক পর্যায়ে চারিকাটার অধিপতিকে হত্যা করে ওই খণ্ডরাজ্যটি দখল করে নেন। এরপর ফালজুর ও জাফলং এর অধিপতিদেরকে হত্যা করে সেগুলোও দখল করে নেন। কিন্তু সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন ভিন্ন কথা। তাঁর বর্ণনামতে, খণ্ডরাজ্যগুলোকে একীভূত করেছিলেন রাজা বিজয় মাণিক। শুধু তাই নয়, এগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু ভূখণ্ডকে তিনি জৈন্তিয়া রাজ্যের সাথে যুক্ত করেছিলেন।

তাঁর রাজ্যের সীমান্তবর্তী ধরগাম অঞ্চলে হঠাৎ করে বেশ অশান্তি দেখা দিয়েছিল। ধরগামের লোকেরা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সেখানকার সরদার রামুন লস্কর রাজা বিজয় মাণিকের প্রতি

আনুগত্য প্রকাশ করলে তিনি ওই অঞ্চলটিকে নিজের রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ক্রমশ চতুল, খরিল, আড়াইখা, চাউরা ও পাঁচভাগ অঞ্চলকেও তিনি নিজের রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন। চারটি খেলুরাজের সাথে যুক্ত এই নতুন ছয়টি ভূখণ্ড জৈন্তিয়া রাজ্যের আয়তনকে অনেকদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল। খেলুরাজের শাসন কাঠামোর সাথে এই নতুন ভূখণ্ডগুলোর শাসনকাঠামোর কিছুটা ভিন্নতা ছিল। সাধারণভাবে এগুলো 'হাজারকি রাজ' নামে পরিচিত ছিল। খেলুরাজের প্রতিনিধিদের মতো এসব হাজারকি রাজের প্রতিনিধিরাও জৈন্তিয়ার রাজদরবারে অংশ নিতে পারতেন। বিজয় মাণিকের পরে আরও আটটি অঞ্চল জৈন্তিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছিল। এগুলো সাধারণভাবে 'জুলাই রাজ' নামে পরিচিত ছিল। সবগুলো অঞ্চলকে সাধারণভাবে 'রাজ' নামে অভিহিত করা হতো। ব্রিটিশ আমলে জৈন্তিয়ার রাজগুলিকে 'পরগনা' নামে অভিহিত করা হতো।

অধ্যায় নয়

চিলারায়ের জৈন্তিয়া বিজয়

(১৫৬৪ সাল)

ত্রিপুরার অধিপতি বিজয় মাণিক্যর সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক পুনরুদ্ধারের পর জৈন্তিয়ার অধিপতি নিরুদ্বেগেই রাজ্য শাসন করছিলেন। কিন্তু তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হল না। জৈন্তিয়ার অধিপতি বিজয় মাণিক হঠাৎ করেই আরেক প্রতিবেশী রাজ্যের সৈন্যদের ভয়ংকর আক্রমণের শিকার হলেন। এই প্রতিবেশী রাজ্যের নাম কামতা রাজ্য। সেখানে কোচবংশীয় রাজাদের শাসন ছিল। এই বংশের বিখ্যাত রাজা ছিলেন নরনারায়ণ (শাসনকালঃ ১৫৫৪ - ১৫৮৭ সাল)। নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজ ছিলেন কামতা রাজ্যের সেনাপতি। তিনি কোন সাধারণ সেনাপতি ছিলেন না। পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা সমরনায়কদের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। এই দিগ্বিজয়ী সেনাপতির হাতে পরাভূত হয়েছিল একের পর এক শক্তিশালী রাজ্য, পরাস্ত হয়েছিলেন অনেক প্রতাপশালী রাজা। চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী রাজ্যগুলোতে তিনি 'চিলারায়' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। চিলের মতো অতর্কিতে আক্রমণ করতেন বলেই তাঁর নাম হয়েছিল চিলারায়। নরনারায়ণের রাজ্যসীমাকে তিনি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।

তাঁর নিপুণ সমরকৌশলের সামনে মাথা নত করতে হয়েছিল আহোম, কাছাড়ি রাজ্য, মনিপুর, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরা, খাইরম এমনকি সিলেট ও চট্টগ্রামকেও। চিলারায়ের প্রথম সফলতা ছিল আহোম বিজয়। ১৫৬৩ সালের জুন মাসে তিনি আসামের রাজধানী গড়গাঁও দখল করেছিলেনন। আহোমদের কাছ থেকে বশ্যতা আদায়ের পর তাঁর দৃষ্টি পড়ে অন্য রাজ্যগুলোর দিকে। কোচ রাজাদের ইতিহাসের দলিল *বংশাবলি-র* বিবরণ থেকে জানা যায়, আহোমদের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর ১৫৬৪ সালের কোন এক সময় চিলারায়ের সেনাবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বর্তমান গোলাঘাট মহকুমার মারাঙ্গিতে থেমে যায় এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। কথিত আছে যে, ওই সময়ে কাছাড়ি রাজা বিনা যুদ্ধে চিলারায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।[11] বংশাবলিতে

---

[11] কাছাড়ি রাজ্যের পুরানো নাম হেড়ম্ব বা হৈড়ম্ব ছিল। কাছাড়ি রাজারা নিজেদেরকে 'হেড়ম্বের প্রভু' বলে মনে করতেন। রাজারা ছিলেন দিমাসা জনগোষ্ঠীর লোক। এজন্য

বলা হয়েছে, কাছাড়ি রাজ্য জয়ের পর নরনারায়ণ এবং চিলারায় মণিপুরের রাজার কাছে কটকী বা দূত পাঠিয়ে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানান। মণিপুরী রাজা মুক্তাবলি সিংহ এই আহবানে সাঁড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।



চিত্র: আসামের ধুবড়ী জেলার চিলারায় মহাবিদ্যালয়ে চিলারায়ের ভাস্কর্য

এরপর কোচ সেনাবাহিনী জৈন্তিয়া রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু জৈন্তিয়ার রাজা কাছাড়ি ও মণিপুরের রাজাদের মতো আত্মসমর্পণ করলেন না। তিনি কোচ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং তাঁর পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন।[12] নতুন রাজা কোচ সেনাপতিকে যুদ্ধের

কাছাড়ি রাজ্যকে দিমাসা রাজ্যও বলা হয়ে থাকে। ১৮৩২ সালে রাজ্যটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। ব্রিটিশদের মানচিত্রে রাজ্যটি কাছাড় জেলা হিসেবে স্থান পায়। বর্তমান ভারতের আসাম রাজ্যের দিমা হাসাও জেলা, কাছাড় জেলা এবং হাইলাকান্দি জেলা হচ্ছে সেই পুরানো কাছাড় জেলার তিনটি অংশ।

[12] মাতৃকূলভিত্তিক সিন্টেং রাজবংশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের নিয়ম ছিল, রাজার পরে ভাগিনেয় হতেন নতুন রাজা। হতে পারে যে, বংশাবলির রচয়িতা জৈন্তিয়ার এই নিয়ম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বিধায় ভাগিনেয় এর স্থলে পুত্র লিখেছেন।

ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা ১০০টি ঘোড়া এবং ১০০টি খঙ্গা নামক জয়ন্তাপুরী তরবারি প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি কোচ রাজাকে প্রতি বছর ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা, ৭০টি ঘোড়া এবং ৩০০টি নকাইদাও (একটি বিশেষ ধরণের ছুরি) দিতে সম্মত হন। এরপর তিনি কোচ রাজার কাছে নিজের নামে মুদ্রা চালু করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু কোচ রাজা তাকে তাঁর রাজধানীর নাম উল্লেখ করে মুদ্রা চালু করার অনুমতি দিলেন।[13] এরপর কোচ সেনাবাহিনী জৈন্তিয়া ছেড়ে ত্রিপুরা অভিযানে চলে যায়। চিলারায় তাঁর ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর এই অভিযানটিও সফল হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, *বংশাবলিতে* জৈন্তিয়ার যে রাজার কথা বলা হয়েছে তিনি ছিলেন বিজয় মাণিক এবং তাঁর স্থলে সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর ভাগিনেয় অথবা পুত্র প্রতাপ রায়। চিলারায়ের ৪০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সাথে বিজয় মাণিক জৈন্তিয়াবাসীকে নিয়ে বীরত্বের সাথেই লড়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই যুদ্ধে রাজা বিজয় মাণিক নিহত হলে জৈন্তিয়াবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং চিলারায় জয়লাভ করেন। এরপর কোচ রাজা নরনারায়ণ বিজয় মাণিকের উত্তরাধিকারী প্রতাপ রায়কে করদ রাজা হিসেবে জৈন্তিয়া শাসনের অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রী পদ্মনাথ বরুয়া সম্পাদিত *অসমৰ বুৰঞ্জী* বইয়ে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বইটির পঞ্চম অধ্যায়ের ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, “চিলাৰায় জয়ন্তীয়া ৰাজ্য আক্রমণ কৰি তাৰ ৰজাক নিক হাতেৰে বধ কৰে, নৰ নাৰায়ণে সেই ৰাজাৰ পুতেককে পিতৃ-সিংহাসন ত বহাই তেওঁক কবতলীয়া ৰাজা পাতিলে।” সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস* গ্রন্থের *জয়ন্তীয়া* অধ্যায়ে লিখেছেন, “প্রতাপ নারায়ণ বার্ষিক ১০,০০০ টাকা, ৭০টি ঘোড়া ও ৩০০ খানা নকাই দাও কর দিতে স্বীকৃত হয়ে রাজ্য ফিরে পান।”[14]

---

[13] কোন করদ রাজ্য সাধারণত নিজস্ব মুদ্রা চালু করতে পারতো না। কিন্তু নরনারায়ণ জৈন্তিয়ার রাজাকে মুদ্রা চালু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সম্ভবত বাংলার সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বাণিজ্য বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বাংলার সাথে পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্য চলতো জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে। জৈন্তিয়া রাজ্যের মুদ্রাব্যবস্থা চালু না থাকলে এই বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হতো।

স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে লিখেছেন, “The first reference to the inhabitants of the Khasi and Jaintia hills in the records of other States occurs about the middle of the sixteenth century, in the annals of the Koch king Nar Narayan. At that time, as later, the two most prominent chiefs seem to have been the Rajas of Jaintia and Khairam. The former is alleged to have been defeated and slain by Nar Narayan's brother Chilarai; and his son, after acknowledging himself a tributary, was set up in his place. Profiting by his example, the chief of Khairam, it is said, hastened to make his submission, and undertook to pay an annual tribute of a considerable amount. From his name, Virjya Vanta, it may be assumed that he also was more or less under the influence of Brahman priests.

The name of the Jaintia king who was defeated by Chilarai is not mentioned, but, from the date of the occurance, it would seem to have been Bar Gosain or Bijay Manik. The Rajmala, or Chronicles of the Kings of Tippera, contains a vague reference to an alleged invasion of Jaintia by the Tippera king, Braja Manik, about the same time as that of the Koches under Chilarai.” (*A HISTORY OF ASSAM*, 1926, Page- 262)

এডওয়ার্ড গেইট এসব তথ্যের উৎস হিসেবে *বংশাবলির* কথাই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কোন প্রতিবেশী রাজ্যের দলিলে জৈন্তিয়ার কথা উল্লেখের প্রথম উদাহরণ হচ্ছে *বংশাবলি*। তিনি আরও বলেছেন, এই দলিলটি ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের। এই দলিলে জৈন্তিয়ার রাজা, রাজার পুত্র এবং খাইরমের সরদার বীর্য্য ভান্তর কথা বলা হয়েছে। জৈন্তিয়ার রাজা এবং তাঁর পুত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, নরনারায়ণের ভাই চিলারায় কর্তৃক রাজা পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র নিজেকে একজন অধীনস্থ রাজা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। এই দলিলে রাজা কিংবা

---

[14] সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রতাপ রায়ের নাম প্রতাপ নারায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই নামটি কোথা থেকে পেয়েছিলেন তা বোধগম্য নয়।

তাঁর পুত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাই এডওয়ার্ড গেইট অনুমান করেছেন যে, প্রথম বড়গোসাঁই অথবা বিজয় মাণিক ছিলেন সেই হতভাগ্য রাজা। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা শুধু বিজয় মাণিকের কথাই বলেছেন।

অধ্যায় দশ

ধনমাণিকের শাসনামল

(১৫৯৬ সাল – ১৬০৫ সাল)

১৫৬৪ সালে কোচ সেনাপতি চিলারায়ের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের পর করদ রাজা হিসেবে প্রতাপ রায় রাজ্যটি শাসনের অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু জৈন্তিয়ার উপর কোচদের এই আধিপত্য বেশিদিন থাকেনি। ১৫৭১ সালে চিলারায়ের মৃত্যুর পর কোচ সাম্রাজ্যের অধিপতি নরনারায়ণ অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৮৮৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর কোচরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'কামতা রাজ্য' নামক মূল কোচ রাজ্যটি ভেঙ্গে তখন কোচবিহার ও কোচ হাজো নামে দুটি আলাদা রাজ্যে পরিণত হয়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর উপর তখন কোচ প্রভাবের অবসান ঘটে। ওই সময়ে কিংবা তারও আগে জৈন্তিয়া রাজ্য স্বাধীন ও সার্বভৌম অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। প্রতাপ রায়ের পরবর্তী রাজা ধনমাণিকের সময়কার (১৫৯৬ সাল - ১৬০৫ সাল) ইতিহাসেও জৈন্তিয়ার ওপর কোচ প্রভাবের কোন উল্লেখ নেই। ধনমাণিকের পরের রাজা যশোমাণিকের সাথে কোচবিহারের রাজপরিবারের স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই রাজপরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তাও হয়েছিল; কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। ওই সময়ে অন্যান্য রাজ্যগুলোর সাথেও কোচবিহারের সম্পর্ক ছিল প্রতিবেশীসুলভ। কোচরা তখন আর আঞ্চলিক পরাশক্তি ছিলেন না।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যে আহম ও ত্রিপুরা ছিল অধিক শক্তিধর রাজ্য। জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের অবস্থান ছিল এদের পরে। কাছাড়ি রাজ্যটি ওই সময়ে অতীতের দুর্বলতা কাটিয়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাছাড়ি রাজা যশোনারায়ণ শত্রুদমন নিজেকে একজন শক্তিশালী রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি পূর্ব সিলেটের প্রতাপগড় পর্যন্ত কাছাড়ি রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর ভাই ও সেনাপতি ভীমবল কনওয়ার ছিলেন একজন সফল সমরবিদ। তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ধনমাণিককে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। এমনকি তাঁর সমরকৌশলের কাছে আহোমের সামরিক গর্বও চূর্ণ হয়েছিল।

এক. জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী কাছাড়ি রাজ্যের উত্থান

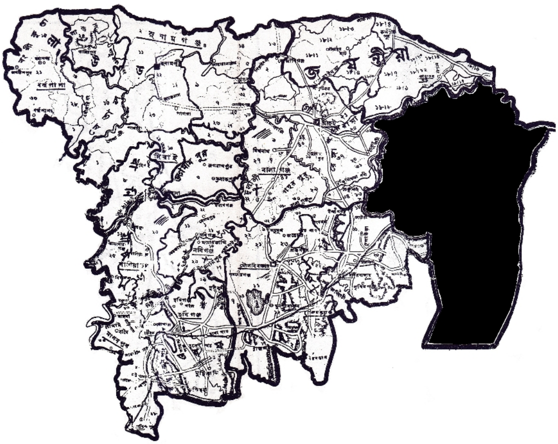
কাছাড়ি রাজ্যটি ছিল ডিমাসা জনগোষ্ঠীর রাজাদের হাতে শাসিত একটি রাজ্য।[15] একারণে এটি ডিমাসা রাজ্য নামেও পরিচিত। ত্রয়োদশ শতকে এটি হিড়িম্বাদেশ নামে পরিচিত ছিল। ওই সময়ে দিখৌ থেকে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণের কালাং নদী পর্যন্ত রাজ্যটির সীমানা বিস্তৃত ছিল; ধানসিড়ি উপত্যকা এবং উত্তর কাছাড় মহকুমা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে আহোমরা তাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে পরাজিত করে নিজেদের রাজ্য সম্প্রসারিত করলে হিড়িম্বাদেশ বা কাছাড়ি রাজ্যের আয়তন কমে যায়। ১৫৩৬ সালের মধ্যে আহোমরা ধানসিড়ি উপত্যকার প্রায় পুরোটাই দখল করে ফেলে এবং ডিমাপুর পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ডিমাপুর ছিল কাছাড়ি রাজ্যের রাজধানী। আহোমদের হাতে ডিমাপুরের পতনের দুই দশক পরে, আনুমানিক ১৫৫৮ সালের দিকে জনৈক কাছাড়ি রাজা মহুর নদীর তীরবর্তী মাইবং শহরে কাছাড়ি রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজ্যটির আয়তন তখন অনেক কম ছিল। ১৫৬৪ সালের কোচ আক্রমণের সময়ে বর্তমান আসামের নগাঁও জেলার উত্তর কাছাড় অঞ্চল এবং কালাং উপত্যকার মধ্যেই রাজ্যটি সীমাবদ্ধ ছিল। খুব সম্ভবত, চিলারায় যখন রাজ্যটির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন তখন এটি পুরোপুরি স্বাধীন রাজ্য ছিল না; এটি ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত রাজ্য ছিল।

১৫৬৪ সালে রাজ্যটি দখলের পর কোচ সেনাপতি চিলারায় সেখানে তাঁর একজন গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্যটির সমতলবর্তী ব্রহ্মপুরে (পরবর্তীতে এর নাম হয় খাসপুর) তিনি একটি শিল্প ও প্রশাসনিক কেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। এই কেন্দ্র থেকে তিনি মণিপুর, ত্রিপুরা, জৈন্তিয়া ও সিলেটের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। কাছাড়ি রাজ্যসহ ওই রাজ্যগুলো তখন কোচ নিয়ন্ত্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই আধিপত্য বেশিদিন

---

[15] কাছাড়ি রাজারা ডিমাসা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই জনগোষ্ঠীটি বৃহত্তর বোডো-কাছাড়ি গোষ্ঠীর একটি অংশ। 'কাছাড়ি' শব্দটি দ্বারা একসাথে অনেকগুলো জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। এসব জনগোষ্ঠীকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল কাছাড়ি রাজ্য। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত হলেও শত শত বছর ধরে ডিমাসা রাজারাই রাজ্যটি শাসন করেছিলেন। তাই রাজ্যটি ডিমাসা রাজ্য নামেও পরিচিত।

টিকেনি। কোচ সেনাপতি চিলারায় ও কোচ অধিপতি নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে ওই রাজ্যগুলো আবারও স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। কোচ আধিপত্যের অবসানের পরবর্তীতে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল কাছাড়ি রাজ্য। আহোম ও ত্রিপুরা রাজ্যদ্বয় কোচ আক্রমণে কিছুটা দুর্বল হয়েছিল। তাই কোচ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তারা কাছাড়ি রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় নেমে পড়েনি। এই সুযোগে কাছাড়ি রাজ্য একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। কাছাড়ি রাজা যশোনারায়ণ শত্রুদমনের হাত ধরেই কাছাড়ি রাজ্যের এই উন্নতি ঘটে। তিনি রাজ্যটির সীমানা বাড়িয়ে পূর্ব সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। পূর্ব সিলেটের প্রতাপগড় অঞ্চলকে (ভারতের করিমগঞ্জ জেলা এবং বাংলাদেশের সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার কিছু অংশ) তিনি কাছাড়ি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলে।



চিত্র: বৃহত্তর সিলেটের মানচিত্রে প্রতাপগড়ের সীমানা

এটি ১৬০২ সালের ঘটনা। পূর্ব সিলেট বিজয়ের স্মারক হিসেবে তিনি ওই বছর একটি মুদ্রা চালু করেছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই মুদ্রাটি সংরক্ষিত আছে। মুদ্রার গায়ে যশোনারায়ণকে ‘সিলেট বিজয়ী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতাপগড় ছিল মূলত সিলটি মুসলমান জমিদারদের এলাকা। ভীমবল কনওয়ার ১৬০২ সালে এক অভিনব কৌশলের সাথে এই অঞ্চলটি দখল করেছিলেন।

এই বিজয়ের ফলে কাছাড়ি রাজ্যের সীমানা জৈন্তিয়া রাজ্যের পূর্বপ্রান্তবর্তী মুলাগুলের কাছে পৌঁছে যায়। ১৬০৩ সালে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নৌপথেও কাছাড়িদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুই. জৈন্তিয়া-কাছাড়ি যুদ্ধ (আনুমানিক ১৬০৩ সাল)

ঐতিহাসিকদের মতে, জৈন্তিয়ার রাজা ধনমাণিকের সময়কাল ছিল ১৫৯৬ সাল থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত। এই সময়কার সবচেয়ে বড় ঘটনা হল জৈন্তিয়া-কাছাড়ি যুদ্ধের ঘটনা। আনুমানিক ১৬০৩ সালে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। স্যার এডওয়ার্ড গেইট লিখেছেন, জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য ডিমারুয়াকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে তিনি এই যুদ্ধ সম্পর্কে পৃথক দুটি বর্ণনা দিয়েছেন। উভয় বর্ণনা থেকে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ।

"সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে কোন এক অজ্ঞাত কারণে জৈন্তিয়ার রাজা ধনমাণিক ডিমারুয়ায় আক্রমণ করে সেখানকার রাজা প্রভাকরকে বন্দী করেছিলেন। ডিমারুয়া ছিল কাছাড়ি রাজ্যের অনুগত একটি সামন্ত রাজ্য। তাই কাছাড়ি রাজা যশোনারায়ণ শত্রুদমন জৈন্তিয়াপতির কাছে প্রভাকরের মুক্তি দাবি করেন। কিন্তু জৈন্তিয়াপতি এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে শত্রুদমন জৈন্তিয়া রাজ্যে আক্রমণ করে ধনমানিককে পরাজিত করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ধনমাণিক কাছাড়ি রাজাকে উপঢৌকন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। একই সাথে তাঁর দুই কন্যা ও ভাগিনেয় যশোমাণিককে কাছাড়ি রাজার হাতে সমর্পণ করেন। ধনমাণিকের উত্তরাধিকারী যশোমাণিককে একজন জিম্মি হিসেবে ব্রহ্মপুরে (পরবর্তীতে এর নাম হয়েছিল খাসপুর) বন্দী করে রাখা হয়। এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শত্রুদমন অসীমদর্দন উপাধি ধারণ করেছিলেন।"[16]

---

[16] "At the beginning of the seventeenth century, the Jaintia king Dhan Manik seized Prabhakar, the chief of Dimarua, whose family owed allegiance to the Kacharis. Prabhakar appealed to the latter, and their king, Satrudaman, demanded his release. Failing to obtain it, he led an army into the Jaintia kingdom and defeated Dhan Manik, who thereupon submitted and undertook to pay tribute; he

রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া সম্পাদিত *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থে এই যুদ্ধের কিছুটা ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির ভূমিকায় এস.কে. দত্ত লিখেছেন, "ধনমাণিক কাছারি রাজা যশোনারায়ণের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কাছাড়ি সেনাপতি ভীমবল কনওয়ার, যিনি মুসলমানদেরকে পরাজিত করেছিলেন, তিনি জয়ন্তীয়া রাজাকেও পরাজিত করে বন্দী করেন। তবে কিছুদিন পরে ধনমাণিক পালিয়ে যান এবং তার বোন ও ভাগিনেয় যশোমাণিককে জামিন হিসেবে পাঠিয়ে কাছাড়ি রাজার সাথে শান্তি স্থাপন করেন। ধনমাণিকের মৃত্যুর পর যশোমাণিক মুক্তি পান এবং জয়ন্তীয়ার রাজা হন।"[17]

---

also gave two princesses to the Kachari king and made over his nephew and heir-apparent, Jasa Manik, as a hostage. The latter was kept a prisoner at Brahmapur, which was afterwards renamed Khaspur. To commemorate his victory, Satrudaman assumed the title Asimardan." (*A HISTORY OF ASSAM*, 2nd Edition, Page- 252)

"At the beginning of the seventeenth century, the Jaintia king Dhan Manik seized Prabhakar, the chief of Dimarua, whose family had formerly been vassals of the Kacharis. He appealed to the Kachari Raja, who demanded his release and, meeting with a refusal, invaded Dhan Manik's kingdom, routed his army, and compelled him to sue for peace. He acknowledged himself a tributary of the Kachari monarch and gave him two princesses in marriage; he also made over his nephew and heir-apparent as a hostage. Soon afterwards, Dhan Manik died, whereupon the Kachari king released Jasa Manik and installed him as king at Jaintiapur." (*A HISTORY OF ASSAM*, 2nd Edition, Page- 262)

[17] Dhan Manik became involved in war with the Kachari King Jasa Narayan. Bhimbal Konwar, the Kachari Commander-in-Chief, who had defeated the Musalmans, also defeated the Jayantia King and made him a prisoner. Dhan Manik however escaped after a time and made peace with the Kachari King by sending his sister and nephew Jasa Manik as hostages. On the death of Dhan Manik Jasa Manik was released and became king of Jayantia. (*Jayantia Buranji*, Introduction by S.K. Dutta, Page- xi and xii)

সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থে এই যুদ্ধ সম্পর্কে আরেকটি ভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, ধনমাণিক ডিমারুয়ায় আক্রমণ করে সেখানকার রাজা প্রভাকরের লোকজনকে বন্দী করেছিলেন এবং তাকে জৈন্তাপুরে নিয়ে এসেছিলেন। এর পরপরই তিনি কাছাড়ি রাজা যশোনারায়ণ শত্রুদমনের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই বিরোধ ডিমারুয়া দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়নি; বিরোধের কারণ ছিল ভিন্ন। জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে সিলেটের সাথে কাছাড়িদের বাণিজ্যের মাশুল আদায় নিয়ে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "কাছাড়িরা জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে সিলেটের সাথে বাণিজ্য করতো। ধনমাণিক কাছাড়ি বণিকদের কাছ থেকে টোল দাবি করেছিলেন। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। প্রথমে কাছাড়ি রাজা পরাজিত হন। এরপর তিনি একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে জৈন্তিয়া আক্রমণ করে ধনমাণিককে পরাজিত করেন। ধনমাণিক ও তাঁর স্ত্রী, ভগিনী মুক্তারানী ও ভাগিনেয় যশোমাণিক (ধনমাণিকের উত্তরাধিকারী) কাছাড়িদের হাতে বন্দী হন। কথিত আছে যে, ধনমাণিক তাঁর কন্যা সন্ধ্যাবলীকে কাছাড়ি রাজার সাথে বিবাহ দিয়ে নিজের মুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে- মুক্তারানী, যশোমানিক এবং জৈন্তিয়ার সেনাপতি অমরসেনকে জিম্মি রেখে ধনমাণিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এরপর মুলাগুলে উভয় রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ১৬০৬ সালের কিছুদিন আগে ধনমাণিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন।"[18]

---

[18] The Kacharis used to carry on trade with Sylhet through the territories of Jaintia Raja. Dhan Manik demanded toll from the Kachari traders, which led to a war between the two countries. At first, the Kachari king was defeated. Later, the Kachari king attacked Jaintia with a bigger army and defeated Dhan Manik and took his wife, Sister Muktarani, nephew and successor Jasomanik as prisoners. Dhan Manik is said to have secured his release by offering his daughter Sundhyabali to the Kachari King. According to another version, Muktarani, Jasomanik and Commander Amarsena were kept as hostages in Kachari court when Dhanamanik was released. The boundary between Jaintia and Kachar was fixed at Mulagool. Dhanamanik died sometime before 1606. (*The History of Jaintia*,

সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর এই বর্ণনায় জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে সিলেটের সাথে কাছাড়িদের বাণিজ্য কীভাবে হতো সেটি ব্যাখ্যা করেননি। ওই আমলের জলপথ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। কাছাড়ি রাজ্যের সাথে সিলেট শহরের যোগাযোগের মূল মাধ্যম ছিল বরাক ও সুরমা নদী। সুরমা নদীর একটি অংশ প্রবাহিত হয়েছে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে। মুলাগুল ও সাতবাকের মধ্যবর্তী অংশ এটি। ১৬০২ সালে কাছাড়ি রাজা কর্তৃক পূর্ব সিলেট বা প্রতাপগড় দখলের পর সুরমা নদীতে কাছাড়ি বণিকদের চলাচল বেড়ে গিয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজা ধনমাণিক এই চলাচলের উপর কর বসিয়েছিলেন এবং তা থেকেই যুদ্ধ বেধেছিল।

Chapter: *Dhan Manik 1596 – 1605*, Page-13)

অধ্যায় এগারো
যশোমাণিকের শাসনামল

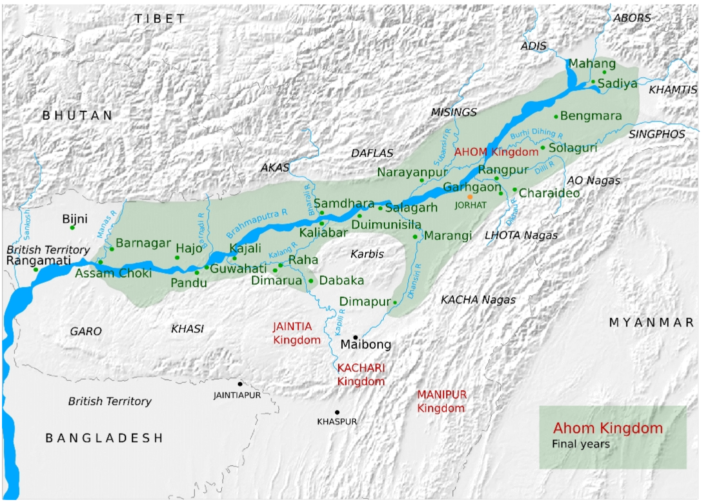
(১৬০৫ সাল – ১৬৪১ সাল)

জৈন্তিয়া-কাছাড়ি যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাজা ধনমাণিক বেশিদিন বাঁচেননি। ১৬০৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর ভাগিনেয় ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যশোমাণিককে তখন কাছাড়ি রাজ্যের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬০৫ অথবা ১৬০৬ সালে যশোমাণিক বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন এবং জৈন্তিয়ায় ফিরে এসে তাঁর মামার উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে লিখেছেন, যশোমাণিকের শাসনকাল ছিল ১৬০৫ সাল থেকে ১৬২৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া সম্পাদিত *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থে বলা হয়েছে, আহোমরাজ প্রতাপ সিংহের সমসাময়িক জৈন্তিয়া রাজা ছিলেন যশোমাণিক। প্রতাপ সিংহের শাসনকাল ছিল ১৫২৫ শকাব্দ থেকে ১৫৬৩ শকাব্দ অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ১৬০৩ সাল থেকে ১৬৪১ সাল পর্যন্ত। এর মানে হচ্ছে, প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর বছর কিংবা এরও পরবর্তী সময় পর্যন্ত যশোমাণিক জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন।

যশোমাণিক কবে মারা গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে জানার কোন উপায় না থাকায় প্রতাপ সিংহের শাসনামলের শেষ বছরটিকে যশোমাণিকের শাসনামলেরও শেষ বছর হিসেবে ধরে নেওয়াটাই যৌক্তিক। যশোমাণিকের শাসনামলের শেষ বছর হিসেবে এডওয়ার্ড গেইট কেন ১৬২৫ সালকে উল্লেখ করেছেন তা বোধগম্য নয়। তিনি কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। তাই এই সালটির গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেহেতু আহোমরাজ প্রতাপসিংহের শাসনামলকে যশোমাণিকের শাসনামলের একটি 'কাছাকাছি সূত্র' হিসেবে পাওয়া গিয়েছে সেহেতু বলা যেতে পারে যে, ধনমাণিকের মৃত্যুর বছর থেকে অর্থাৎ ১৬০৫ সাল থেকে কমপক্ষে প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর বছর অর্থাৎ ১৬৪১ সাল পর্যন্ত যশোমাণিক জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থে যশোমাণিকের শাসনামলের শেষ বছর হিসেবে ১৬৪১ সালকেই উল্লেখ করেছেন।

এক. আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধ (১৬০৬ সাল)

যশোমাণিকের শাসনামলে (১৬০৫ সাল – ১৬৪১ সাল) জৈন্তিয়া রাজ্য কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়ায়নি। প্রতিবেশীদের সাথে জৈন্তিয়ার সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ। তবে যশোমাণিক কাছাড়ি রাজা শত্রুদমনের কাছে জৈন্তিয়ার পরাজয়ের কথা ভুলেননি। জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসার পরপরই তিনি কৌশলে কাছাড়ি রাজাকে একটি উচিত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। আহোমের রাজা প্রতাপ সিংহ সুসেংফার কাছে তিনি দূত পাঠিয়ে জানালেন যে, উভয় রাজপরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে তিনি বিশেষ আগ্রহী। তাঁর কন্যাদের মধ্যে একজনকে তিনি আহোমরাজের কাছে বিয়ে দিতে ইচ্ছুক। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকবে যে, আহোমরাজ এই কন্যাকে কাছাড়ি রাজ্যের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাবেন (কন্যাহে দিম, সাতগাঁও তেতেলীগুবিয়েদি কন্যাক যদি নিয়ে তেহে মঞি আনন্দ পাওঁ - *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী*)। প্রতাপ সিংহ এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। তিনি কাছাড়ি রাজা শত্রুদমনের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন যে, একদল সৈন্যের সাহায্যে তিনি কাছাড়ি রাজ্যের ভেতর দিয়ে জৈন্তিয়ার রাজকুমারীকে আহোম রাজ্যে নিয়ে যেতে চান।



চিত্র: আহোম রাজ্যের একটি গ্রহণযোগ্য মানচিত্র

শত্রুদমন এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলো। এই যুদ্ধের শেষের দিকে স্বয়ং আহোমরাজ প্রতাপ সিংহ নিজে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। ১৬০৬ সালের জুন মাসে প্রতাপ সিংহ কাছাড়িদের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল পাঠান। এরা কপিলিতে পৌঁছে কাছাড়িদের অনুগত একজন সরদারকে পরাজিত করে। এরপর ধরমটীকা নামক স্থানে উভয় রাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আহোম সৈন্যরা জয়লাভ করে। প্রচুর বল্লম, বন্দুক ও তরবারি তাদের হস্তগত হয়। পরাজিত কাছাড়ি সৈন্যরা মাইবং ফিরে যায়। তবে কপিলি এবং মারাদোইয়াং নদীর সংযোগস্থলের একটি দূর্গে তারা কিছু সৈন্য রেখে যায়। আহোমরা এই দূর্গটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। এরপর তারা নিজেদের অবস্থানেই সময় কাটাতে থাকে। অক্টোবর মাসে আহোমরাজ প্রতাপসিংহ নিজে একটি বাহিনী নিয়ে ধানসিড়ি উপত্যাকার দিকে অগ্রসর হন এবং দেমালাইতে কাছাড়িদের একটি সুরক্ষিত অবস্থান দখল করে নেন। নভেম্বর মাসে জৈন্তিয়ার রাজকন্যাকে জয়ন্তীপুর থেকে রহা এবং সেখান থেকে আহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রতাপ সিংহ তাঁর রাজধানীতে ফিরে যান। নগাঁও থেকে বেশিরভাগ আহোম সৈন্যও রাজধানীতে ফিরে যায়। তবে সেনাপতি সুন্দর গোসাঁইয়ের নেতৃত্বে কিছু সৈন্য রহা দূর্গে থেকে যায়। কাছাড়ি রাজা শত্রুদমন এই অল্পসংখ্যাক সৈন্যের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন গভীর রাতে কাছাড়ি রাজার ভাই ও সেনাপতি ভীমবল কনওয়ার রহা দূর্গে আক্রমণ করলেন। আহোম সৈন্যরা এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারল না। তাদের অধিকাংশই মারা পড়ল; বাকীরা পালিয়ে গেল। শত্রুদমন এই কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নিজের রাজধানীর নাম পাল্টে ফেললেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল মাইবং; নতুন নাম রাখা হল ‘কীর্তিপুর’। এমনকি তিনি নিজের নামও পাল্টে ফেললেন। তাঁর নাম ছিল যশোনারায়ণ শত্রুদমন; নতুন নাম রাখলেন প্রতাপনারায়ণ শত্রুদমন। প্রতাপসিংহের পরাভবকারী হিসেবে নিজেকে জাহির করার জন্য তিনি ‘প্রতাপনারায়ণ’ নামটি রেখেছিলেন। নাম পরিবর্তন ছাড়াও শত্রুদমন আরেকটি কাজ করেছিলেন। কাছাড়ি রাজ্য থেকে প্রতি বছর করবাবদ আহোমরাজকে ২০ জন দাস ও ৯ নয়টি ঘোড়া প্রদানের যে নিয়ম ছিল সেটি তিনি রহিত করে দেন।

দুই. *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জীতে* আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধের বর্ণনা

“On the death of Dhan Manik, Jasa Manik was released and became king of Jayantia. It may be noted here that in another chronicle, portions from which have been published as additional matter in our Buranji, we are told that the Jayantia King who suffered defeat in the hands of the Kacharis and was taken prisoner, was Jasa Manik.

Jasa Manik became determined to take revenge on the Kacharis and thought out a plan to invoke the aid of the powerful Ahoms. He offered his daughter to the Ahom King but requested that she should be conveyed through the Kachari country. The Kachari King refused a passage through his kingdom, and consequently, a war broke out between the Ahoms and the Kacharis. Through an artifice of the Kachari Commander, the Ahom army was routed and its Commander Sondar Gohain was killed. As mentioned already, the former also defeated the Muhammadans, and he did so through a sheer trick. The Muhammadan Commander Jamal Khan was led to believe that the Kacharis were anxious for his friendship, and he was persuaded to wait for valuable presents from them instead of advancing against their country. Then one night, the Kacharis suddenly pounded upon the Muhammadan army and, taking them quite at unawares, thoroughly defeated them. Jamal Khan himself was slain. The history of Assam is lull of trickeries in battles, and it appears that the Assamese princes and generals fully believed in the Machiavellian doctrine that on the battlefield justice must go down before force and strategy.

The Ahom King was very sore for the defeat of Sondar Gohain and the Kachari King added insult to the injury by

sending a message that he had preserved Sondar Gohain's head, which could be taken away if it was needed for religious rites. But in the meantime, the Muhammadans attacked the kingdom of the Ahom King, and he naturally did not want another battle with the Kacharis. So he saved his face by informing the Kachari King that Sondar Goohain was acting without authority in attacking the Kacharis, and hence they acted properly by killing him. He also requested the Kachari King not to be displeased.

But the friendship with the Ahoms, which was thus established by Jayantia with a view to punish the Kacharis, did not last long. During the reign of Jayadhwaj Singha, a trader who was a subject of the Ahom King was seized under the orders of the Jayantia King Jasamanta Rai. He was subsequently released, but his property was not restored to him under the plea that the trader was not a subject of the Ahom King, as the latter did not write for the property." (*Jayantia Buranji*, *Introduction* by S.K. Dutta, Page- xii)

তিন. এডওয়ার্ড গেইটের বর্ণনায় আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধ

"Soon after his accession, Jasa Manik, Raja of Jaintia, who was on bad terms with the Kachari Raja, Pratap Narayan, endeavoured to embroil the Ahom king by offering him his daughter on condition that he fetched her by a route which led through the Kachari country. Pratap Singh sent messengers to Pratap Narayan to ask for his assent, but the latter, having come to despise the power of the Ahoms since their defeat by Chilarai, refused to give it, and shortly afterwards made a raid on a village inside the Ahom boundary. Incensed by his refusal and by the subsequent unprovoked aggression, Pratap Singh determined to clear a road by force. In June 1606 he

sent troops up the Kallang to Raha and thence up the Kopili, where they defeated a tributary chief of the Kacharis. They proceeded via Hanan to Satgaon and defeated the Kacharis at Dharamtika, capturing many guns, swords and spears. The main body of the Kacharis then retreated to Maibong, leaving a garrison in a fort at the junction of the Kopili and Maradoyang rivers. The Ahoms made an assault on this fort but were repelled. They entrenched themselves and sent word to Pratap Singh, who in October led a fresh force up the Dhansiri valley, and occupied a fortified position at Demalai. In November, the Jaintia princess was successfully escorted from Jaintiapur to Raha, and thence to the Ahom country. Pratap Singh returned to his capital, and the bulk of his troops in Nowgong were withdrawn; but a strong garrison was left at Raha in charge of a Gohain named Sundar.

The latter demanded tribute of the Kacharis and said that if they failed to pay he would attack Maibong itself. In the meantime, Sundar's son Akhek poisoned his mind against the king, and he became indifferent to his duties. The Kachiris, under Bhim Darpa, their king's eldest son, took advantage of the slackness which now prevailed in the fort, to make a night attack, in which Sundar and many other Ahoms were killed, and the rest were put to flight.

Pratap Singh was greatly enraged on receiving news of this disaster, but he foresaw the approach of renewed hostilities with the Muhammadans and was unwilling to weaken his resources by continuing the struggle with the Kachari king. He therefore sent him a pacific message and presents, and said that Sundar Gohain, in attacking him, had disobeyed orders. Pratap Nariyan accepted the explanation and asked for an Ahom princess in marriage. He was given a daughter of one of the chief nobles, who was escorted by the Burha Gohain to his capital." (*A HISTORY OF ASSAM*, 2nd Edition, Page-106 & 107)

চার. জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তির কথা

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, জৈন্তিয়ার রাজা যশোমাণিকের স্ত্রী ছিলেন কোচবিহারের রাজকন্যা। কামতা রাজ্যের একাংশ নিয়ে গঠিত কোচবিহার রাজ্যের অধিপতি ছিলেন নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। যশোমাণিক তাঁরই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই রাজকন্যা ছিলেন সনাতন ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁর প্রভাবে যশোমাণিকও সনাতন ধর্মের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কথিত আছে, বিয়ের পর নববধূকে নিয়ে জৈন্তিয়ায় ফেরার সময় যশোমাণিক একটি ধাতব মূর্তিও সঙ্গে এনেছিলেন। এটি জয়ন্তেশ্বরী দেবীর মূর্তি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিল। জৈন্তিয়ায় রাজকীয়ভাবে এই মূর্তিটির অর্চনা হতো। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের লেখক শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে, যশোমাণিক কোচবিহারের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধে শত্রুদমনের বিজয়ের পরে। কিন্তু এই তথ্যটি অসংগতিপূর্ণ। আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধটি সংগঠিত হয়েছিল যশোমাণিকের কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে। যশোমাণিক নিজে বিবাহ করেছিলেন এর অনেক আগে। তখন তিনি রাজা ছিলেন না; তখন রাজা ছিলেন তাঁর মামা ধনমাণিক।

স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে যশোমাণিকের বিয়ে এবং মূর্তিপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এর কোন সময়কাল তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন, “There is a tradition that Jasa Manik went to Koch Bihar and married a daughter of Lakshmi Narayan, the ruler of the western Koch kingdom, who died in 1622. It is said that he brought back with him the image of Jaintesvari, which was thenceforth worshipped with great assiduity at Jaintiapur.” (Note: This image is known to have been in Jaintapur at the time of the Ahom conquest in 1708.) (*A HISTORY OF ASSAM*, 1926, Page-263)

এ প্রসঙ্গে শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের *মোসলমান প্রভাব জয়ন্তীয়া* খণ্ডে লিখেছেন, “কথিত আছে যশোমাণিক শত্রুদমনের এই বিজয়ের পর কোচবিহার করিয়াছিলেন[19]; এবং পশ্চিম

---

[19] এই বাক্যটিতে তথ্যগত ও ব্যাকরণগত ভুল আছে – লেখক।

কোচরাজ্যের অধীশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার পানি গ্রহণ করতঃ প্রত্যাগমনকালে স্ত্রী ও তাম্রনির্ম্মিত মূর্ত্তি লইয়া প্রত্যাগমন করেন। এই মূর্ত্তিই জয়ন্তেশ্বরীমূর্ত্তি। যশোমাণিক বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই মূর্ত্তি স্থাপন করতঃ ইহার সেবা পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।" শ্রী চৌধুরী এসব তথ্যের সূত্র হিসেবে *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের পূর্বোক্ত বাক্যগুলোর কথাই উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ তাঁর *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকে লিখেছেন, "ধনমাণিকের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী যশোমাণিক সিংহাসন লাভ করেন। ইনি কোচ-বিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় যৌতুক স্বরূপ ধাতু নির্ম্মিত একটি দেবমুর্ত্তি প্রাপ্ত হন। উহাই নিজপাট রাজধানীতে আনয়ন পুর্ব্বক মহা সমারোহে জৈন্তাশ্বরী কালী নামে প্রতিষ্ঠিত করতঃ তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় আট হাত উচ্চ ও নানা কারুকার্য্য খচিত সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।"

ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজা যশোমাণিক তাঁর শশুরের রাজ্য থেকে প্রাপ্ত জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটিকে রাজধানী জয়ন্তীপুরেই (বর্তমান নিজপাট) স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এখানে এমন কোন মূর্তি বা মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। নিজপাটের প্রাণকেন্দ্রে 'জৈন্তেশ্বরী বাড়ি' নামে একটি বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু এখানে জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তির কোন অস্তিত্ব নেই। এই বাড়িটিতে জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রশাসনিক ও বিচারিক কাজ হতো বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু এখানে জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তি ছিল কিনা তা নিয়ে স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। নিজপাট থেকে জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তির অন্তর্ধানের পেছনে প্রকৃত ঘটনা কী ছিল তা খুঁজে পাওয়া যায় রাজা যশোমাণিকের সময়কালের পরবর্তী শতকে সংঘটিত জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের ইতিহাসে। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৭০৮ সালে। ওই বছরের প্রথমদিকে জৈন্তিয়ার রাজধানী দখলের পর আহোম সৈন্যদের একটি দল জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটিকে আহোমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা মূর্তিটিকে নিয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গোভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু তাদের এই যাত্রা সফল হয়নি। যাত্রাপথে তারা জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মারাত্মক আক্রমণের মুখে পড়ে।

আহোম সৈন্যরা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। আক্রমণে তাদের অনেকেই নিহত হয়। বাকীরা প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে মূর্তিটিকে ফেলে রেখে

পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে তারা নারতিয়াং পুঞ্জিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে আরও কিছু জায়গা থেকে আহোম সৈন্যরা পালিয়ে এসে জড়ো হয়েছিল। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর তারা সবাই মিলে গোভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু এবারেও তারা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়। তাদের বেশিরভাগই প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়। খুব অল্পসংখ্যাক সৈন্যই পালিয়ে যেতে পেরেছিল। আহোমের রাজা জৈন্তিয়াবাসীর এই বিদ্রোহ দমনের জন্য নতুন করে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আহোম সৈন্যরা শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়। উপায়ান্তর না পেয়ে তারা কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। নারতিয়াং এর চারপাশের অনেকগুলো গ্রাম তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে। এসব গ্রাম ছিল জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল। আহোমরা গ্রামগুলোর সকল বাড়িঘর ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু এতেও বিদ্রোহ দমন হয়নি। জৈন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে প্রতিরোধ চলতে থাকলো। অবশেষে ১৭০৮ সালের এপ্রিল মাসে আহোম সৈন্যরা জৈন্তিয়া ত্যাগ করলে এই যুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান হয়।

আহোমের বুরুঞ্জীতে বর্ণিত এই যুদ্ধের ইতিহাসে জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তি কিংবা নারতিয়াং পুঞ্জি নিয়ে আর কোন তথ্যের উল্লেখ নেই। যেটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, আহোম সৈন্যরা জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটি ফেলে চলে যাওয়ার পর সেটি জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হস্তগত হয়েছিল এবং তারা যখন নারতিয়াং পুঞ্জিতে ঘাটি স্থাপন করতে গিয়েছিল তখন মূর্তিটিও তাদের সঙ্গেই ছিল। খুব সম্ভবত, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে মূর্তিটিকে আর জয়ন্তীপুরে ফেরত আনা হয়নি। জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই মূর্তিটিকে নারতিয়াং মন্দিরেই স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে এই মন্দিরে যে তিনটি প্রাচীন মূর্তি দেখা যায় তার মধ্যে যশোমাণিকের আমলের জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটিও রয়েছে বলে অনেকের অভিমত।

পাঁচ. জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটি গেল কোথায়?

জয়ন্তীপুরের (বর্তমান নিজপাট) জৈন্তেশ্বরী বাড়ি কিংবা কোন মন্দিরে জয়ন্তেশ্বরীর ধাতব মূর্তিটির কোন সন্ধান মিলে না। এর কারণ, ১৭০৮ সালে আহোম সৈন্যরা জয়ন্তীপুর থেকে মূর্তিটিকে সরিয়ে নিয়েছিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট তথ্য দিয়েছেন।

গ্রন্থটির একাদশ অধ্যায়ে তিনি মূর্তিটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "This image is known to have been in Jaintapur at the time of the Ahom conquest in 1708." (*A HISTORY OF ASSAM*, 2nd Edition, Page-263) মূর্তিটি কীভাবে জৈন্তাপুর থেকে গায়েব হয়ে গেল সে ব্যাপারে তিনি একই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্ট তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "These measures caused the greatest possible irritation amongst the Jaintia nobles. …they induced the Bar Dalai, the Raja of Khairam, and the inhabitants of two hundred independent Khasi villages to join them in a supreme effort to expel the invaders. …Three of these forts were taken unawares and were captured by the Jaintias, who put the defenders to death. …At the same time a small detachment, which was taking the copper image of the Goddess Jaintesvari to Rudra Singh, was attacked and put to flight and the image was rescued. (*A HISTORY OF ASSAM*, 1926, Page-178)

মূর্তিটি জৈন্তিয়ার যোদ্ধাদের হস্তগত হওয়ার পরেও আহোমদের সাথে তাদের যুদ্ধ চলছিল। জৈন্তিয়ার যোদ্ধাদের শক্তিশালী ঘাটি ছিল নারতিয়াং। আহোমরা সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েও তাদেরকে নির্মুল করতে পারেনি। অবশেষে বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেলে আহোমরা যুদ্ধটিকে অসমাপ্ত রেখেই তাদের নিজেদের দেশে চলে যায়। এরপর কী হয়েছিল সে ব্যাপারে গেইট সাহেব কিছু উল্লেখ করেননি। তবে অনুমান করা যায় যে, জৈন্তিয়ার যোদ্ধারা নারতিয়াং পুঞ্জির গ্রামগুলোকে পুনর্নির্মাণ করেছিল এবং জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটিকে সেখানকার মন্দিরেই স্থাপন করেছিল। নারতিয়াং মন্দিরটি ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলোর একটি। এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা যশোমাণিক। শশুরালয় থেকে জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটি পাওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই কেউ কেউ দাবি করেন যে, যশোমাণিক জয়ন্তেশ্বরীর মূর্তিটিকে এখানেই স্থাপন করেছিলেন (এরা এডওয়ার্ড গেইটের দাবিকে ভুল মনে করেন)।

ছয়. নারতিয়াং মন্দিরের কথা

নারতিয়াং পুঞ্জিতে অবস্থিত প্রাচীন মন্দিরটি কোন সাধারণ মন্দির নয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, এই মন্দিরটি একটি উপপীঠ। এই উপপীঠের ভৈরবী হচ্ছেন জয়ন্তী বা জয়ন্তেশ্বরী দেবী আর ভৈরব হচ্ছেন ক্রমদীশ্বর। গুরুত্বের বিচারে এটি জৈন্তিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্দির। অদ্ভূত ব্যাপার হল, প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই মন্দিরে কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই।[20] এখানকার পুরোহিত হলেন ক্ষত্রিয়। শত শত বছর ধরে বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষত্রিয় পুরোহিতগণ এই মন্দিরের সেবা করে আসছেন। কয়েকশ বছর আগের প্রথম পুরোহিতের বংশধররা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন। তাদের বংশের ইতিহাস অনুযায়ী, জৈন্তিয়ার রাজা যশোমাণিক এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মহারাষ্ট্র থেকে ক্ষত্রিয় বর্ণের একজন মারাঠা পুরোহিতকে (তাদের আদিপুরুষ) এনে এখানে নিযুক্ত করেছিলেন। মন্দিরের বর্তমান পুরোহিতও এমন তথ্যই দেন। তিনি নিজেকে প্রথম মারাঠা পুরোহিতের ত্রিশতম অধঃস্তন বংশধর বলে পরিচয় দেন।

কিছু ঐতিহাসিকের মতে, যশোমাণিকই সিন্টেং রাজবংশের প্রথম রাজা যিনি পুরোপুরিভাবে সিন্টেংদের আদি ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসে সনাতন ধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। যশোমাণিকের সময় পর্যন্ত সিন্টেং রাজপরিবারে সনাতন ধর্মের পাশাপাশি তাদের আদি গোত্রীয় ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতির চর্চা হতো। কোচবিহারের হিন্দু রাজকন্যাকে বিয়ের পর যশোমাণিক পুরোপুরিভাবে সনাতন ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। ওই রাজকন্যা বেশ ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি একজন ‘শাক্ত’ ছিলেন এবং মাতৃরূপী শক্তি দেবীর আরাধনা করতেন। রাজা যশোমাণিক তাঁর প্রভাবেই শক্তি পূজারী হয়ে ওঠেন। কথিত আছে, একদা রাজা স্বপ্নযোগে শক্তি দেবী দূর্গার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই সাক্ষাতে দেবী তাকে নারতিয়াংয়ের একটি পবিত্র স্থান দেখিয়ে সেখানে পূজা দেওয়ার কথা বলেন। দেবী তাকে আরও বলেন যে, এই পবিত্র স্থানটি একটি পীঠস্থান এবং

---

[20] সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, এই মন্দিরে সতী দেবীর বামজঙ্ঘা বা বামউরুর একাংশ পতিত হয়েছিল। তাই তাদের কাছে এটি একটি উপপীঠ এবং ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসেবে গণ্য হয়। ব্রিটিশ আমলের আগে এখানে নরবলি দেওয়া হতো। প্রতি বছর জৈন্তিয়ার রাজদরবারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দু-একজন আসামীকে এখানে বলি দেওয়া হতো। সেই ধর্মীয় রীতির অনুসরণে এখনও এখানে মানুষের পোষাক পরিয়ে পাঠা বলি দেওয়া হয় (প্রতি বছর শারদীয় উৎসবের সময় পাঠা বলিদানের আয়োজন করা হয়)।

এর ভৈরবীর নাম জয়ন্তেশ্বরী। যশোমাণিক দেবীর কথা অনুযায়ী সেখানে একটি মন্দির স্থাপন করে পূজা ও নরবলির প্রচলন করেছিলেন।



চিত্র: নারতিয়াং মন্দির

পাহাড়ি সিন্টেংদের আদি ধর্মবিশ্বাসের সাথে সনাতন ধর্মের সংমিশ্রণের প্রতীক হচ্ছে এই মন্দির। পাহাড়ি সিন্টেংদের আদি ধর্মের নাম নিয়েমত্রে বা নিয়েমট্যানরাই; এই ধর্মে দূর্গা দেবীর পূজার কোন প্রচলন ছিল না। কিন্তু সপ্তদশ শতকে দেখা গেল, নারতিয়াং পুঞ্জিতে বসবাসরত সিন্টেংরা দূর্গার অবতাররূপী জয়ন্তেশ্বরীর পূজায় অভ্যস্থ হয়ে উঠছেন। এর মূলে রয়েছে জয়ন্তেশ্বরীর পীঠস্থানটির প্রভাব। সিন্টেংরা এই মন্দিরটিকে নিজেদের মন্দির হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাই এটি হয়ে উঠেছিল সনাতনী এবং সিন্টেং- উভয় সম্প্রদায়েরই মন্দির।

সাত. পাঠান-মোগল যুদ্ধে জৈন্তিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকা

যশোমাণিক জৈন্তিয়ার সিংহাসন লাভ করেন ১৬০৫ সালে। জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী সিলেটে তখন পাঠান সরদারদের শাসন চলছে। সিলেট শহর ছিল পাঠান সরদারদের নেতা বায়োজিদ লোহানীর অধীনে। বায়োজিদ এবং তাঁর অনুগত পাঠান যোদ্ধারা বাংলার মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁ-র অনুগত ছিলেন না। তাই

ওই সময়ে সিলেট ছিল মোগল সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে একটি স্বাধীন পাঠানশাসিত অঞ্চল। ১৬১২ সালে বাংলার মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁ সিলেটের স্বাধীন পাঠান সরদারদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে দুটি বাহিনী প্রেরণ করেন। একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শেখ কামাল। তিনি সিলেট শহরস্থ বায়োজিদের বাহিনীকে পরাস্থ করার জন্য এগিয়ে আসেন।

আরেকটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সুজাত খান। তিনি আরেকদল পাঠান সরদারদের নেতা খাজা উসমান খান লোহানীকে পরাজিত করার জন্য বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার দিকে অগ্রসর হন। খাজা উসমান ছিলেন বায়োজিদের চাচাতো ভাই ও মিত্র। বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার পতনউষার ইউনিয়নে ছিল তাঁর রাজধানী।[21] সুজাত খানের বাহিনী সরাইল হয়ে পতনউষারের দিকে অগ্রসর হয়। তারা ক্রমশ তরফের দুর্গ ও পুটীজুরী দুর্গ দখল করে খাজা উসমানের রাজধানীর তেরো মাইল পশ্চিমে পৌঁছে যায়। এ জায়গাটির নাম দৌলম্ভাপুর। এখানে পাঠান ও মোগল বাহিনীর মধ্যে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পাঠান নেতা খাজা উসমান পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে দক্ষিণ সিলেটে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে শেখ কামালের নেতৃত্বাধীন মোগল বাহিনীটিও উত্তর সিলেটে প্রভূত সাফল্য লাভ করে। সাতদিনের প্রবল যুদ্ধের পর তারা সুরমা নদী অতিক্রম করে সিলেট শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সিলেট শহরস্থ পাঠান দুর্গ তাদের দখলে চলে যায়। পাঠানরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে। এমতাবস্থায় কাছাড়ি রাজ্য থেকে একদল সৈন্য এসে পাঠানদের সাথে যোগ দেয়। কাছাড়ি রাজা শত্রুদমন সিলেটে মোগল আক্রমনের সংবাদ পেয়ে পাঠান নেতা বায়োজিদের সাহায্যার্থে এসব সৈন্যদেরকে পাঠিয়েছিলেন। এই মিলিত বাহিনী মোগলদেরকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। মোগলদের একাংশকে তারা সুরমা নদীর দক্ষিণ পাশে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে পাঠানদের কাছে খবর এলো যে, দৌলম্ভাপুরের যুদ্ধে খাজা উসমান পরাজিত ও নিহত হয়েছেন।

---

[21] বৃহত্তর সিলেটে তখন পাঠানদের একক রাজ্য ছিল না। সিলেট শহরকে কেন্দ্র করে উত্তর সিলেটে বায়োজিদের শাসন চলছিল। আর দক্ষিণ সিলেটের পতনউষারকে কেন্দ্র করে খাজা উসমানের শাসন চলছিল। তারা উভয়ে একে অপরের মিত্র ছিলেন। বৃহত্তর সিলেটের একটি বড় অংশ এই দুই পাঠান নেতার অধীনে ছিল।

মহাবীর খাজা উসমানের এমন মৃত্যুতে পাঠানরা মুষড়ে পড়ে এবং যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় পাঠান নেতা বায়োজিদ মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

ওই দিন থেকে সিলেট অঞ্চলটি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার মোগল সুবাদারের অধীনস্থ একজন ফৌজদারের হাতে সিলেটের শাসনভার ন্যাস্ত করা হয়। মোগলদের সিলেট বিজয় শেষ হলেও পাঠানদের পক্ষে কাছাড়ি রাজার ভূমিকার কথা তারা ভুলে গেলো না। সিলেট বিজয়ী মোগল সেনাপতি শেখ কামাল সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কাছাড়ি রাজা শত্রুদমনকে তিনি একটি একটি উচিত শিক্ষা দিবেন। তাই তিনি মোগলশাসিত সিলেটের পূর্ব সীমান্ত পেরিয়ে কাছাড়ি রাজ্যের ভেতরে অভিযান চালান। এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল প্রতাপগড়। মোগল সৈন্যরা প্রতাপগড়ে অবস্থিত কাছাড়ি রাজার একটি দুর্গ দখল করে নিয়েছিল। তবে এরপর যুদ্ধ আর এগোয়নি। উভয়পক্ষই নিরস্ত হয়ে গিয়েছিল।

সিলেটের পাঠান শাসকদের পরাজয় এবং মোগলদের বিজয়ের ঘটনায় প্রতিবেশী জৈন্তিয়া অনেকটা দর্শকের ভূমিকাই পালন করেছিল; রাজ্যটি কোন পক্ষেই যোগ দেয়নি। জৈন্তিয়ার রাজা যশোমাণিক তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়িয়ে চলার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তবে যুদ্ধে না জড়ালেও যশোমাণিক মনে মনে পাঠানদেরই বিজয় কামনা করেছিলেন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এমনই মনে হয়। কাছাড়ি রাজা শত্রুদমনের মতো যশোমাণিকও পাঠানদের বিরুদ্ধে মোগলদের বিজয় চাননি। তবে নিজের দুর্বলতার কারণে তিনি পাঠানদের পক্ষ নিতে পারেননি। পাঠানদের হাত থেকে মোগলরা সিলেট কেঁড়ে নেওয়ার পরে সিলেটের নাম হয়ে গেল মোগলান। জৈন্তিয়া, আহোম ও কাছাড়ী রাজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, সিলেটকে বার বার মোগলান নামে অভিহিত করা হয়েছে। এসব রাজ্যের ইতিহাসে মোগলানের সাথে শত্রুতা ও মিত্রতার কথা বার বার আলোচিত হয়েছে।

আট. পাঠান সরদারদের জৈন্তিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ

সিলেটের পাঠান শাসকদের সাথে জৈন্তিয়ার রাজা যশোমাণিকের সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। একারণে ১৬১২ সালের পাঠান-মোগল যুদ্ধের পর যশোমাণিক বেশ কিছু পাঠান পরিবারকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

দৌলম্ভাপুরের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর এসব পাঠান পরিবার জৈন্তিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। অনেকের পারিবারিক শেকড়ের সাথে এই ইতিহাসটি জড়িয়ে আছে। জৈন্তিয়ায় বসবাসকারী বহু পরিবার দাবি করেন যে, তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন পাঠান সরদার। মোগলদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এসব পাঠান সরদার সপরিবারে জৈন্তিয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজাগঞ্জ, চতুল, খরিল, সাতবাক, আড়াইখা, পিয়াইনগুল, ধরগাম প্রভৃতি অঞ্চলে এসব পাঠান পরিবার বসতি স্থাপন করেছিল। পুকাশের মনসুর চৌধুরী খাজা ছিলেন খাজা উসমান খান লোহানীর জ্ঞাতিভাই বাহরাম খাঁ-র বংশধর। এছাড়াও চতুলের খাদনলস্কর, আজমত উল্লাহ জমাদার প্রমুখ ছিলেন পাঠান সরদারদের অধঃস্তন বংশধর। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, জৈন্তিয়ার আদি মুসলমান ছিলেন পাঠানরাই। তাদের বংশধররা এখন সংখ্যায় অনেক বড়ো।

অধ্যায় বারো

যশোমন্ত রায় ও মানসিংহের শাসনামল

(১৬৪৮ সাল – ১৬৬৮ সাল ও ১৬৬৮ সাল – ১৬৬৯ সাল)

রাজা যশোমাণিকের পরে সুন্দর রায় ও ছোট পর্বত রায় নামের দুজন রাজা কিছুদিন জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। এদের সম্পর্কে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাসে কোন তথ্য নেই। তাই এদের নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। আহোমের ইতিহাস থেকে তাদের পরের রাজা যশোমন্ত রায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। এই রাজা ছিলেন আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের সমসাময়িক রাজা। জয়ধ্বজ সিংহ ১৫৭০ শকাব্দ বা ১৬৪৮ সালে আহোমের রাজা হয়েছিলেন। ওই বছরেই জৈন্তিয়ার রাজা যশোমন্ত রায়ের সাথে তাঁর বার্তা বিনিময়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। যশোমন্ত রায় হয়তো ১৬৪৮ সালের আগে থেকেই জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। কিন্তু ১৬৪৮ সালের আগের কোন ইতিহাসে তাঁর নাম নেই। তাই এই বছরটিকেই তাঁর শাসনামলের প্রথম বছর হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর এবং যশোনারায়ণের মধ্যবর্তী সময়ে সুন্দর রায় ও ছোট পর্বত রায় জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। আহোমের ইতিহাস অনুযায়ী, যশোনারায়ণ কমপক্ষে ১৬৪১ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। এই বছরটিকেই যদি তাঁর শাসনামলের শেষ বছর হিসেবে গণ্য করা যায় তাহলে সুন্দর রায় ও ছোট পর্বত রায়ের শাসনকাল ১৬৪১ সাল থেকে ১৬৪৮ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। দুজনের মধ্যে এই সময়কালকে নিম্নোক্ত উপায়ে সমবন্টন করা যেতে পারে।

রাজাদের নাম	**রাজাদের শাসনকাল**		**মোট সময়**
	সূচনা	সমাপ্তি	
সুন্দর রায়	১৬৪১ সাল	১৬৪৪/১৬৪৫ সাল	৩.৫ বছর
ছোট পর্বত রায়	১৬৪৪/১৬৪৫ সাল	১৬৪৮ সাল	৩.৫ বছর

স্যার এডওয়ার্ড গেইট ১৬২৫ সালকে যশোনারায়ণের শাসনামলের শেষ বছর এবং ১৬৪৭ সালকে যশোমন্ত রায়ের শাসনামলের প্রথম বছর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই দুই রাজার মধ্যবর্তী সময়কে তিনি সুন্দর রায় ও ছোট পর্বত রায়ের মধ্যে নিম্নোক্তভাবে সমবন্টন করছেন।

রাজাদের নাম	রাজাদের শাসনকাল		মোট সময়
	সূচনা	সমাপ্তি	
সুন্দর রায়	১৬২৫ সাল	১৬৩৬ সাল	১১ বছর
ছোট পর্বত রায়	১৬৩৬ সাল	১৬৪৭ সাল	১১ বছর

সুন্দর রায় ও ছোট পর্বত রায়ের শাসনামলে জৈন্তিয়া রাজ্যে হয়তো কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি। তাই তাদের সম্পর্কে কোন জনশ্রুতিও প্রচলিত হয়নি। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাসেও তারা অনুপস্থিত। তাই এই দুই রাজা সম্পর্কে কোন কিছু জানার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাদের পরবর্তী রাজা যশোমন্ত রায়ের ক্ষেত্রে উল্টো ব্যাপার ঘটেছে। আহোমের ইতিহাসে এই রাজা খুবই প্রাসঙ্গিক। আহোমের রাজাদের সঙ্গে তাঁর যেসব পত্র বিনিময় হয়েছিল সেগুলো আহোমের ইতিহাস বা বুরুঞ্জীতে সংরক্ষিত হয়েছে। রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া তাঁর *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থে এসব পত্র হুবহু তোলে ধরেছেন।

যশোমন্ত রায় যখন জৈন্তিয়ার সিংহাসনে ছিলেন তখন একের পর এক নতুন রাজা আহোমের সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন। এরা হলেন নড়িয়া রাজা বা সুতিংফা (শাসনকাল: ১৬৪৪ সাল - ১৬৪৮ সাল), জয়ধ্বজ সিংহ সুতামলা (শাসনকাল: ১৬৪৮ সাল - ১৬৬৩ সাল) এবং চক্রধ্বজ সিংহ সুপাংমাং (শাসনকাল: ১৬৬৩ সাল - ১৬৬৯ সাল)।[22] যশোমন্ত রায় জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসার পর আহোমরাজ সুতিংফা তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এতে উভয় রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। এর কয়েক বছর পরে উভয়রাজ্যের মধ্যে আবারও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের সময়কাল পর্যন্ত এই সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

---

[22] সুতিংফা একজন অসুস্থ রাজা ছিলেন। তাঁর শাসনকাল ছিল ১৬৪৪ সাল থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত। তিনি স্কোলিওসিস রোগে ভুগছিলেন। তাই তাকে নড়িয়া রাজা বা কেকুরা রাজা (কুঁজো রাজা) নামেও ডাকা হতো। রাজ্য পরিচালনায় তিনি অনেকটাই অক্ষম ছিলেন এবং পালকিতে করে যাতায়াত করতেন। তাঁর পরে আহোমের রাজা হন তাঁর পুত্র সুতামলা। সুতামলার অপর নাম ছিল জয়ধ্বজ সিংহ। তিনি ১৬৬৩ সাল পর্যন্ত আহোমের রাজা ছিলেন। তাঁর পরের রাজা সুপাংমাং যিনি চক্রধ্বজ সিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৬৬৯ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন।

এক. আহোম ব্যবসায়ীকে আটকের ঘটনা (১৬৪৮ সাল)

১৬৪৮ সালে আহোমের এক ব্যবসায়ীকে জৈন্তিয়া রাজ্যে ব্যবসার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর নাম ছিল জয়হরি মুদই। তিনি ৮,০০০ টাকার মালামাল নিয়ে নারতিয়াং অথবা খাইরম হয়ে জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন। কোন এক অজ্ঞাত কারণে জৈন্তিয়ার রাজা যশোমন্ত রায় ওই ব্যবসায়ীকে তাঁর মালপত্রসহ আটক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আহোমের ক্ষমতায় তখন পরিবর্তন এসেছে; সুতিংফার স্থলে তাঁর পুত্র জয়ধ্বজ সিংহ নতুন রাজা হয়েছেন। তিনি জয়হরি মুদইকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য জৈন্তিয়াপতির কাছে সুপারিশ করেন। আহোমরাজের সুপারিশে জয়হরি মুদইকে ছেড়ে দেওয়া হয়; কিন্তু তার মালপত্র আটকে রাখা হয়। এতে আহোমরাজ খুবই অসন্তুষ্ট হন। জৈন্তিয়ার রাজাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সোনাপুর থেকে জৈন্তিয়ার কয়েকজন ব্যবসায়ীকে আটক করেন। উভয় রাজ্যের মধ্যে পার্বত্য পথগুলিও বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েক বছর ধরে এই বিরোধ চলতে থাকে। অবশেষে যশোমন্ত রায়ের উদ্যোগে এই বিরোধের নিষ্পত্তির হয়। ১৬৫২ সালে তিনি বেশ কিছু উপঢৌকন পাঠিয়ে আহোমরাজকে তুষ্ট করেন। এর ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে আবারও স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুই. ১৬৫২ সাল থেকে ১৬৬২ সাল অবধি কিছু ঘটনা

রায় সাহেব গোলাপ চন্দ্র বড়ুয়া সম্পাদিত *আহম বুৰঞ্জী* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৬৫২ সালের শ্রাবণ মাসে জৈন্তিয়া রাজা যশোমন্ত রায়ের পক্ষ থেকে বেশ কিছু উপঢৌকন নিয়ে কয়েকজন দূত আহোমের রাজার কাছে পৌঁছায়। তাদের সাথে ছিল অনেকগুলো বড় নৌকা, ৮০টি সোনার আসন এবং ১৪০টি ছাতা। উভয় রাজ্যের বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য যশোমন্ত রায় এসব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। একই সাথে তিনি আহোমরাজকে সন্তুষ্ট করে জৈন্তিয়া রাজ্যের তিনটি অঞ্চলও পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ জৈন্তিয়ার উপঢৌকনগুলো পেয়ে খুশী হন এবং পুরানো বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে রাজী হন। তবে তিনি জৈন্তিয়াপতিকে ওই অঞ্চলগুলো ফেরত দিতে রাজী হলেন না।

অঞ্চলগুলো হল- ডিমারুয়া, কুফানলী এবং কাওবান অঞ্চল। এগুলো একসময় জৈন্তিয়ার অধীনস্থ অঞ্চল ছিল। জৈন্তিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হওয়ার পর এগুলো আহোমের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। তাই জৈন্তিয়ার রাজা আহোমরাজকে তুষ্ট করে অঞ্চলগুলো ফেরত নিতে চাচ্ছিলেন। জৈন্তিয়ার দূতরা আহোমরাজকে এই অনুরোধ জানালে তিনি বললেন যে, ওই অঞ্চলগুলোকে ইতোমধ্যে তাঁর অধীনস্থ সরদারদের হাতে তোলে দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোকে ফেরত আনা সম্ভব নয়। অঞ্চলগুলোর পরিবর্তে তিনি জৈন্তিয়ার রাজাকে বেশ কিছু সোনার দ্রব্য দান করলেন। জৈন্তিয়ার রাজা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে উভয় রাজ্যের মধ্যে আবারও স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬৫৫ সালে যশোমন্ত রায় আহোমরাজের শশুর বড়ফুকনের কাছে দুজন দূত পাঠিয়ে জৈন্তিয়ার সেই ব্যবসায়ীদেরকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন যাদেরকে ১৬৪৮ সালে সোনাপুর থেকে আটক করা হয়েছিল। আহোমের নিয়ম মেনে ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়ে ওই ব্যবসায়ীদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৬৬০ সালে যশোমন্ত রায় এবং তাঁর নাতি প্রমথ রায় বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। যশোমন্ত রায়কে পরাভূত করার জন্য প্রমথ রায় গোভার রাজার সাহায্য চান। কিন্তু গোভার রাজা এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রমথ রায় গোভার চারটি গ্রাম দখল করে নেন। গোভা রাজা আহোমরাজের কাছে নিরাপত্তা চাইলে প্রমথ রায় পিঁছু হটেন।

১৬৬২ সালে মোগলরা আহোমে আক্রমণ চালিয়ে রাজ্যটির একাংশ দখল করে নিয়েছিল। জৈন্তিয়ার দুজন দূত তখন আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু আহোমরাজ তখন তাঁর রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি তাঁর রাজধানী গড়গাঁও ছেড়ে নামরূপের পাহাড়ি অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার দূতদ্বয় মোগলদের হাতে ধরা পড়ে। আহোমরাজ এই ঘটনার কথা শুনে জৈন্তিয়ার রাজার কাছে পত্র লিখে সমবেদনা প্রকাশ করেন। পত্রের সাথে তিনি কিছু উপহারও পাঠিয়েছিলেন। নরফাইং এর রাজা মাণিক সিংহের সহায়তায় আহোমরাজের দূতগণ পত্র ও উপহার নিয়ে জয়ন্তীপুরে পৌঁছেছিল। এই পত্রের জবাবে যশোমন্ত রায় ১৬৬৩ সালে আহোমরাজের কাছে দুটি পত্র পাঠিয়েছিলেন।

তিন. জৈন্তিয়া-আহোম পত্র বিনিময় (১৬৬২ ও ১৬৬৩ সাল)

জৈন্তিয়ার রাজা যশোমন্ত রায় এবং আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের মধ্যে যেসব পত্র চালাচালি হয়েছিল সেগুলোকে বুরুঞ্জী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া তাঁর *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই পত্রগুলোকে যুক্ত করেছেন। প্রথম পত্রটি লিখেছেন আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ। এই পত্রের সাথে তিনি কিছু উপহারসামগ্রীও পাঠিয়েছিলেন। পত্রটি রচিত হয়েছিল ১৫৮৪ শকাব্দে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ১৬৬২ সালে। অন্যদিকে জৈন্তিয়াপতি যশোমানিক আহোমরাজের কাছে দুটি পত্র লিখেছিলেন ১৫৮৫ শকাব্দের জেষ্ঠ মাসে। প্রথম পত্রটিতে আহোমরাজের কাছে প্ররিত উপহারসামগ্রীর একটি বড়সড় তালিকা রয়েছে। উভয় পত্রের শুরুতে সংস্কৃত ভাষায় স্বস্তি গাওয়া হয়েছে।

<u>যশোমন্ত রায়ের কাছে জয়ধ্বজ সিংহের পত্র</u>

এথাত আমাৰ সমস্তৰে কুশল। ৰাজা লাণ্ঢা সুলতানেৰ নিৰন্তৰে কুশল চাহি। তুমি যে উকীল পঠালা সি আসি বঙ্গালত পৰিল। তাৰ এক চাকৰ আসি তোমাৰ বাৰ্ত্তা জনালেহি, তাক শুনি আমি পৰম সন্তোষ হৈলোঁ। আৰু তোমাৰ আমাৰ পূৰ্ব্ব ধৰি যিহেতু মিত্ৰৰতি এই নিমিত্তে তুমি আমাৰ বাৰ্ত্তা ললা, ইহাত আমাৰ আনন্দ। আৰু তোমাৰ উকীল বঙ্গালত পৰিল, ইয়াক শুনি বৰ অসন্তোষ পাইলোঁ। কিন্তু যিহেতু আমাৰ বিপদ কাল এই নিমিত্তে তোমাৰ উকীলৰ এমত হ'ল, ইহাত মনে দুখ নকৰিবা। ইদানীক তোমাৰ যেমনে বাৰ্ত্তা পাই থাকোঁ এমত কৰিবা।

তোমাক লাগি সন্দেশ, —পাটকাপৰ ১ খন, গান্ধ ৮ টা, গাঁঠিয়ন ১ মোনা, কটাৰী ৬ খন। ৫৬ ।।

<u>জয়ধ্বজ সিংহের কাছে যশোমন্ত রায়ের পত্র-১</u>

স্বস্তি সমস্ত- প্ৰশস্ত- ক্ৰিয়াচৰণ- চাক- পবিত্ৰ- চৰিত্ৰ- শৌৰ্য্য- ধৈৰ্য্য- দাৰ্ঢ্য- মৰ্য্যাদ- গম্ভীৰ- পাৰাবাৰ- ভূবন- উত্তম- ভাবুক- ভবন- কুল- কৈৰব- পালন- পাৰ্ব্বণ- শাৰদ- শশধৰ- গঙ্গাধৰ- হিম- হিণ্ডীৰ- পিণ্ড- পাণ্ডুৰ- যশঃ- পৰিপূৰিত-

দিগন্তৰ- কমলামলাদিবৃন্দাৰক- বৃন্দ- বন্দনীয়- মুকুন্দ- পদ- সৰোজ- সৰস- মধুব্ৰত- ত্ৰিবিক্ৰমোদ্দাম- বাম- পাদাঙ্গুষ্ঠ- নখ- শিখৰ- খণ্ডিত- ব্ৰহ্মাণ্ডবিবৰণী- শৰৎ- শাৰদামৃতকৰ- সুৰবাহিনীতোয়- শৰীৰ- সৌমাৰ- ধৰণী- মণ্ডলাখণ্ডল- শ্ৰীশ্ৰীমহাৰাজ- স্বৰ্গদেবনাৰায়ণ- প্ৰচণ্ড- প্ৰতাপ- চৰিত্ৰ- বিচিত্ৰ- গুণ- সমুহেষু—

পৰম-সৌহাৰ্দ্দ-লিখনং কায্যঞ্চ আগে। এথা কুশল, তোমাৰ ৰাজোন্নতি কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছি। পৰং তোমাৰ লিখা পত্ৰ আসি পহুছিল। সমাচাৰ পৰম প্ৰীতে জানিলাম। আৰ তোমাৰ কটকীৰ প্ৰমুখ্যে বাৰ্ত্তা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হৈলাম। অতঃপৰ মধ্যে শুনিলাম মগলে আসিয়া তোমাৰ ৰাজ্য মাৰিলে, এসকল বাৰ্ত্তা আমালৈ নিদিলা। কতোদিন পাচে আমি বাৰ্ত্তা পায়া গোভাৰ বামাই দলৈক ও নিৰৈক আনিয়া তোমাৰ থানে পাঠাইলাম বাৰ্ত্তা লৈবাৰ, কিছু পত্ৰ-সন্দেশ দিছিলাম, আৰ পত্ৰ লেখি দিছিলাম। তুমি প্ৰীতি-উত্তৰ বিদলেখ সেই অনুসাৰে কাৰ্য্য কৰিম। তাতে তোমাৰ কৰ্ম্মাইব লোকে সেই মনুষ্য আমাৰ দুইজন মগোলেব সাতে বান্ধিয়া দিলে কি মাৰিলে এবং নিৰ্ণয় নাপাইলাম, আৰ সন্দেশ তোমাৰ থানে পহুছিল হেন নাজানিলাম। এবে বিচাৰ কৰিয়া অতদিন সেই পত্ৰেৰ প্ৰীতি- উত্তৰ আনিব কৰিয়া জানিছিলাম, এখন নিষ্ঠা বুজিয়া তোমাৰ থানে পুছিল, কটকী বিদায় কৰিলাম। আমাৰ কটকী ৰামাইকে পাঠাইতেছি। আপোনাৰ কুশল-মঙ্গল বাৰ্ত্তা বিবেচিয়া সকল লেখিয়া ততকাল কটকী পঠাইবা। জয়ন্তা আৰ গড়গাঞ দুই বাহই। তোমাৰ দেশ নামাৰিছে যেন আমাৰ দেশহে মাৰিছে, আমাৰ মনে এমত দুখ লাগিছে। অতঃপৰ বহুত মন দুখী আছি। তোমাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আইলেহে চিত্ত নিবৃতি হ..। আৰ তোমাৰ আমাৰ প্ৰীতি নবীন নাহই, পূৰ্ব্বাৰধি চলি আহিতেছে। বিশেষত অধিকতত অধিক হৈবাৰ ক্ৰম হেন চিন্ন। তাতে এমত প্ৰপঞ্চ হৈল। অতঃপৰ তুমি কুশলে আছা, ৰাজ্য কুশলে আছে। পৰং এমন সময়তে তোমাৰ প্ৰীতি-উত্তৰ নাপাইলাম, হুকুম নাকৰিলাম, এটা মন দুখ ৰহিল। সময় পৰিলে যদি অত্যন্ত সহায় নাহইব তবে প্ৰীতেৰ কাৰণ কি? তাৰ প্ৰীতি ৰক্ষা বা কিয় হৈব? অতঃপৰ যে হৈবাৰ আছিল সে হৈল, এখন যেমতে দিন দিন অধিক প্ৰীতি হয় তাক কৰিবায়। বাকী সমাচাৰ কটকীসকলে কহিবেক। আৰ বঙ্গালে খানিক ৰাজ্যক পীড কৰিলে এই মাত্ৰ, মাটিক নিবাক নপাৰিল। সেই দেশ, সেই লোকসকল আছে, তুমি আপনে কুশলে আছ। এখন এমত কাৰ্য্য কৰি তুমি আমি এক প্ৰীতি হৈয়া যেমনে বঙ্গালৰ দাদ লৈবাৰ পাৰি তাকে কৰ। গৰীয়াএ যি কৰিছে যদি তেমত দাদ লৈবাক পাই তেবেসে আমাৰ সন্তোষ হয়, মন দুখ যায়। এতেকে যেমতে

তোমাৰ চিত্তেত ভাল প্ৰতিবাসে তাৰে লেখিবা। আৰো সময়ে ইয়াত যেটা কৰণা হয় ততকালে লেখিবা।

আব পত্ৰ-সন্দেশ, – শাৰ কাপৰ ৪ খান, খাচা ৪ খানা, সূতাৰ কাপৰ ১০ খান, আঠাৰে খান যায়। আদতাই ৪ খান, ঢৰা ৩ খান, গাজি খাচা ২০ খান। বাকী সমাচাৰ তোমাৰ দুই কটকী ও ৰামাই প্ৰমুখে জ্ঞাত হৈবা। কিমধিকং বিজ্ঞেষু। ইতি, শক ১৫৮৫, মাস জেঠ। হাট-ভেঁটি, – খাচা ১ খান। পালেহি তাৰিখ ১১, ভাদ্ৰ মাসে এই শকতে। ৫৮ ।।

<u>জয়ধ্বজ সিংহের কাছে যশোমন্ত রায়ের পত্র-২</u>

স্বস্তি প্ৰকাণ্ড- দোৰ্দ্দণ্ড- পিণ্ডীকৃত- কোদণ্ড- মণ্ডিত- চণ্ড- কাণ্ড- খণ্ড- খণ্ডীকৃত- অশেষ- বৈবি- খণ্ড- মণ্ডত- প্ৰতাপ- তপন- শ্ৰীশ্ৰীযুত- মহাবাজ- স্বৰ্গদেব- নাৰায়ণ- মহোগ্ৰ- প্ৰতাপেষু–

পরম-সৌহাৰ্দ্দ-লিখনং কায্যঞ্চ। পৰং যে কিছু সমাচাৰ পত্ৰতে সকল জ্ঞাত হৈবাৰ। মাত্ৰ যেমনে দিন দিন অধিক প্ৰীতি বাঢ়ে তাক কৰিবায়। আৰ বঙ্গালে যেমত কৰিছে তেমত তাৰ দাদ লৈবাৰ পাৰি তেবেসে মন সন্তোষ হই। এতেকে তোমাৰ চিতে যেমত ভালো প্ৰতিবালে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ লেখিবায়। বাকী সমাচাৰ কটকীয়ে কহিব। কিমধিকং বিজ্ঞেষু। ইতি, শক ১৫৮৫, তাৰিখ ১০, মাস জেষ্ঠ। ইঠাই পালেহি তাৰিখ ১১, মাস ভাদ্ৰ। ০৯ ।।

চার. যশোমন্ত রায়ের সিলেট আক্রমণ (১৬৬৩ সাল)

যশোমন্ত রায়ের কাছে পাঠানো পত্রটিতে আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ তাঁর বিপদকাল চলছে বলে উল্লেখ করেছেন। এই বিপদটি এসেছিল মোগলদের তরফ থেকে। বাংলার মোগল সুবাদার মীর জুমলা ওই সময়ে আহোমে অভিযান চালিয়েছিলেন। ১৬৬২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৬৬৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত মোগলদের এই অভিযান চলমান ছিল। অভিযানের প্রথমদিকে মোগলরা আহোমের রাজধানী গড়গাঁও দখল করে নিয়েছিল। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ তখন নামরূপের পাহাড়ি অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত, তিনি সেখান থেকেই জৈন্তিয়াপতির কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন।

এই পত্রের জবাবে যশোমন্ত রায় যে দুটি পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে আহোমরাজের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ পেয়েছে। যশোমন্ত রায় তাঁর দীর্ঘ পত্রটিতে লিখেছেন- শুনলাম, মোগলরা এসে তোমার রাজ্যে আক্রমণ করেছে (শুনিলাম মগলে আসিয়া তোমাৰ ৰাজ্য মাৰিলে)... জৈন্তিয়া আর গড়গাঁও দুই ভাই। তোমার দেশে আক্রমণ মানে আমার দেশেই আক্রমণ। আমি এতে দুঃখ পেয়েছি (জয়ন্তা আৰ গড়গাঞ দুই বাহই। তোমাৰ দেশ নামাৰিছে যেন আমাৰ দেশহে মাৰিছে, আমাৰ মনে এমত দুখ লাগিছে। অতঃপর বহুত মন দুখী আছি।)

শুধু তাই নয়, যশোমন্ত রায় আহোমরাজের সাথে এক হয়ে বাংলার মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের কথাও লিখেছেন (তুমি আমি এক প্রীতি হৈয়া যেমনে বঙ্গালৰ দাদ লৈবাৰ পাৰি তাকে কৰ)। তিনি লিখেছেন, মোগলরা আহোমে যেমন আক্রমণ চালিয়েছে, মোগলদের ওপর তেমন পাল্টা আক্রমণ করতে পারলে তাঁর মনের দুঃখ দূর হবে (এখন এমত কার্য্য কৰি গৰীয়াএ যি কৰিছে যদি তেমত দাদ লৈবাক পাই তেবেসে আমাৰ সন্তোষ হয়, মন দুখ যায়)। দ্বিতীয় পত্রটিতেও তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন (আৰ বঙ্গালে যেমত কৰিছে তেমত তাৰ দাদ লৈবাৰ পাৰি তেবেসে মন সন্তোষ হই)।

যশোমন্ত রায় আহোমরাজকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম মোগলানের সিলেট শহরে আক্রমণ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। এই ঘটনাটির কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইতিহাসে নেই। খুব সম্ভবত ১৬৬৩ সালে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। ওই বছর মোগলরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নানান প্রতিকূলতার কারণে তারা আহোম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। মোগল সুবাদার ও সেনাপতি মীর জুমলা আহোম থেকে ফেরার পথেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৬৬৩ সালের ৩০ মার্চ তিনি আহোমের সীমানার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

এর পরের বছর, ১৬৬৪ সালের প্রথমদিকে শায়েস্তা খাঁ-কে বাংলার নতুন মোগল সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। শায়েস্ত খাঁ-র কার্যভার গ্রহণের সংবাদ পেয়ে যশোমন্ত রায়ের আশংকা হলো যে, তিনি হয়তো সিলেট শহর আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে জৈন্তিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবেন। তাই যশোমন্ত রায় মোগলদের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি করে সম্পর্ক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি মোগলানে আর আক্রমণ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সিলেটের

মোগল ফৌজদারের মারফতে শায়েস্তা খাঁ-র কাছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিটি উপহার পাঠিয়ে দিলেন। শায়েস্তা খাঁ এই উপহার গ্রহণ করলেন এবং জৈন্তিয়া আক্রমণ থেকে বিরত রইলেন।

পাঁচ. যশোমন্ত রায় ও চক্রধ্বজ সিংহের মৈত্রীসম্পর্ক

মোগলদের হাত থেকে আহোমের রাজধানী উদ্ধারের কিছুদিন পরে আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাই আহোমের অভিজাতরা মিলে জয়ধ্বজ সিংহের ভাই চক্রধ্বজ সিংহকে নতুন রাজা নির্বাচিত করেন। এটি ১৫৮৫ শকাব্দ বা ১৬৬৩ সালের ঘটনা। জয়ধ্বজ সিংহের মতো এই নতুন রাজাও জৈন্তিয়াপতির সাথে বেশ প্রীতি বজায় রেখেছিলেন। জয়ধ্বজ সিংহ জৈন্তিয়াপতির কাছ থেকে যে দুটি পত্র পেয়েছিলেন সেগুলোর জবাব দিতে পারেননি; এর আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ ক্ষমতায় আরোহণের পর এই পত্র দুটির জবাব পাঠালেন।

১৫৮৬ শকাব্দের ২ বৈশাগ তারিখে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা যশোমন্ত রায়ের কাছে একটি পত্র লিখে আগের পত্র দুটির জবাব দেন। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকোমোরা নামের দুজন দূত আহোমরাজের এই পত্রটি নিয়ে জৈন্তিয়ায় যায়। এই পত্রে তিনি জৈন্তিয়ার সাথে আহোমের সুসম্পর্ক ও প্রীতির কথা বার বার উল্লেখ করেছিলেন। পত্রের সাথে কিছু উপহারও ছিল। যশোমন্ত রায় এই পত্রের জবাবে আহোমরাজকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানিয়ে একটি দীর্ঘ পত্র লিখে নিজের দূতকে দিয়ে পাঠান। ১৫৮৬ শকাব্দের আহিন মাসের ৬ তারিখে লিখিত এই পত্রে যশোমন্ত রায় আহোমের সাথে পূর্বের সম্পর্ক রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।

পত্রে যশোমন্ত রায় লিখেন, "...তুমি লিখেছ, পূর্বের মতো প্রীতি-কুটুম্বিতা চালিয়ে যেতে। তুমি ভালোই লিখেছো। ...পূর্ব ছেড়ে সূর্য্য যেদিন পশ্চিমে উদিত হবে, কালো কাক যেদিন সাদা হয়ে যাবে সেদিনও তোমার আমার প্রীতি বজায় থাকবে। আগে যে প্রীতি-কুটুম্বিতা ছিল, তোমার সাথে আমার প্রীতি-কুটুম্বিতা তার চেয়েও বেশী হবে। তুমিও তেমনই করবে যাতে দেশ-বিদেশের লোক তা শুনে প্রশংসা করে। ...আর বাঙ্গাল যা করেছে ত দৈবক্রমেই হয়েছে। ...একারণে দুঃখ করোনা। এই দুঃখে আমিও দুঃখী আছি। গড়গ্রাম জয়ন্তী দুই ভাই। তোমার আমার শত্রু বাঙ্গাল। তোমার আমার বুদ্ধি এক হলে সবকিছু

ভালো হবে। ...বাকী সমাচার তোমার দুই দূত এবং আমার রামাই দূতের মুখ থেকে জেনে নিবে।"

পত্রের শেষে যশোমন্ত রায় চক্রধ্বজ সিংহকে জবাব পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, চক্রধ্বজ সিংহ জৈন্তিয়ার দূতের সঙ্গে নিজের দূতদেরকে দিয়ে একটি প্রীতিপূর্ণ জবাব পাঠাবেন। কিন্তু একটি তুচ্ছ কারণে আহোমরাজ তা করলেন না।[23] জৈন্তিয়াপতির দূত রামাই একা জৈন্তিয়ায় ফিরে এলো। এতে জৈন্তিয়াপতি মনে কষ্ট পেলেন। এর প্রায় দেড় বছর পরে তিনি আহোমরাজের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে তাঁর মনোঃকষ্টের কথা জানালেন।[24] এই পত্রের তারিখ ১৫৮৭ শকাব্দের ২০ ফাগুন। পত্রটি বহন করেছিল জৈন্তিয়াপতির দূত রামাই।

আহোমরাজ এই পত্রের জবাবে জৈন্তিয়ার দূতের সঙ্গে তাঁর দূত শ্রীরাম ও জয়কৃষ্ণকে দিয়ে একটি পত্র পাঠালেন। পত্রের সঙ্গে বেশ কিছু উপহারও ছিল। পত্রটির তারিখ ১৫৮৮ শকাব্দের ৮ আঘণ। এই পত্র পেয়ে জৈন্তিয়াপতি খুশী হলেন। পত্রের বাহক শ্রীরাম ও জয়কৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি শুনলেন যে, আহোমরাজ মোগলানে আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছেন। এ সংবাদ শুনে তিনি আহোমরাজকে সামরিক সহায়তা দিতে চাইলেন। আহোমরাজের পত্রের জবাবে তিনি লিখলেন, "...শুনলাম তুমি মোগলের সাথে লড়াই করার জন্য

---

[23] ওই সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্তর্গত নারতিয়াং পুঞ্জির দলই বা সরদারের একটি ভুলের কারণে আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ জৈন্তিয়াপতির উপর মনোঃক্ষুণ্ণ ছিলেন। নারতিয়াং পুঞ্জির ওই সরদার আহোমরাজের কাছে লিখা একটি পত্রে আহোমরাজকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেননি। ওই যুগের রীতি অনুযায়ী তিনি ওই পত্রের স্বস্তিতে 'শ্রীশ্রী' (দুইবার) না লিখে 'শ্রী' (একবার) লিখেছিলেন। যেহেতু নারতিয়াং পুঞ্জির সরদার ছিলেন জৈন্তিয়াপতির অধীনস্থ ও অনুগত একজন সরদার সেহেতু আহোমরাজ ওই ভুলের জন্য জৈন্তিয়াপতিকেই দায়ী করেছিলেন। নারতিয়াং পুঞ্জির সরদারের মাতৃভাষা ছিল প্নার ভাষা। তিনি হয়তো আহোম ভাষায় পারদর্শী কাউকে দিয়ে ওই পত্রটি লিখিয়েছিলেন। ওই লেখকই হয়তো মনের ভুলে দুইবারের স্থলে একবার 'শ্রী' লিখেছিল। কিন্তু এর দায় বর্তায় খোদ জৈন্তিয়াপতির উপর।

[24] জৈন্তিয়াপতি যশোমন্ত রায় এই পত্রে নারতিয়াং সরদারের ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। এতে খুশী হয়ে আহোমরাজ জৈন্তিয়াপতির পত্রের উত্তর পাঠান এবং আবারও জৈন্তিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

লোক-লস্কর পাঠিয়েছ। ... মোগলরা তোমারও শত্রু আমারও শত্রু। আমিও ডিমারুয়ার পথে লোক-লস্কর পাঠাতে চাই। সবকিছু প্রস্তুত আছে। শুধু তোমার বার্তার অপেক্ষায় আছি।"

আহোমরাজের উদ্দেশ্যে যশোমন্ত রায়ের লিখা শেষ পত্র এটিই। এই পত্রটির তারিখ ১৫৮৯ শকাব্দের ৯ কার্তিক। পত্রটি বহন করেছিল জৈন্তিয়াপতির দূত রামাই। এই পত্রের জবাবে আহোমরাজ তাঁর দূত নিরহ ও বিরিণাকে দিয়ে একটি পত্র পাঠান। এটিই জৈন্তিয়াপতির উদ্দেশ্যে লিখা আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের শেষ পত্র। আহোমরাজ এই পত্রে জৈন্তিয়াপতির সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব গ্রহণ করে বিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। একই সাথে তিনি জৈন্তিয়ার রাজকন্যাকে বিবাহের আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন।

এই পত্রটির তারিখ ১৫৯০ শকাব্দের ৪ পৌষ। খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পত্রটি লিখা হয়েছিল ১৬৬৮ সালের একেবারে শেষ দিকে অথবা ১৬৬৯ সালের একেবারে প্রথমদিকে। পত্রের সঙ্গে কিছু উপহারও ছিল। কিন্তু পত্রটি যশোমন্ত রায়ের হাতে পৌঁছেনি। এর কারণ, আহোমরাজের দূতগণ যখন পত্রটি নিয়ে জৈন্তিয়ায় পৌঁছল তখন তিনি আর জীবিত ছিলেন না। এই পত্রের সূত্র ধরে, *অ্যান অ্যাকাউন্ট অভ আসাম* গ্রন্থের রচয়িতা ডক্টর ওয়েড দাবি করেছেন যে, যশোমন্ত রায়ের মৃত্যু হয়েছিল ১৫৯০ শকাব্দের ৪ পৌষ তারিখে। প্রকৃত সত্য হল, ওই তারিখের খুব কাছাকাছি সময়ে যশোমন্ত রায়ের মৃত্যু হয়েছিল।

ছয়. জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় প্রমথ রায় বা মানসিংহ (১৬৬৮ সাল)

যশোমন্ত রায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৬৬৮ সালে। এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণে তিনি আহোমরাজের সহায়তায় সৈন্য পাঠাতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর নাতি প্রমথ রায়। প্রমথ রায় নিজের নাম পাল্টে 'মানসিংহ' নামে সিংহাসনে বসেছিলেন। রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া সম্পাদিত *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যশোমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর নাতি মানসিংহ রাজা হন। কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যশোমন্ত রায় ১৬৬০ সালে মারা যান এবং তাঁর পুত্র বানসিংহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

এডওয়ার্ড গেইট যশোমন্ত রায়ের মৃত্যুর যে সাল উল্লেখ করেছেন সেটি ভুল। সঠিক সাল হবে ১৬৬৮। নতুন রাজার নামেও তিনি ভুল করেছেন। অনেক লেখক-গবেষক তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যশোমন্ত রায়ের উত্তরাধিকারীর নাম 'বানসিংহ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থে দেওয়া তথ্যকে সঠিক ধরে নিলে ওই রাজার নাম হবে 'মানসিংহ'। এরপর আসে উত্তরাধিকারীর সাথে যশোমন্ত রায়ের সম্পর্কের ব্যাপারটি। *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থে বলা হয়েছে 'নাতি'; এডওয়ার্ড গেইট লিখেছেন 'পুত্র'। কিন্তু জৈন্তিয়া রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রথা অনুযায়ী রাজার পরে ভাগিনেয় রাজা হওয়ার কথা; পুত্র বা নাতি রাজা হওয়ার কথা নয়। এই বিভ্রান্তি নিরসনের কোন উপায় নেই।

যশোমন্ত রায়ের কাছে লিখা আহোমরাজের শেষ পত্রটি নিয়ে আহোমের দূত নিরহ ও বিরিণা যখন জৈন্তিয়ায় যখন পৌঁছল তখন মানসিংহ জৈন্তিয়ার নতুন রাজা হয়েছেন। আহোমের দূতদ্বয়কে তিনিই গ্রহণ করলেন। আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের পত্রটি তাঁর হাতেই তোলে দেওয়া হল। এই পত্রে আহোমরাজ জৈন্তিয়ার সামরিক সাহায্য চেয়েছিলেন (মোগলদেরকে মোকাবিলার জন্য)। কিন্তু মানসিংহ আহোমরাজের এই আহ্বানে সাঁড়া দিতে পারেননি। এমনকি তিনি আহোমরাজের পত্রটির জবাব লেখারই সুযোগ পাননি। এর আগেই তিনি ক্ষমতা ও প্রাণ দুটোই হারিয়েছিলেন।

সিংহাসনে আরোহনের মাত্র ছয় মাসের মাথায় মানসিংহ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাকে হত্যা করে জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় এসেছিলেন প্রতাপ সিংহ। এই প্রতাপ সিংহ কে ছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। শুধু এটুকু জানা যায় যে, তিনি বাংলা থেকে জৈন্তিয়ায় ফিরে এসেছিলেন এবং রাজা মানসিংহকে সরিয়ে নিজে রাজা হয়েছিলেন। প্রতাপ সিংহ সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের কোন আত্মীয় ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি মোগলানে (বাংলায়) নির্বাসিত ছিলেন। ১৬৬৯ সালে তিনি মানসিংহকে সরিয়ে জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন।

সাত. ১৫৯১ শকাব্দের মুদ্রা বা কাটরা টাকা

কোচ রাজাদের ইতিহাস *বংশাবলি* থেকে জানা যায়, ১৫৬৪ সালে জৈন্তিয়া দখলের পর কোচ সাম্রাজ্যের অধিপতি নরনারায়ণ জৈন্তিয়ার রাজাকে একটি বিশেষ শর্তে মুদ্রা চালু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শর্তটি ছিল, জৈন্তিয়ার রাজা

মুদ্রার গায়ে নিজের নাম উল্লেখ করতে পারবেন না; নিজের নামের স্থলে তিনি রাজধানীর নাম উল্লেখ করতে পারবেন। *বংশাবলি* থেকে এই তথ্য পাওয়া গেলেও ওই সময়কার কোন মুদ্রা ঐতিহাসিকদের হাতে আসেনি। ওই সময়কার মুদ্রাসমূহ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়ার যেসব মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো মুদ্রাটি হল ১৫৯১ শকাব্দের অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ১৬৬৯ সালের।[25]

অদ্ভূত ব্যাপার হল, কোচদের জৈন্তিয়া বিজয়ের এক শতাব্দীকাল পরে চালু হওয়া এই মুদ্রাটির গায়েও কোন রাজার নাম উল্লেখ করা হয়নি। যখন এই মুদ্রাটি চালু হয় তখন জৈন্তিয়ার উপরে কোচদের কোন প্রভাব বিদ্যমান ছিল না। ১৫৮৭ সালে কোচ অধিপতি নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচদের সকল আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল এবং কোচশাসিত কামতা রাজ্যটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর আর কখনোই আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে কোচদের উত্থান ঘটেনি। তাই জৈন্তিয়া রাজ্যের ১৬৬৯ সালের মুদ্রায় শতাব্দীকাল পূর্ববর্তী কোচ বিজয়ীদের দেওয়া শর্ত রক্ষার ব্যাপারটি বেশ বিস্ময়কর!

১৬৬৯ সালের পরবর্তী সময়ের মুদ্রাগুলোতেও রাজারা নিজেদের নাম লিখেননি। অবশ্য রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই ও রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ নিজের নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন। অন্যান্য রাজারা রাজধানীর নামেই মুদ্রা চালু করেছিলেন। খুব সংগত কারণেই বলা যায় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের রাজারা জৈন্তিয়া রাজ্যের একটি রীতি হিসেবেই রাজধানীর নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন; এর মধ্যে কোচ অধিপতি নরনারায়ণের দেওয়া শর্ত মেনে চলার কোন ব্যাপার ছিল না। এছাড়া আর কোনভাবে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

স্যার এডওয়ার্ড গেইটের *সাম নোটস অন জৈন্তিয়া হিস্টরি* প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ঐতিহাসিকদের হাতে আসা জৈন্তিয়ার সবচেয়ে পুরানো মুদ্রা অর্থাৎ ১৫৯১

---

[25] ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রায় এক ডজন মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। প্রতিটি মুদ্রার গায়েই শকাব্দের উল্লেখ রয়েছে। দুটি মুদ্রা ছাড়া অন্যগুলোতে রাজার নাম নেই; রাজার নামের স্থলে রাজধানীর নাম রয়েছে। সবগুলো মুদ্রার গায়েই তরবারি বা কাটারির চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নটির কারণে জৈন্তিয়ার মুদ্রাকে ‘কাটরা টাকা’ নামেও ডাকা হয়।

শকাব্দ বা খ্রিষ্টীয় ১৬৬৯ সালের মুদ্রাটির একপাশে লিখা রয়েছে, 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৫৯১' এবং আরেকপাশে লিখা রয়েছে, 'শ্রীশ্রী রঘুনাথ পাদপদ্ম পরায়ণস্য'। এই মুদ্রাটি কোন রাজা চালু করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করা মুশকিল। এর কারণ, ১৬৬৯ সালে মোট তিনজন রাজা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। এরা হলেন- মানসিংহ, প্রতাপ সিংহ এবং লক্ষ্মীসিংহ বা লক্ষ্মীনারায়ণ। সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থে লিখেছেন, মানসিংহ অথবা প্রতাপ সিংহ ১৫৯১ শকাব্দের মুদ্রাটি চালু করেছিলেন। অন্য কোন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

অধ্যায় তেরো
প্রতাপ সিংহ ও লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনামল

(১৬৬৯ সাল ও ১৬৬৯ সাল – ১৭০১ সাল)

আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ জৈন্তিয়ার রাজা যশোমন্ত রায়ের কাছে শেষ পত্রটি লিখেছিলেন ১৬৬৮ সালের একেবারে শেষ দিকে অথবা ১৬৬৯ সালের একেবারে প্রথমদিকে। আহোমরাজের দূত নিরহ ও বিরিণা যখন পত্রটি নিয়ে জৈন্তিয়ায় পৌঁছল তখন মানসিংহ নতুন রাজা হয়েছেন। তিনি দূতদ্বয়কে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পত্রের জবাব পাঠানোর আগেই তিনি প্রতাপ সিংহের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন। প্রতাপ সিংহ আহোমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি আহোমরাজের কাছে একটি পত্র ও একটি মৌখিক বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

এক. প্রতাপ সিংহের কথা (১৬৬৯ সাল)

প্রতাপ সিংহ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসার পর যশোমন্ত রায়ের উদ্দেশে লিখিত আহোমরাজের পত্রটির জবাবে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রটির পাশাপাশি আহোমের দূতদ্বয়ের মাধ্যমে তিনি আহোমরাজের কাছে একটি পত্র-সন্দেশও পাঠাতে চাইলেন। পত্র-সন্দেশ মানে হল মৌখিক বার্তা। প্রতাপ সিংহ তাঁর মৌখিক বার্তায় ডিমারুয়া রাজ্যটিকে নিজের বলে দাবি করেছিলেন। আহোমের দূতদ্বয় আহোমরাজের কাছে এমন বার্তা পৌঁছে দিতে অপারগতা প্রকাশ করল।

তারা জৈন্তিয়াপতিকে বলল যে, আহোমরাজের সামনে এমন বার্তা উচ্চারণ করা যাবে না। কিন্তু জৈন্তিয়াপতি নাছোড়বান্দা রইলেন। তিনি বললেন, "যদি তোমরা এটি না বল তাহলে আমি এটি পত্রে লিখব।" অগত্যা কোন উপায় না দেখে দূতগণ এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে রাজী হল। প্রতাপ সিংহের পত্র ও মৌখিক বার্তা নিয়ে জৈন্তিয়ার দূত রামাই ও আহোমের দূতদ্বয় আহোমে গেল। কিন্তু তারা গন্তব্যে পৌঁছার আগেই প্রতাপ সিংহকে হত্যা করে জৈন্তিয়ার সিংহাসন দখল করেন তাঁর জামাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বা লক্ষ্মী সিংহ।[26]

---

[26] রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া এবং সৈয়দ মুর্তাজা আলী এই রাজার নাম লক্ষ্মীসিংহ বলে উল্লেখ করেছেন। বাদবাকি সকল ঐতিহাসিক এই রাজার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ বলে

এটিও ১৬৬৯ সালের ঘটনা (এই একটিমাত্র বছরের মধ্যে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে তিনজন রাজা বসেছিলেন)। প্রতাপ সিংহের পত্র ও মৌখিক বার্তা নিয়ে দূতগণ আহোমে পৌঁছার আগেই তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদটি সেখানে পৌঁছে যায়। তাই দূতগণ যখন আহোমে পৌঁছল, আহোমের রাজদরবারে প্রতাপ সিংহের পত্রটি আর পাঠ করা হল না। আহোমের মন্ত্রী বড়ফুকন এই পত্রটিকে একটি অশুভ পত্র বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। পত্রটি আর খোলা হয়নি। তাই আহোমের বুরুঞ্জীতে এই পত্রটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

দুই. লক্ষ্মীনারায়ণের ডিমারুয়া নিয়ন্ত্রণের দাবি

জৈন্তিয়ার রাজা প্রতাপ সিংহের পত্রটি প্রত্যাখ্যানের পরে আহোমের রাজদরবার থেকে জৈন্তিয়ার দূত রামাইকে বলা হয়, তিনি যেনো জয়ন্তীপুরে ফিরে যান এবং জৈন্তিয়ার নতুন রাজার কাছ থেকে একটি পত্র নিয়ে আহোমে উপস্থিত হন। রামাই দূত জয়ন্তীপুরে ফিরে এসে নতুন রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে একথা জানালেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৯৩ শকাব্দের ১০ আষাঢ় তারিখে আহোমরাজের কাছে একটি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের মতো আহোমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রামাই দূতকে দিয়ে পত্রটি আহোমে পাঠানো হয়।

পত্রটির পাশাপাশি লক্ষ্মীনারায়ণ আহোমরাজের কাছে একটি মৌখিক বার্তাও পাঠিয়েছিলেন। এই বার্তায় তিনি আহোমরাজের কাছ থেকে ডিমারুয়া ফেরত চান এবং আহোমরাজের কাছে কন্যা সমর্পণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু রামাই দূত আহোমের রাজদরবারে লক্ষ্মীনারায়ণের পত্র ও কন্যা সমর্পণের প্রস্তাব পৌঁছে দিলেও ডিমারুয়ার দাবিটি সেখানে উত্থাপন করতে পারেননি। রুক্ষ বুঢ়াগোহাঁই (সম্ভবত আহোমের কোন একজন মন্ত্রী) তাকে এই দাবিটি রাজদরবারে উত্থাপন করতে নিষেধ করেছিলেন। আহোমরা সবেমাত্র মোগলদের কাছ থেকে ডিমারুয়া অঞ্চলটি উদ্ধার করেছিল। তাই তারা বিজয়ের নিয়ম অনুসারে এই অঞ্চলটিকে নিজেদের বলে দাবি করছিল।[27]

উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী এই রাজাকে প্রতাপ সিংহের জামাতা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অন্য কোন ঐতিহাসিক এমন কোন তথ্য দেননি।

[27] এই সামন্তরাজ্যটি নিয়ে অতীতে জৈন্তিয়ার রাজা ধনমাণিকের সাথে কাছাড়ি রাজা শত্রুদমনের বিরোধ হয়েছিল। এরপর কোন এক সময়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি জৈন্তিয়ার

জৈন্তিয়াপতির পত্রের জবাবের জন্য আহোমের রাজধানীতে অপেক্ষারত অবস্থায় হঠাৎ করেই রামাই দূতের মৃত্যু হয়; তিনি আর কখনো জৈন্তিয়ায় ফিরে আসেননি। ১৫৯৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭২ সালে আহোমের দূত বলোরাম ও জয়কৃষ্ণ আহোমরাজের একটি পত্র নিয়ে জয়ন্তীপুরে পৌঁছায়। ১৫৯৪ শকাব্দের ২৪ মাঘ তারিখে লিখিত এই পত্রে আহোমরাজ উদয়াদিত্য সিংহ সুনইয়াৎফা[28] উভয় রাজ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই পত্রের সঙ্গে আহোমের দূতদ্বয় জৈন্তিয়ার রাজকন্যার বাগদানের জন্য প্রয়োজনীয় অলংকার ও বিয়ের পোষাকও নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু জৈন্তিয়াপতি তাদেরকে জানালেন যে, তিনি আহোমরাজকে কন্যা সমর্পণের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতে রাজকন্যার কথা বলেননি; অন্য কন্যার কথা বলেছেন। এরপর তিনি দূতদের কাছ থেকে ডিমারুয়ার ব্যাপারে আহোমরাজের বার্তা জানতে চাইলেন। দূতরা বলল, আহোমরাজ এ ব্যাপারে মৌখিক কোন বার্তা দেননি। সবকিছু পত্রেই উল্লেখ করা আছে। কিন্তু পত্রটিতে ডিমারুয়ার ব্যাপারে কিছু লিখা ছিল না। জৈন্তিয়াপতির কাছ থেকে আহোমরাজের পত্রের জবাবের জন্য আহোমের দূতরা জয়ন্তীপুরে অপেক্ষা করতে লাগল।

এরই মধ্যে হঠাৎ করে খবর এলো যে, আহোমরাজ উদয়াদিত্য সিংহ সুনইয়াৎফা মৃত্যুবরণ করেছেন। জৈন্তিয়াপতি আহোমের দূতদেরকে বললেন, যেহেতু আহোমরাজ মৃত্যুবরণ করেছেন সেহেতু কন্যা বাগদানের জন্য তাঁর পাঠানো অলঙ্কার ও পোষাকগুলো আর কোন প্রয়োজন রইল না। দূতরা জৈন্তিয়াপতিকে অনুরোধ করে বলল যে, আহোমের নতুন রাজা রামধ্বজ সিংহের জন্য একজন কন্যা বাগদানের ব্যবস্থা করা হোক। এতে উভয় রাজ্যের সম্পর্ক মজবুত হবে। কিন্তু জৈন্তিয়াপতি বললেন, যেহেতু তিনি ডিমারুয়ার

রাজার অধীনেই এসেছিল। ১৬৬২ সালে এটি মোগলদের অধিকারে চলে যায় (মোগল সেনাপতি মীর জুমলার আহোম অভিযানের সময়)। এরপর মোগলদেরকে হটিয়ে আহোমরা এটি দখল করে নেয়। এটি আহোম রাজা চক্রধ্বজ সিংহের সময়ের ঘটনা।

[28] আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ তখন আর জীবিত ছিলেন না। মোগলদের সাথে যুদ্ধ চলা অবস্থায়ই তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তাঁর ছোটভাই উদয়াদিত্য সিংহ সুনইয়াৎফা।

ব্যাপারে আহোমের কাছ থেকে কোন সাঁড়া পাননি সেহেতু তিনি আহোমরাজের জন্য কোন কন্যা সমর্পণে ইচ্ছুক নন।

এরপর তিনি আহোমের রুক্ষ বুঢ়াগোহাঁইয়ের উদ্দেশে একটি পত্র লিখেন। ১৫৯৫ শকাব্দের ১০ পৌষ তারিখে লিখিত এই পত্রে তিনি উভয় রাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেন এবং ডিমারুয়ার উপরে জৈন্তিয়ার দাবির কথা পুনর্ব্যক্ত করে ওই অঞ্চলটিকে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানান। পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "গড়গাঁও জয়ন্তী অভেদ প্রীতিতে চলিয়া যাইতেছে, এতে যে আজি ভেদাভেদ হৈব তেবে প্রীতি কিৰূপে ৰহিব? কি কারণ এমত কহিছে? সকল দিনে ডিমাৰুয়া আমাৰ খাটনীয়াৰ, তাৰে যে তুমি অধিকাৰ কৰ ইটো বৰ অনুচিত। অতঃপৰ ডিমাৰুয়া আমাৰে ছাৰিয়া দিবা, প্রীতিৰ দিনে দিন যেমনে অধিক হয় তাকে করিৰবা।"

এই পত্রটি নিয়ে জৈন্তিয়ার নতুন দূত সুবুদ্ধি রায় আহোমের দূত বলোরাম ও জয়কৃষ্ণের সঙ্গে আহোমে চলে যান। কিন্তু আহোমদের পক্ষ থেকে এই পত্রটির জবাব আসতে বেশ দেরী হয়। সুবুদ্ধি রায়কে দীর্ঘদিন আহোমে বসিয়ে রেখে অবশেষে ১৫৯৭ শকাব্দের ১৮ কার্ত্তিক তারিখে রুক্ষ বুঢ়াগোহাঁই জৈন্তিয়াপতির কাছে একটি পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি বলেন যে, নবাব সৈয়দ ফিরোজকে পরাজিত করে আহোমরা ডিমারুয়া জয় করেছে এবং এটি ফেরত দেওয়ার কোন ইচ্ছা তাদের নেই। আহোমের দূতদেরকে দিয়ে না পাঠিয়ে সুবুদ্ধি রায়কে দিয়েই পত্রটিকে জয়ন্তীপুরে পাঠানো হয়। এতে লক্ষ্মীনারায়ণ বেশ মনোঃক্ষুণ্ন হন।

১৫৯৯ শকাব্দের ৮ আঘণ তারিখে আহোমরাজের কাছে লিখিত একটি পত্রে তিনি এই মনোঃকষ্টের কথা ব্যক্ত করেন। ওই পত্রে তিনি বলেন যে, "আমাৰ ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা লৈয়া কটকী তোমাৰ তথাতে যাইতেছে, তোমাৰ তথাৰ কুশল ভদ্রাভদ্র বার্ত্তা লৈয়া কটকী আমাৰ এথাতে আসিতেছে। অন্যোন্য কটকীৰ দ্বাৰাএ কুশল বার্ত্তা পাইলে হৃদয় সাহলাদ ধৰে, মনঃ পীতিও অধিক হয়। তাতে এমত কর্ম্ম কৰিলা, পূৰ্ব্বাপৰে এমত কর্ম্ম নাহৈছে। তোমাৰ দিগের পত্র আমাৰ কটকীর স্থানে দিয়া এক বৎসৰ ৰাখিয়া অনাদৰ কৰিয়া বিদায় কৰিলাই, তোমাৰ দিগেৰ কটকীও নেদিলাই, এমতটা কোন প্রীতি-কুটুম্বিতাৰ লক্ষণ? যাৰ যাৰ প্রীতি ভঙ্গ হৈয়া থাকে তথাপীও তাৰ কটকীৰ সহিত কটকী অবশ্য আইছে। তোমাৰ আমাৰ অভেদ প্রীতি, তাতে যে এমতখানি হৈল কাৰণ কি?"

আহোমরাজ এই পত্রটির জবাবে দুজন দূতকে দিয়ে জৈন্তিয়াপতির কাছে একটি পত্র পাঠান। ১৬০০ শকাব্দের ৪ আঘণ তারিখে লিখিত এই পত্রে তিনি দাবি করেন যে, জৈন্তিয়ার সাথে তাঁর সম্পর্ককে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন। কিন্তু ডিমারুয়ার প্রশ্নে তিনি জৈন্তিয়াকে কোন ছাড় দেওয়ার আশ্বাস দিলেন না। এরপর উভয় রাজ্যের সম্পর্ক বেশ দুর্বল হয়ে গেলো। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পত্র যোগাযোগ টিকে রইল। মূলত ডিমারুয়া ফিরে পাওয়ার আশায় লক্ষ্মীনারায়ণ আহোমের সাথে পত্র যোগাযোগ চালু রেখেছিলেন। ১৬২৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০১ সাল পর্যন্ত আহোমদের সাথে তাঁর অনেকগুলো পত্র বিনিময় হয়েছিল।

এসব পত্র থেকে কিছু ছোট ছোট ঘটনার কথা যায়। আহোমরা জৈন্তিয়ার সীমান্তবর্তী কালাং নদীর মুখে একটি সেনাচৌকি স্থাপন করায় জৈন্তিয়াপতি এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ডিমারুয়া থেকে পালিয়ে আসা বৈরাগী কুওরকে তিনি ডিমারুয়ার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকার (নগাঁও জেলার অন্তর্গত) সরদার নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বড়ফুকন বৈরাগী কুওরকে বন্দী করে জৈন্তিয়াপতির প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা রুখে দিয়েছিলেন। ডিমারুয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের শেষ চেষ্টা হিসেবে জৈন্তিয়াপতি ডিমারুয়ার সরদারের কাছে কর দাবি করে বসেন। কিন্তু ডিমারুয়ার সরদার জানালেন যে, যদি তিনি জৈন্তিয়াকে কর পরিশোধ করেন তাহলে ডিমারুয়ার উপর বড়ফুকনের শাস্তি নেমে আসবে।

তিন. লক্ষ্মীনারায়ণের সিলেট শহর আক্রমণ (১৬৮২ সাল)

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মোগলশাসিত সিলেট শহর আক্রমণের ঘটনা। মোগলদের সাথে তাঁর কী নিয়ে বিরোধ হয়েছিল তা ইতিহাসে নেই। কিছু সূত্র থেকে কেবল এটুকুই জানা যায় যে, ১৬৮২ সালে তিনি সিলেট শহর আক্রমণ করেছিলেন। তখনকার সিলেট ছিল মোগলদের অধীনস্থ সুবে বাংলার অন্তর্ভুক্ত। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন তখনকার সুবে বাংলার মোগল সুবাদার। লক্ষ্মীনারায়ণের সিলেট আক্রমণের সংবাদ শুনে তিনি শহরটি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেন। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন শায়েস্তা খাঁ-র পুত্র ইরাদত খাঁ। তিনি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কাছ সিলেট শহর পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এরপর মোগলদের সাথে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আর কোন বিরোধ হয়নি।

চার. ১৫৯২ শকাব্দের মুদ্রা বা কাটরা টাকা

১৫৯১ শকাব্দ বা ১৬৬৯ সালে তিনজন রাজা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের ক্ষমতা দখল-বেদখলের এই ক্রান্তিলগ্নের স্মারক হয়ে আছে একটি মুদ্রা বা কাটরা টাকা। তিনজন রাজার মধ্যে কোন রাজা এটি চালু করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। তবে লক্ষ্মীনারায়ণ ওই মুদ্রাটি চালু করেননি- এমন দাবি করাটা অযৌক্তিক হবে না। এর কারণ, ঐতিহাসিকরা ঠিক পরের বছরের আরেকটি মুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। এই মুদ্রাটি ১৫৯২ শকাব্দ বা ১৬৭০ সালের। তখন লক্ষ্মীনারায়ণ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে ছিলেন। তাই এতে সন্দেহ নেই যে, এই মুদ্রাটি তিনিই চালু করেছিলেন। যদি তিনি আগের বছরের মুদ্রাটি চালু করতেন তাহলে পরের বছরের মুদ্রাটি চালু করার প্রয়োজন হতো না। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৬৬৯ সালের মুদ্রাটি চালু করেছিলেন রাজা মানসিংহ অথবা রাজা প্রতাপ সিংহ আর ১৬৭০ সালের মুদ্রাটি চালু করেছিলেন রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ। ১৬৭০ সালের মুদ্রাটির একপাশে লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৫৯২' এবং অপর পাশে লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য'।

পাঁচ. জয়ন্তীপুরের ৫২ হাটির কথা

জৈন্তিয়ার যেসব রাজারা দীর্ঘসময় রাজ্য শাসন করেছিলেন তাদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ অন্যতম। তিনি ১৬৬৯ সাল থেকে ১৬৯৭ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। ওই সময়ে জৈন্তিয়ার রাজধানী জয়ন্তীপুরের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। শহরটিকে তিনি ৫২টি গলি বা হাটিতে বিভক্ত করেছিলেন। এই ৫২ হাটির চিহ্ন ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত টিকে ছিল। ১৮৯৭ সালের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প লক্ষ্মীনারায়ণের অনেক উন্নয়ন কর্মকে মুছে দিয়েছে। স্যার এডওয়ার্ড গেইট লক্ষ্মীনারায়ণ কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাসাদের (সম্ভবত বড়দেউল) কথা বলেছেন যার ধ্বংসাবশেষ তিনি নিজে দেখেছেন। এই প্রাসাদের প্রবেশপথে তিনি একটি শিলালিপিও দেখেছিলেন যাতে লক্ষ্মীনারায়ণ কর্তৃক এটির নির্মাণকাল (১৬০২ শকাব্দ বা ১৬৮০ সাল) উল্লিখিত ছিল।

ছয়. লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর তারিখ (১৭০১ সাল)

রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া সম্পাদিত *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্মীসিংহের (ওই গ্রন্থে তাকে এই নামেই পাওয়া যায়) শাসনকাল হল ১৫৯১ শকাব্দ থেকে ১৬২৩ শকাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৬৬৯ সাল থেকে ১৭০১ সাল পর্যন্ত। ওই গ্রন্থে লক্ষ্মীসিংহ বা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া আছে। এই তারিখটি হল, ১৬২৩ শকাব্দের ২০ আষাঢ়। এমনকি এই তারিখের সাথে বারও উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের (১৯৩৭) ৭২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "লক্ষ্মীসিংহ মৰিল আষাঢ়ৰ ২০ দিন যাওঁতে বৃহস্পতিবাৰে।"

জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী গ্রন্থটি হচ্ছে আহোমের বুরুঞ্জীতে স্থান পাওয়া জৈন্তিয়া সংক্রান্ত উপাদানসমূহের একটি সংকলন। এই গ্রন্থের তথ্যগুলোর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোন সংশয় নেই। লক্ষ্মীসিংহ বা লক্ষ্মীনারায়ণ আহোমদের কাছে যেসব পত্র লিখেছিলেন তার সবগুলোই এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর কাছে লিখা আহোমদের সবগুলো পত্রও এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর সময়েই জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পত্র-যোগাযোগ হয়েছিল। একারণে আহোমের ইতিহাস বা বুরুঞ্জীতে এই রাজা বেশ প্রাসঙ্গিক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজা যার মৃত্যুর তারিখটি আহোমের বুরুঞ্জীতে স্থান পেয়েছে।

অধ্যায় চৌদ্দ
প্রথম রামসিংহের শাসনামল

(১৭০১ সাল – ১৭০৮ সাল)

১৬২৩ শকাব্দ বা ১৭০১ সালে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পরে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন রামসিংহ। তিনি ১৭০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। অতিদীর্ঘ না হলেও তাঁর সময়কাল জৈন্তিয়ার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের ঘটনা। উভয় রাজ্যের ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৭০৭ ও ১৭০৮ সালে। এই যুদ্ধের প্রধান চরিত্র হিসেবে রামসিংহকে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজা হিসেবে গণ্য করা হয়। জৈন্তিয়ার ইতিহাসে তিনি প্রথম রামসিংহ নামে আলোচিত হয়েছেন। এর কারণ, তাঁর পরবর্তী সময়ে রামসিংহ নামের আরেকজন রাজা জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। তাই ঐতিহাসিকরা দুজনের পার্থক্য বোঝাতে ‘প্রথম’ ও ‘দ্বিতীয়’ শব্দের ব্যবহার করে থাকেন।

এক. আহোমের বুরুঞ্জীতে রামসিংহের কথা

প্রথম রামসিংহের সিংহানারোহণের তারিখটি আহোমের ইতিহাস বা বুরুঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারিখটি হল ১৬২৩ শকাব্দের ১৫ শাওণ (শ্রাবণ)।[29] আহোমের বুরুঞ্জীতে রাজা রামসিংহের সিংহাসনারোহণের এমন সুনির্দিষ্ট তারিখ লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণ হল, ওই সময়টিতে আহোমের দুজন দূত বা কটকী জৈন্তিয়ার রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন। তারা আহোম থেকে বার্তা নিয়ে রামসিংহের আগের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এরপর তারা লক্ষ্মীনারায়ণের বার্তার জন্য জৈন্তিয়ার রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন। ওই সময়েই লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয় এবং রামসিংহ নতুন রাজা হন। তিনি আহোমের দূতদ্বয়কে আহিণ (আশ্বিণ) মাসের ১৫ তারিখ বিদায় দেন। দূতদ্বয় আহোমের রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ এবং রামসিংহের রাজা হওয়ার সংবাদ তোলে ধরে।

---

[29] রায় বাহাদুর সূর্য্য কুমার ভূঁইয়া সম্পাদিত *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৯৩৭) ৭২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, “ৰামসিংহ ৰাজা হ’ল শাওণর ১৫ দিন যাওঁতে।”

তখনকার বুরুঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে এই তথ্যগুলো ইতিহাসের উপাদানে পরিণত হয়েছে। রামসিংহ যখন জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তখন আহোমের রাজা ছিলেন রুদ্র সিংহ সুখরুংফা (শাসনকাল: ১৬৯৬ - ১৭১৪ সাল)। তাঁর আমলের বুরুঞ্জী থেকে জানা যায়, জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহ ১৭০৩ সালে শ্রী বিজয়রাম নামক দূতের মারফতে আহোমের বড়ফুকনের কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। পত্রটি ১৬২৫ শকাব্দের ৮ আহিন তারিখে লিখিত হয়েছিল। রামসিংহ এই পত্রে লিখেছিলেন, "আমি পূর্ব্ব সম্বন্ধ-প্রীতি অনুক্রমে আছি।" ওই বছর জৈন্তিয়ায় বসন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। পরের বছর, ১৭০৪ সালে আহোমের বড়ফুকন রামসিংহের কাছে একটি পত্র পাঠান। ১৬২৬ শকাব্দের ২৩ ফাগুন তারিখে লিখিত এই পত্রে তিনি বলেন, "অদ্যাপিও আমি সেই নিবন্ধ-প্রীতিতে ৰহিছি। আপুনিও যে তাতে ৰহিবা আমাৰো এইগোটহে অভিমত।"

উভয় পত্রে রাজ্যদ্বয়ের স্বাভাবিক সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। তবে এই সম্পর্কের তেমন গভীরতা ছিল না। ১৭০৪ অথবা ১৭০৫ সালে আহোম থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে জৈন্তিয়ায় আগত একজন বৈরাগীকে আটক করা হয়। একই সাথে আহোমের দূতদেরকেও আটক করা হয়। আহোম থেকে তাদের মুক্তির ব্যাপারে জৈন্তিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হলে জৈন্তিয়া থেকে জানানো হয় যে, জৈন্তিয়ার রাজা সিলেটে থাকায় এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। রাজা সিলেট থেকে ফিরলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এসব ঘটনার কথা আহোমের বুরুঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আহোমের বুরুঞ্জীতে জৈন্তিয়ার যেসব রাজার কথা এসেছে তাদের মধ্যে প্রথম রামসিংহকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা রয়েছে। এর কারণ, উভয় রাজ্য তখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। আহোমের বুরুঞ্জীতে এই যুদ্ধের যে বিশদ বিবরণ স্থান পেয়েছে তাতে জৈন্তিয়ার রাজা খুবই প্রাসঙ্গিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

যেকোন যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গেলে উভয় পক্ষের বর্ণনাই চলে আসে। আহোমের বুরুঞ্জীতে বর্ণিত জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের ইতিহাসে আহোমদের কথা যেমন এসেছে তেমনি জৈন্তিয়াবাসীদের কথাও এসেছে। তাই ওই যুদ্ধ সংক্রান্ত বুরুঞ্জীসমূহ একই সাথে উভয় রাজ্যের ইতিহাসের মূল্যবান দলিলে পরিণত হয়েছে। আহোমের বুরুঞ্জীতে জৈন্তিয়ার যতগুলো ঘটনার কথা এসেছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের ঘটনা। জৈন্তিয়ার আর কোন ঘটনা সম্পর্কে আহোমের বুরুঞ্জীতে এতো বিশদ বর্ণনা নেই।

রামসিংহের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই এই যুদ্ধটির সূচনা হয়েছিল। এরপর আহোমদের কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধটি প্রকট আকার ধারণ করেছিল। তবে সব ঘটনার আগের ঘটনা ছিল আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধ। এই যুদ্ধটি না হলে জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের ঘটনাও ঘটতো না।

দুই. আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধ (১৭০৬-১৭০৭ সাল)

১৫৬৩-৬৪ সালে কামতা রাজ্যের কোচবংশীয় অধিপতি নরনারায়ণের হাতে আহোম, কাছাড়ি রাজ্য, মনিপুর, জৈন্তিয়া ও ত্রিপুরা রাজ্যের পতনের ফলে এই রাজ্যগুলো সামরিক দিক থেকে একপ্রকার সমতা অর্জন করেছিল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে কোচপ্রভাবের অবসানের পর থেকে এরা একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ১৬০৬ সালে আহোমরা কাছাড়ি রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এই যুদ্ধে কারও চূড়ান্ত বিজয় কিংবা পতন হয়নি। উভয় রাজ্যের সীমানা ও সার্বভৌমত্বের কোন হানি ঘটেনি। আহোম আক্রমণ রুখে দেওয়ার পর কাছাড়ি রাজা যশোনারায়ণ শত্রুদমন আহোমদের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কাছাড়ি রাজ্য থেকে প্রতি বছর করবাবদ আহোমরাজকে ২০ জন দাস ও ৯ নয়টি ঘোড়া প্রদানের যে পুরানো নিয়ম ছিল সেটি তিনি রহিত করে দেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে আহোমরা আর কাছাড়িদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি।

পুরো এক শতক ধরে কাছাড়ি রাজ্যের এই পূর্ণ সার্বভৌমত্ব বজায় ছিল। এক শতক পর, আহোমরাজ রুদ্রসিংহ সুখরুংফা আবারও কাছাড়িদের উপর আহোম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ১৭০৪ অথবা ১৭০৫ সালে তিনি কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণকে আহোমের আনুগত্য মেনে নিয়ে প্রতি বছর রাজস্ব আদায়ের আহ্বান জানান। কিন্তু তাম্রধ্বজ নারায়ণ আহোমরাজের কাছে একটি পত্র লিখে জানিয়ে দেন যে, তিনি আহোমের আনুগত্য করতে মোটেও রাজী নন। এতে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফা কাছাড়ি রাজ্য আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৭০৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি রাজ্যটিকে আক্রমণের জন্য দুটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দেন। দুই দিক থেকে রাজ্যটিকে আক্রমণের জন্য এমন কৌশল বেছে নেওয়া হয়েছিল। একটি দল ছিল সেনাপতি দিহিঁয়া বড়বড়ুয়ার নেতৃত্বে। এদের সংখ্যা ছিল ৩৭,০০০। এরা অগ্রসর হয় ধনশ্রী নদীর তীর ধরে।

আরেকটি দল ছিল সেনাপতি পানি ফুকনের নেতৃত্বে। এদের সংখ্যা ছিল ৩৪,০০০। এরা অগ্রসর হয় কপিলি নদীর তীর ধরে। এই পথে রহা দূর্গ অবস্থিত ছিল। ১৭০৭ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে বড়বড়ুয়ার সৈন্যরা বিনা বাধায় কাছাড়ি রাজধানী মাইবং বা কীর্তিপুর (শত্রুদমন এই নাম রেখেছিলেন) দখল করে নেয়। নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে কাছাড়ি সৈন্যরা আহোমদের প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই করেনি। কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ রাজধানী ছেড়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে সমতলের খাসপুরে চলে যান। এদিকে আহোম সেনাপতি পানি ফুকন পথিমধ্যেই মাইবং বিজয়ের সংবাদ পেলেন এবং সাথে সাথে এই খবর আহোমরাজ রুদ্র সিংহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আহোমরাজ উভয় দলকেই খাসপুর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তা হল না। আহোম সৈন্যদের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ল। সেনাপতি বড়বড়ুয়া নিজেও মহামারীতে আক্রান্ত হলেন।

পানি ফুকন যদিও সুস্থ্য ছিলেন, কিন্তু মহামারী, রসদের অভাব এবং অনেক সৈন্য মারা পড়ার কারণে তাঁর বাহিনীটিও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবুও আহোম সৈন্যদের একটি ছোট দল খাসপুরে গেলো। তারা মাই-লাং-দামে শিবির স্থাপন করল এবং কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজের কাছে তিন জন দূত পাঠিয়ে তাকে আত্মসমর্পণের আহ্বান করল। কিন্তু কাছাড়ি রাজা এই আহ্বানে সাঁড়া দিলেন না। এদিকে আহোমরাজ সেনাপতি বড়বড়ুয়াসহ সকল অসুস্থ্য সৈন্যকে দিমারায় ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বড়বড়ুয়া পথিমধ্যেই মারা গেলেন। এই ঘটনার পর আহোমরাজ কাছাড়ি রাজ্য অভিযান পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেনাবাহিনীকে আহোমে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ১৭০৭ সালের মার্চ মাসে পানি ফুকনের নেতৃত্বে আহোম সৈন্যরা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। তবে ফিরে যাওয়ার পূর্বে তারা মাইবং নগরীটি ধ্বংস করে ফেলে। নগরীর ইটের দূর্গটি ধ্বংস করা হয় এবং বাড়িগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। বিজয়ের স্মারক হিসেবে তারা একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে রেখে যায়।

তিন. আহোম-কাছাড়ি যুদ্ধে জৈন্তিয়ার হস্তক্ষেপ

প্রতিবেশী রাজ্য জৈন্তিয়ার সাথে কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণের সুসম্পর্ক ছিল। আহোমদের ভয়ে তিনি যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর মনে হলো যে, এই প্রতিবেশী রাজ্যটির সাহায্য নেওয়া উচিত। সমতলের বিক্রমপুরে এসে

তিনি জরুরি সাহায্য চেয়ে জৈন্তিয়ার রাজার কাছে দূত পাঠালেন। জৈন্তিয়ার রাজা প্রথম রামসিংহ এই আহ্বানে সাঁড়া দিলেন। তাম্রধ্বজের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যদলকে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে মহামারীতে কাবু হয়ে আহোমরা কাছাড়ী অভিযান ত্যাগ করেছিল। তাম্রধ্বজ জৈন্তিয়াপতির কাছে পুনরায় দূত পাঠিয়ে জানালেন যে, এখন আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জৈন্তিয়াপতির কাছে এটা প্রতারণার সামিল বলেই মনে হলো। তিনি থামলেন না; তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে মুলাগুলের পথে কাছাড়ি রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। কাছাড়ি রাজার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো বালেশ্বরে। এই সাক্ষাতের সময় এক অভিনব কৌশলে তিনি কাছাড়ি রাজাকে বন্দী করে ফেললেন। এরপর বন্দী রাজাকে নিয়ে আসলেন জৈন্তিয়ার রাজধানীতে। সেখানে তিনি কয়েক মাস বন্দী রইলেন। দুর্বল কাছাড়ি রাজ্যকে নিজের অধীনস্থ্ করার জন্যই রামসিংহ তাকে বন্দী করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত *রাজমালা* গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "জয়ন্তীয়ারাজ একখানি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ নৌকা প্রস্তুতপূর্ব্বক তদারোহণে খাসপুরে গমন করেন। তিনি মহারাজ তাম্রধ্বজকে বলিলেন, বন্ধো! আমি এই নৌকা আপনার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছি, আসুন আমরা উভয়ে ইহাতে একবার আরোহণ করি। সরলচিত্ত তাম্রধ্বজ সেই নৌকায় আরোহণ করিলে, কপটমিত্র জয়ন্তীয়াপতি তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক বরবক্রের প্রবল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কাছাড়-পতির সৈন্যগণ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে ধনুর্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইল। তাম্রধ্বজ হস্তসঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। জয়ন্তীয়া-পতি স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কাছাড়পতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাম্রধ্বজের পত্নী রানী চন্দ্রপ্রভাবতী জয়ন্তীয়ারাজের বিশ্বাসঘাতকতা ও সমস্ত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আসামের অধিপতি স্বর্গদেবের[30] সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।"

রামসিংহ ইতোমধ্যে কাছাড়ি রাজ্যের পশ্চিমাংশের কিছু জায়গা নিজ রাজ্যভুক্ত করে ফেলেছিলেন। বুন্দাশীল ও ইছামতি দূর্গ তাঁর সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কাছাড়ি রানী আহোমরাজের

---

[30] আহোমরাজদের উপাধি ছিল স্বর্গদেব। তারা নিজেদেরকে দেবরাজ ইন্দ্রের বংশধর বলে দাবি করতেন।

কাছে নতি স্বীকারের সিদ্ধান্ত নিলেন। আহোমরাজের কাছে দূত পাঠিয়ে তিনি পূর্বের অবাধ্যতার (তাঁর স্বামীর) জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেলে ভবিষ্যতে আর কোন অবাধ্যতার ঘটনা ঘটবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দিলেন। আহোমরাজ এই বার্তাটি গ্রহণ করলেন এবং কাছাড়ি রাজার মুক্তির জন্য পদক্ষেপ নিতে রাজী হলেন। স্যার এডওয়ার্ড গেইটের লেখা থেকে জানা যায়, কাছাড়ি রানী নন বরং কাছাড়ি রাজাই আহোমরাজ রুদ্র সিংহের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। জনৈক বৈরাগীর মাধ্যমে তিনি পত্রটি পাঠিয়েছিলেন। কোনটি সঠিক তা নির্ধারণের কোন উপায় এখন আর নেই। রাজা কিংবা রানী- যার পত্রই হোক, আহোমরাজ তাতে সাঁড়া দিয়েছিলেন। তিনি জাগি ফাঁড়িতে দায়িত্বরত আহোম কর্মকর্তাদের দ্বারা জৈন্তিয়াপতির কাছে বার্তা পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যে, কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। কেউ কেউ লিখেছেন, আহোমরাজ জৈন্তিয়ার সীমান্তবর্তী সামন্ত রাজ্য গোভার অধিপতির মাধ্যমে জৈন্তিয়াপতির কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন।

অধ্যায় পনেরো
জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধ

(১৭০৭ সাল – ১৭০৮ সাল)

জৈন্তিয়ার রাজা প্রথম রামসিংহ আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার অনুরোধে কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজকে মুক্তি দিলেন না। এতে রুদ্র সিংহ প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, জৈন্তিয়া আক্রমণ করবেন। প্রথমেই জৈন্তিয়ার সীমান্তবর্তী গোভার বাজার বন্ধ করে দেওয়া হল (জৈন্তিয়ার পাহাড়ি সিন্টেংরা পণ্য পরিবহণের জন্য এই বাজারটির উপর নির্ভরশীল ছিল)। এরপর মিসা নামক স্থানে যুদ্ধের সদরদপ্তর স্থাপন করা হল এবং জৈন্তিয়া আক্রমণের জন্য দুটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দেওয়া হল। একদল ছিল সুরথ সিংহ বড়বড়ুয়ার[31] নেতৃত্বে এবং অন্যদল ছিল বড়ফুকনের নেতৃত্বে। পূর্ব দিক থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ১৭০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়বড়ুয়ার নেতৃত্বে ৪৩,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী রওনা হয়। এরা কপিলি উপত্যকা ধরে কাছাড়ি রাজ্যের ভেতর দিয়ে জৈন্তিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। অপর বাহিনীটি উত্তর দিক থেকে জৈন্তিয়া আক্রমণের জন্য বড়ফুকনের নেতৃত্বে রওনা হয়। এরা বড়খাড়ই ক্যাম্প থেকে গোভা হয়ে দুর্গম জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করে। দারাং এর রাজাও একদল সৈন্য নিয়ে এদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

এক. বড়বড়ুয়ার জৈন্তিয়া অভিযান

বড়বড়ুয়া তাঁর সৈন্যদেরকে কাছাড়ি রাজ্যের গ্রামগুলোতে কোন প্রকার ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে দেননি। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোন রসদও নেননি। এতে লোকজন খুশী হয়ে তাঁর বাহিনীকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাঁর বাহিনী জৈন্তিয়ার সীমান্তে পৌঁছে যায় এবং খুব সহজেই জৈন্তিয়ার তিনটি সীমান্ত ফাঁড়ি যথা- বালেশ্বর, দলাগাঁও এবং মুলাগুল দখল করে নেয়। এরপর তারা মুলাগুলে শিবির স্থাপন করে। সেখান থেকে জৈন্তিয়াপতির কাছে লোক পাঠিয়ে বলা হল, কাছাড়ি অধিপতি তাম্রধ্বজকে

---

[31] এই বড়বড়ুয়া কাছাড়ি রাজ্য অভিযানের সেনাপতি বড়বড়ুয়া নন। কাছাড়ি রাজ্য অভিযানে নিযুক্ত সেনাপতি বড়বড়ুয়া মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

যেনো সপরিবারে তাদের হাতে তোলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সিলেটের মোগল ফৌজদার মতিউল্লাহ খান বাহাদুরের কাছে লোক পাঠিয়ে এই অভিযানের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হল।[32] জৈন্তিয়াপতি আহোমদের হাতে তাম্রধ্বজকে তোলে দিতে রাজী হলেন না। তিনি বড়বড়ুয়া এবং বড়ফুকনের কাছে দূত পাঠিয়ে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করলেন এবং মুলাগুল থেকে জয়ন্তীপুর পর্যন্ত স্থানে স্থানে কামান পেতে রাখলেন।

কিন্তু বড়বড়ুয়ার বাহিনী এতে থামল না। রামসিংহের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে তাঁরা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হল। এতে রামসিংহের টনক নড়ল। বিশাল আহোম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তিনি জয়ী হতে পারবেন না- এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আহোম বাহিনীর অদম্য মনোভাব দেখে রামসিংহের রণোৎসাহ চলে গেল। তিনি মূল্যবান ধনরত্ন ভূগর্ভে পুতে রাখলেন এবং রাজধানী ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু জৈন্তিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদাররা এতে বাধ সাধলেন। এসব লোকজন শুরু থেকেই জৈন্তিয়াপতির ভুল কাজগুলোর বিরোধিতা করছিলেন। এবারেও তারা তাদেরকে এভাবে আক্রমণের মুখে ফেলে রেখে জৈন্তিয়াপতির চলে যাওয়া মেনে নিলেন না। তারা তাকে আহোম সেনাপতির কাছে নতি স্বীকার করার পরামর্শ দিলেন। রামসিংহ নতি স্বীকারে রাজী হলেন। তিনি বিশটি হাতির একটি বহর নিয়ে বড়বড়ুয়ার শিবিরের দিকে রওনা হলেন। শিবিরের নিকট পৌঁছে তিনি হাতি থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে বড়বড়ুয়ার তাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। বড়বড়ুয়া তাকে সাদরেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাকে আর রাজধানীতে ফিরতে দিলেন না।

দুই. বড়ফুকনের জৈন্তিয়া অভিযান

---

[32] মোগলদের সাথে আহোমদের তখনকার সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। উভয়পক্ষ বিরোধ এড়িয়ে চলতো। জৈন্তিয়া ছিল মোগল সীমান্তবর্তী রাজ্য। মোগলদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এই রাজ্যে আহোমদের আক্রমণের ঘটনায় মোগলরা শংকিত ও বিব্রত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এ নিয়ে আহোমদের সাথে মোগলদের সম্পর্কের অবনতি ঘটা বিচিত্র কিছু ছিল না। তাই আহোম সেনাপতি সিলেটের মোগল ফৌজদারকে জৈন্তিয়া আক্রমণের আগাম খবর জানিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং মোগলদের সাথে আহোমদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারেও তিনি আন্তরিক বলে জানিয়েছিলেন। এর ফলে সিলেটের মোগল ফৌজদার আহোমদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন এবং জৈন্তিয়ার রাজাকে কোন প্রকার সহায্য করা থেকে বিরত ছিলেন।

বড়ফুকন তাঁর বাহিনী নিয়ে জৈন্তিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন জগি থেকে। তাঁর পরবর্তী গন্তব্য ছিল গোভা। এর পরের গন্তব্য ছিল যথাক্রমে হাতিবান্ধা, অথিতভাংগা, লাচোর পাহাড়, বুড়িটিকর পাহাড়, বড়পানি নদীর তীর, পাভানাই এবং শেষ পর্যন্ত জয়ন্তীপুর।[33] ১৭০৮ সালের ২০ জানুয়ারি তাঁর বাহিনীটি গোভায় পৌঁছল। বড়ফুকন গোভার সরদারদেরকে উপহার দিয়ে খুশী করলেন। গোভায় কোন ঝামেলা হল না। কিন্তু গোভা থেকে পার্বত্য জৈন্তিয়ায় প্রবেশের পর তাদের পদযাত্রা নির্বিঘ্ন হল না। তাদেরকে ছোট ছোট হামলার মুখে পড়তে হলো। বুড়িটিকর পাহাড় অতিক্রমের সময় তাদেরকে যথেষ্ট বাধার মুখে পড়তে হলো।

জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহ যখন সমঝোতার উদ্দেশ্যে বড়বড়ুয়ার শিবিরে গিয়েছিলেন তখন জৈন্তিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদাররা আশা করেছিলেন যে, বড়বড়ুয়া রাজার সাথে যাবতীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি করে আহোমে ফিরে যাবেন। কিন্তু বড়বড়ুয়া তা না করে রাজাকে আটক করে ফেললেন। এতে জৈন্তিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদাররা আহোমদের ওপর প্রচণ্ড নাখোশ হলেন। কিন্তু বড়বড়ুয়ার বিশাল বাহিনীর সঙ্গে সমতলে যুদ্ধ করে কোন লাভ হবে না- এটা তারা জানতেন। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জৈন্তিয়া পাহাড়ে আহোমদেরকে প্রতিরোধ করা হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। বড়ফুকনের বাহিনী যখন গোভা থেকে জৈন্তিয়ার দিকে অগ্রসর হল, জৈন্তিয়ার প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের উপর হামলা শুরু করল। বড়ফুকনের বাহিনী যখন গোভা থেকে ১৯ মাইল এগিয়ে হাতিবান্ধায় পৌঁছল, জঙ্গল পরিস্কারে নিয়োজিত অগ্রবর্তী দলটি জৈন্তিয়ার একদল প্রতিরোধ যোদ্ধাকে দেখতে পেলো। তবে শক্তিশালী আহোম বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পিছু হটল। আরও আট মাইল এগিয়ে আহোমরা যখন অথিতভাংগায় পৌঁছল, প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের উপর হামলা করল।

---

[33] স্যার এডওয়ার্ড তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৭৬ পৃষ্ঠায় এই পুরো যাত্রাপথটির বিবরণ দিয়েছেন এভাবে- গোভা ৭ মাইল; অমসিয়ংগা পাহাড় ৯ মাইল; হাতিবান্ধা ১০ মাইল; নরোত্তম পাহাড় ৭ মাইল; অথিতভাংগা ১ মাইল; লাচোর পাহাড় ২ মাইল; বুড়িটিকর ২ মাইল; বড়পানি ৫ মাইল; সরলপানি ১৩ মাইল; সিলসাকো ২ মাইল; নারতুং ৫ মাইল; লাকিমপুর ৩ মাইল; চামতাং নারতুং ২ মাইল; নাতাগড়ি ৩ মাইল; পাভানি ৮ মাইল; মুকুতাপুর ১৬ মাইল এবং জৈন্তিয়াপুর নয়াগাং ২ মাইল।

এই হামলাটি ব্যর্থ হয় এবং প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের আহত ও নিহত সঙ্গীদেরকে নিয়ে পিছু হটে। আহোমরা লাচোর পাহাড়ে পৌঁছার পর আরও শক্তিশালী একটি আক্রমণের মুখে পড়ে। এবারের আক্রমণে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং তাদের সাথে কিছু হাতিও ছিল। এই হামলাটি আহোমদেরকে চমকে দিলেও তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকে গুছিয়ে নিয়ে শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। তবে এটি কোন চূড়ান্ত বিজয় ছিল না। দুই মাইল এগিয়ে বুড়িটিকর পাহাড়ে পৌঁছতেই তারা আবারও হামলার মুখোমুখি হয়। এবারের হামলা ছিল আগেরবারের চেয়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী। বুড়িটিকরে হামলাকারিদের দখলে কিছু কাঠের দূর্গও ছিল। এসব দূর্গে আক্রমণের জন্য আহোমদের কাছে পর্যাপ্ত গোলা বারুদ ছিল না। তাই তারা বুড়িটিকরে যাত্রাবিরতি করল এবং নতুন রসদের অপেক্ষায় রইল। গোলা বারুদের নতুন চালান এসে পৌঁছলে তারা দূর্গগুলোতে হামলা চালাল। প্রতিরোধ যোদ্ধারা দূর্গ ছেড়ে পিছু হটল। তারা পাঁচ মাইল পিছু হটে বড়পানি নদীর তীরবর্তী তিনটি কাঠের দূর্গে অবস্থান নিল।

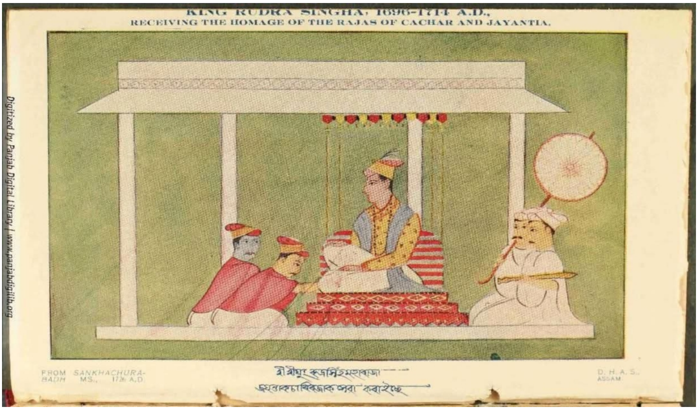
তবে এবার তারা আর আহোমদের উপর হামলা চালাল না। তারা বড়ফুকনের কাছে প্রস্তাব পাঠালো যে, যদি আহোমরা গোভায় ফিরে যায় তাহলে কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজকে তাদের হাতে তোলে দেওয়া হবে। বড়ফুকন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং হামলা চালিয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কাঠের দূর্গগুলো দখল করে নিলেন। এরপর আর আহোমদেরকে প্রতিরোধ করার মতো কেউ রইল না। জৈন্তিয়াবাসীর প্রতিরোধ যুদ্ধ বড়পানি নদীর তীরেই থেমে গেলো। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে কয়জন জৈন্তিয়াবাসী জীবন দিয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে বন্দীদের সংখ্যা জানা যায়। আহোমরা ১২ জন নেতৃস্থানীয় যোদ্ধা এবং ২০ জন সাধারণ যোদ্ধাকে বন্দী করেছিল। এছাড়াও তারা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ২০টি হাতিও জব্দ করেছিল। জৈন্তিয়াবাসীর প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষ হলে আহোমরা বিনা বাধায় জয়ন্তীপুরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পাভানিতে পৌঁছে বড়ফুকন খবর পেলেন যে, বড়বড়ুয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে ইতোমধ্যে জয়ন্তীপুর পৌঁছে গেছেন। এই সংবাদ আহোমদের আনন্দিত করল এবং বড় বড়ুয়ার বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তারা দ্রুতবেগে পা চালাল। জয়ন্তীপুর পৌঁছতে তাদের আর বেশি সময় লাগল না। আহোমদের জৈন্তিয়া বিজয় সম্পন্ন হলো। কিন্তু অনেক ঘটনা তখনও ঘটার বাকী ছিল।

তিন. জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের পরাধীনতা

বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকনের বাহিনীদ্বয় ১৭০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জৈন্তিয়া বিজয় সম্পন্ন করেছিল। এই বিজয় সংবাদ পেয়ে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফা আদেশ পাঠালেন যে, জৈন্তিয়াপতি ও কাছাড়ি রাজাকে তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক। জৈন্তিয়াপতির সঙ্গে তাঁর সকল রত্নসম্ভার, পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, হাতি এবং ঘোড়াগুলোকেও পাঠিয়ে দেওয়া হোক এবং তাঁর সকল ধনসম্পদ আহোম সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক। এই আদেশ কার্যকর করা হলো। জৈন্তিয়াপতি রামসিংহকে পার্বত্য পথে (জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে) আহোমরাজের কাছে পাঠানো হল। কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজকে কাছাড়ি রাজ্যের ভেতর দিয়ে মাইবং এর পথে আহোমরাজের কাছে পাঠানো হল। আহোমরাজ ঘোষণা দিলেন যে, জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যকে আহোমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। সিলেটের মোগল ফৌজদার মতিউল্লাহ খান বাহাদুরের কাছে দূত পাঠিয়ে এই সংবাদটি জানানো হয়েছিল। ১৭০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আহোমরাজ এই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন। শুধু ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না।

জৈন্তিয়াবাসীদেরকে বশে রাখার জন্য তিনি সামরিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করলেন। বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকনের নেতৃত্বাধীন দখলদার সৈন্যদলের একটি অংশকে স্থায়ীভাবে জৈন্তিয়ায় মোতায়েন করলেন। আহোমরাজের এসব কর্মকাণ্ড জৈন্তিয়াবাসীদেরকে ক্রুদ্ধ করল। অতীতেও জৈন্তিয়ার কোন কোন রাজা প্রতিবেশী রাজ্যের সেনাবাহিনীর কাছে হেরেছিলেন। কিন্তু সেসব বিজয়ীরা এভাবে রাজ্যটিকে জবরদখলের চেষ্টা করেনি। জৈন্তিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদাররা শুরু থেকেই রাজা রামসিংহকে তাঁর ভুল কাজগুলো থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তারা রাজাকে রাজী করিয়েছিলেন। বিষয়টিকে নিষ্পত্তি করার জন্য তারা রাজাকে আহোম সেনাপতি বড় বড়ুয়ার শিবিরেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আহোম সেনাপতি বড়বড়ুয়া এবং আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার পদক্ষেপগুলো তাদেরকে হতাশ ও ব্যথিত করল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদাররা চেয়েছিলেন জৈন্তিয়াপতির হাত থেকে কাছাড়ি রাজার মুক্তি। কিন্তু দেখা গেলো, এবার উভয় রাজাই বন্দী হয়ে গেছেন এবং উভই রাজ্যেরই স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্যার এডওয়ার্ড তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “These measures caused the greatest possible irritation amongst the Jaintia nobles. They had been quite willing to permit the rescue of the Kachari king, but they were not prepared to allow their own ruler to be carried off and their independence to be subverted without a far more strenuous resistance than they had yet attempted; and they induced the Bar Dalai, the Raja of Khiram, and the inhabitants of two hundred Khasi villages to join them in a supreme effort to expel the invaders.”



চিত্রঃ আহোম রাজ্যের রাজকীয় নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত একটি ঐতিহাসিক ছবি। ছবিতে আহোমরাজ রুদ্র সিংহকে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। তাঁর সামনে বসে আছেন জৈন্তিয়ার রাজা প্রথম রামসিংহ ও কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণ। আসামের গুয়াহাটিতে ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ব বিভাগে (DHAS) এই ছবিটি সংরক্ষিত আছে।

চার. জৈন্তিয়াবাসীদের প্রতিরোধ যুদ্ধ

জৈন্তিয়ার রাজাকে জৈন্তিয়াবাসীরা তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক মনে করতো। তাই রাজা রমসিংহের বন্দীদশায় তারা বিচলিত হলো। তদুপরি জৈন্তিয়ায় আহোম সৈন্য মোতায়েন এবং রাজ্যটিকে আহোমের অঙ্গীভূত করায়

জৈন্তিয়াবাসীরা আরও উত্তেজিত হল। যেকোন মূল্যে রাজ্যের স্বাধীনতা উদ্ধারে তারা রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদারদের নেতৃত্বে একাট্টা হল। যেহেতু জৈন্তিয়াবাসীরা নিজেদের শক্তি দিয়ে আহোমদের সাথে পেরে উঠছিল না সেহেতু তারা তাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের দ্বারস্ত হল। খাসিয়া পাহাড় জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি ছিল স্বাধীন খাসিয়া সরদারদের অধীনস্থ অঞ্চল। এসব খাসিয়া সরদাররা জৈন্তিয়ার মিত্র ছিলেন। সাধারণ খাসিয়ারাও জৈন্তিয়াবাসীদেরকে তদের বন্ধু মনে করতো। জৈন্তিয়াবাসীদের বিপদ হলে খাসিয়ারা এসে পাশে দাঁড়াতো। আহোমদের হাত থেকে জৈন্তিয়ার স্বাধীনতা উদ্ধারে খাসিয়ারা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। খাসিয়া পাহাড়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী সরদার ছিলেন খাইরমের সরদার। তিনি জৈন্তিয়াবাসীদের পক্ষে দাঁড়ালেন।

দুইশত খাসিয়া পল্লীর অধিবাসীরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে জৈন্তিয়াবাসীদের পক্ষে লড়াইয়ে যোগ দিল। নতুন করে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হল। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জৈন্তিয়ার রাজাকে উদ্ধার করা। ওই সময়ে রাজা রামসিংহকে জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গোভায় নেওয়া হচ্ছিল। আহোম সৈন্যদের একটি বড়সড় দল তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এই দলকে আক্রমণ করে কাবু করা বেশ কঠিন কাজ হবে বলেই মনে হচ্ছিল। তাই প্রতিরোধ যোদ্ধারা এদের সাথে সংঘাতে গেল না। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হল জৈন্তিয়া পাহাড়ে স্থাপিত আহোমদের দূর্গসমূহ। আহোম সেনাপতি বড়ফুকন যখন জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে জয়ন্তীপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন স্থানে স্থানে এসব দূর্গ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। পাহাড়ি পথে তিনি মোট আটটি দূর্গ স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে তিনটি দূর্গ প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হস্তগত হলো। দূর্গের সৈন্যদেরকে তারা মেরে ফেলল। বাকি দূর্গগুলোর রক্ষীরা প্রাথমিকভাবে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেও খাদ্য ও গোলা বারুদের অভাবে তারা একসময় পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলো।

আহোমদের একটি ক্ষুদ্র দল পাহাড়ি পথে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর ধাতব মূর্তি নিয়ে যাচ্ছিল।[34] প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আক্রমণে এরা মূর্তি ফেলে পালিয়ে যায়। মূর্তি

---

[34] অতীতে রাজা যশোমানিক কোচবিহার থেকে এই মূর্তিটিকে জৈন্তিয়ায় নিয়ে এসেছিলেন। আহোমরা এটি লুট করে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কাছ থেকে এটি পুনরায় জৈন্তিয়াবাসীর হস্তগত হয়।

বহনকারী দল এবং বিভিন্ন দূর্গের যেসব সৈন্যরা প্রাণে বেঁচেছিল তারা নারতুং-এ জড়ো হয়। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তারা গোভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের পিছু ছাড়ল না। আহোম সৈন্যদের এই দলটি যাত্রাপথে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মারাত্মক আক্রমণের শিকার হলো। দলটির সেনা কর্মকর্তারা শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। সৈন্যদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ায় তারা শৃঙ্খলা ভেঙ্গে এলোপাথাড়ি পালাতে শুরু করল। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হলো। খুব অল্পসংখ্যাক সৈন্যই পালিয়ে যেতে পেরেছিল। পালিয়ে গিয়ে তারা আশ্রয় নিলো সরুপানিতে। সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করল আহোম সৈন্যদের সেই বড়ো দলটি যারা জৈন্তিয়ার রাজাকে নিয়ে গোভার দিকে যাচ্ছিল।

পাঁচ. বিদ্রোহ দমনে আহোমদের প্রচেষ্টা

জৈন্তিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলে আহোম সৈন্যদের বিপর্যয়ের পর আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফা নতুন করে সৈন্য পাঠালেন। সেনাপতি বুড়া গোসাঁইয়ের নেতৃত্বে চার হাজার আহোম সৈন্যের একটি দল দিমারায় মোতায়েন করা ছিল। এই দলটি জৈন্তিয়া পাহাড়ের বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে গেলো। আরও অনেক আহোম সৈন্য বিদ্রোহ দমনে যোগ দিল। নবশক্তিতে বলিয়ান হয়ে আহোমরা প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে দমনের চেষ্টা করল। কিন্তু এতে খুব একটা লাভ হলো না। গেরিলা যুদ্ধে অভিজ্ঞ প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে পরাজিত করা আহোমদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে উঠল। প্রতিরোধ যোদ্ধারা আহোমদের আক্রমণের মুখে পালিয়ে যেতো। তাদেরকে খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে আহোমরা যখন ছাউনির দিকে ফিরে চলতো ঠিক তখনই তারা ঝড়ের বেগে হাজির হতো এবং ভয়ংকর পাল্টা হামলা চালাতো। এমন কৌশলের কারণে আহোমদের বিজয় অর্জন করা কঠিন হয়ে ওঠে। উপায়ান্তর না পেয়ে তারা কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। নারতুং এর চারপাশের অনেকগুলো গ্রাম তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে। এসব গ্রাম প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল ছিল। আহোমরা গ্রামগুলোর সকল বাড়িঘর ধ্বংস করে ফেলে এবং সকল গবাদী পশুকে হত্যা করে। কিন্তু এতেও বিজয় অর্জন হলো না।

জৈন্তিয়া পাহাড়ের প্রবল প্রতিরোধের সংবাদ পেয়ে সমতলে অবস্থানরত আহোম সেনাপতি বড়বড়ুয়া এবং বড়ফুকন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সমতলের

নিকটবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলকে অর্থাৎ জৈন্তিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী অংশকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। এই পরিকল্পনাটি সফল হল। জৈন্তিয়া সমতলে যেসব আহোম সৈন্য অবস্থান করছিল তাদের একটি অংশ পাহাড়ে প্রবেশ করে অভিযান শুরু করল। তারা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাত থেকে দুটি দূর্গ উদ্ধার করল। এগুলো ছিল বড়ফুকন কর্তৃক স্থাপিত আটটি দূর্গের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষিণের দুটি দুর্গ। কিন্তু এতেও প্রতিরোধ যুদ্ধ থামল না। জৈন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে প্রতিরোধ চলতে থাকলো। আহোম সেনাপতিদের বুঝতে দেরী হল না যে, এরকম বৈরী মনোভাবাপন্ন রাজ্যবাসীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাদেরকে ক্রমাগত যুদ্ধের মধ্যেই লিপ্ত থাকতে হবে। রাজ্যটির কেবল অধিবাসীরাই নয়, রাজ্যটির প্রকৃতিও আহোমদের জন্য বেশ প্রতিকূল ছিল। সেনাপতিরা ভেবে দেখলেন, বর্ষাকাল শুরু হলে রাজ্যটি তাদের জন্য চরম বিপদসংকুল হয়ে উঠবে। তাই তারা বর্ষাকালে এই রাজ্যটিতে অবস্থান করার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। বড়বড়ুয়া এবং বড়ফুকন বর্ষার আগমনের পূর্বেই তাদের বাহিনী নিয়ে গোভায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ছয়. আহোমদের ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রস্থান

আহোম সেনাপতি বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকন জৈন্তিয়া ছেড়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন বটে কিন্তু তা শান্তিপূর্ণভাবে কার্যকর করলেন না। ফিরে যাওয়ার পূর্বে তারা অবাধ্য জৈন্তিয়াবাসীকে উচিৎ শিক্ষা দিতে চাইলেন। জৈন্তিয়ার রাজধানী এবং এর চারপাশের গ্রামগুলোকে তাদের সৈন্যরা ধ্বংস করলো। সৈন্যদের তরবারির আঘাতে রাজধানী ও গ্রামগুলির এক হাজার অধিবাসী প্রাণ হারালো। এই নির্মমতায় ক্রুদ্ধ হয়ে জৈন্তিয়াবাসীরা আহোমদের উপরে হামলা করলেও তা ব্যর্থ হলো। জৈন্তিয়া সমতলের দুটি স্থানে আহোম সৈন্যদের অবস্থান ছিল- রাজধানী জয়ন্তীপুর এবং মুলাগুল। উভয় স্থানেই ক্রুদ্ধ জৈন্তিয়াবাসীরা তাদের উপর হামলা চালায়। তবে তারা এসব হামলা প্রতিহত করে এবং হামলাকারিদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। এরপর তারা জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে (যে পথে বড়ফুকন জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন) গোভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যাত্রাপথে তারা আর কোন আক্রমণের শিকার হয়নি। প্রচুর জীবনহানী ও ক্ষয়ক্ষতির পরে কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল ছাড়াই আহোম সৈন্যদের জৈন্তিয়া অভিযান এভাবেই সমাপ্তি লাভ করল।

আহোম সৈন্যদের এমন প্রত্যাবর্তনে আহোমরাজ ক্রুদ্ধ হলেন। ব্যর্থ অভিযানের জন্য তিনি উভয় সেনাপতিকে শাস্তি দিতে চাইলেন। তবে অভিজাতদের মধ্যস্থতায় তিনি শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। জৈন্তিয়াবাসীদের প্রতিরোধ যুদ্ধে আহোমদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের ২৩৬৬ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে ১২ জন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাও ছিলেন। তাদের প্রতিপক্ষ দলের এতো যোদ্ধা নিহত হয়নি (আহোমদের ধ্বংসযজ্ঞের সময়ে নিহত এক হাজার জৈন্তিয়াবাসীর কথা বাদ দিলে)। তবে জৈন্তিয়ার প্রায় ৭০০ যোদ্ধা আহোমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। অভিযানের সময় ৩টি কামান, ২২৭৩টি বন্দুক, ১০৯টি হাতি এবং ১২,০০০ মুদ্রা আহোমদের হস্তগত হয়েছিল। মুদ্রাগুলো ছিল মোগল সাম্রাজ্য, আহোম, কোচবিহার এবং জৈন্তিয়া রাজ্যের। সোনা, রূপা এবং অন্যান্য ধাতুনির্মিত কিছু তৈজসপত্রও আহোমদের হস্তগত হয়। আহোমদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে কিছু গহনাও ছিল। কিছু আহোম সেনা-কর্মকর্তা সেগুলো আত্মসাৎ করেছিলেন। পরে তাদেরকে চিহ্নিত করা হলে তারা সেগুলো ফেরত দিতে বাধ্য হন।

সাত. জৈন্তিয়াপতির জীবনাবসান

আহোমদের জৈন্তিয়া অভিযান শেষ হলে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফা বিজয়পুর থেকে তাঁর শিবির সরিয়ে নিয়ে সালা-তে স্থাপন করেন। জৈন্তিয়ার রাজা প্রথম রামসিংহ এবং কাছাড়ি রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণকে তখন বিশ্বনাথের নিকটবর্তী দুটি আলাদা শিবিরে রাখা হয়েছিল। ১৭০৮ সালের এপ্রিল মাসের আলাদা দুটি দিনে আহোমরাজ কাছাড়ি রাজা ও জৈন্তিয়াপতিকে নিজ শিবিরে অভ্যর্থনা জানান। প্রথমে কাছাড়ি রাজাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাজকীয় সম্মান দিয়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি প্রথমে বিশ্বনাথ মন্দিরে যান। সেখান থেকে একদল আহোম সৈন্য তাকে দিমারায় নিয়ে যায়। দিমারায় গিয়ে তিনি নিজের লোকজনদের দেখা পান এবং তাদের সঙ্গে নিজ ভূমিতে ফিরে যান।

কাছাড়ি রাজার পরে জৈন্তিয়াপতিকে আহোমরাজের শিবিরে অভ্যর্থনা জানানো হয়। একটি রাজকীয় বজরা নৌকায় করে তাকে ব্রহ্মপুত্র পার করানো হয়। নৌকা থেকে নামিয়ে তাকে একটি হাতির পিঠে তোলা হলো এবং সোনার হাওদায় বসানো হলো। হাতি চলল আহোমরাজের শিবিরের দিকে। শিবিরের

কাছে পৌঁছার পর তাকে হতির পিঠ থেকে নামিয়ে ঘোড়ায় চড়ানো হল। ঘোড়া চলল রাজকীয় তাবুর দিকে। সোনা-রূপার খুঁটির উপর নির্মিত এই তাবুটি ছিল আহোমরাজের দরবার। জৈন্তিয়াপতি পায়ে হেটে দরবারে প্রবেশ করলেন এবং নতজানু হয়ে আহোমরাজকে সম্মান জানালেন। বড়বড়ুয়া দরবারে উপস্থিত অভিজাতদের সামনে জৈন্তিয়াপতির পরিচয় তোলে ধরলেন। আহোমরাজ জৈন্তিয়াপতিকে তাঁর আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন এবং তাকে সম্বোধন করে একটি ভাষণ দিলেন। এরপর জৈন্তিয়াপতিকে জানানো হলো যে, যদি তাঁর রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদাররা আহোমরাজের কাছে নতি স্বীকার করেন তাহলে তাকে নিজ রাজ্যে ফিরতে দেওয়া হবে। এরপর দরবার সমাপ্ত করা হলো।

জৈন্তিয়াপতিকে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আহোমরাজ কী শর্ত দিয়েছেন সেটি জানিয়ে জৈন্তিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সরদারদের কাছে বার্তা পাঠানো হল। কিন্তু তারা সশরীরে আহোমরাজের সামনে উপস্থিত না হয়ে বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে, তারা আহোমরাজের কাছে নতি স্বীকার করেছেন। আহোমরাজ তাদের এই নতি স্বীকারমূলক বার্তাকে যথেষ্ট মনে করলেন না। তাই তিনি জৈন্তিয়াপতিকে মুক্তি দিলেন না। এর কিছুদিনের মধ্যেই জৈন্তিয়াপতি ভয়াবহ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁর সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হলো না। কিন্তু রোগ থেকে তাঁর মুক্তি মিলল না। প্রচণ্ড অসুস্থ্য হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভাগিনেয় জয়নারায়ণ। তিনিও আহোমদের হাতে বন্দী ছিলেন। রামসিংহের মৃত্যুর পর আহোমরাজ জয়নারায়ণকে আর বন্দী করে রাখলেন না। তিনি মুক্তি পেলেন এবং নিরাপদেই জৈন্তিয়ায় ফিরলেন। আহোমের বুরুঞ্জী থেকে জানা যায়, আহোমরাজ জয়নারায়ণের দুই বোনকে বিবাহ করেছিলেন। এরপর আর উভয় রাজ্যের মধ্যে কোন বৈরীতা থাকেনি।

আট. মোগল-আহোম পত্র বিনিময়

আহোমদের জৈন্তিয়া অভিযানের সময়ে সিলেটের মোগল ফৌজদার মতিউল্লাহ খান বাহাদুর আহোমরাজের গুয়াহাটিস্থ[35] প্রতিনিধি বড়ফুকনের কাছে একটি

---

[35] তৎকালীন সময়ে গৌহাটির নাম ছিল গুয়াহাটি।

পত্র পাঠিয়েছিলেন। *আসাম বন্তির* প্রথম ভাগের ছাব্বিশ সংখ্যায় এই পত্রটির সন্ধান মিলে। পত্রে উল্লিখিত তারিখ ১৬২৯ শকাব্দের ১৫ মাঘ। এর মানে হলো, মতিউল্লাহ খান বাহাদুর খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৭০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে এই পত্রটি লিখেছিলেন। ওই সময়ে আহোম সেনাপতি বড়ফুকন জৈন্তিয়া অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন; গুয়াহাটি বা গৌহাটিতে আহোমরাজের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর থাকার কথা নয়। তাই বলা যেতে পারে, পত্রের প্রাপক বড়ফুকন আর সেনাপতি বড়ফুকন একক ব্যক্তি নন; এরা ছিলেন দুজন ভিন্ন ব্যক্তি। পত্রটি ছিল একটি প্রীতিপত্র। এতে জৈন্তিয়ার রাজা ও কাছাড়ি রাজার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

পত্রটি গৌহাটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন হৃদয়রাম সিপাই। তাঁর সাথে কিছু উপহারসামগ্রীও ছিল। এই উপহারসামগ্রীর একটি তালিকা পত্রের শেষে সংযুক্ত রয়েছে। পত্রের শুরুতে সংস্কৃত ভাষায় সম্মানসূচক সম্বোধন করা হয়েছে। এর পরে আহোম ভাষায় মূল পত্র লেখা হয়েছে। কিছু কিছু বাক্যাংশ বাংলা ভাষার সাথেও মিলে যায়। সিলেটি ভাষার কোন ব্যবহার পত্রে নেই। বড়ফুকন এই পত্রের জবাবে একটি প্রতিউত্তরও লিখেছিলেন। বড়ফুকনের পত্রবাহক এটি নিয়ে হৃদয়রাম সিপাইর সঙ্গে সিলেটে গিয়েছিল। আসাম বন্তির প্রথম ভাগের ছাব্বিশ সংখ্যায় মূল পত্রের সঙ্গে এই প্রতিউত্তরটিও সংযুক্ত রয়েছে। এই পত্রেও জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রের শুরুতে সংস্কৃত ভাষায় সম্মানসূচক সম্বোধন করা হয়েছে। এর পরে আহোম ভাষায় মূল পত্র লেখা হয়েছে। পত্রে উল্লিখিত তারিখ ১৬২৯ শকাব্দের ফাল্গুন মাস। এর মানে হলো, বড়ফুকন খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৭০৮ সালের মার্চ মাসে এই প্রতিউত্তরটি লিখেছিলেন।

আহোমরাজের গুরুহাটিস্থ প্রতিনিধি বড়ফুকনের কাছে শ্রীহট্টের ফৌজদার মতিউল্লাহ খান বাহাদুরের পত্র

স্বস্তি সৰ্ব্ব শাস্ত্রাভ্যাসাতি কুল দমন দলিত যশোৰাশি বিৰাজিতাশেষ বিবিধ গুণালঙ্কৃত স্বধৰ্ম্ম নিপুণ স্বকুল কমল প্ৰভাকৰ সুহৃজ্জনদন কুমুদ সমুন্নেষণ নৃপবৃন্দাৰ্চ্চিত মহামহত্তৰ মহোগ্ৰ প্ৰতাপেষু।

প্ৰত্যেভিপ্সাদ কোয়ং বৰ্ণ নিচয়সমিহসাত্মৈকং তৎসভাবতা মনুবেদ মিহেতৰং।

পৰঞ্চ সমাচাৰ এহি। প্ৰীতি পত্ৰ এথা আমি শুভক্ষণে পহুছিল। যেৰুপ নিমক হাৰাম জয়ন্তা ও কাছাৰীৰ কাৰণ লিখিলা সেৰুপ হৈব। প্ৰাচীন আমাৰ পিতা নবাব নাথুল খাঁ চিৰাজি কোচবেহাৰ ও ৰঙ্গামাটীর সূবা আছিলা, তাতে তোমাৰ ঠাই অধিক প্ৰীতি আছিল। এখন পত্ৰ পায় আমাৰ অন্তঃকৰণে অধিক প্ৰীতি উৎপন্ন হইল, পৰস্পৰ প্ৰীতি প্ৰতিপালন উচিত। আপনি লিখিয়াছিলা বামনিয়াৰ খাঁৰ যোগে ৰঙ্গামাটী পথক্ৰমে নবাব সঙ্গে প্ৰীতি হইয়াছে। এবে কাৰণ এইক্ৰমে আগত অধিক প্ৰীতি হইবে। অধিক প্ৰীতিতে অনেকৰুপ কাৰ্য হইবে। অল্পদিবস হয়, আমি এথা আসিয়াছি। থানাৰ কাৰ্যতে প্ৰবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগেৰ থানা দৃঢ় কৰিয়া সেই দিগেৰ থানাত ফৌজ পাঠাইতেছি। আব তোমাৰ মানুষৰ মুখহন্তে সমাচাৰ শুনিয়া প্ৰত্যুত্তৰ কহিয়াছি শুনিবা। আপনে লিখিছিলা দ্ৰব্যেৰ কাৰণ লিখিবাৰ; তাতো সকল দ্ৰব্যই প্ৰীতিৰ অধীন। এখন যে দ্ৰব্যেৰ কাৰণ থাকে তাকে লিখিবা। এখনে ভাল দ্ৰব্য উপস্থিত নহয়, কাৰণ উত্তম দ্ৰব্য না পাঠাইলাম। আৰ আমাৰ মানুষ পাঠাইতেছি, তাহাতে সকল গোচৰ হইবা। আমাৰ মনুষ্য শীঘ্ৰ বিদায় দিবা। এমত কৰিবা তোমাৰ আমাৰ মানুষ সৰ্ব্বদায়ে প্ৰেমপত্ৰ লৈয়া গতাগত কৰে, কুশলাদি বাৰ্ত্তায় সন্তোষ কৰে। এ জ্ঞাত কৰিলাম। কিমধিকং বিজ্ঞবৰেম্বিতি শঁক ১৬২৯ তাৰিখ ১৫ মাঘ।

এই চিঠিৰ লগত সন্দেশ আনিছিল- পটুকা+কাপৰ ১, পাগুৰি ১, শালকাপৰ ১ জোৰ, গুজৰাতি আতলকঞ্চ+১, এলচা+১, আতলঞ্চ+৫, মুঠত ১০ কাপৰ।

শ্ৰীহট্টের ফৌজদার মতিউল্লাহ খান বাহাদুরের পত্রের জবাবে বড়ফুকনের পত্র

স্বস্তি নিখিল কল্যাণ নিলয় নিজগুণানুৰঞ্জিত সকল সজ্জন মানস শ্যামলকুল কমল প্ৰকাশকাৰণ শ্ৰীযুত শ্ৰীহট্ট স্থানাদাৰম্প্ৰতি লেখন প্ৰয়োজনঞ্চ।

পূৰ্ব্ব সমাচাৰ এহি। তোমাৰ পত্ৰ সমাচাৰ পহুছিল। তাহাৰ শুনিয়া পৰম প্ৰসন্ন হৈলাম। আৰ তোমাৰ পিতা সমেত পূৰ্ব্বপ্ৰীতি স্মৰিয়া এইক্ৰমে অধিক প্ৰীতি হৈবে হেন যি লিখিছা এ বিশেষ কিন্তু পৰস্পৰ যেমতে প্ৰীতি হয় তেমন কৰিবা। আৰ জয়ন্তা ও কাছাৰিও আমাৰ ঠাই নিমকহাৰাম কৰিলেক। তাৰ কাৰণে ৰে তাৰে যে অবস্থা কৰিলেন তাহাক তুমি দেখিয়াছ। অতএব তোমাৰ মাঝে যেমন বিগড়ি নয় সেই কৰিবা। আৰ তোমাৰ আমাৰ মধ্যে সীমাৰ নিবদ্ধ এহি অদ্যাবধি জয়ন্তাৰ কছাৰীত অঠিক হৈল, তাহাত আমি অন্যবঢা নকৰিব ও

তুমিও সেই সীমাতে ৰহিবা; প্ৰীতি বাঢ়ে তাকে কৰিবা। অতস্পৰ উভয় তৰফেৰ কুশলাদি সমাচাৰ যেমনে গতাগত হুয়া থাকে, সেই কৰিবা। আৰ তোমাৰ পত্ৰ মনুষ্য সহিত আমাৰ মনুষ্য শীঘ্ৰে বিদায় দিবা। কিমধিকিং বিজ্ঞেয়মিতি শঁক **১৬২৯**। তাৰিখ ফাল্গুণ।

অধ্যায় ষোল
জয়নারায়ণের শাসনামল

(১৭০৮ সাল – ১৭৩১ সাল)

১৭০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে (আনুমানিক মে মাসে) জয়নারায়ণ আহোমদের কাছ থেকে মুক্তিলাভ করেন। এরপর তিনি জৈন্তিয়ার রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং রাজা রামসিংহের উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে বসেন। রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রথমেই মুদ্রা প্রস্তুত করার দিকে মনোযোগ দেন। আহোমরা প্রচুর মুদ্রা নিয়ে যাওয়ায় জৈন্তিয়ায় তখন মুদ্রা সংকট চলছিল। এই সংকট দূর করার জন্য জয়নারায়ণ নতুন মুদ্রা চালু করেন। জৈন্তিয়ার যেসব মুদ্রা ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তার মধ্যে এই মুদ্রাটিও রয়েছে। মুদ্রাটির একপাশে লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৩০' এবং অপর পাশে লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য'।

আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার সাথে জয়নারায়ণের সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। ১৭১৪ সালে সুখরুংফার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট ছিল। জৈন্তিয়ার সাথে আহোমদের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হওয়ার পরে আহোমরাজ মোগলানে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেছিলেন। জৈন্তিয়া এবং কাছাড়ি রাজ্য থেকেও এই সৈন্যবাহিনীতে লোক সরবরাহ করা হয়। জৈন্তিয়ার রাজা জয়নারায়ণ ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে আহোমরাজের বাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু ১৭১৪ সালের আগস্ট মাসে আহোমরাজ হঠাৎ করে অসুস্থ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করলে মোগলানের অভিযানটি রদ করা হয়।

প্রতিবেশী আহোমদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকলেও অন্যান্য প্রতিবেশী যেমন মোগলান ও কাছাড়ি রাজ্যের সাথে জয়নারাণের ভালো সম্পর্ক ছিল না। মোগলানের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল জৈন্তিয়ার অভ্যন্তরে মোগলদের ভূমি বন্দোবস্তের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজা জয়নারায়ণ মোগলানের ঢাকাদক্ষিণে আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং পরগনাটিকে তিনি দখল করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মোগলানের চারখাই পরগনাটিকেও দখল করেছিলেন। তাঁর শত্রুকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে তিনি কাছাড়ি রাজ্যেও অভিযান চালিয়েছিলেন।

এক. কাছাড়ি রাজ্যে অভিযান

১৭০৮ সালের এপ্রিল মাসে কাছাড়ী রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণ আহোমের বন্দীদশা মুক্তি পেয়েছিলেন। আহোমের বিশ্বনাথ থেকে কাছাড়ি রাজ্যের খাসপুরে ফিরে আসার পরপরই তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন এবং সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান। তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন তাঁর শিশুপুত্র শূরদর্প নারায়ণ। শূরদর্প মাত্র ৯ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় আহোমরাজ তাঁর রক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তাকে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন আহোম কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করেছিলেন। যখন তিনি কিছুটা বড়ো হলেন, একটি অদ্ভূত ঘটনাকে কেন্দ্র করে জৈন্তিয়াপতির সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়লেন। এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত *রাজমালা* গ্রন্থে। গ্রন্থটির তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, জৈন্তিয়ার রাজা জয়নারায়ণের সাথে কাছাড়ি রাজা শূরদর্প নারায়ণের বিবাদের উৎপত্তি হয় একটি জঘন্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

জঘন্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন জৈন্তিয়াপতির ভাই। তিনি স্বীয় ভাতিজির সঙ্গে নিষিদ্ধ প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার সামাজিক নিয়ম এবং রাজসভার বিধান অনুযায়ী এমন সম্পর্কের জন্য তাদের উভয়ের প্রাণদণ্ড ছিল নিশ্চিত ব্যাপার। তাই এমন পরিণাম এড়াতে তারা উভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলেন কাছাড়ি রাজ্যে। কাছাড়ি রাজা শূরদর্প নারায়ণ এই নিষিদ্ধ দম্পতিকে তাঁর রাজধানী মাইবং-এ আশ্রয় দিলেন। জৈন্তিয়াপতি এই পাপীষ্ঠ ও পাপীয়সীকে ফেরত চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কাছাড়ি রাজ্যে আক্রমণ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে জয়লাভ করলেন জৈন্তিয়াপতি। কাছাড়ি রাজধানী মাইবং তাঁর হস্তগত হলো। এই নগরীটি অতীতে আহোদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এরপর নগরীটির যতটুকু পুনর্গঠন হয়েছিল সেটুকু এবার জৈন্তিয়াপতির হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

এই পরাজয়ের পর কাছাড়ি রাজা শূরদর্প সমতলের খাসপুরে (পুরাতন নাম ব্রহ্মপুর) রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যে পলাতক দম্পতিকে নিয়ে এতো ঘটনা তারা অবশ্য নিরাপদেই বেঁচে রইলেন। জৈন্তিয়াপতি কাছাড় আক্রমণ করলে তারা একদল অনুচর নিয়ে দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় নেন। এরপর তারা নাগাদের শরণাপন্ন হন। পলাতক দম্পতি এবং তাদের অনুচররা নাগাদের

মধ্যেই মিশে যান। এই সংমিশ্রণের ফলে অঙ্গমী নাগা নামে একটি গোত্রের উদ্ভব হয়। অঙ্গমী নাগাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী তাদের সরদারদের আদি পিতামাতা হচ্ছেন ওই দম্পতি। এতে মনে হয় যে, দম্পতিটির মৃত্যুর পরে তাদের সন্তানই নতুন সরদার নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এভাবে একটি বংশানুক্রমিক ধারা সৃষ্টি হয়েছিল।

দুই. মোগলানের ঢাকাদক্ষিণে অভিযান

জৈন্তিয়া রাজ্যের সর্বদক্ষিণের রাজ বা পরগনা ছিল বর্ণফৌদ। এই পরগনার সাথে ছিল মোগলানের ঢাকাদক্ষিণ পরগনার সীমান্ত। রাজা জয়নারায়ণের আমলে ঢাকাদক্ষিণের মোগল শাসনকর্তা ছিলেন আমুড়ার দুর্লভ দাস সেনাপতি। তিনি খুব সম্ভবত একজন নায়েবে ফৌজদার ছিলেন। তিনি জৈন্তিয়ার সীমান্তবর্তী কিছু গ্রামের ভূমি মোগলানের লোকজনকে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। সীমান্ত লঙ্ঘনের এই ঘটনায় রাজা জয়নারায়ণ বেশ ক্রুদ্ধ হন। দুর্লভ দাস সেনাপতিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ঢাকাদক্ষিণ আক্রমণ করে বসেন। তাঁর সৈন্যরা সুরমা নদী অতিক্রম করে রণকেলী নামক স্থানে পৌঁছলে স্থানীয় মোগল বাহিনী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।[36] কিন্তু তাদের এই প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। রণকেলীর যুদ্ধে জৈন্তিয়ার সৈন্যদের হাতে দুর্বল মোগল বাহিনীর পরাজয়ের পর ঢাকাদক্ষিণ পরগনার নিয়ন্ত্রণ চলে আসে রাজা জয়নারায়ণের হাতে।

তিনি একজন সেনাপতিকে এই পরগনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। এই সেনাপতি আমুড়ায় বসবাস করতেন (তাঁর বংশধররা নিজেদেরকে ‘দাস সেনাপতির বংশধর’ হিসেবে পরিচয় দেন)। জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণের বারকুটে একটি গড় বা সেনাচৌকিও স্থাপন করেছিলেণ। এসব ঘটনা আনুমানিকভাবে ১৭১৯ সালের। আনুমানিকভাবে ১৭৪০ সাল পর্যন্ত ঢাকাদক্ষিণ ও চারখাই পরগনাদ্বয় জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ছিল। অদ্ভূত ব্যাপার হল, জৈন্তিয়ার হাতে ঢাকাদক্ষিণের পতনের পর পরগনাটিকে উদ্ধারের জন্য কোন মোগল বাহিনী এগিয়ে আসেনি। এর কারণ, মোগলানে তখন বিশৃংখলা চলছিল। ১৭১৭ সালে

---

[36] এই খণ্ডযুদ্ধের কারণেই ওই স্থানটির নাম ‘রণকেলী’ হয়েছে। মোগলানের লোকজনের কাছে স্থানটি প্রথমে ‘রণকেলীর স্থান’ হিসেবে পরিচিতি পেলেও পরে শুধু ‘রণকেলী’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। জায়গাটি এখনও এই নামেই পরিচিত।

মোগল সাম্রাজ্য থেকে সুবে বাংলা আলাদা হয়ে গিয়েছিল।[37] মোগল সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ নিজেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব ঘোষণার পর রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। এতে সিলেটের সাথে রাজধানীর দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া মুর্শিদকুলী খাঁ রাজ্য সংস্কার নিয়ে এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে, রাজ্যের দূরতম সীমান্তবর্তী সিলেটের ঢাকাদক্ষিণ হাতছাড়া হওয়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেখানোর মতো সুযোগ তাঁর হাতে ছিল না। তাই ঢাকাদক্ষিণ উদ্ধারের জন্য কোন মোগল বাহিনী এগিয়ে এলো না। জয়নারায়ণের মৃত্যু পর্যন্ত পরগনাটি তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর পরবর্তী রাজা বড়গোসাঁই প্রায় এক দশক ধরে এই পরগনাটি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। ১৭৪০ সালে আলীবর্দি খাঁ মোগলানের ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা থেকে একদল মোগল সৈন্য এসে পরগনাটিকে জৈন্তিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেছিল। তখন থেকে সেখানে আবারও মোগল রাজস্ব প্রশাসনের পরগনা-ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

তিন. মোগলানের চারখাইয়ে অভিযান

রাজা গৌড়গোবিন্দের আমলে শ্রীহট্ট শহরে হাটকেশ্বর শিব নামে এক প্রসিদ্ধ শিবের উপাসনা হতো। ১৩০৩ সালে মুসলমানদের হাতে গৌড় রাজ্যের পতন হলে গৌড়গোবিন্দ শ্রীহট্ট থেকে পালিয়ে কোন এক অজানা গন্তব্যে চলে যান। তখন থেকে হাটকেশ্বর শিবের রাজকীয় উপাসনা বন্ধ হয়ে যায়। অদ্ভূত ঘটনা হল, রাজা গৌড়গোবিন্দের পতনের চার শতক পরে মোগলানের চারখাই পরগনার সেনগ্রাম নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ দাবি করেন যে, তিনি জৈন্তিয়ার বর্ণফৌদ রাজের অন্তর্গত বড়হাওরে এই হাটকেশ্বর শিবকে খুঁজে পেয়েছেন। জৈন্তিয়ায় তখন রাজা জয়নারায়ণের শাসনকাল চলছে। তিনি হঠাৎ একদিন খবর পেলেন যে, মোগলানের সেনগ্রাম নিবাসী আগমবাগীশ উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ মহাদেব শিবের সন্ধান লাভের দাবি করেছেন। রাজা স্বচক্ষে এই শিবকে

---

[37] মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর থেকে মোগল সাম্রাজ্য একপ্রকার ভেঙ্গেই পড়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চল স্বাধীনভাবেই শাসিত হচ্ছিল। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তখন সুবাদারী মোগল শাসনের পরিবর্তে চলছিল নবাবী মোগল শাসন। বাঙলার ইতিহাসে এ আমলকে নবাবী আমল বলা হয়। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে এ নবাবী আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দেখার উদ্দেশ্যে একদল সৈন্যসহযোগে সেনগ্রাম গমণ করলেন। কথিত আছে যে, রাজা এই শিবকে স্থানান্তরের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এরপর তিনি আগমবাগীশকে এই শিবের সেবায়েত নিযুক্ত করেন এবং সেখানে একটি মন্দির বানিয়ে দেন। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়নি। মন্দিরটিকে জৈন্তিয়ার সীমানার ভেতরে নিয়ে আসার জন্য রাজা চারখাই পরগনাটিকে নিজের অধীনস্ত করে রেখেছিলেন (রাজা জয়নারায়ণের পরেও প্রায় এক দশক ধরে এই পরগনাটি জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ছিল)।

সেনগ্রামের বর্তমান অধিবাসীদের কাছ থেকে হাটকেশ্বর শিব উদ্ধারের যে গল্পটি পাওয়া যায় সেটি হল: আগমবাগীশের একটি গাভী ছিল। গাভীটি প্রতিদিনই নদী পার হয়ে জৈন্তিয়ার বড়হাওরে চলে যেতো। সারাদিন ঘাস-পাতা খেয়ে সেটি আবার নিজে নিজেই ফিরে আসত। একদিন গরুটি বাড়িতে ফিরল না। পরের দিন আগমবাগীশ গাভীটির সন্ধানে বড়হাওরে গেলেন। সেখানে তিনি এক অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলেন। তিনি দেখলেন যে, জঙ্গলের মধ্যে গাভীটি হাটকেশ্বর শিবের ওপর দুগ্ধবর্ষণ করছে। এরপর তিনি শিবশিলাটিকে কোলে তোলে নিয়ে চলে আসলেন নিজের গ্রামে। গ্রামে প্রবেশের পূর্বে তিনি স্নান করতে নামলেন নদীর জলে আর হাটকেশ্বর শিবকে বসিয়ে রাখলেন নদীর পাড়ে। এরপর কিছু অলৌকিক ঘটনার পর নদীর পাড়ের ঐ স্থানেই শিবশিলাটির পূঁজা শুরু হয়। হাটকেশ্বর শিব আবিষ্কারের এই ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হলে জৈন্তিয়ার রাজার কানেও খবরটি পৌঁছে যায়। রাজা জয়নারায়ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সেনগ্রামে আগমন করেন। রাজার আগমনে আগমবাগীশ কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। তিনি রাজাকে প্রস্তাব দিলেন যে, মহারাজ চাইলে হাটকেশ্বর শিবকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু রাজা জয়নারায়ণ শিবলিঙ্গটিকে স্থানান্তরের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এরপর তিনি আগমবাগীশকেই এর পূজক নিযুক্ত করে চলে যান।

এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের *মোসলমান প্রভাব জয়ন্তীয়া* খণ্ডে লিখেছেন, "এই শিব রাজা জয়নারায়ণের সময়ে আগমবাগীশ কর্তৃক সেনগ্রামে নীত হইলে, রাজা তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্য সেনগ্রামে আগমন করেন। চূড়খাই সম্ভবতঃ তৎকালেই জয়ন্তীয়া রাজ্যের অধীন করা হয়। জয়ন্তীয়ার শেষ নৃপতি রাজেন্দ্র

সিংহের সময় পর্যন্ত ইহা জয়ন্তীয়ার অধীন ছিল।[38] সেনগ্রামে পৌঁছিয়া রাজা আগমবাগীশকে শিব আনয়নের বিষয়ে জিজ্ঞাসিলে তিনি ভীত হইলেন ও বলিলেন যে ইচ্ছা করিলে মহারাজ মহাদেবকে পুনঃ জয়ন্তীয়াপুরে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু শিব আর স্থানান্তরিত হইলেন না এবং আগমবাগীশকে তাঁহার সেবায়েত নিযুক্ত করা হইল।”

চার. জয়নারায়ণ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য

সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থে লিখেছেন, রাজা জয়নারায়ণ তাঁর ধর্মীয় গুরু মধুসুধন উপাধ্যায়কে সাতবাক পরগনার ঠাকুরের মাটি পশ্চিম মৌজা থেকে ৩২৬ বিঘা ভূমি দান করেছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজাদের ভূমি অনুদানের যতগুলো ঘটনার কথা জানা যায় তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরানো। ব্রিটিশদের প্রথম ভূমি বন্দোবস্তের সময়েও এই অনুদানটিকে বহাল রেখে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৪১ সালের ২৪ জুন সিলেটের ব্রিটিশ কালেক্টর ওই ভূমিকে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। রাজা জয়নারায়ণ মধুসুধন উপাধ্যায়কে জয়ন্তাপুরী রাজ পরগনার লক্ষ্মীপ্রাসাদ মৌজা থেকেও ৪৬ বিঘা ভূমি দান করেছিলেন।

জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যে পুনরায় ‘হাট-বাট’ অর্থাৎ বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু করার অনুরোধ জানিয়ে রাজা জয়নারায়ণ তাঁর দূত রঘুনাথকে আহোমরাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আহোমের বুরুঞ্জী থেকে জানা যায়, জয়নারায়ণের সময়ে জৈন্তিয়া বেশ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ১৬৪৫ শকাব্দের (১৭২৩ সাল) আশ্বিন মাসে উভয় রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য চালু করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি আরেকজন দূতকে আহোমরাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই দূতের নাম ছিল ধেমেলীয়া। আহোমরাজের উপহার হিসেবে ধেমেলীয়া তিনটি হাতি ও দুটি ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যু হয়েছিল ১৭৩১ সালে।

---

[38] অচ্যুতচরণ চৌধুরীর এই দাবিটি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। চারখাই পরগনাটি এতো দীর্ঘসময় ধরে জৈন্তিয়া রাজ্যের অধীনে থাকার কথা নয়। যতদূর অনুমান করা যায়, জয়নারায়ণের পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বড় গোসাঁইয়ের আমলে এটি আবার মোগলানের হাতেই চলে গিয়েছিল।

অধ্যায় সতেরো
দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের শাসনামল

(১৭৩১ সাল – ১৭৭০ সাল)

জয়নারায়ণের মৃত্যুর পরে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাগিনেয় বড়গোসাঁই। তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'দ্বিতীয় বড়গোসাঁই' নামে পরিচিত। ১৭৩১ সাল থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত একাধারে ৩৯ বছর তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল, কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই রাজা বড়গোসাঁই প্রায় চার দশক ধরে জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। এজন্য এই রাজাকে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় রাজা বলা হয়। যেসব রাজাদের আমলের মুদ্রা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর চালু করা দুটি মুদ্রা পাওয়া যায়; একটি পূর্ণমুদ্রা এবং একটি সিকিমুদ্রা অর্থাৎ চার আনা বা পঁচিশ পয়সা মূল্যমানের মুদ্রা। উভয় মুদ্রার গায়ে উল্লিখিত সালটি হচ্ছে ১৬৫৩ শকাব্দ (১৭৩১ সাল)।



চিত্র: রাজা দ্বিতীয় বড় গোসাঁইয়ের চালু করা পূর্ণমুদ্রা (কাটরা টাকা)। মুদ্রার এক পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য। অপর পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৫৩। শক মানে হল শকাব্দ।

এক. ১৬৫৩ শকাব্দের সিকিমুদ্রা ও পূর্ণমুদ্রা

জৈন্তিয়া রাজ্যের ধাতব মুদ্রাগুলোর গায়ে তরবারি বা কাটারির চিহ্ন আঁকা থাকতো। তাই এগুলোকে কাটরা টাকা নামে ডাকা হতো। ঐতিহাসিকরা এসব কাটরা টাকার কিছু নমুনা সংগহ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্যে রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের আমলের দুটি কাটরা টাকাও রয়েছে; একটি পূর্ণমুদ্রা এবং অপরটি এর সিকি ভাগ অর্থাৎ চার আনা বা পঁচিশ পয়সার মুদ্রা। পুরানো রীতির অনুকরণে রাজা বড়গোসাঁই রাজধানীর নামে পূর্ণমুদ্রাটি চালু করেছিলেন। কিন্তু সিকিমুদ্রাটি তিনি নিজের নামেই চালু করেছিলেন। এ ব্যাপারটি বেশ অভিনব। জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিজের নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁর চালু করা মুদ্রা দুটোর গায়ের লেখা নিম্নরূপ।

১৬৫৩ শকাব্দের পূর্ণমুদ্রা
এপিঠ: শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৫৩
ওপিঠ: শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য

১৬৫৩ শকাব্দের সিকিমুদ্রা
এপিঠ: শ্রীশ্রী রাজা বড়গোসাঁই
ওপিঠ: সিংহ বাহাদুরস্য ১৬৫৩

দুই. রাজা বড়গোসাঁইয়ের রাজ্যাভিষেকের সাল

রাজা বড়গোসাঁইয়ের চালু করা মুদ্রা দুটো থেকে তাঁর রাজ্যাভিষেক বা সিংহাসনারোহণের সাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।[39] মুদ্রা দুটো চালু হয়েছিল ১৬৫৩ শকাব্দ বা ১৭৩১ সালে। ওই বছরটিই রাজা বড়গোসাঁইয়ের রাজ্যাভিষেকের বছর- তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড গেইট বলেছেন, রাজা বড়গোসাঁইয়ের সিংহাসন লাভের দুই বছর পরেই হয়তো তাঁর

[39] চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী রাজ্যগুলোর একটি সাধারণ রীতি ছিল, রাজাদের চালু করা মুদ্রাগুলোতে তাদের সিংহাসনারোহণের শকাব্দ উল্লেখ করা হতো। জৈন্তিয়া রাজ্য এই রীতির বাইরে ছিল না। জৈন্তিয়ার যেসব কাটরা টাকার সন্ধান মিলেছে সেগুলোর প্রতিটির গায়েই শকাব্দের উল্লেখ রয়েছে।

রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং একারণে মুদ্রাও চালু হয়েছিল দেরীতে। *১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টের* তথ্যকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়েই তিনি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। গেইট সাহেব এই রিপোর্টটির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

১৮৩৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে জৈন্তিয়ার পতনের চার বছর পর সিলেটের ডেপুটি কালেক্টর জর্জ লক এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিলেন। এই রিপোর্টে তিনি জৈন্তিয়ার শেষ ছয় রাজার একটি বিবরণ যুক্ত করেছিলেন যাতে ওই রাজাদের সিংহাসন লাভের সালগুলোও উল্লিখিত ছিল। লক সাহেবের দেওয়া সালগুলো আর রাজাদের চালু করা মুদ্রার গায়ে উল্লিখিত সালগুলো হুবহু এক নয়। লক সাহেবের দেওয়া সালগুলো থেকে মুদ্রাগুলোর সাল এক বা দুই বছর করে পিছিয়ে আছে। স্যার এডওয়ার্ড গেইট লক সাহেবের দেওয়া সালগুলোকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে তিনি ওই সালগুলোর ভিত্তিতেই রাজাদের শাসনকাল নির্ধারণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সেটলমেন্ট রিপোর্টে দেওয়া সালগুলোর সাথে মুদ্রার সালগুলো সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মুদ্রাগুলো হয়তো রাজাদের সিংহাসনারোহণের স্মারক হিসেবেই চালু হয়েছিল। যদি মিস্টার লকের দেওয়া সালগুলো সঠিক হয় তাহলে বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, মুদ্রাগুলো চালু হতে দেরী হয়েছিল। রাজাদের অভিষেক অনুষ্ঠান স্তগিত হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে এই দেরীটা হয়েছিল। ...ব্যতিক্রমীভাবে, ১৭৮৫ সালে চালু করা একটি মুদ্রা রয়েছে যা এমন ব্যখ্যার ঊর্দ্ধে। হয়তোবা রাজা বিজয় নারায়ণ ১৭৮৬ সালের স্থলে ওই বছরেই সিংহাসনারোহণ করেছিলেন।"[40]

---

[40] The dates of Bar Gosain and his successors are given in a Jaintia Settlement Report which was written by Loch in 1939, and was found among the records of the Deputy Commissioner of Sylhet by Chandra Kanta Sen, who effected the settlement of 1897. I have followed the dates there given, except in the case of Bar Gosain, whose abdication is mentioned in a copper-plate inscription bearing a date equivalent to 1770 A.D. The dates do not in all cases correspond to those on the (anonymous) coins, which were presumably issued to mark the accession of successive kings. If the dates given by Loch are correct, the explanation may be that there

তিন. আহোমের সাথে বড়গোসাঁইয়ের সম্পর্ক

একবার খাইরমের সরদার সোনাপুর দুয়ার নামক পার্বত্য পথটি বন্ধ করে দেন। এই পথটি ছিল জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ। এই পথের বাণিজ্যে উভয় রাজ্যই লাভবান হতো। তাই রাজা বড়গোসাঁই আহোমের সহায়তায় এই পথটি চালু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই তিনি ১৭৫৭ সালে আহোমরাজের কাছে একজন দূত পাঠান। ওই দূত আহোমের হাজো মন্দিরের বারান্দায় আহোমরাজের সাথে দেখা করেন এবং তাকে সোনাপুর দুয়ার বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে অবহিত করেন। আহোমরাজ সাথে সাথেই এই পথটি খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে খাইরমে দূত পাঠান।

১৭৬৯ সালে রাজা বড়গোসাঁই একদল সৈন্য নিয়ে আহোম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই যাত্রায় পার্বত্য সরদাররাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। খুব সম্ভবত রাজার কাছে এই মর্মে একটি ভুল সংবাদ পৌঁছেছিল যে, জৈন্তিয়া আক্রমণের জন্য আহোমদের একটি বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে এবং ওই বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্যই রাজা পাহাড় ও সমতলের যোদ্ধাদের নিয়ে আহোম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থলে গিয়ে তারা দেখলেন যে, আহোম সৈন্যদের খুবই ক্ষুদ্র একটি দল রহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (এটি আহোম সৈন্যদের নিয়মিত চলাচলেরই অংশ ছিল)। এরপর রাজা তাঁর সৈন্যদেরকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসলেন। রাজা বড়গোসাঁইয়ের পুরো শাসনামলে জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যে কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়নি।

চার. জৈন্তিয়া–মোগলান মৈত্রীসম্পর্ক (১৭৪০ সাল)

---

was sometimes a delay in issuing the new coins, owing to the postponement of the coronation ceremony or for some other reason. The coins which were probably issued by Bar Gosain and Chatra Singh were dated two years, and those by Jatra Naryan and Ram Singh II one year, after the date of accession given by Loch. There is a coin bearing a date corresponding to 1785, which cannot be explained in this way. Possibly Bijay Narayan succeeded in this year and not in 1786. (*A HISTORY OF ASSAM*, 2nd Edition, Page 266)

রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের শাসনামলে জৈন্তিয়ার সাথে প্রতিবেশীদের সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ। রাজা বড়গোসাঁই তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের মতো কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াননি। তাঁর দীর্ঘ শাসনামলের ইতিহাসে কোন সত্যিকারের যুদ্ধের ঘটনা নেই। তবে ছোটখাটো কিছু সমস্যার কথা জানা যায়। ১৭৪০ সালে মোগলানের সাথে তাঁর যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মোগলানের সাথে জৈন্তিয়ার এই সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছিল তাঁর পূর্ববর্তী রাজা জয়নারায়ণের আমলে। আমুড়ার দুর্লভ দাস সেনাপতি কর্তৃক জৈন্তিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম দখলের ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে রাজা জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণ পরগনাটি দখল করে নিয়েছিলেন। তবে মোগলরা তখন জৈন্তিয়ায় আক্রমণ করেনি।

এমনকি ঢাকাদক্ষিণ উদ্ধারেও তারা কোন পদক্ষেপ নেয়নি। মূলত নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার কারণে মোগলানের শাসকরা তখন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের দিকে নজর দিতে পারেননি। অবশেষে ১৭৪০ সালে নবাব আলীবর্দি খাঁ মোগলানের নবাব হওয়ার পর রাজ্যকে সুসংহত করলেন ও সীমান্তবর্তী সমস্যাগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন। তাঁর ভাতিজা ও জামাতা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ ঢাকার নায়েবে নাজিম নিযুক্ত হওয়ার পরপরই সিলেটের ঢাকাদক্ষিণ উদ্ধারের জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। এ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন নওশেরওয়ান খাঁ। তবে ঢাকাদক্ষিণ উদ্ধারের জন্য নওশেরওয়ান খাঁ-কে কোন যুদ্ধ করতে হল না। শান্তিপ্রিয় রাজা বড়গোসাঁই বিনাযুদ্ধেই তাদের হাতে ঢাকাদক্ষিণ ছেড়ে দিলেন।

শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যাতে জৈন্তিয়া ও মোগলানের মধ্যে নতুন কোন বিরোধ সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি উভয়ের মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন। সন্ধিপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উভয় রাজপরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হল; ঢাকার নবাব নওয়াজিশের সাথে জৈন্তিয়ার রাজকুওরীর (রাজার বোন) বিবাহ সম্পন্ন হল।[41] জৈন্তিয়ার রাজকুওরীর নাম ছিল ভৈরবী কুয়ঁরী। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নওয়াজিশের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় জৈন্তিয়া ও মোগলানের

---

[41] এটি নওয়াজিশের দ্বিতীয় বিবাহ ছিল। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন নবাব আলীবর্দি খাঁ-র জ্যেষ্ঠ কন্যা মেহেরুন্নিসা উরফে ঘষেটি বেগম।

মধ্যে একটি কার্যকর মৈত্রীসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এসব ঘটনার সময়কাল ১৭৪০ সাল অথবা ১৭৪১ সাল। নওয়াজিশের সাথে ভৈরবী কুয়ঁরীর বিবাহের পর তাদের ঘরে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই সন্তানের নাম ফতেহ খাঁ।

পাঁচ. মোগলানের মুসলমানদের জৈন্তিয়ায় আগমন

রাজা বড়গোসাঁইয়ের ভগ্নিপতি, ঢাকার নবাব নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ ১৭৫৫ সালে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এর পরের বছর, ১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দী খাঁ-ও মারা যান। নওয়াজিশ এবং আলীবর্দি খাঁ-র মৃত্যুতে মোগলানে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়। আলীবর্দি খাঁ-র রাজ্যের হাল ধরার মতো কোন যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন না। তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিলেন না। তিন কন্যার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মেহেরুন্নিসা ওরফে ঘষেটি বেগম। এই মেহেরুন্নিসাই ছিলেন নওয়াজিশের প্রথম স্ত্রী। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। যদি তাঁর কোন পুত্রসন্তান থাকতো তাহলে সে-ই যে আলীবর্দি খাঁ-র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে সুযোগ না থাকায় তিনি পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর ছোটবোন মাইমুনা বেগমের পুত্র শওকত জঙ্গকে মনোনীত করলেন। এমনকি নওয়াজিশ খাঁ-ও তাঁর স্ত্রীর এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন।

কিন্তু আলীবর্দী খাঁ তাঁর জীবদ্দশায়ই কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পর প্রবল গৃহবিবাদের সৃষ্টি হয়। মেহেরুন্নিসা এবং শওকত জঙ্গ ছাড়াও আরও অনেকেই তাঁর বিরোধীতা করছিলেন। এসবের পরিণামে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে এবং মোগলানের স্বাধীনতার সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়ে যায়। মোগলানে শুরু হয় ব্রিটিশদের প্রবল দুঃশাসন ও বেপরোয়া শোষণ-লুণ্ঠন। ব্রিটিশ অধিকৃত মোগলানের অনেকেই তখন স্বাধীন রাজ্য জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান। এর কারণ, ব্রিটিশদের হাতে মোগলানের পতনে মুসলমানরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন।

১৭৬০ ও ১৭৭০ এর দশকে ব্রিটিশ অধিকৃত মোগলান থেকে যেসব মুসলমানরা জৈন্তিয়ায় হিযরত করেন তাদের মধ্যে তুর্কী, খোরাসানী, পারসীয়সহ মিশ্র জাতির লোকজনও ছিলেন। একককভাবে এদের সবাইকে মোগলান বলে

অভিহিত করা যায়। আনুমানিক ১৭৬৫ সালে প্রায় সাতশো জনের এক বিশাল কাফেলা মোগলান থেকে জৈন্তিয়ায় হিযরত করেন। এই দলে ছিলেন নওয়াজিশের বিধবা স্ত্রী ভৈরবী কুয়ঁরী, তাঁর পুত্র ফতেহ খাঁ এবং মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত দরবেশ ও নবাব পরিবারের ধর্মীয় উস্তাদ হযরত মোহাম্মদ কাশিম শাহ মুর্শিদাবাদী (রাহ.) প্রমুখ। আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দলে ছিলেন। রাজা বড়গোসাঁই এদের সবাইকে তাঁর রাজ্যে সাদরেই গ্রহণ করেন এবং তাদের বাসস্থান ও জীবিকার জন্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। কিছু লোককে রাজা উচ্চ পদেও বসিয়েছিলেন। এরা হলেন- ফতেহ খাঁ, পহহার খাঁ, সোনা খাঁ প্রমুখ।

ছয়. ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের ঘটনা (১৭৬৭ সাল)

১৭৬৫ সালে ভৈরবী কুয়ঁরী ও ফতেহ খাঁ জৈন্তিয়ায় চলে আসার পর রাজা তাদেরকে দেখে খুবই খুশী হয়েছিলেন। ভাগিনেয় ফতেহ খাঁ-কে তিনি অত্যাধিক স্নেহে নিজের কাছে টেনে নিলেন। এই তরুণ যুবককে তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ বিষয়দার অর্থাৎ সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেও উপযুক্ত পদে বহাল করা হল। একপর্যায়ে দেখা গেলো, রাজা কার্যতঃ পুরো রাজ্যভারই ফতেহ খাঁ-র কাঁধে তোলে দিয়েছেন; ফতেহ খাঁ-র পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন সিদ্ধান্তই নিচ্ছেন না। রাজসভাতেও ফতেহ খাঁ-র মতামত ছাড়া তিনি অন্য কারো মতামত শুনছেন না।

ফতেহ খাঁ-র হাতে রাজ্যের সকল ক্ষমতা চলে যাওয়ায় রাজসভার সদস্যদের একটি অংশ তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। তারা রাজাকে বোঝায় যে, ফতেহ খাঁ তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, কুচক্রীরা রাজাকে বোঝায় যে, ফতেহ খাঁ-র মসজিদের আযানের শব্দে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর মূর্তিটি মাটিতে পড়ে যায়। ওই সময়ে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর মূর্তিটি জয়ন্তীপুরে ছিল না। তাই এই বর্ণনাটি কতোটা সঠিক তা বোঝার উপায় নেই। তবে যাই হোক, কুচক্রীরা শেষ পর্যন্ত রাজাকে ভুল বুঝিয়ে ফতেহ খাঁ-র প্রাণনাশে সক্ষম হয়। রাজা তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফতেহ খাঁ-কে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। এই ঘটনা ১৭৬৭ সালের।

সাত. রাজা বড়গোসাঁইয়ের বন্দীদশা ও মুক্তি

খাসিয়া পাহাড়ের খাইরম পুঞ্জির সরদার বড়মাণিকের স্ত্রী ছিলেন ফতেহ খাঁ-র মাসী। তিনি ফতেহ খাঁ-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ফতেহ খাঁ তাঁর এই মাসীকে 'মা' বলে ডাকতেন। রাজা বড়গোসাঁইয়ের আদেশে ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং নিজের স্বামীর সহায়তায় ভাইয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। তাঁর স্বামী বড়মাণিক ছিলেন খুবই প্রভাবশালী একজন পাহাড়ি সরদার। খাসিয়া পাহাড়ের সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী পুঞ্জি খাইরমের সিয়েম হওয়ার সুবাধে তাঁর অনেক নিজস্ব সৈন্য ও লোকবল ছিল।[42] স্ত্রীর অনুরোধে তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে জয়ন্তীপুরে চলে আসেন এবং কৌশলে রাজাকে বন্দী করে নিয়ে খাইরমে চলে যান।

সেখানে একটি ছোটখাটো ঘরের ভেতর মাচাং এর উপরে রাজাকে বেঁধে রাখা হয় এবং মাচাং এর নিচে মরিচ পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়ে রাজার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে রাজসভার যেসকল সদস্য ফতেহ খাঁ-কে হত্যার চক্রান্তে জড়িত ছিল তারা রাজাকে উদ্ধারের লক্ষ্যে হিম্মত চেরা নামে এক লোককে নিযুক্ত করে। জয়ন্তীপুরের হিম্মত চেরা অল্প কয়েকজন লোককে নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে খাইরমে উপস্থিত হয় এবং রাজার প্রহরীদের সাথে ভাব জমিয়ে তোলে। এরপর সে তাদেরকে আফিম সেবন করিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে এবং রাজাকে নিয়ে খাইরমের পার্শ্ববর্তী চেরাপুঞ্জিতে পালিয়ে যায়।

আট. চেরাপুঞ্জির সিয়েম যাত্রাসিংহের সহায়তা

হিম্মত চেরা ও তাঁর লোকজন রাজা বড়গোসাঁইকে নিয়ে চেরাপুঞ্জিতে উপস্থিত হলে সেখানকার সিয়েম যাত্রাসিংহ (এডওয়ার্ড গেইটের বর্ণনায় তাঁর নাম অমর সিংহ) রাজার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।[43] তিনি রাজাকে নিরাপদে

---

[42] খাইরম পুঞ্জিটি জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত ১২টি পুঞ্জির কোনটি নয়। এটি জৈন্তিয়া পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত খাসিয়া পাহাড়ের একটি পুঞ্জি ছিল। খাসিয়া পাহাড়ের সরদারদের মধ্যে খাইরমের সরদারই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী।

[43] স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "There is a tradition that Bar Gosain and his sister Gauri Kuari were taken captive by the Siem, or chief, of Khairam, but escaped by the aid of men sent by Amar Singh, the Siem of Cherrapunji. Two villages in the Jaintia parganas are still held rent-

রাজধানীতে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু রাজা রাজধানীর নিকটে পৌঁছার পর ভেতরে প্রবেশ না করে পার্শ্ববর্তী ভিত্রিখেল গ্রামে অবস্থান নিলেন। ততোদিনে ফতেহ খাঁ সম্পর্কে তাঁর ভুল ভেঙ্গেছে। নিজের কৃতকর্মের জন্য তিনি মনে মনে অনুতপ্ত হচ্ছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি রাজকীয় মসজিদ না বানিয়ে দিয়ে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করবেন না। তাঁর আদেশে রাজধানীর বন্দরহাটিতে একটি বিশাল রাজকীয় মসজিদ নির্মিত হল।

এরপর তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। এবার কৃতজ্ঞতা আদায়ের পালা। চেরাপুঞ্জির সীয়েমকে রাজা দুটি বড় বড় গ্রাম উপহার দিলেন। আড়াইখা রাজের ফতেপুর গ্রাম এবং পিয়াইনগুল রাজের আঙ্গারজুর গ্রাম (এ দুটি গ্রাম যুগ যুগ ধরে চেরাপুঞ্জির সরদারের বংশধরদের লাখেরাজ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য ছিল এবং ব্রিটিশ আমলেও গ্রাম দুটি তাদেরই সম্পত্তি ছিল)। হিম্মত চেরাও রাজার কাছে প্রতিদান চাইল। রাজা তাকে একটি বাড়ি বানিয়ে দিলেন এবং জৈন্তাপুর হাটের পূর্বদিকে একটি বড়সড় পুকুরও খনন করে দিলেন। এসব ঘটনা ১৭৬৯ সালের। এসব ঘটনার পর রাজা আর বেশিদিন রাজ্য চালাননি।

নয়. রাজার অনুশোচনা ও বন্দরহাটি মসজিদ নির্মাণ

ফতেহ খাঁ-র প্রাণদন্ডের ঘটনার জেরে বন্দী হওয়ার পর রাজা বড়গোসাঁই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ফতেহ খাঁ-র ব্যাপারে তাকে ভুল ধারণা দেওয়া হয়েছিল- এই সত্য উপলব্ধির পর তাঁর প্রবল অনুশোচনা হচ্ছিল। তাই মুক্ত হওয়ার পর তিনি প্রথমেই নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন। তিনি পণ করলেন যে, ফতেহ খাঁ-র মসজিদের চেয়ে অনেকগুণ বড় আরেকটি

---

free by the chief of the latter State, and it is said that they were given to Amar Singh as a reward for his services on this occasion. The feud between Jaintia and Khairam seems to have been of long standing ; and it still existed at the time of the annexation of Jaintia in 1835." (এডওয়ার্ড গেইটের বইতে ফতেহ খাঁ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। তিনি রাজা বড়গোসাঁইয়ের বন্দী হওয়ার কোন কারণ উল্লেখ করেননি। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, চেরাপুঞ্জির সিয়েমের নাম ছিল। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, চেরাপুঞ্জির সিয়েমের নাম ছিল যাত্রাসিংহ। - লেখক)

মসজিদ না বানানো পর্যন্ত রাজধানীতে প্রবেশ করবেন না। যেই কথা সেই কাজ। রাজা রাজধানীর নিকটস্থ ভিত্রিখেল গ্রামের একটি অস্থায়ী আবাসে বসবাস করতে লাগলেন। এদিকে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র বন্দরহাটিতে একটি রাজকীয় মসজিদ নির্মাণের কাজ চলতে লাগল। এই বিশাল রাজকীয় মসজিদটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল প্রায় দুই বছর। আনুমানিকভাবে, ১৭৬৭ সালে রাজা বড়গোসাঁই এই মসজিদটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। আর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল ১৭৬৯ সালে। মসজিদটি পুরোপুরিভাবে নির্মিত হয়ে গেলে রাজা তাঁর অস্থায়ী আবাসস্থল ছেড়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন।

রাজধানীতে তখন হযরত কাশিম শাহের বাড়ির একটি অস্থায়ী মসজিদে নামায আদায় চলছিল। রাজা হযরত কাশিম শাহকে নতুন রাজকীয় মসজিদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। তখন অস্থায়ী মসজিদটির কার্যক্রম বন্ধ করে সেখানে কিতাবের দরসখানা চালু করা হল আর নতুন মসজিদে নামায আদায় শুরু হল। তখন থেকে আজ অবধি এই মসজিদটিতে নামায আদায় হচ্ছে। হযরত কাশিম শাহ ছিলেন এই মসজিদের প্রথম ইমাম ও খতিব। রাজা বড়গোসাঁইয়ের রাজত্বকালে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে এই মসজিদটিই শীর্ষস্থানীয়। আকৃতিতে বেশ বড় হওয়ায় ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মসজিদটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর বার বার সংস্কার ও নবনির্মাণের ফলে মূল মসজিদটি ক্রমশ বিলুপ্তি লাভ করে। বর্তমানে মূল মসজিদটির কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। ২০০০ সাল পর্যন্ত এর একটি দেওয়ালের কিছু অংশ টিকে ছিল। ওই বছরের সংস্কারকাজের সময় সেটুকুও বিলুপ্তি লাভ করে। মূল স্থাপনা পুরোপুরিভাবে হারিয়ে গেলেও মসজিদ হিসেবে বন্দরহাটি মসজিদই জৈন্তিয়ার সবচেয়ে পুরানো।

দশ. রাজার মানসিক বিপর্যয় ও ধর্মগুরুদের ভূমিকা

সেনাপতি ফতেহ খাঁ-কে প্রাণদণ্ড দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে জয়ন্তীপুরে একটি রাজকীয় মসজিদ নির্মাণের পরেও রাজা বড়গোসাঁইয়ের অনুশোচনা দূর হয়নি। তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। রাজ্য পরিচালনায় তাঁর আর কোন উৎসাহ ছিল না। রাজদরবারের কাজেও তিনি আর মন দিতে পারছিলেন না। সবকিছু থেকে দূরে সরে গিয়ে তিনি হযরত কাশিম শাহের কাছে কুরআন

শিখতে চাইলেন।[44] কোন কোন ঐতিহাসিকে মতে, রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে হযরত কাশিম শাহের কাছে কুরআন শেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি আর রাজ্য পরিচালনায় ইচ্ছুক ছিলেন না। এমতাবস্থায় প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী লীলাপুরী স্বামী জৈন্তিয়ায় আগমন করেন। তিনি রাজাকে রাজত্ব ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রাজা এই পরামর্শ মেনে সন্ন্যাস জীবনে চলে গেলেন। ১৭৭০ সালে তিনি ভাগিনেয় ছত্রসিংহের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়ের লখডং পুঞ্জিতে চলে যান। বাকি জীবন তিনি সেখানেই আধ্যাত্মিক সাধনা করে কাটিয়েছিলেন।

পাহাড়ে চলে যাওয়ার আগে রাজা বড়গোসাঁই হযরত কাশিম শাহ এবং লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে বিশেষ রাজকীয় মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। জৈন্তিয়ার নতুন রাজাকে মুকুট পরিয়ে অভিষিক্ত করেছিলেন এই দুজনেই। তখন থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যে এই নিয়মটি চালু হল যে, হযরত কাশিম শাহের পরিবার এবং লীলাপুরীর শিষ্যরাই নতুন রাজাদেরকে অভিষিক্ত করবেন। ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তাজা আলীর *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পরবর্তী যুগে হযরত কাশিম শাহের বংশধরদের মধ্যকার প্রধান ব্যক্তি এবং লীলাপুরী সন্ন্যাসীর শিষ্যদের মধ্যকার প্রধান ব্যক্তি নতুন রাজাকে মুকুট পরিয়ে অভিষিক্ত করতেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় তারা রাজার ডানপাশে বসতেন।[45] হযরত কাশিম

---

[44] ওই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান লিখেছেন, “কথিত আছে, অনুতপ্ত বড়গোসাঁই কাশিম শাহের নিকট কোরআন শরীফ শিখতে চেয়েছিলেন। তখন হিন্দু পুরোহিতগণ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। রাজা তখন মানসিকভাবে বিপর্য্যস্ত।” (*সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যায়-*সেনাপতি ফতেহ খাঁ*)

[45] “Bar Gossain began to learn the Quran from Kasim Shah. The Hindu notables apprehended that the Raja might embrace Islam and induced Lilapuri Sanyasi to come and settle in Jaintiapur. The king was initiated to asceticism by Lilapuri. At the time of the coronation, the descendants of Kasim Shah and the disciples of Lilapuri used to put the crown on the royal head. At the time of the installation they were given seats to the right of the king. All questions on Islamic Law were decided with the advice of the descendant of Kasim Shah.” (*The History of Jaintia*, Chapter: *Muslim Predominance*, Syed Murtaza Ali)

শাহের বংশধররা জৈন্তিয়ার রাজদরবারে ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি করতেন। একইভাবে লীলাপুরীর শিষ্যরাও রাজদরবারে বসে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন বিষয়ে শাস্ত্রীয় সমাধান দিতেন বলে শোনা যায়।

এগারো. লীলাপুরী সন্ন্যাসীর কালীমন্দির

১৭৭০ সালে রাজা বড়গোসাঁই সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। এর পূর্বে তিনি রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকের (১৫-২০ ফুট নিচুতে) খোলা জায়গায় একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের যেসব স্থাপনা আজও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে তার মধ্যে এই মন্দিরটি অন্যতম।[46] এটি একটি কালীমন্দির। ১৭৬৯-৭০ সালে এটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরে রাজা তাঁর ধর্মগুরু লীলাপুরী স্বামীর হাতে এর সেবায়েতের দায়িত্ব তোলে দিয়েছিলেন। মন্দিরের ব্যবস্থাপনাসহ সেবায়েতের ভরণ-পোষণের জন্য রাজা বেশ কিছু ভূমিও দান করেছিলেন। একটি তাম্রফলক বা তাম্রপত্রে এই ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই দলিলে রাজা বড়গোসাঁইয়ের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের কথা এবং তাঁর গুরু লীলাপুরী স্বামীর হাতে একটি মন্দিরের দায়িত্ব ও ১৯২ কেদার ভূমির ভোগ-দখলের অধিকার তোলে দেওয়ার কথা বেশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রফলকের এই দলিলটি ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছিল।

দলিলটির ভাষ্য অনুযায়ী, ১৬৯২ শকাব্দে (১৭৭০ সালে) রাজা বড়গোসাঁই তাঁর ধর্মগুরু শ্রী শ্রী লীলাপুরী স্বামীর মুখ থেকে পরমহংস মন্ত্র গ্রহণ করে সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করেন এবং ‘শ্রী শ্রীমদ রাজপুরী’ নামধারণ করেন। একই সাথে রাজা লীলাপুরীর হাতে একটি মন্দিরের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ওই মন্দিরের উপাসনাসহ অন্যান্য ধর্মীয় কাজের নিমিত্তে লীলাপুরীকে ১৯২ কেদার ভূমি প্রদান করেন। ১৯২৩ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* এই দলিলের পাঠোদ্ধারসহ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত দলিলটির ইংরেজি অনুবাদের কিছু অংশ হল:

---

[46] জৈন্তিয়া রাজ্যের টিকে থাকা স্থাপনাগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে উঁচু স্থাপনা। জৈন্তিয়া রাজবাড়ীর পশ্চিমপাশে অবস্থিত বর্তমান খেলার মাঠ বা স্টেডিয়ামের ঠিক দক্ষিণ পাশে এটি অবস্থিত। বর্তমানে এই মন্দিরটি অনেকটাই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে নিয়মিত কোন উপাসনা হয় না।

After having given a temple, he has made over one hundred and ninety-two Kedaras of land with all rights abandoned to his preceptor's feet for the maintenance of that (temple) as well as for pleasing his spiritual preceptor, Sri Sri Lilapuri. এই অংশটুকু হচ্ছে তাম্রফলকের দলিলটির ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম লাইনের ইংরেজি অনুবাদ।



চিত্র: লীলাপুরী সন্ন্যাসীর কালীমন্দির

কিছু ঐতিহাসিকের বর্ণনাতেও লীলাপুরী সন্ন্যাসীর কালীমন্দিরটির কথা উঠে এসেছে। শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন, "কথিত আছে, বড় গোসাঞির সময়ে নিজপাটের প্রসিদ্ধ কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হন। প্রাচীর বেষ্টিত বাটীকায় সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কালীর এরূপ মাহাত্ম্য ছিল যে, কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও কালী বাড়ীতে আশ্রয় লইতে পারিলে দণ্ড হইতে মুক্ত হইত। এই কালীর অর্চ্চনার জন্য লীলাপুরী নামক এক সন্ন্যাসী যুবককে নিযুক্ত করা হয়।" মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ তাঁর *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকে রাজা বড়গোসাঁই সম্পর্কে লিখেছেন, "ইহার পর নিজপাটের প্রসিদ্ধ কালীমুর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত ও সুন্দর বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং কালীর সেবা অর্চ্চনার জন্য লীলাপুরী নামক সন্ন্যাসীকে নিযুক্ত করেন।"

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় কালীমন্দিরটির চারপাশে একটি প্রাচীর ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্যের সত্যতা আজও মিলে। কালীমন্দিরের প্রাচীরের একাংশ আজও টিকে আছে। এমনকি প্রাচীরের গায়ের ফটকটিও টিকে আছে। একসময় এই মন্দিরের গায়ের একটি প্রস্থরফলকে 'কালীমন্দির' শব্দটি লিখা ছিল। বর্তমানে এই প্রস্থরফলকটি আর নেই। মন্দিরটির গায়ে কিংবা এর প্রাচীরের ফটকে কোন নামফলক না থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে এটি একটি নামবিহীন মন্দিরে পরিণত হয়েছে। কোন রাজা এটি বানিয়েছিলেন তা-ও এখন আর কেউ বলতে পারে না। তাই মন্দিরটিকে চিহ্নিত করতে গেলে পুরোপুরিভাবে যুক্তির উপরে নির্ভর করতে হয়। কিছু শক্তিশালী যুক্তির ভিত্তিতে এই মন্দিরটির পরিচয় নিশ্চিত করা যায়।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী 'প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির' খুঁজতে গেলে এই মন্দিরটিকেই পাওয়া যায়। জৈন্তিয়ার রাজবাড়ির প্রাচীরের ভেতরে একটি মন্দির রয়েছে। কিন্তু সেটি 'সুন্দর ও বৃহৎ' নয় এবং সেটি একটি পারিবারিক (রাজপরিবারের) মন্দির ছিল। জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রাচীরের ভেতরেও কোন বৃহৎ মন্দির কিংবা বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নেই। এই বাড়িটি ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রশাসনিক সদরদপ্তর। এখানে এমন একটি মন্দির নির্মাণের কোন সম্ভাবনা নেই যে মন্দিরের সীমানা প্রাচীরের অন্তর্ভুক্ত ভূমিটুকু একজন সেবায়েতের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি (দেবোত্তর) হবে। রাজবাড়ির ক্ষেত্রেও

একথাটি খাটে। জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্যান্য যতো মঠ-মন্দির কিংবা মঠ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেগুলোর কোনটি কীভাবে নির্মিত হয়েছিল তা বেশ স্পষ্ট। সেসবের মধ্যে রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক নির্মিত কালীমন্দিরের সন্ধান করার কোন সুযোগ নেই। এই মন্দিরটির সন্ধান রয়েছে এমন একটি মন্দিরের মধ্যে যা একটি 'প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির' এবং যা অন্য কোন মঠ-মন্দিরের নামে পরিচিত নয়। এমন মন্দির নিজপাটে একটিই রয়েছে। তাই এটিই সেই মন্দির।

বারো. রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্মৃতিবিজড়িত বড়ঘাট

১৭৭০ সালে রাজা বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যান। তিনি লীলাপুরী স্বামীর কাছ থেকে পরমহংস মন্ত্র গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় রাজপুরী সন্ন্যাসী। নীরবে-নিভৃতে বাকি জীবন কাটানোর জন্য তিনি পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়ের লখডং পুঞ্জির একটি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে এই গ্রামটি 'বড়ঘাট' নামে পরিচিত। গ্রামটির অবস্থান থিসাং নদীর (Wah Thisang) তীরে। রাজা বড়গোসাঁইয়ের নামের 'বড়' শব্দটি এবং নদীর ঘাটের 'ঘাট' শব্দ মিলিয়ে গ্রামটি বড়ঘাট নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তৎকালীন নদী-যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই গ্রামের একটি 'ঘাট' ব্যবহৃত হতো বলেই অনুমেয়। বর্তমানে এই গ্রামে সড়কপথে যাওয়া যায়। শিলং থেকে Amlarem হয়ে এই গ্রামের দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার। জোয়াই থেকে Lad Rymbai হয়ে এই গ্রামের দূরত্ব ৭১ কিলোমিটার। আর পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়ের খিলিয়েহরিয়াট থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার।

রাজা বড়গোসাঁই যখন এই গ্রামে পাড়ি দিয়েছিলেন তখন এখানে সিন্টেং জনগোষ্ঠীর পারাং (Parang) ক্ল্যানের লোকজন বসবাস করতো। বর্তমানে এখানে সিন্টেংদের রিম্বাই, সাচেন, লিংদহ ও সিউয়ার (Rymbai, Suchen, Lyngdoh, Swer) ক্ল্যানের লোকজনের বসবাস রয়েছে। তাদের প্রায় সকলেই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী (অতীতে তারা নিয়েমট্যানরাই ধর্মের অনুসারী ছিলেন)। তবে রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সনাতনী মন্দিরটি নিয়ে তারা বেশ গর্ববোধ করেন। স্থানীয়ভাবে এই মন্দিরটি 'সিয়েমের মঠ' (Mot Syiem) নামে পরিচিত। জৈন্তিয়ার রাজাদেরকে সিন্টেং জনগোষ্ঠীর লোকজন 'সিয়েম' বা

‘সিয়েম সুতংগা’ বলে ডাকতো। তাই বড়ঘাটে রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্থাপনাগুলোর নামের সাথে এই শব্দটি যুক্ত রয়েছে। সিয়েমের মঠ ছাড়াও রাজার হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন বাজারটিকে স্থানীয়রা ‘সিয়েমের ইয়েও’ (Iew Syiem) নামে ডাকেন। এছাড়াও কয়েকটি প্রাচীন পাথরকে তারা ‘সিয়েমের দিয়েংদু’ (Diengduh Syiem) নামে ডাকেন।



চিত্র: বড়ঘাটের মঠ সিয়েম

বড়ঘাটে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্মৃতি বিজড়িত মঠ-মন্দির, বাজার এবং প্রাচীন পাথর ছাড়াও তাঁর বাসস্থানের সামান্য অংশও টিকে আছে। এর অবস্থান থিসাং নদীর ঠিক পাশেই। জনশ্রুতি আছে যে, সুদূর অতীতের এক দানবীয় পাহাড়ি ঢলের তোড়ে এই বাসস্থানের উপরের অংশ নদীতে হারিয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার পর থেকে রাজার বাসস্থানের শুধু ভিত্তিটিই টিকে আছে। ‘সিয়েমের দিয়েংদু’ নামে পরিচিত পাথরগুলো নিয়েও স্থানীয়ভাবে কিছু অতিরঞ্জিত গল্প প্রচলিত আছে। এসব গল্প থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে ‘উ মার ফালিংকি’ নামের এক দানব এসব পাথর বহন করে বড়ঘাটে নিয়ে এসেছিল (জৈন্তিয়ার অন্যান্য স্থানের পাথরের সাথেও একই দানবের গল্প জড়িয়ে আছে)। রাজা

বড়গোসাঁইয়ের মঠ বা মন্দিরটি নিয়েও স্থানীয়দের মতে বিভিন্ন গল্প প্রচলিত আছে। *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া গ্রন্থের* লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী বড়ঘাটের স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জেনেছিলেন যে, একসময় এই মন্দিরে পাঠা বলি দেওয়ার প্রচলন ছিল।

রাজা বড়গোসাঁই বড়ঘাটে কতদিন বসবাস করেছিলেন তা জানার কোন উপায় নেই। তাঁর মৃত্যুর কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তবে বড়ঘাটের স্থাপনাগুলো দেখে মনে হয়, রাজা বেশ কিছুদিন সেখানে বসবাস করেছিলেন। বড়ঘাটের অধিবাসীরা সনাতন ধর্মাবলম্বী না হলেও তাদের জনগোষ্ঠীর সিয়েম হিসেবে তারা রাজাকে বেশ সম্মানের চোখেই দেখতেন। এখনও রাজার প্রতি তাদের এই সম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার মঠটিকে তারা একটি দর্শনীয় স্থানে পরিণত করেছেন। মঠের চারপাশে পর্যাপ্ত খোলা জায়গা রেখেই আবাসন গড়ে তোলা হয়েছে। মঠটিও নিয়মিত সংস্কারের ফলে বেশ অক্ষত অবস্থায়ই রয়েছে। জৈন্তিয়া রাজ্যের যতগুলো স্থাপনা এখনও টিকে আছে তার মধ্যে শুধু এই স্থাপনাটিই নির্মাণকালের কারুকাজ ধরে রাখতে পেরেছে। মঠের প্রবেশদ্বার, দেয়াল, ছাদ ও ভেতরের পাঠা বলির বেদির গায়ের বিভিন্ন কারুকাজ এখনও পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প এই স্থাপনাটির কোন ক্ষতি করেনি বলেই মনে হয়।

অধ্যায় আঠারো
জৈন্তিয়ায় মুসলমানদের আগমন

১৭৬৫ সালে ব্রিটিশরা বাংলার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করে এবং বাংলার অধিবাসীদের উপর ঔপনিবেশিক শোষণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। যদিও তারা দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায়িত্ব পালনের জন্য অনেক পুরাতন মোগল কর্মচারীকে বহাল রেখেছিল তাতে বাংলার অধিবাসীদের তেমন কোন লাভ হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা বাংলার মানুষের গলায় অর্থনৈতিক শোষণের ফাঁস পরিয়ে দেয়। দেওয়ানী লাভের পরের বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ৬৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৭ লক্ষ টাকায় উন্নীত করে। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ তারা উত্তরোত্তর বাড়াতেই থাকে। কোম্পানির এই ভয়াবহ রাজস্ব লুণ্ঠন নীতি বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে দেয়। জনজীবনে প্রবল দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। দারিদ্রতা ক্রমশ দুর্ভিক্ষের দিকে ধাবিত হয়। ১৭৭০ সালে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে মারা যায়। এটিই বাংলার সর্বকালের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মনন্তর' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটেও ব্রিটিশরা রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে এখানকার অধিবাসীরা শুরু থেকেই ব্রিটিশ শাসনকে ভালো চোখে দেখেননি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনতাকে তারা পরাধীনতাই মনে করতেন।

এক. বিভিন্ন সিলেটি পরিবারের জৈন্তিয়ায় আগমন

১৬১২ সালে সিলেটে মোগল শাসনের সূচনা হয়। তখন সিলেটের কিছু পাঠান পরিবার জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। আনুমানিক ১৭১৯ সালে এক মোগল কর্মচারী কর্তৃক জৈন্তিয়ার বর্ণফৌদ রাজস্থ কিছু ভূমি দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জৈন্তিয়া-মোগলান সম্পর্কের অবনতি হয়। ১৭৪০ সালে এ সমস্যার সমাধান হয় এবং জৈন্তিয়া-মোগলান মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপিত হয়। মূলত তখন থেকেই জৈন্তিয়া রাজ্যে সিলেটের অধিবাসীদের বসবাসের পথ উন্মুক্ত হয়। তবে ১৭৪০ ও ১৭৫০ এর দশকে খুব বেশি মানুষ সিলেট থেকে জৈন্তিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেনি। এর কারণ, মোগলানে তখন কোন অর্থনৈতিক সংকট

ছিল না। ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতনের পর সিলেটও তাদের অধিকারে চলে যায়। একপর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিলেটেও তাদের নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা কার্যকর করে।

এর ফলে সিলেটের মানুষ অর্থনৈতিক শোষণভিত্তিক এক নতুন শাসনব্যবস্থায় প্রবেশ করে। সিলেটের মানুষ বুঝতে পারল, এই নতুন শাসকরা মোগলদের মতো নয়। এরা কেবল লুট করতেই এসেছে এবং এদের অধীনে বসবাস করা মানে পরাধীন দেশে বসবাস করা। তাই কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা ব্রিটিশ সীমানার বাইরে চলে যাবেন। গন্তব্য হিসেবে তাদের পছন্দ ছিল ব্রিটিশ সীমান্তবর্তী জৈন্তিয়া বা কাছাড়ি রাজ্য। ১৭৬০ এর দশক থেকে ১৮২০ এর দশক পর্যন্ত সিলেটের বহু পরিবার এ দুটি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের সিংহভাগই ছিলেন মুসলমান; বাকিরা ছিলেন হিন্দু। ব্রিটিশদের রাজস্ব নীতির কারণে সিলেটের অসংখ্য স্বচ্ছল পরিবার নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। আর সাধারণ প্রজাদের অবস্থা তো ছিল আরও শোচনীয়। তাই ব্রিটিশ শোষণের হাত থেকে বাঁচতে বহু সিলেটি পরিবার ব্রিটিশ রাজের প্রতিবেশী জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল।

দুই. আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি জৈন্তিয়াপতির মনোভাব

জৈন্তিয়া ছিল মোগলানের মিত্র রাজ্য। জৈন্তিয়ার রাজা বড়গোসাঁই ছিলেন মোগলানের নবাব পরিবারের আত্মীয় ও মিত্র। মোগলানের নবাব আলীবর্দি খাঁ-র ভাতিজা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ ছিলেন জৈন্তিয়াপতির ভগ্নিপতি। নওয়াজিশ ছিলেন আলীবর্দি খাঁ-র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা নিজামতের শাসনকর্তা। ১৭৪০ সালে আলীবর্দি খাঁ তাকে ঢাকার নবাব (নায়েবে নাজিম) নিযুক্ত করেছিলেন।[47]

---

[47] নওয়াজিশ ১৭২০ সালে তাঁর বাবা হাজী আহমেদ ও চাচা আলীবর্দি খাঁ-র পরিবারের সাথে বাঙলায় এসেছিলেন। ১৭৪০ সালে আলীবর্দি খাঁ বাঙলা-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হলে নওয়াজিশের ভাগ্যও বদলে যায়। তিনি তাঁর চাচার রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৭৪০ সালে তিনি ঢাকার নায়েবে নাজিম হিসেবে নিযুক্ত হন। জৈন্তিয়া ছিল তাঁরই প্রতিবেশী রাজ্য। ক্ষমতায় বসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজ্যটির সাথে বিরোধে লিপ্ত হন। তবে এই বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। সন্ধিপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নওয়াজিশ জৈন্তিয়াপতির বোনকে বিবাহ করেছিলেন। এরপর জৈন্তিয়া-মোগলান মৈত্রীসম্পর্কে আর কোন ফাটল ধরেনি।

এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সন্ধিপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জৈন্তিয়াপতির বোন ভৈরবী কুয়ঁরীকে বিবাহ করেছিলেন। এই আত্মীয়তার সুবাধে জৈন্তিয়া ও মোগলানের মধ্যে একটি কার্যকর মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

মোগলানের নবাব পরিবারের সাথে আত্মীয়তা থাকায় রাজা বড়গোসাঁই মোগলানের বুকে ব্রিটিশ আগ্রাসনকে ভালো চোখে দেখেননি। রাজার বোন ও ভাগিনেয় ব্রিটিশ আগ্রাসনের ভুক্তভোগী ছিলেন। তাই রাজা বড়গোসাঁই ব্রিটিশদেরকে পছন্দ করতেন না। তবে যেহেতু তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়িয়ে চলতে পছন্দ করতেন সেহেতু তিনি ব্রিটিশদের সাথে কোন ঝামেলায় জড়াননি। বরং নিজ রাজ্যের সীমানাকে সমুন্নত রেখে মোগলান থেকে আগত পরিবারগুলোকে আশ্রয় দেয়ার কাজটিকেই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন। রাজার এই উদার মনোভাবের কারণে মোগলানের অনেক হিন্দু ও মুসলমান পরিবার কাছাড়ি রাজ্যে না গিয়ে জৈন্তিয়া রাজ্যকেই গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

তিন. ভৈরবী কুয়ঁরী ও ফতেহ খাঁ-র দলের আগমন

ব্রিটিশরা যখন মোগলানের কর্তৃত্ব লাভ করে, ঢাকার নবাব নওয়াজিশ তখন জীবিত ছিলেন না। পলাশীর বিপর্যয়ের দুই বছর পূর্বে, ১৭৫৫ সালে নওয়াজিশ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসের বই-পুস্তকে লেখা আছে নওয়াজিশ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। এ তথ্যটি সঠিক নয়। নওয়াজিশের প্রথম স্ত্রী মেহেরুন্নিসার কোন সন্তান না থাকলেও দ্বিতীয় স্ত্রী ভৈরবী কুয়ঁরীর গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। এই পুত্রসন্তানের নাম ছিল ফতেহ খাঁ। তাঁর জন্ম কত সালে হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তাকে অল্প বয়সে রেখেই নওয়াজিশ মারা গিয়েছিলেন। এর দু'বছর পর ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতন ঘটে। বাংলার ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে ব্রিটিশদের পক্ষে কাজ করার জন্য আজও যারা কুখ্যাত হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নওয়াজিশের প্রথম স্ত্রী মেহেরুন্নিসা।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথমদিকে তিনি বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকাডুবির শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। নওয়াজিশের পরিবারে তখন বাকি রইলেন শুধু ভৈরবী কুয়ঁরী আর ফতেহ খাঁ। বক্সারের যুদ্ধের পর তারা আর ব্রিটিশ রাজত্বে থাকতে

মোগলানের অধিবাসীদের কাছে জৈন্তিয়া একটি মিত্র রাজ্য হিসেবেই গণ্য হতো।

চাইলেন না। ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজয়ের ফলে বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের শেষ আশাটুকুও হারিয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে বাংলার স্বাধীনতাকামী নবাব মীর কাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো আর কোন শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় নওয়াজিশপত্নী ভৈরবী কুয়ঁরী ব্রিটিশ রাজত্ব (মোগলান) ছেড়ে জৈন্তিয়ায় চলে যাবেন বলে মনস্থ করলেন। ভৈরবী কুয়ঁরী তাঁর পুত্রকে নিয়ে ভাইয়ের রাজ্যে পাড়ি দেবেন- এই সংবাদটি ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের অনেককেই আন্দোলিত করল।

এরা ছিলেন বাংলায় ব্রিটিশ আগ্রাসনের ভুক্তভোগী। ব্রিটিশদের নতুন রাষ্ট্র ও রাজস্বব্যবস্থা তাদেরকে কর্মহীন, বিত্তহীন ও ক্ষমতাহীন বানিয়েছিল। নবাবী আমলে তারা বিভিন্ন রাজকীয় পেশায় জড়িত থাকলেও ব্রিটিশদের শাসনব্যবস্থায় তাদের কোন স্থান ছিল না। তাদের কেউ কেউ ছিলেন নবাব পরিবারেরই সদস্য কিংবা আত্মীয়। কিন্তু ব্রিটিশ বাংলায় তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। এসকল বনেদি ও সম্ভ্রান্ত লোকজন ভৈরবী কুয়ঁরীর সাথে স্থায়ীভাবে জৈন্তিয়া রাজ্যে চলে যেতে মনস্থ করলেন। এই দেশান্তরীদের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় সাতশো। তৎকালীণ সময়ের বিচারে এই সংখ্যাটি অনেক বড়ো। এরা বক্সারের যুদ্ধের পর জৈন্তিয়ায় হিযরতের উদ্দেশ্যে ঢাকায় জড়ো হয়ে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তখনকার সময়ে ঢাকা থেকে জৈন্তিয়ায় আসতে হতো নৌপথে। যাত্রাপথে প্রায় দশ-বারো দিন সময় লাগতো। দেশান্তরী দলটি নৌ-ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা ও রসদ সামগ্রী যোগাড় করল।

১৭৬৫ সালের কোন এক শুভ দিনে ভৈরবী কুয়ঁরী ও ফতেহ খাঁ এই দেশান্তরী দলটিকে নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করলেন। তাদের বিশাল নৌবহর মেঘনা নদী হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার হাওরাঞ্চলে প্রবেশ করল। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলাজুড়ে ওই সময়ে যে হাওরের অস্তিত্ব ছিল তার সাথে সমুদ্রের কোন পার্থক্য ছিল না। এই বিশাল জলরাশি অতিক্রম করে নৌবহর প্রবেশ করল সুরমা নদীতে। এরপর সুরমার শাখা সারী-গোয়াইন হয়ে তারা জৈন্তিয়ার রাজধানীতে পৌঁছল। রাজা বড়গোসাঁই এই নবাগতদেরকে তাঁর রাজ্যে সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন। বেশ উদার চিত্তেই তিনি তাদের

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজার কাছ থেকে ভূ-সম্পত্তি, চাকুরী কিংবা অন্য কোন সুবিধা নিয়ে তারা জৈন্তিয়ার মাটিতে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন।

চার. কাশিম শাহ, সোনা খাঁ ও পহহার খাঁ-র কথা

ঢাকা থেকে যারা নৌপথে জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন তাদের মধ্য থেকে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা জানা যায়। ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছেন এমন তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন- হযরত মোহাম্মদ কাশিম শাহ মুর্শিদাবাদী (রাহ.), মোহাম্মদ খাঁ উরফে সোনা খাঁ ও পহহার খাঁ। তাদের বংশধরদের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকেও তাদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমেই আসে হযরত কাশিম শাহের কথা। তিনি ছিলেন একাধারে একজন দরবেশ, ইসলামী পণ্ডিত এবং বাংলার নবাব পরিবারের উস্তাদ। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের অনেকেই তাকে মুরশিদ হিসেবে মান্য করতেন। নবাব পরিবারের সন্তান ফতেহ খাঁ-র উস্তাদ ও মুরশিদ ছিলেন তিনিই। মূলত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন। রাজা বড়গোসাঁই হযরত কাশিম শাহকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। রাজদরবারের দক্ষিণপাশের পুরো জায়গাটি রাজা হযরত কাশিম শাহের জন্য বরাদ্দ দিয়েছিলেন এবং হযরতের বসবাসের জন্য এখানে একটি দালানঘরও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই বাড়ির একপাশে একটি পুরানো মোকামের অস্তিত্ব থাকায় এটি ‘মোকামবাড়ি’ নামেই পরিচিতি পেয়েছিল। জৈন্তিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র বা খানকাহ ছিল এই বাড়িটিই। এই বাড়িটি ছাড়াও রাজা হযরত কাশিম শাহকে বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তিও দান করেছিলেন।

ঢাকা থেকে আগত দলের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন নবাব আলীবর্দি খাঁ-র দূর সম্পর্কের ভাতিজা মোহাম্মদ খাঁ উরফে সোনা খাঁ। তিনি একসময় মোগল সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং সেই সুবাধে যুদ্ধ ও সামরিক বিদ্যায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। ঢাকা থেকে নৌপথে জৈন্তিয়ায় আসার সময় তিনি ভৈরবী কুয়ঁরী ও ফতেহ খাঁ-র নিরাপত্তা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জৈন্তিয়ায় আগমনের পরে ফতেহ খাঁ-র অন্যান্য সঙ্গীদের মতো তিনিও একজন রাজকর্মচারী হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন। রাজা বড়গোসাঁই তাকে হাওলাদার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের ঘটনায় অনুতপ্ত

হয়ে রাজা বড়গোসাইঁ যখন বন্দরহাটি মসজিদটি বানিয়ে দেন তখন সোনা খাঁ রাজ্যের অস্থায়ী সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন বলে শোনা যায়। নিজপাটের জাঙ্গালহাটিতে অবস্থিত তাঁর বাড়িটি যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে 'সেনাপতির বাড়ি' নামেই পরিচিত ছিল।[48] তাঁর বংশধররাও এই বাড়িতেই বসবাস করতেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন করিম বখশ, মুন্সি শাহ ইসমাইল মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) এবং মাওলানা শাহ হাবিব উল্লাহ (রাহ.) প্রমুখ। বর্তমানে সোনা খাঁ-র বংশধররা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করছেন।

পহহার খাঁ ছিলেন ঢাকা থেকে জৈন্তিয়ায় আগত দলের আরেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। জৈন্তিয়ায় আগমনের পর রাজা বড়গোসাঁই তাকে জৈন্তিয়া রাজ্যের সহ-সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের সেনাবাহিনীতে ফতেহ খাঁ-র পরেই ছিল তাঁর স্থান। ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের ঘটনার পরে সোনা খাঁ-র মতো তিনিও কিছুদিন অস্থায়ী সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন বলে শোনা যায়। গোয়াইনঘাটের পুকাশ গ্রামে আজও তাঁর বংশধররা বসবাস করছেন। ওই গ্রামের আব্দুল গফুর ছিলেন পহহার খাঁ-র বংশের একজন বিশিষ্ট সন্তান। তাঁর কাছ থেকে *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান পহহার খাঁ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। অন্যান্য লেখকদের বর্ণনাতেও পহহার খাঁ-র কথা পাওয়া যায়।

---

[48] এই বাড়িটি বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলা সদরস্থ ইমরান আহমদ সরকারি মহিলা কলেজের ঠিক পশ্চিম পাশে অবস্থিত ছিল।

অধ্যায় উনিশ
সেনাপতি ফতেহ খাঁ-র কথা

সেনাপতি ফতেহ খাঁ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা যেসব তথ্য দিয়েছেন তা মূলত লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প থেকেই সংগৃহীত। ফতেহ খাঁ-র কাহিনী আজও নিজপাটবাসীর মুখে শোনা যায়। তবে এসব গল্প পরস্পরবিরোধী; একটি গল্পের তথ্যের সাথে আরেকটি গল্প মিলে না। সব গল্পের মধ্যে যে তথ্যগুলোকে অভিন্নরূপে পাওয়া যায় সেগুলোকেই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ফতেহ খাঁ-কে নিয়ে দুজন লেখকের বর্ণনাকেও ইতিহাসের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই দুজন লেখক হলেন- মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এবং সৈয়দ মুর্তাজা আলী। তারাও মূলত জনশ্রুতি থেকেই ফতেহ খাঁ-র কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজ নিজ বইয়ে তা তোলে ধরেছিলেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৯২০ এর দশকে আর সৈয়দ মুর্তাজা আলী তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৯৫০ এর দশকে। মূল ঘটনার দেড়-দুশো বছর পরে, শোনা কথার সাথে নিজেদের অভিমত যুক্ত করে তারা সংক্ষিপ্ত আকারে ফতেহ খাঁ-র কথা লিখেছেন।

উভয় লেখকের বর্ণনায় কিছু তথ্য যেমন অভিন্ন রয়েছে তেমনি তারা কিছু বিষয়ে ভিন্নধর্মী বর্ণনা দিয়েছেন। জৈন্তিয়া রাজ্যে ফতেহ খাঁ-র উত্থান ও অবদান নিয়ে তারা অভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। উভয়ের বর্ণনা থেকেই জানা যায়, ভৈরবী কুয়ঁরী, ফতেহ খাঁ ও তাদের সঙ্গীদেরকে রাজা বড়গোসাঁই বেশ সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন। ফতেহ খাঁ-কে তিনি রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ সেনাপতির পদ দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ তাঁর *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকে লিখেছেন, "রাজা আপন ভগিনী ও ভাগিনাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহাদের বসবাসের জন্য স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়া ফতেখাঁকে স্বীয় সেনাপতির পদে বরণ করিয়া লইলেন।" একই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি (ফতেহ খাঁ) বড়গোসাঁইর প্রিয়পাত্র ছিলেন ও রাজা তাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন।"

জৈন্তিয়া রাজ্যে রাজার পরেই ছিল সেনাপতির স্থান। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ফতেহ খাঁ-র মতো একজন অল্পবয়সী তরুণকে বসিয়ে দেওয়ার পেছনে

রাজার মাত্রাতিরিক্ত স্নেহই যে মূল কারণ ছিল তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়না। এদিকে ফতেহ খাঁ-ও একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যের সেনাপতি হতে পেরে তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজ্য হারানোর বেদনা কিছুটা ভুলতে পারলেন। ভৈরবী কুয়ঁরী এবং ফতেহ খাঁ-র সাথে অন্যান্য যারা জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন তারাও এখানে নতুন জীবন শুরু করলেন। ব্রিটিশ অধিকৃত মোগলানের চেয়ে স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যকেই তারা অধিক নিরাপদ ও শান্তির জায়গা মনে করলেন।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির প্রধান ফটক

এক. জয়ন্তীপুরের উন্নয়নে ফতেহ খাঁ-র অবদান

সেনাপতির কাজ রাজ্যকে বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা। তবে জৈন্তিয়া রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী সেনাপতি অনেকটা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করতেন। রাজ্যের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও সেনাপতির ভূমিকা থাকতো। রাজ্য পরিচালনায় রাজার পরে সেনাপতিই মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। এমনকি রাজার অবর্তমানে সেনাপতিই রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাই এই পদটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফতেহ খাঁ

সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাজ্যের সীমান্তে তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ওঁৎ পেতে বসে আছে। যেকোন ছুতোয় তারা জৈন্তিয়া দখলের চেষ্টা করবে- এটি ফতেহ খাঁ জানতেন। তাই তিনি রাজ্যের নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নয়নে মন দিলেন।

তিনি সেনাবাহিনীর অনেক উন্নতি সাধন করলেন। মোগলান থেকে আগত সৈন্য ও লস্করদেরকে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করলেন এবং কিছু সেনানিবাসও নির্মাণ করলেন। জৈন্তিয়ার সৈন্যদেরকে তিনি কামান পরিচালনায় দক্ষ করে তোললেন। মোগলরা তাদের রাজধানী বা দুর্গের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য চারপাশে পরিখা খনন করতো। ফতেহ খাঁ এই কৌশল সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি রাজধানী জয়ন্তীপুরকে সুরক্ষিত করার জন্য এর চারপাশে এক গভীর ও চওড়া পরিখা খনন করলেন। এরপর নগরীতে প্রবেশের জন্য তিনটি সিংহদ্বার বা ফটক নির্মাণ করলেন এবং প্রত্যেক ফটকের পাশে নগর রক্ষীদের দূর্গও নির্মাণ করলেন। ফটকগুলোর নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর জন্য তিনি ঢাকা থেকে ছয়টি কামান আনালেন এবং প্রত্যেক ফটকে এগুলোর একজোড়া করে স্থাপন করলেন। এতে রাজধানীর সুরক্ষা অনেক বেড়ে গেলো।



চিত্রঃ সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির ইন্দারা

ফতেহ খাঁ-র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল জয়ন্তীপুরের জলাভাব দূর করা। ইতোপূর্বে এই নগরীতে পানীয় জলের ভালো ব্যবস্থা ছিল না। ফতেহ খাঁ নগরীর স্থানে স্থানে কূপ, ইন্দারা ও পুকুর খননের ব্যবস্থা করে পানীয় জলের এই অসুবিধা দূর করলেন। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও নির্মাণ করেছিলেন।

জৈন্তিয়া রাজ্যে মোগল স্থাপত্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তিনিই। বর্তমানে নিজপাটে (সাবেক জয়ন্তীপুর) যে পরিত্যক্ত রাজবাড়িটি দেখা যায় এটি ফতেহ খাঁ-র উদ্যোগেই নির্মিত হয়েছিল। এই বাড়িটির প্রধান ফটক, একটি ইন্দারা, সামান্য প্রাচীর এবং একটি ভবন আজও টিকে আছে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরে বাড়িটির মূল ভবন ক্রমশ বিলুপ্তি লাভ করেছিল। এই বাড়িটি নির্মাণের পূর্বে একটি প্রস্তরনির্মিত বাড়িতে রাজপরিবারের লোকজন বসবাস করতেন। সেই বাড়িটির স্থলে ব্রিটিশ আমলে একটি থানা ও ডাক-বাংলো নির্মিত হওয়ায় সেটির কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির মন্দির

ফতেহ খাঁ-র মুরশিদ হযরত কাশিম শাহ (রাহ.) রাজদরবারের দক্ষিণ পাশে একটি বিশাল বাড়িতে বসবাস করতেন। এটি মোকামবাড়ি নামে পরিচিত ছিল। ইসলামী খানকাহ ও তালিম-তরবিয়তের কেন্দ্র হওয়ায় এই বাড়িতে মুসলমানদের বেশ সমাগম ছিল। ফতেহ খাঁ এই বাড়িতে একটি মসজিদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাই বাড়ির উত্তর পাশে তিনি একটি পাকা মসজিদ বানিয়ে দিলেন। মাত্র দুই বছরের মধ্যে জয়ন্তীপুরের সর্বত্র ফতেহ খাঁ-র উন্নয়নমূলক কাজের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাই সকল ধর্মের ও সকল জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেলো।

দুই. ফতেহ খাঁ-র জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি

ফতেহ খাঁ একদিকে যেমন রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন তেমনি তিনি সাধারণ মানুষের কাছেও বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। রাজার স্নেহ, জনপ্রিয়তা এবং নিজ কর্মদক্ষতার গুণে তিনি জৈন্তিয়া রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। একসময় দেখা গেল, রাজ্য পরিচালনায় রাজার তেমন কোন ভূমিকা নেই; ফতেহ খাঁ-ই সবকিছু নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। ফতেহ খাঁ-র প্রতি রাজার দুর্বলতা এতোটাই বেশি ছিল যে, ভাগিনেয় এর সাথে পরামর্শ না করে তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। এতে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে, ফতেহ খাঁ-ই হয়ে উঠলেন রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকে মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ লিখেছেন, “রাজা তাহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; এমনকি তাহার পরামর্শ ব্যতিত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না।”

রাজার এই অতিরিক্ত আনুকূল্যের কারণে পুরো জৈন্তিয়া রাজ্য চলে এলো সেনাপতি ফতেহ খাঁ-র হাতের মুঠোয়। কিন্তু ইতিহাসের একটি অমোঘ নিয়ম হল, ক্ষমতা যার হাতেই আসুক তার কিছু প্রতিপক্ষও সৃষ্টি হয়ে যায়। আর জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তাকে হিংসা করার মতো লোকেরও অভাব হয় না। ফতেহ খাঁ-ও এই ভবিতব্য এড়াতে পারলেন না। জৈন্তিয়া রাজ্যে তাঁর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও জনপ্রিতা দেখে কিছু লোকের হিংসা হতে লাগল। এরা ছিলেন রাজা বড়গোসাঁইয়ের রাজসভার সদস্য। জৈন্তিয়া রাজ্যের শাসনপ্রণালী অনুযায়ী রাজার সাথে রাজসভাও রাজ্য শাসনে

অংশ নিতো। রাজসভার সদস্যরা নিয়মিত দরবারে বসতেন এবং সেখানে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো রাজা তা কার্যকর করতন।

খেলুরাজ ও হাজারকী রাজের প্রধানগণ এবং পার্বত্য পুঞ্জিগুলোর সরদারগণ জৈন্তিয়ার রাজসভার সদস্য হতেন। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য রাজকর্মচারীগণ এবং রাজার মনোনীত বিশেষ ব্যক্তিরাও রাজসভার সদস্য হতেন। রাজা এদের পরামর্শের ভিত্তিতেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। যখন ফতেহ খাঁ সকল বিষয়ে রাজার পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন, রাজসভার অনেকেই তাঁর প্রতিপক্ষ হয়ে গেলেন। এরা যেকোন মূল্যে ফতেহ খাঁ-র প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তারা ভেবে দেখলেন, যদি রাজাকে ফতেহ খাঁ-র প্রতি সন্দিহান করে তোলা না যায় তাহলে কোনভাবেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। তাই তারা এক গভীর চক্রান্তের পথ বেছে নিলেন।

তিন. ষড়যন্ত্রের কবলে ফতেহ খাঁ (১৭৬৭ সাল)

রাজসভার যেসকল সদস্য বা আমাত্যগণ ফতেহ খাঁ-র প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল তারা সম্মিলিতভাবে রাজাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, ফতেহ খাঁ রাজাকে হত্যা করে নিজে রাজা হওয়ার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। রাজা তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত এসব আমাত্যদের কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। রাজা ভাবলেন, দীর্ঘদিনের পরিচিত ও বিশ্বস্ত এতো লোক যখন ফতেহ খাঁ-র বিরুদ্ধে বলছে তাহলে নিশ্চয়ই এর পেছনে সত্যতা রয়েছে। তাই এদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ফতেহ খাঁ-কে ক্ষমতাচ্যুত করলেন ও হত্যার আদেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, "...তিনি বড়গোসাঁইর প্রিয়পাত্র ছিলেন ও রাজা তাকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। ফতেহ খানের প্রতিপত্তি দেখে হিন্দু আমাত্যরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁরা প্রচার করেন যে ফতেহ খান সিংহাসনে আরোহণের ষড়যন্ত্র করছেন। রাজা আমাত্যদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ফতেহ খাঁ-কে হত্যার আদেশ দেন।" ফতেহ খাঁ-র পতন ও মৃত্যু নিয়ে অবশ্য প্রচুর ভিন্ন বর্ণনাও পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় দাবি করা হয়, ফতেহ খাঁ রাজার আদেশ মান্য করতেন না বিধায় রাজা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন ও প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় দাবি করা হয় যে, কুচক্রীরা ফতেহ খাঁ-কে ধ্বংস করার জন্য ধর্মভীরু

রাজাকে দেবীর অভিশাপের ভয় দেখিয়ে কাবু করেছিল। এজন্য তারা ফতেহ খাঁ-র মসজিদের আজানের শব্দে দেবীর মূর্তি পড়ে যাওয়ার গুজব ছড়িয়েছিল।

রাজা এই গুজবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং দেবীর কোপানলে পড়ার ভয়ে ফতেহ খাঁ-কে মসজিদ উঠিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এই বর্ণনাকে সমর্থন করেছেন। *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকে তিনি লিখেছেন, "...হিন্দুনেতাগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া রাজাকে ফতেখাঁর প্রতি প্রকুপিত করিবার জন্য ছলনা বাক্যে বলিলেন, 'রাজন। মুসলমানেরা মসজিদে আজান ধ্বনি করা কালে জৈন্তীশ্বরী দেবী স্বীয় আসন হইতে পড়িয়া যান। সুতরাং এই স্থান হইতে মসজিদ স্থানান্তরিত না করিলে দেবীর অবমাননা হইবে।' অতএব সত্বর এস্থান হইতে মসজিদ উঠাইয়া নেওয়ার আদেশ করা হউক। এতদ্ভিন্ন ফতেখাঁ সেনাপতি মহারাজের অহিত সাধনে সতত তৎপর ইত্যাদি নানা কুমন্ত্রণা দ্বারা রাজাকে ফতেখাঁর প্রতি সন্দিহান করিয়া তুলিলেন। মহারাজ বিদ্বেষিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া ফতেখাঁকে মসজিদ উঠাইয়া নেওয়ার আদেশ করিলেন এবং অন্যথায় কালীর সদনে তাহার মস্তক ছেদন করা হইবে, ইহাও ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইহাতে কয়েকজন নীচাশয় মুসলমানও অর্থ লোভে বশীভূত হইয়া রাজার পক্ষ সমর্থন করিয়া ছিলেন। নগরে মহা হুলস্থুল আরম্ভ হইল; কিন্তু বীর সেনাপতি কোনক্রমেই রাজার এই অন্যায় আদেশ পালনে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাজ আদেশে মুসলিম-তিলক ফতেখাঁ সেনাপতির শিরচ্ছেদ করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের চিহ্ন পর্য্যন্তও রহিল না।"

চার. বর্ণনাসমূহের বিশ্লেষণ

ফতেহ খাঁ-র পরিণতি নিয়ে সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের দেওয়া বর্ণনায় কুচক্রীদেরকে হিন্দু আমাত্য বা হিন্দু নেতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরা ছিলেন রাজসভার সদস্য (আমাত্য মানে রাজসভার সদস্য)। এরা বাদে অন্যান্য হিন্দু রাজকর্মচারী কিংবা সাধারণ হিন্দুদের কাছে ফতেহ খাঁ-র জনপ্রিয়তার কোন কমতি ছিল না। তিনি মূলত হিন্দু-মুসলমান ও আদিবাসী নির্বিশেষে সবার কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের বর্ণনা থেকে মনে হয়, রাজসভার অল্পকিছু মুসলমান সদস্যও ফতেহ খাঁ-র বিরুদ্ধে ছিলেন। এই নীচাশয় মুসলমানগণকে কুচক্রীরা অর্থ দিয়ে বশীভূত করেছিল। তাই তারা ফতেহ খাঁ-র বিরুদ্ধে রাজার আদেশকেই সমর্থন করেছিল।

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের বর্ণনার একটি তথ্য বেশ দ্বিধায় ফেলে দেয়। তিনি লিখেছেন, ফতেহ খাঁ-র প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত লোকগুলি রাজাকে বুঝিয়েছিল যে, ফতেহ খাঁ-র নির্মিত মসজিদের আজানের শব্দে জয়ন্তেশ্বরী দেবী স্বীয় আসন থেকে পড়ে যান। কিন্তু জয়ন্তেশ্বরী দেবীর মূর্তিটি ওই সময়ে জয়ন্তীপুরে ছিল না। এর প্রায় ছয় দশক পূর্বে মূর্তিটিকে জয়ন্তীপুর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ১৭০৮ সালে আহোম সৈন্যরা জৈন্তিয়া দখলের পর মূর্তিটিকে সরিয়ে নিয়েছিল। জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে তারা মূর্তিটিকে আহোমে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইট তাঁর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এই মূর্তিটি ১৭০৮ সাল পর্যন্ত জয়ন্তীপুরে ছিল। তাই ১৭৬৭ সালের ঘটনার বর্ণনায় মূর্তিটির প্রাসঙ্গিকতা বেশ বিস্ময়করই বটে। আরেকটি ব্যাপার হল, ফতেহ খাঁ-র মসজিদের পাশেই ছিল হযরত কাশিম শাহের বাড়ি ও খানকাহ। সেখানে দিন রাত জিকির-আজকার ও কুরআন পাঠ চলতো। ওসব শব্দের সাথে মসজিদের আজানের শব্দের তেমন কোন পার্থক্য নেই। তাই ওসব শব্দ বাদ দিয়ে শুধু আজানের শব্দ নিয়ে গুজব ছড়ানো কীভাবে সম্ভব হলো সেটিও এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ লিখেছেন, রাজা ‘কালীর সদনে’ ফতেহ খাঁ-র মস্তক ছেদনের হুমকি দিয়েছিলেন। এ তথ্যটিও দ্বিধায় ফেলে দেয়। ‘কালীর সদন’ বলতে তিনি কোন জায়গাটি বুঝিয়েছেন তা পরিস্কার নয়। ওই সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো জৈন্তেশ্বরী বাড়ি নামক প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে; কোন কালীমন্দিরে নয়। জয়ন্তীপুরে যে রাজকীয় কালীমন্দির ছিল সেটি নির্মিত হয়েছিল ফতেহ খাঁ-র মৃত্যুর দুই বছর পরে এবং এই মন্দিরের সাথে নরবলির কোন সম্পর্ক ছিল না।[49] তাই সেখানে ফতেহ খাঁ-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না। নিজপাটের (সাবেক জয়ন্তীপুর) প্রবীণদের মতে, ফতেহ খাঁ-কে মৃতুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল জৈন্তেশ্বরী বাড়িতেই; অন্য কোথাও নয়। ফতেহ খাঁ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন লেখকের যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলোতেও এমন তথ্য রয়েছে।

---

[49] এ তথ্যটি মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ নিজেই তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, বন্দরহাটি মসজিদ নির্মাণের পরে রাজা ওই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন এবং লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে এর সেবায়েত নিযুক্ত করেছিলেন।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ-র মাজার (নবনির্মিত)। মাজারটির অবস্থান জৈন্তাপুর উপজেলার সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রের ভেতরে।

অধ্যায় বিশ
হযরত কাশিম শাহের কথা

১৭৬০ এর দশকে ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলা থেকে যারা জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের অনেকেরই মুরশিদ বা আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু ছিলেন হযরত মোহাম্মদ কাশিম শাহ মুর্শিদাবাদী (রাহ.)। তিনি ছিলেন একাধারে একজন দরবেশ, ইসলামী পণ্ডিত এবং বাংলার নবাব পরিবারের ধর্মীয় উস্তাদ। ব্রিটিশদের হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা উদ্ধারের লক্ষ্যে তিনি রণাঙ্গনেও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশরাই বিজয়ী হয়েছিল। তাই বাংলার মোগল শাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকের মতো তিনিও বাংলা থেকে হিযরত করেছিলেন। নিরাপদ গন্তব্যস্থল হিসেবে তিনি স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যকেই পছন্দ করেছিলেন। জীবনের বাকি অংশ তিনি এখানেই কাটিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজদরবারের বিচারকের পাশাপাশি তিনি এখানে খানকাহ ও দরসখানা পরিচালনা করতেন এবং রাজকীয় মসজিদের ইমামতিও করতেন। এখানকার রাজপরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। নাগরিকদের মধ্যেও তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

জৈন্তিয়ার রাজার কাছ থেকে তিনি যে বাড়িটি পেয়েছিলেন সেখানে আজও তাঁর বংশধররা বসবাস করছেন। তাদের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর জীবনী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তাঁর বংশের বিশিষ্ট সন্তান জনাব সিকান্দার আলী খন্দকার। বিভিন্ন ঐতিহাসিকরাও তাঁর জীবনী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মূর্তাজা আলী এবং *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থের লেখক ফজলুর রহমান তাদের মধ্যে অন্যতম। সিলেটের ইতিহাস গবেষক দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেনের লেখা থেকেও হযরত কাশিম শাহ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন লেখকদের বর্ণনা এবং হযরতের বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ থেকে জানা যায়, তিনি মূলত একজন তুর্কি ছিলেন; বাংলার নবাব আলীবর্দি খাঁর আমন্ত্রণে তিনি সুদূর তুরস্ক থেকে বাংলায় এসেছিলেন। ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতনের পর তিনি জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন এবং এখানকার রাজার কাছ থেকে রাজকীয় বাড়ি ও

জমিদারী লাভ করেছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের সাথে তাঁর নিজের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তেমনি তাঁর বংশধরদেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

এক. তুরস্ক থেকে বাংলায় আগমন

হযরত কাশিম শাহ (রাহ.) জৈন্তিয়ায় আগমনের পূর্বে দীর্ঘদিন মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। এজন্য তিনি 'মুর্শিদাবাদী' নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ কিংবা বাংলা তাঁর জন্মস্থান ছিল না। জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন একজন তুর্কি। তাঁর জীবনের প্রথমভাগ কেটেছে তুর্কিয়ে-তে (তুরস্ক)। তাঁর পিতা হযরত দামো শাহ (রাহ.) তুরস্কের একজন ইসলামী পণ্ডিত বা আলেম ব্যক্তি ছিলেন। পরিণত বয়সে হযরত কাশিম শাহ তাঁর পিতার মতোই একজন নামকরা ইসলামী পণ্ডিত হয়ে উঠেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের কথা কোনও এক উপায়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দির খাঁ-র কানে পৌঁছেছিল। তাই আলীবর্দি খাঁ তাকে নবাব পরিবারের ধর্মীয় উস্তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য মুর্শিদাবাদে আমন্ত্রণ জানান। নবাবের এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে হযরত কাশিম শাহ মুর্শিদাবাদে আসেন এবং নবাব পরিবারের উস্তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি আর তুরস্কে ফিরে যাননি। মুর্শিদাবাদেই তিনি ঘর-সংসার বেধেছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল নবাব সুবাদারের বোনের সাথে। যখন তিনি বাংলা থেকে জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানরাও তাঁর সাথে এখানে এসেছিলেন।

দুই. মুঙ্গেরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ (১৭৬৩ সাল)

হযরতের জীবনী (বংশধরদের কাছে রক্ষিত) থেকে জানা যায়, তিনি শুধু কেতাবী জ্ঞানের অধিকারীই ছিলেন না; বাস্তব জগতের অনেক বিষয়েও তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন। ধর্মবিদ্যার পাশাপাশি যুদ্ধবিদ্যায়ও তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ-র সময়ে তিনি নবাবের পক্ষে কিছু ছোটখাটো সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতনের পরে তিনি নবাব মীর কাশিমের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। ১৭৬৩ সালে সংঘটিত মুঙ্গেরের যুদ্ধে তিনি নবাব মীর কাশিমের পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তবে এই যুদ্ধে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি। নবাবের পক্ষের সৈন্যবাহিনী এই যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। মুঙ্গের ছিল নবাব মীর কাশিমের দুর্গ ও রাজধানী। ব্রিটিশদের

হাতে দুর্গটির পতনের পর হযরত কাশিম শাহ সপরিবারে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে চলে গিয়েছিলেন; মুঙ্গের কিংবা মুর্শিদাবাদে তিনি আর ফিরে যাননি। আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য তখন তিনি একটি স্বাধীন রাজ্যে হিযরত করার কথা ভাবছিলেন। তাঁর মতো আরও অনেকেই তখন একই কথা ভাবছিলেন। এদের একটি অংশ জড়ো হলেন ঢাকায়। হযরত কাশিম শাহ ও তাঁর পরিবার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ঢাকায় এসে এই দলের সাথে যোগ দেন। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকার প্রয়াত নবাব নওয়াজিশের স্ত্রী ভৈরবী কুয়ঁরী ও কুয়ঁরীপুত্র ফতেহ খাঁ। সেখান থেকে তারা সবাই মিলে ভৈরবী কুয়ঁরীর পিতৃভূমি জৈন্তিয়া রাজ্যের উদ্দেশে রওনা দেন।

তিন. বাংলা থেকে জৈন্তিয়ায় আগমন (১৭৬৫ সাল)

আনুমানিক ১৭৬৫ সালে ভৈরবী কুয়ঁরী, ফতেহ খাঁ ও হযরত কাশিম শাহের দলটি ঢাকা থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যের উদ্দেশে রওনা হয়। কয়েক সপ্তাহের নৌ-ভ্রমণ শেষে তারা জৈন্তিয়ার রাজধানীতে এসে পৌঁছায়। জৈন্তিয়ার রাজা বড়গোসাঁই এই দলের সবাইকে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেন ও বসবাসের জন্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। এই দলের মধ্যে হযরত কাশিম শাহকে রাজা বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রাজা এই ধর্মপ্রচারকের সুবিধার জন্য রাজদরবারের পাশেই একটি বিশাল বাড়ি দান করেন এবং এই বাড়িতে একটি ঘরও বানিয়ে দেন। এমনকি রাজা তাকে রাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুর মর্যাদাও প্রদান করেছিলেন। বাংলার নবাব পরিবারের ধর্মীয় উস্তাদের দায়িত্ব পালনের সুবাধে হযরত কাশিম শাহ ছিলেন রাজকুমার ফতেহ খাঁ-র উস্তাদ। জৈন্তিয়া রাজ্যে হিযরতের পরেও তাদের সম্পর্ক অনুরূপ ছিল। সেনাপতি ফতেহ খাঁ কাশিম শাহকে স্বীয় পির বা মুরশিদ হিসেবে মান্য করতেন। জয়ন্তীপুরের অন্যান্য মুসলমানরাও তাকে একজন পির বা দরবেশ হিসেবে মান্য করতেন। তিনি রাজদরবারে উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় (মুসলমান নাগরিকদের) নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। এজন্য তিনি জৈন্তিয়ার একজন রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় ধর্মগুরু হিসেবে গণ্য ছিলেন।

চার. রাজদরবারের বিচারকাজে অংশগ্রহণ

জৈন্তিয়া রাজ্যের শাসনপ্রণালী অনুযায়ী রাজদরবার বা রাজসভাতেই সকল বিচারকাজ সম্পন্ন হতো। রাজসভার সদস্যরা দরবারে বসে রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি অপরাধের ঘটনারও বিচার করতেন। এমনকি তারা পারিবারিক সমস্যা কিংবা সম্পত্তি বন্টন সংক্রান্ত সমস্যারও সূরাহা করতেন। অনেক সময় এসব বিষয়ে রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ফরিয়াদকারি ব্যক্তি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয়ের আলোকে ধর্মগুরুদের মতামত নেওয়া হতো। হযরত কাশিম শাহ জৈন্তিয়ায় আগমনের পর রাজদরবারের এমন প্রয়োজনে (মুসলমান নাগরিকদের ক্ষেত্রে) ইসলাম ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি রাজদরবারের বিচারিক কাজের প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে রায় বা সিদ্ধান্ত জানাতেন। রাজদরবারের বিচারকাজে সহায়তার এই দায়িত্বটি ছিল একটি রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি হযরত কাশিম শাহ জৈন্তিয়ার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারেও মনোযোগী ছিলেন।

পাঁচ. মোকামবাড়িতে ইসলামী খানকাহ স্থাপন

দীর্ঘকাল থেকে জৈন্তিয়ায় যেসব মুসলমানরা বসবাস করে আসছিলেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন শিয়া রীতিনীতির প্রচলন ছিল। তারা আশুরার দিনে তাজিয়া মিছিল, কারবালার জারী পাঠ ও মাতমের আয়োজন করতেন। এমনকি ইমাম হোসেনের কৃত্রিম মোকাম বানিয়ে তাতে চেরাগ বাতিও প্রজ্জলন করতেন। এসব মোকামে নেয়াজ-নজর-মানত ও শিন্নি-সওগাত চলতো। এমনকি রাজারাও এসব মোকামের জন্য চেরাগী মহাল নামে নিষ্কর ভূমি দান করতেন। রাজ্যে মসজিদ ছিল না বললেই চলে; মোকামই ছিল মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান। হযরত কাশিম শাহ জৈন্তিয়ায় এসেই বুঝতে পারলেন, জৈন্তিয়ার মুসলমানদের মধ্য থেকে এসব রীতি-নীতি দূর করতে হলে সঠিক ধর্মশিক্ষা প্রচারের বিকল্প নেই। এ উদ্দেশে তিনি রাজা বড়গোসাঁই প্রদত্ত বাড়িটিকে তালিম-তরবিয়তের কেন্দ্রে পরিণত করলেন। বাড়িটি ছিল একই সাথে বসতবাড়ি, খানকাহ, যিকির-আযকার এবং ধর্মীয় শিক্ষালাভের কেন্দ্র। জনসাধারণের মধ্যে এটি 'মোকামবাড়ি' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। রাজদরবারের দক্ষিণ পাশের বিশাল জায়গাজুড়ে ছিল বাড়িটির অবস্থান।

একপাশে একটি পুরানো মোকামের অস্তিত্ব থাকায় এটি ‘মোকামবাড়ি’ নামে পরিচিতি পেয়েছিল।[50]



চিত্র: মোকামবাড়ির রাজকীয় ফটক

[50] এই মোকামটি কার বা কাদের তা জানা যায় না। হতে পারে যে, এটি পূর্ববর্তী শতকে জৈন্তিয়ায় আগত কোন পাঠান সরদারের মোকাম অথবা কোন আউলিয়ার মোকাম। জৈন্তিয়ার রাজাদের কাছে এই মোকামটির বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। মোকামটি রাজকীয়ভাবে নির্মিত এবং এর অবস্থান রাজদরবারের একেবারে পাশেই। দেখে মনে হয় যে, এটি কোন রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মোকাম ছিল। দুঃখের ব্যাপার হলো, জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্যের সঙ্গে ওই ব্যক্তিটির পরিচয়ও হারিয়ে গেছে।

রাজা বড়গোসাঁই হযরত কাশিম শাহকে এই বাড়িটি দিয়েছিলেন আনুমানিক ১৭৬৫ সালে। তখন থেকে এটি ক্রমশ ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। রাজদরবারের নিকটস্থ এই বাড়িটিতে রাতদিন ইসলামী তা'লিম-তরবিয়ত এবং জিকির-আজকার চলতো। সাধারণ মুসলমানরা এখানে এসে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতেন। জৈন্তিয়াব্যাপী বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে এই বাড়িটির ভূমিকা ছিল ব্যাপক। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি জৈন্তিয়ার ইসলামী ঐতিহ্যের একটি মূল্যবান উপাদান। হযরত কাশিম শাহের বংশধররা আজও এখানে বসবাস করছেন। রাজার আমলের স্মৃতি নিয়ে এই বাড়ির ফটকটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। তবে রাজা বড়গোসাঁই এখানে যে ঘরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন সেটির কোন চিহ্ন এখন আর নেই। ১৮৯৭ সালের ভুমিকম্পে এটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরপর ১৯১১ সালে আগুন লেগে এটি পুরোপুরিভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

ছয়. মোকামবাড়িতে কিতাবের দরসখানা স্থাপন

সেনাপতি ফতেহ খাঁ মোকামবাড়ির উত্তরপাশে একটি মসজিদ স্থাপন করেছিলেন। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হওয়ার পর তারা এই মসজিদটিও ভেঙ্গে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় হযরত কাশিম শাহ মোকামবাড়িতেই একটি অস্থায়ী মসজিদ চালু করলেন। এসব ঘটনা ১৭৬৭ সালের। তখন থেকে পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত জয়ন্তীপুরের মুসলমানরা মোকামবাড়ির অস্থায়ী মসজিদেই নামাজ আদায় করেছিলেন। ওই সময়ে বন্দরহাটিতে একটি বিশাল রাজকীয় মসজিদের নির্মাণকাজ চলছিল। রাজা বড়গোসাঁই ফতেহ খাঁ-কে হত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বন্দরহাটিতে ওই রাজকীয় মসজিদটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৭৬৯ সালে রাজকীয় মসজিদটি নির্মিত ও চালু হয়ে গেলে হযরত কাশিম শাহ মোকামবাড়ির অস্থায়ী মসজিদটি বন্ধ করে দেন এবং এটিকে একটি কিতাবের দরসখানায় পরিণত করেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা মূলত এই দরসখানা থেকেই। হযরত কাশিম শাহ এই দরসখানায় তাঁর ছাত্রদেরকে ইসলামের ধর্মের বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

জৈন্তিয়া রাজ্যে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা প্রতিষ্ঠায় এই দরসখানার প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। হযরত কর্তৃক খানকাহ ও দরসখানা

প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দুই শতক ধরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা অর্জনে জৈন্তিয়ার মুসলমানদের আগ্রসরতা চোখে পড়ার মতো। হযরতের বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত ইতিহাস থেকে জানা যায়, মোকামবাড়িতে নির্মিত এই দরসখানাটি বহুবার সংস্কারের মধ্য দিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত টিকেছিল। এটিকে সর্বশেষ সংস্কার করা হয়েছিল ১৯২৪ সালে। ওই বছর হযরতের বংশের বিশিষ্ট সন্তান জনাব সিকান্দার আলী খন্দকার মোকামবাড়িতে একটি নতুন বসতঘর নির্মাণের সময় পুরানো দরসখানাটিকে সংস্কার করে নিজের বৈঠকখানায় পরিণত করেছিলেন। তখন থেকে অগণিত সরকারি আমলা, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকগণ এ বৈঠকখানার মেহমান হয়েছিলেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সাদউল্লাহ (১৯৩৭ অথবা ৩৮ সালে), সিলেটের ডিসি খোরশেদ আলম, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, রুকুনুজ্জামান খান দাদাভাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ ঘরের অতিথি হয়েছিলেন।



চিত্র: ১৯২৪ সালে নির্মিত মোকামবাড়ির বসতঘর

সৈয়দ মূর্তাজা আলী তাঁর *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* বইটি রচনার কাজে জৈন্তিয়ায় আসার পর একাধারে ১৫ দিন এই ঘরেই থেকেছিলেন। খন্দকার সাহেবের কাছ থেকে তখন তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাস বিষয়ক প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন। খন্দকার সাহেব ছিলেন বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীদের অধিকার আদায়ের প্রাণপুরুষ। তাঁর কর্মতৎপরতার কারণে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মোকামবাড়ি ছিল বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীদের অঘোষিত সদরদপ্তর। ওই সময়ে জৈন্তিয়া ১৭ পরগনার বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে মোকামবাড়ির বৈঠকখানাতেই। ১৯৫৬ সালে খন্দকার সাহেবের মৃত্যুর পর থেকে এটি পড়ার ঘর এবং লাইব্রেরি ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সর্বশেষ এটি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২০০২ সাল থেকে ঘরটি আর কোন কাজে ব্যবহৃত হয়নি। পরিত্যক্ত ও অতিজীর্ণ হওয়ার কারণে ২০২২ সালে ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। তবে খন্দকার সাহেবের বানানো বসতঘরটি আজও মোকামবাড়িতে টিকে আছে এবং তাঁর বংশধররা সেখানেই বসবাস করছেন।

সাত. রাজার কাছ থেকে জমিদারী লাভ

জৈন্তিয়ায় আগমনের পর থেকে হযরত কাশিম শাহ দিন-রাত ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। রাজদরবারের বিচারকাজে সহায়তার পাশাপাশি খানকাহ ও দরসখানা পরিচালনায় নিজের পুরো সময়কে কাজে লাগাতেন। নিজ পরিবারের জীবিকার জন্য অন্য কিছু করার মতো সময় তাঁর হাতে ছিল না। রাজা বড়গোসাঁই হযরতের এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। কাশিম শাহের জীবিকার জন্য তিনি বিশাল ভূ-সম্পত্তি দান করলেন। মৌজাখলা, চৈলাখেল, কাকুনাখাই, সতীপুর ও ধর্মগ্রামে এসব ভূমি ছড়িয়ে ছিল। ভূমিগুলো ছিল উর্বর ও সহজে চাষযোগ্য। ভূমিগুলো যারা চাষবাস করতেন তারা উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ ভূমি মালিকের কাছে পৌঁছে দিতেন অথবা দৈহিক শ্রম দিয়ে ভূমি মালিককে সন্তুষ্ট করতেন। এই বিশাল জমিদারী লাভ করায় হযরতকে আর কখনোই নিজ পরিবারের জীবিকার কথা ভাবতে হয়নি। জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে তিনি বেশ স্বচ্ছলভাবেই জীবন অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন। জীবিকার ভাবনা না থাকায় তিনি বাকি জীবন নির্বিঘ্নেই ধর্মসাধনা চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। হযরতের বংশধরেরাও যুগ যুগ ধরে এই জমিদারি ভোগ করে

যেতে পেরেছিলেন। তাঁর বংশধরদের দেওয়া তথ্যমতে, ১৯১০ সাল পর্যন্ত তারা এসব জমির উপস্বত্ত ভোগ করেছিলেন।

আট. মোকামবাড়ির রহস্যময় মোকাম

মোকামবাড়ির উত্তরপাশে একটি রাজকীয় ও দৃষ্টিনন্দন মোকাম রয়েছে। এই মোকামটির কারণেই মোকামবাড়ি নামটির উদ্ভব হয়েছে। মোকামটির আকার দেখে মনে হয় এর ভেতরে কয়েকজনের কবর রয়েছে। তবে কার বা কাদের কবর এখানে রয়েছে সে ব্যাপারে জৈন্তিয়ার ইতিহাসে কোন তথ্য নেই। জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের যেসব মূল্যবান তথ্য চিরতরে হারিয়ে গেছে তার মধ্যে এই মোকামে শায়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পরিচয়ও রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও জৈন্তিয়ার ইতিহাস গবেষকরা এই তথ্যটি উদ্ধার করতে পারেননি। রাজকীয়ভাবে নির্মিত হওয়ায় এবং রাজদরবারের একেবারে নিকটবর্তী হওয়ায় মোকামটি যে কোন সাধারণ লোকের মোকাম নয় তা বেশ সহজেই বলে দেওয়া যায়।



চিত্র: মোকামবাড়ির রহস্যময় মোকাম

যে বা যারা এখানে শায়িত আছেন তারা তাদের সমসাময়িক রাজার কাছে বেশ সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য ছিলেন। অন্যথায় তাদেরকে রাজদরবারের পাশে কবরস্থ করা হতো না এবং কোন রাজকীয় মোকামও নির্মিত হতো না। যে রাজা এই মোকামটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁরও পরিচয় মেলেনি। শুধু এটুকুই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মোকামটি নির্মিত হয়েছিল ১৭৬৫ সালের আগে অর্থাৎ হযরত কাশিম শাহের জৈন্তিয়ায় আগমনের পূর্বে। জৈন্তিয়ার রাজারা মুসলমান জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ (ধর্মীয়ভাবে কিংবা সামাজিকভাবে) ব্যক্তিদেরকে খুবই সম্মান ও খাতির করতেন। হযরত কাশিম শাহের জৈন্তিয়ায় আগমনের বহু আগে থেকেই রাজাদের এমন মনোভাব ছিল। তাঁর প্রমাণ এই মোকামটি। কাশিম শাহের মৃত্যুর পর তাকে এই মোকামের পাশে সমাহিত করাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তা হয়নি। কাশিম শাহকে সমাহিত করা হয়েছিল একটু দূরে, মোকামবাড়ির পশ্চিম পাশে। তবে কাশিম শাহের কয়েকজন বংশধরকে এই মোকামের পাশে সমাহিত করা হয়েছিল।

নয়. হযরত কাশিম শাহের মোকাম

হযরত কাশিম শাহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৭৭১ সালে। মৃত্যুর পর তাকে মোকামবাড়ির পশ্চিম পাশে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিস্থলে একটি অনুচ্চ দেয়াল রয়েছে। এই দেয়ালবেষ্টিত সমাধি বা মোকামটি হযরত কাশিম শাহের একার নয়। এর ভেতরে মোট তিন জনের কবর রয়েছে। কাশিম শাহের পুত্র ময়না শাহ এবং ময়না শাহের পুত্র কাদির বখসের কবরও এখানে রয়েছে। কাদির বখস মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৮৯৭ সালে। খুব সম্ভবত, কাশিম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর কবরের দুই পাশে পর্যাপ্ত জায়গা রেখে দেয়ালটি তোলা হয়েছিল। পরে এই দেয়ালের ভেতরে, তাঁর দুপাশে বাকি দুজনকে সমাহিত করা হয়েছিল। মোকামটি বর্তমানে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের ঠিক পাশেই অবস্থিত। ১৯১৮ সালের ল্যান্ড সার্ভের নকশাতে এটিকে আলাদা দাগ দ্বারা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছিল। এর পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালে সিলেট-শিলং হাইওয়ে চালু করার সময় মোকামটিকে রাস্তার বাইরে রাখা হয়েছিল। পাক আমলে এবং বর্তমান বাংলাদেশের নতুন সার্ভেতেও এই মোকামটিকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। বর্তমানের জৈন্তাপুর উপজেলা সদরের বাসস্ট্যান্ড থেকে সামান্য দক্ষিণে, মহাসড়কের পূর্ব পাশে মোকামটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে।



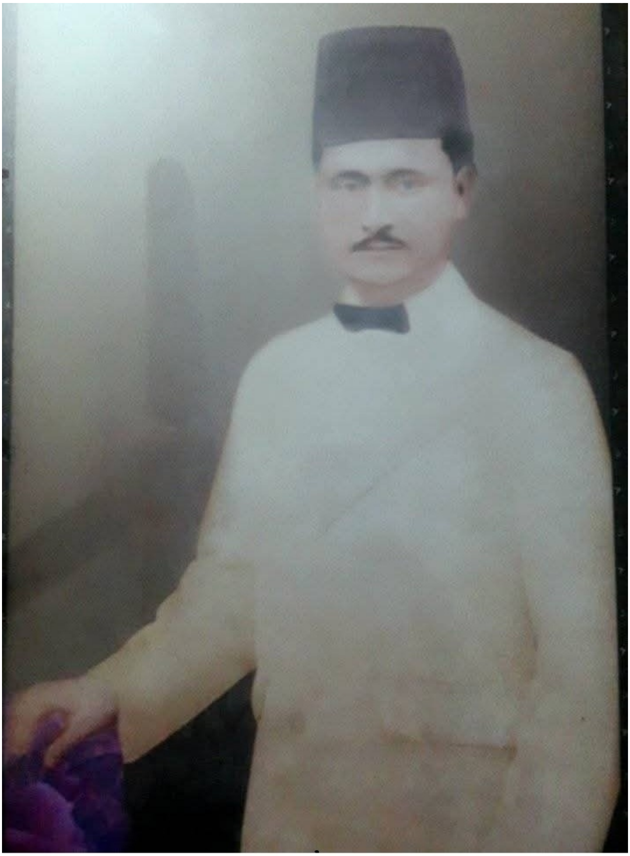
চিত্র: হযরত কাশিম শাহের মোকাম

দশ. হযরতের বংশের সূর্যসন্তানের কথা

হযরত কাশিম শাহের বংশের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন জনাব সিকান্দার আলী খন্দকার। তিনি মোকামবাড়িতেই বসবাস করতেন এবং জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের উত্তরসূরিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর পরিচয় অনেক। ব্রিটিশ আমলের শেষ তিন দশকজুড়ে এবং পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে তিনি বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি বৃহত্তর সিলেটের খিলাফত আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হিসেবে নাম কুড়িয়েছিলেন। তখন তিনি সিলেটের নর্থ সার্কেলের লোকাল বোর্ড মেম্বার ছিলেন। **১৯২১** সালে তিনি এ বোর্ডের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন।[51]

---

[51] এ সংবাদে খুশী হয়ে জৈন্তিয়ার শেষ পেনশনভোগী রাজা (প্রতিকী রাজা) কুমার ছত্রসিংহ নৃপ খন্দকার সাহেবকে একটি জার্মান ল্যাম্প উপহার দিয়েছিলেন। জার্মান



চিত্র: জনাব সিকান্দার আলী খন্দকার

কোম্পানি এইচ.কে.এস. কর্তৃক নির্মিত সেই ল্যাম্পটি আজও ওই পরিবারের কাছে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। হযরত কাশিম শাহের বংশধরদের সাথে জৈন্তিয়ার রাজা বা প্রতীকী রাজাদের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সর্বশেষ প্রতীকী রাজা ছত্রসিংহের কন্যা ইরাদেবীও এই পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

তখন থেকে মোকামবাড়ি হয়ে ওঠে বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত খন্দকার সাহেব সিলেট ডিস্ট্রিক্ট জজের জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বৃহত্তর জৈন্তিয়াবাসীদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে ওঠা সংগঠন জৈন্তিয়া ল্যান্ড হোল্ডার সমিতি নামক সংগঠনেও তিনি দীর্ঘদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন। এ সমিতির একটি দলিল থেকে জানা যায় তিনি সংগঠনটির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন। জৈন্তিয়ার ইতিহাস সংরক্ষণেও জনাব খন্দকার সাহেবের প্রচুর অবদান রয়েছে। জৈন্তিয়ার ইতিহাস গবেষকদেরকে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে তিনি সহায়তা করেছেন। এছাড়াও পারিবারিক ডায়েরি ও টালি খাতায় তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের যেসব মূল্যবান তথ্য লিখে গিয়েছেন সেগুলো আজও এ রাজ্যের ইতিহাস গবেষণায় কাজে লাগছে। জনাব খন্দকার সাহেবের ডায়েরি থেকে জানা যায়, হযরত কাশিম শাহ তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য মূল্যবান কাজের পাশাপাশি দুটি ধর্মবিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এ দুটি গ্রন্থের নাম হল- সিরাজুল ক্বলব এবং সুলতান জমজমা।

<u>জৈন্তিয়া রাজ্যে মুসলমানদের অভিবাসনের ঘটনাক্রম নিম্নরূপ</u>

১৭৪০ জৈন্তিয়া-মোগলান সন্ধিচুক্তি এবং ঢাকার নায়েবে নিজাম নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ-র সাথে ভৈরবী কুয়ঁরীর বিবাহ।

১৭৫৫ ঢাকার নায়েবে নিজাম নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ-র মৃত্যু।

১৭৫৭ ব্রিটিশদের হাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পতন।

১৭৬৫ ভৈরবী কুয়ঁরী, ফতেহ খাঁ এবং হযরত কাশিম শাহ মুর্শিদাবাদী (রাহ.)-র জৈন্তিয়ায় আগমন।

১৭৬৫ রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই কর্তৃক হযরত কাশিম শাহকে রাজকীয় বাড়ি (মোকামবাড়ি) প্রদান এবং সেই বাড়িতে ধর্মীয় খানকা চালু।

১৭৬৭ ফতেহ খাঁ-র মৃত্যু, ফতেহ খাঁ-র মসজিদ ধ্বংস এবং রাজা বড়গোসাঁইয়ের প্রায়শ্চিত্ত। মোকামবাড়িতে অস্থায়ী মসজিদ স্থাপন এবং রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই কর্তৃক বন্দরহাটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু।

১৭৬৯ বন্দরহাটি মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন এবং সেই মসজিদে নামায আদায় শুরু। মোকামবাড়ির অস্থায়ী মসজিদ বন্ধ এবং সেই স্থানে কিতাবের দরসখানা (জৈন্তিয়ার প্রথম মাদ্রাসা) স্থাপন।

অধ্যায় একুশ
বড়গোসাঁই ও কাশাসতীর ভূমিদান

১৭৭০ সালে রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু লীলাপুরী স্বামীর ধর্মনিষ্ঠা ও সদুপদেশে মোহিত হয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই লীলাপুরী স্বামী ছিলেন রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক সদ্যনির্মিত রাজকীয় কালীমন্দিরের সেবায়েত। তিনি যাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে মন্দিরের অর্চ্চনাসহ সকল ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য রাজা বড়গোসাঁই ও রানী কাশাসতী তাকে বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। রাজা বড়গোসাঁই লীলাপুরীকে ওই রাজকীয় মন্দিরসহ ১৯২ কেদার বা ১৬ হাল দেবোত্তর ভূমি দান করেছিলেন।[52] ১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালের একটি তাম্রফলকে এসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ফলকটিতে লেখা রয়েছে, রাজা বড়গোসাঁই সিংহ সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাঁর পরিবারের সদস্যদের (বোন, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী প্রমুখ) সম্মতিতে এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী উমাউপ্লার লস্কর এবং সেনাপতি মাণিক্য রায় এর উপস্থিতিতে লীলাপুরী স্বামীকে একটি মন্দির ও ১৯২ কেদার জমি দান করলেন।[53]

এক. রাজা বড়গোসাঁইয়ের ভূমিদানের দলিল

জৈন্তিয়া এবং এর প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে ভূ-সম্পত্তি দানের লিখিত দলিল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাম্রলিপির প্রচলন ছিল (এর মানে হচ্ছে, ভূ-সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে সাধারণত তাম্রপত্র বা তাম্রফলকে দলিল রচনা করা হতো)। জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রফলক ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তার সবগুলোই হল রাজা বা রানী কর্তৃক ভূ-সম্পত্তি দানের দলিল। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরানো ফলকটি ১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালের। এটি হল রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি দানের একটি দলিল। ফলকটির গায়ে উল্লিখিত তারিখ ১৬৯২ শকাব্দের ১৭ কার্তিক। এটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও

[52] ১ হাল = ৩.৪ একর = ১০.৫ বিঘা = ১২ কেদার

[53] রাজার প্রধানমন্ত্রীর নাম থেকে ধারণা করা যায় যে, তিনি একজন পাহাড়ি সিন্টেং ছিলেন। ভূ-সম্পত্তি দানের বেলায় রাজার ভাগিনেয় এবং ভাগিনেয়ীর সম্মতি গ্রহণের ব্যাপারটি মাতৃকূলভিত্তিক সিন্টেং রীতির পরিচায়ক।

অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত। জৈন্তিয়ার শেষ প্রতীকী রাজা কুমার ছত্রসিংহ নৃপ তাকে এই ফলকটি দেখিয়েছিলেন। অধ্যাপক গুপ্ত এই ফলকের লেখাগুলোকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে এর উপর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে এই প্রবন্ধটি *Jaintiapur Copper Plate Inscription of Badagosayi* শিরোনামে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধে বর্ণিত অনুবাদটি (তাম্রফলকের) নিচে তোলে ধরা হল।

Jaintiapur Copper Plate Inscription of Badagosayi, 1692 (A.D. 1770)

By Prof. Kishori Mohan Gupta
Assam Educational Service

Translation.

Om (expressed in Symbol). To Sri Sri Lilapurisvami, the great sage (who is like) the earth encircled by the creeper of merit acquired by his distribution of knowledge day after day (1-2).

Om (expressed in symbol). To Sri Sri Lilapurisvami, the great sage (who is like) the earth encircled by the creeper of merit acquired by his distribution of knowledge day after day (1-2).

King Sri Sri Badagosayi Simha, the Purandara (i.e. king) of the beautiful Jayantipura which (or whose reputation) is maintained by the fame acquired by the crushing into pieces of enemy's head with the arrow thrown from the bow held by violently strong hands, having taken to the life of a sannyasi (ascetic) and having accepted "paramahamsa mantra" (the vow of a great mendicant) from the mouth of Sri Sri Lilapurisvami, he now resides in the abode of an Avadhuta (after assuming) the name of Sri Sri-mad Rajapuri avadhuta (2-6). After having given a temple, he has made over one hundred and ninety-two Kedaras of land with all rights abandoned to his preceptor's

feet for the maintenance of that (temple) as well as for pleasing his spiritual preceptor, Sri Sri Lilapuri (6-8). Wherever that land should be given with cultivators and tenants, it should be announced in (popular) language (8-9). Now this is given with the permission of the members of his own family-sister's husband, younger sister, nephew, husband of sister's daughter and niece (who are respectively) Sri Urakhada Kuyara, Srimati Gaurikuyari, Maharajadhiraj srimad Chatrasimha, Sri Jatakuyara and Srimati Sunakuyari. This deed of gift of land by king Sri Sri Badagosayi Simha, is made in presence of the Prime minister, Sri Umaupnar Laskara and of the General, Sri Manikya Raya. In another language (9-15): with all rights given up I endow, on the whole 16 Halas of land including Banachirakhala (attached to) Kharilagrama, with cultivators and tenants, (which were) formerly in my possession, for your maintenance (15-17). I have not right upon this land. The right of gift, sale and enjoyment is yours as you will (17-18). If at any time any one having been born in my line subjugates this land or any other person dominates over it, then he eats the food not to be eaten by his caste, and his wife becomes, as if, his mother (19-21). For this purpose, I have executed this deed of land-grant (21-22). Dated the 17th Kartika, Wednesday, the twelfth day of the moon in her Bright fortnight, Sakabada year 1692 (lines 22-23).

দুই. রাজা বড়গোসাঁইয়ের ভূমিদানের আরও তথ্য

হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, চন্দ্রগ্রামের অধিবাসী সেনাপতি পরিবারের তিনজন পূর্বপুরুষ জৈন্তিয়া রাজ্যের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রথম সেনাপতি ছিলেন গজেন্দ্র কিশোর রায়। তিনি অল্পদিনের জন্য রাজা বড়গোসাঁইয়ের সেনাপতি ছিলেন। চন্দ্রগ্রাম নামটি এসেছে তাঁর ভাতিজা হরচন্দ্রের নাম থেকে। হরচন্দ্রের ভাতিজা মাণিক্য রায় দীর্ঘদিন রাজা বড়গোসাঁইয়ের সেনাপতি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই মাণিক্য

রায়কে রাজা বড়গোসাঁই বাউরভাগ রাজের ব্রাহ্মণগ্রাম ও গড়াইগ্রাম থেকে ভূমি দান করেছিলেন। এছাড়াও মাণিক্য রায়ের মাতা রুক্ষিনী দেবীকে তিনি বাউরভাগ রাজের নিজ বাউরভাগ থেকে ২০ হাল ভূমি দান করেছিলেন। মাণিক্য রায়ের কোন পুত্রসন্তান ছিল না।

তাঁর কন্যার ঘরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছিল। এই শিশুটির নাম ছিল বিজয় সিংহ। এই বিজয় সিংহকে রাজা বড়গোসাঁই বেশ কিছু ভূমি দান করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল বাউরভাগ রাজের নিজ বাউরভাগ গ্রাম থেকে ২৭৯ বিঘা, ব্রাহ্মণগ্রাম থেকে ১৪ বিঘা এবং গড়াইগ্রাম থেকে ৩১ বিঘা। বিজয় সিংহ বড় হয়ে রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের সেনাপতি হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল দূর্গা দেবী। ব্রিটিশদের জৈন্তিয়া দখলের পরে বড়গোসাঁইয়ের দান করা ভূ-সম্পত্তিগুলোকে বিধবা দূর্গা দেবীর কাছে নিষ্কর মহাল হিসেবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। দূর্গা দেবী সিলেটের ডেপুটি কালেক্টর জর্জ লকের সামনে উপস্থিত হয়ে তাম্রপত্রে ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছিলেন। বিজয় সিংহ ও দূর্গা দেবীর বংশধররা দীর্ঘদিন ধরে এসব জমি ভোগ-দখল করেছিলেন।

১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালে রাজা বড়গোসাঁই লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে দুটো জায়গা থেকে ভূমি দিয়েছিলেন। খরিল রাজের নয়াবাড়ীখলা থেকে লীলাপুরীকে দেওয়া হয়েছিল ১৬৭ বিঘা ভূমি আর নিজপাট থেকে দেওয়া হয়েছিল কালীমন্দিরসহ ৩ বিঘা ভূমি (নিজপাটের কালীমন্দিরটিরও লীলাপুরীর নামে তাম্রফলকে লিখে দেওয়া হয়েছিল)। রাজা বড়গোসাঁই কেবল লীলাপুরীকেই ভূ-সম্পত্তি দান করেননি। হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায় নামক আরেকজন সন্ন্যাসীকেও তিনি ভূমি দান করেছিলেন। কালীমন্দির নির্মাণের কিছুদিন পূর্বে রাজা ও তাঁর পত্নী রানী কাশাসতী দেবী হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায়ের কাছ থেকে ইশ্বরাধনার নিমিত্তে মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। এরপর রাজা ওই সন্ন্যাসীকে সাতবাক রাজের নয়ামাটি মৌজা থেকে ৬০ হাল ভূমি দিয়েছিলেন।[54]

---

[54] মোহাম্মদ আবদুল আজিজ তাঁর *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* পুস্তকে নয়ামাটি মৌজার ৬০ হাল ভূমির কথা লিখেছেন। কিন্ত সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থে লিখেছেন, হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায়কে রাজা বড়গোসাঁই পূর্ব ঠাকুরের মাটি থেকে ৯৩৫ বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন।

১৭৭০ সালে বিনোদ রায় লস্কর নামে এক ব্যক্তি রাজাকে তিনটি বন্দুক উপহার দিয়েছিলেন। এতে খুশী হয়ে রাজা বিনোদ রায়কে নিজপাট থেকে ২৩ বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন। দুমাই ভাট নামক এক ব্যক্তিকে তিনি খরিল পরগনার লামা মহাইল থেকে ৩ বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন। রাজা বড়গোসাঁই সবচেয়ে বড় আকারের ভূমি দান করেছিলেন চেরাপুঞ্জির সিয়েম যাত্রাসিংহকে। তাকে ফতেপুর ও আঙ্গারজুর নামক দুটি বড় বড় গ্রাম উপহার দেওয়া হয়েছিল। আড়াইখা রাজের অন্তর্গত ফতেপুরের আয়তন ছিল ১০,৩৫৫ বিঘা। আর পিয়াইনগুল রাজের অন্তর্গত আঙ্গারজুরের আয়তন ছিল ৩,৫৮৫ বিঘা।

তিন. রানী কাশাসতীর ভূমিদানের তথ্য

রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রী রানী কাশাসতী দেবীর জন্ম হয়েছিল পঞ্চখণ্ডের এক ব্রাহ্মণের ঘরে। ছোটবেলা থেকেই তিনি বেশ ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন এবং রাজা বড় গোসাঁইয়ের রাজত্বের সমাপ্তির পর অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। ওই সময়ে তিনি বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। লীলাপুরী সন্ন্যাসী, দয়ালপুরী সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দ গোস্বামী, হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায়, লক্ষ্মীকৃষ্ণ উপাধ্যায় প্রমুখ ধর্মগুরুকে তিনি নিজস্ব জুলাই মহালের ভূমি দান করেছিলেন। এছাড়াও রাজাদের সম্মতিতে তিনি কিছু ভূমি দান করেছিলেন। সিন্টেং রাজবংশের দীর্ঘ শাসনামলে রানী কাশাসতীর মতো এতোবেশি ভূ-সম্পত্তি দানের নজির আর কেউ দেখাতে পারেননি। জৈন্তিয়া থেকে উদ্ধারকৃত তাম্রফলকগুলোর বেশিরভাগই হল রানী কাশাসতীর ভূ-সম্পত্তি দানের দলিল।

বিভিন্ন রাজাদের সময়ে তিনি এসব ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। রাজা বড়গোসাঁই যখন লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে ভূমি দান করেছিলেন তখন রানীও এই সন্ন্যাসীকে বেশ কিছু ভূমি দিয়েছিলেন। ১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালে রানী কাশাসতী দেবী লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে বর্ণফৌদ রাজের ঝিঙ্গাবাড়ী মৌজা থেকে ৮৫ বিঘা এবং বাউরভাগ রাজের দলইকান্দি মৌজা থেকে ৪৫ বিঘা ভূমি দেন। এছাড়াও ১৭৮৮ সালে তিনি এই সন্ন্যাসীকে বাজেরাজ রাজের নিজ গোবিন্দপুর মৌজা থেকে আরও ২২ হাল ভূমি দেন। ১৮০১ সালে তিনি আবারও লীলাপুরীকে পূর্বফৌদ গ্রাম থেকে ২.৫ হাল ভূমি দেন। ১৭৮৮ সালে তিনি দয়ালপুরী সন্ন্যাসীকে বাজেরাজ রাজের লামা গোবিন্দপুর মৌজা থেকে ২৯২

বিঘা ভূমি দেন। এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং ভূমিদানের দলিলগুলো (তাম্রফলকসমূহ) থেকে রানী কাশাসতীর আরও অনেক ভূমিদানের তথ্য পাওয়া যায়।

জৈন্তিয়া রাজ্যে নিত্যানন্দ গোস্বামী একজন প্রভাবশালী ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁর মূল বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলার উঠনী গ্রামে। সেখান থেকে জৈন্তিয়ায় এসে তিনি বৈষ্ণব মতবাদের প্রচার শুরু করেছিলেন। তাঁর এই ধর্মীয় মিশন বেশ সফল হয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ (শাসনকাল: ১৭৯০ – ১৮৩২ সাল) এই ধর্মগুরুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধা রানী কাশাশতী দেবীও তাঁর দ্বারা বেশ প্রভাবিত ছিলেন। সবচেয়ে বেশি ভূমি তিনি তাকেই দান করেছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি এই ধর্মগুরুকে পাঁচভাগ রাজের চিকনাগুল থেকে ৩৫ হাল ভূমি দেন (সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বর্ণনায় ৫৩৫ হাল ভূমির কথা এসেছে। হয়তো টাইপিং ভুলের কারণে ৩৫ হাল '৫৩৫ হাল' হয়ে গিয়েছে।)

এছাড়াও ১৮০৫ সালে তাকে বাজেরাজের অন্তর্গত ধর্মপুর থেকে ২৪ হাল ভূমি, রাধানগর থেকে এক দফায় ৩৭ হাল ভূমি এবং আরেক দফায় ২৬ হাল ১০ কেদার ভূমি দেন। নিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র জগবন্ধু গোস্বামী ব্রিটিশ আমলেও নিষ্কর মহাল হিসেবে এসব ভূমি ভোগদখলের অধিকার পেয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালের ২৯ মার্চ তিনি সিলেটের ডেপুটি কালেক্টর জর্জ লক সাহেবের সামনে (কানাইঘাটস্থ ক্যাম্পে) উপস্থিত হয়ে তাম্রপত্রে এসব ভূমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। ধর্মগুরু হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায়কে রানী কাশাসতী বাজেরাজের ধনপুর গ্রাম থেকে ২৭২ বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন। ধর্মগুরু লক্ষ্মীকৃষ্ণ উপাধ্যায়কে তিনি বাজেরাজের নন্দীরাই থেকে ৮৮ বিঘা এবং শিবনগর থেকে ১৭২ বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন।

চার. রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল

রানী কাশাসতীর ভূমিদানের একাধিক দলিল (তাম্রফলক) ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে। স্যার এডওয়ার্ড গেইট এবং অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত এসব তাম্রফলকের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাদের রচনা থেকে জানা যায়, রানী কাশাসতী দেবী রাজা বড়গোসাঁইয়ের পরবর্তী চারজন রাজার সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে তাম্রফলকের দলিলে

দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন। স্যার এডওয়ার্ড গেইট এমন তিনটি ফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ফলকটি ছিল তিনটি আলাদা সময়ের (১৭১০, ১৭২৪ ও ১৭২৫ শকাব্দ) ভূমিদানের দলিলসমূহের একটি সংকলন। দ্বিতীয় ফলকটি ছিল ১৭২৭ শকাব্দের ভূমিদানের দলিল এবং তৃতীয় ফলকটি ছিল ১৭৩৫ শকাব্দের ভূমিদানের দলিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইটের *Report on the Progress of Historical Research in Assam (page 16)* পুস্তকে এই তিনটি তাম্রফলকের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

এই তিনটি তাম্রফলকের মধ্যে প্রথমটির ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত। তবে তিনি এই ফলকের দ্বিতীয় দলিলটিকে ১৭২৩ শকাব্দের (১৭২৪ এর স্থলে) দলিল বলে উল্লেখ করেছেন। রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক গুপ্ত স্যার এডওয়ার্ড গেইটের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি ১৭২৫ সালের একটি পৃথক তাম্রফলক আবিষ্কার করেছিলেন যা এডওয়ার্ড গেইটের হস্তগত হয়নি। এটি ডৌডিক গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল। তাই অধ্যাপক গুপ্ত এটিকে 'ডৌডিক তাম্রফলক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই তাম্রফলকটি নিয়েও তিনি বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল *আসাম রিসার্চ সোসাইটির জার্নালে* (১৯৩৩ সালে) আর দ্বিতীয়টি ছাপা হয়েছিল *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* (১৯২৩ সালে)। প্রবন্ধদ্বয়ে উল্লিখিত ফলক দুটোর ইংরেজি অনুবাদসমূহ হুবহু নিম্নরূপ।

The Jaintiapur Copper Plate Inscription of Mahadevi Kasasati

Deted Sakabda 1710 (A.D. 1788), 1723 (A.D. 1801) and 1725 (A.D. 1803)

By Dr. K.M. GUPTA, M A, Ph D.

TRANSLATION

(First Side)

(Thus) written by the queen of king Badagosayi, the Purandara of Jayantipura: land measuring twenty-two halas of Govindapur village along with (its) tennants have been given

by me to Kalikadevi for her pleasure, with all (my) rights abandoned and with the permission of Sri Gaurkumari, Sri Sunakumari, Sri Jayantikumari and also of king Sri-Sri Vijayanarayana, for the discharge of worship of Sri-Sri-Kalikadevi (estiblished) in Sri-Sri-Lilapuri Sannyasi's abode (matha) (Line 1-10). The stealer of what is given as gift will become a Chandala. For this purpose (i.e. for gift) this copper-plate has been written in 1710 Sakabda when the Moon was in the place of Brihsapati. (This has been) verily writen in the month of Paush (Line 11-14). Land measuring four halas of land is given (to the writer) for writing this (copper-plate). Of these (four halas) two halas are from Nayavanakhala and the rest from the eastern part of Dalaikandi village (Line 15-16). Later on (was given) the pasture and water-tank off Govindapur village. Later on, two halas of land have been given for Kalikadevi's pleasure derived from the service (performed) by the Brahmanas and the oil-presser (attached to) by the Brahmana and the oil-presser (attached to) the monastery (matha) and the temple (Line 17-19). Later on, land measuring two halas in Nayavanakhala (lit. New Forest Clearings) of Devipura have been given to Sri Vishnu for the pleasure of Sri Vishnu (Line 20-28).

(Second Side)

(Salutation to) Sri Durga. On the 25th of Ashadha in 1723 Sakabda (A.D. 1801) land measuring two and a half halas, (that is), thirty kedaras in (Village) Purvaphauda attached to Nayavana is given by the queen named Sri Sri Kasayi, wife of king Badagosayi for the pleasure of Sri Sri Kalikadevi (Line 1-8).

Later on, in 1725 Sakabda (A.D. 1803) two halas of land (that is), twenty-four kedaras lying in (village) Dalaikandi, and measured with the rod, eight cubits long, have

been given by Srimati Kasasatidevi, wife of king Badagosayi for pleasure of Sri-Radha-Krishna and for the cremony of ‘doljatra’ of the (two) 'manchas' (cradle-beds) lying in the Kalika-matha and at Ujaninagara. Document (executed) on the 13th day of Agrahayana. (Line 9-16).

With seven halas…………………..…?

Daudig Copper Plate Inscription of Kasasati, Sakabda, 1725 (A.D. 1803).

By Prof. Kishori Mohan Gupta

TRANSLATION

Om. Salutation to Siva.

In Sakabada 1725 (expresed in astronomical language) king Ramasimha having given his consent (...*), a few pieces of land left (to her) by king Badagosayi have been given, in this city of Jayantipura, for (the purpose of) pleasing Sambhu, Lord of the Avadhutas (religious mendicants) as well as (for the pleasure of) the Bhudhara-image of Sri-Vasudeva, by Kasangadevi, wife of (Badagosayi), after deliberations with (her) sons and with the approval of the younger (lines 1-4).

Explanation of this (as follows, line 4)

By the mahadevi (queen) named Srimati Kassasati, wife of king Badagosyi Simha (have been given) half yasti (of land) in the village named Pirlakandi, and half yasti (of land) in the village named Dharmapura for pleasing Siva, lord of the Avadhutas, jagannatha, and Budhara, the incarnation of Vasudeva (residing) in the village named Dauding (lines 4-7).

The boundary of these two village: in the East, the land attached to half of Nandirai, in the West land attached to Dhanapura in the North the land attached to Chaura and Dhanapura, and in the South land attached to Jayantiapura and

Kachairkandi (lines 7-9): In the East land attached to Chaura in the West land attached to Sivanagar, in the North the river named Dhadapadia and in the South land attached to Dhanapura and Pirlakandi (lines 9-11).

Land measuring four halas together with Haripalka's land measuring half a hala (lying) between these (two village) was formerly given away for pleasing the Siva-phallus at Badaghata (lines 11-12).

With the exceeption of this (pice of land) the whole of the inhabited region measuring twenty-four halas with tenants is given in the true sense of the term (...*) (lines 12-24).

It is also true that upon these no ownership either mine or of my son, exists. No one would be able at any distance of time to take away (these). This (grant?) exists by merits of Avadhutas (...*). I have no pride (in making this grant). (This is to be judged) by the learned (...*). Document (written on) the 22nd day of the month Kartika (lines 14-17).

* The blank spaces (...) have been left for the unreadable or untypable symbols/ characters/ words/ sentences of the original article. – Asif Ajhar

অধ্যায় বাইশ
রাজা বড়গোসাঁইয়ের ভূমিদানের দলিল
১৬৯২ শকাব্দের (১৭৭০ সালের) তাম্রফলক

জৈন্তিয়া রাজ্যের শেষ প্রতীকী রাজা কুমার ছত্রসিংহ নৃপের কাছে জৈন্তিয়া রাজ্যের বিভিন্ন মূল্যবান দলিল সংরক্ষিত ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি এসব দলিলের অধিকারী হয়েছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালের একটি তাম্রফলক। এটি ছিল রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের আমলের সবচেয়ে মূল্যবান দলিল। এই দলিলে রাজা তাঁর ধর্মগুরু লীলাপুরী স্বামীকে জয়ন্তীপুরের রাজকীয় কালীমন্দিরসহ ১৯২ কেদার ভূমি দান করেছিলেন। তাম্রফলকটির ভাষ্য অনুযায়ী, ১৬৯২ শকাব্দে রাজা বড়গোসাঁই তাঁর ধর্মগুরু শ্রী শ্রী লীলাপুরী স্বামীর মুখ থেকে পরমহংস মন্ত্র গ্রহণ করে সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশ করেন এবং 'শ্রী শ্রীমদ রাজপুরী' নামধারণ করেন। একই সাথে রাজা লীলাপুরীর হাতে রাজকীয় মন্দিরের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ওই মন্দিরের সেবাসহ অন্যান্য ধর্মীয় কাজের নিমিত্তে লীলাপুরীকে ১৯২ কেদার ভূমি প্রদান করেন।

তাম্রফলকে এটাও বলা হয়েছে যে, রাজা তাঁর পরিবার সদস্যদের সম্মতিতেই লীলাপুরী স্বামীর হাতে মন্দির ও ভূ-সম্পত্তি তোলে দিয়েছেন। রাজার পরিবারের যেসব সদস্যের সম্মতিতে দানকার্য্যটি সম্পন্ন হয়েছে তারা হলেন রাজার বোন শ্রীমতী গৌরীকুয়ঁরী, গৌরীকুয়ঁরীর স্বামী শ্রী উরাখাদা কুওর, রাজার ভাগিনেয় (গৌরীকুয়ঁরীর পুত্র) মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ ছত্রসিংহ, রাজার ভাগিনেয়ী (গৌরীকুয়ঁরীর কন্যা) শ্রীমতি সোনাকুয়ঁরী এবং সোনাকুয়ঁরীর স্বামী শ্রী যাতাকুওর। ভূ-সম্পত্তি দানের সাক্ষী হিসেবে তাম্রফলকে আরও দুজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলেন, রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী শ্রী উমাউপ্পার লস্কর এবং রাজ্যের সেনাপতি শ্রী মাণিক্য রায়।

জৈন্তিয়া থেকে প্রাপ্ত সবচেয়ে পুরানো এই তাম্রফলকটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত।[55] ১৯২০ এর

[55] অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত ছিলেন একাধারে একজন শিক্ষক, লেখক ও গবেষক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদকসহ এম.এ. ডিগ্রি অর্জনের পর

দশকের প্রথমদিকে তিনি জৈন্তিয়ার প্রতীকী রাজা কুমার ছত্রসিংহ নৃপের কাছ থেকে এই ফলকের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর তিনি ফলকটিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং এর উপর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। *Jaintiapur Copper Plate Inscription of Badagosayi* শিরোনামে এই প্রবন্ধটি *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* (১৯২৩ সালে) প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি হুবহু নিচে তোলে ধরা হল।

JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, VOL XIX (1923) (PAGE 331–335)

Jaintiapur Copper Plate Inscription of Badagosayi, 1692 (A.D. 1770)

By Prof. Kishori Mohan Gupta
Assam Educational Service

Preliminary

This copper plate is in the custody of the present "raja" of Jaintiapur who kindly showed me the inscription. I understand it is the property of the Mohanta of the temple of Kali at Jaintiapur (26 miles from Sylhet). On examination I found it to be the same as is briefly noticed by Sir Edward Gait in his *Report on the progress of Historical Research in Assam*, page 16. "This plate sets forth that the king, Badagosain Simha, having become a sannyasi, makes grant of 192 kedaras of land to Lila Puri Swami, with the consent of his nephews and nieces, including his successor, Chattra Simha. and in the

---

লন্ডন থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তিনি ছিলেন আসাম এডুকেশনাল সার্ভিসের অধীনে পরিচালিত 'মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট' এর ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। পরবর্তীতে তিনি 'বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা' এর ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস সংরক্ষণে তাঁর অনন্য অবদান রয়েছে।

presence of his Prime minister, U. Maupnar Laskar, and the commander-in-chief, Manikya Ray.”

I edit and publish the inscription for the first time.

The plate measures 6.5" x 8.5" and has an upper projection in the middle with a hole in it evidently for the purpose of suspending the plate. The royal seal is just beneath this projection. It consists of three circles, one within another. The circle in the middle is composed of dots. Within the inmost circle there is the design of a jumping lion with its head turned towards the right, over a creeper or a bunch of lilies. The diameter of the seal is 1.875" It is nearly the same as is to be found in the other Jaintiapur Plates.

The inscription consists of 23 lines, and the language is Sanskrit up to line 15 and Bengali from line 15. It is throughout prose. There are a few orthographical errors, principally due to dialectic provincialism, e.g. …* for…* (lines 17-18) …* for …* (line 19) …* for …* (line 20), etc. There are also syntactical mistakes, such as the instrumental case-ending for the sixth case-ending in …* (line 4-5), omission of euphonic combination, etc. The characters are modern Bengali with slight modifications, e.g. the doubling of a letter is indicated by the addition of a …* to it. The …* is like Bengali …*. The inscription as pointed out refers itself to the reign of Badagosayi, who is the 17th king in descent in the line of Jaintia kings, and presumably reigned from 1731 to 1770 A.D. (See *J.A.S.B. 1895*, vol. lxiv, page 246). It is dated Kartik 17, Sakabda 1692 (1770 A.D.).

TEXT

1. ओम्[1] अनुदिनज्ञानवितरणजनितपुण्यवल्लीवलयितभूमण्डल[2]श्रीश्री-
लीलापुरिस्वा
2. मियोगिवरेषु ॥ प्रचण्डदोर्दण्ड गृहीतकोदण्ड निक्षिप्तकाण्ड खण्ड-
खण्डीकृ
3. तारिमुण्डजनित कीर्त्तिपरिपालितसुनगरजयन्तीपुरपुरन्दरश्रीश्री-
वड़
4. गोसायि सिंहभूपालः स एव सन्न्यासग्रहणात्[3] श्रीश्रीलीलापुरि-
स्वामि
5. ना वक्त्रात् परमहंसमन्त्रं गृहीत्वा अवधूताश्रमे[4] श्रीश्रीमद्राजपुरिअ
6. वधूत[5] इति ख्यातिमान् विराजते स एव मठमन्दिरं दत्वा तन्निर्व्वा-
हार्थं
7. [6]श्रीश्रीगुरोर्ल्लीलापुरि प्रीत्यर्थञ्च तच्चरणे दानवत्यधिक शतकेदार
8. परिमिताभूमिः स्वत्वपरित्यागेनार्पिता सा भूमिर्यत्र कृषकमनुष्यैः
9. सह दातव्या [7]तद्भाषां ज्ञातव्या परन्तु स्वपरिवाराणां [8]स्वष्टप
10. ति अनुजाभागिनेय [9]स्वष्टजापतिभागिनेयीनां श्रीउरखाड़कु
11. यर श्रीमती गौरीकुयरी श्रीमत् श्रीक्षत्रसिंहमहाराजाधिराज
12. श्रीजाताकुयर श्रीमतीशुनाकुयरीणामनुमत्या [10]तदत्वा श्रेष्ठमन्त्रि
13. णोः श्रीउमउपनारलस्कर श्रीमाणिक्य राय सेनापत्योर्व्वर्त्तमाने
14. श्रीश्रीवड़गोसायिसिंहभूपालस्य भूदानपत्रिकेयं विराजते [11]तरा
15. परं भासया[12] ॥ आगे आमार अधिकारेते खरिलग्रामर
16. वानाक्किरखलामवलग १६८८ षोल हाल भूमि कृषाण मनुष्यसमेत

[1] Expressed by a symbol.

[2] Read ०लीलापुरी०

[3] Read ०लीलापुरीस्वामिनो

[4] Read गृहीत्वावधूताश्रमे

[5] Read ०राजपुर्य्यवधूत

[6] Read ०गुरुर्लीलापुरी०

[7] Read तद्भाषायां

[8] Read स्वष्टपत्यनुजा०

[9] Read स्वष्ट०

[10] Read ताम् दत्वा वा सा दत्ता

[11] Read तराम्

[12] Read भाषया

17. तुमार[1] सेवार निमित्त आमार स्वत्वपरित्यागे दिलाम एइ भूमिर उ

18. पर आमार स्वत्व नाइ यथेच्छ दानविक्रयभोगाधिकार तुमार[1] ए

19. ते यदि [2]कुनकाले आमार राजवंशेते उत्पन्न हइया एइ भूमिके
ये अ

20. धिकार करे आर अन्य वा केय[3] अधिन[4] करे तबे ये जातिर ये
द्रव्य भक्ष[5] ना

21. हय ताके भक्ष[6] करे आर तार स्त्रि[7] तार माता समान हय एत-
दर्थे भूदान

22. पत्र लेखिया दिलाम इति शकाब्दा १६६२ साल तेरिक [8]१७
कार्त्तिक वुदवार[9]

23. तिथि सुक्ला द्वादशि[10] ॥

Translation.

Om (expressed in Symbol). To Sri Sri Lilapurisvami, the great sage (who is like) the earth encircled by the creeper of merit acquired by his distribution of knowledge day after day (1-2).

Om (expressed in symbol). To Sri Sri Lilapurisvami, the great sage (who is like) the earth encircled by the creeper of merit acquired by his distribution of knowledge day after day (1-2).

King Sri Sri Badagosayi Simha, the Purandara (i.e. king) of the beautiful Jayantipura which (or whose reputation) is maintained by the fame acquired by the crushing into pieces of enemy's head with the arrow thrown from the bow held by violently strong hands, having taken to the life of a sannyasi (ascetic) and having accepted "paramahamsa mantra" (the vow of a great mendicant) from the mouth of Sri Sri Lilapurisvami, he now resides in the abode of an Avadhuta (after assuming) the name of Sri Sri-mad Rajapuri avadhuta (2-6). After having given a temple, he has made over one hundred and ninety-two Kedaras of land with all rights abandoned to his preceptor's

feet for the maintenance of that (temple) as well as for pleasing his spiritual preceptor, Sri Sri Lilapuri (6-8). Wherever that land should be given with cultivators and tenants, it should be announced in (popular) language (8-9). Now this is given with the permission of the members of his own family-sister's husband, younger sister, nephew, husband of sister's daughter and niece (who are respectively) Sri Urakhada Kuyara, Srimati Gaurikuyari, Maharajadhiraj srimad Chatrasimha, Sri Jatakuyara and Srimati Sunakuyari. This deed of gift of land by king Sri Sri Badagosayi Simha, is made in presence of the Prime minister, Sri Umaupnar Laskara and of the General, Sri Manikya Raya. In another language (9-15): with all rights given up I endow, on the whole 16 Halas of land including Banachirakhala (attached to) Kharilagrama, with cultivators and tenants, (which were) formerly in my possession, for your maintenance (15-17). I have not right upon this land. The right of gift, sale and enjoyment is yours as you will (17-18). If at any time any one having been born in my line subjugates this land or any other person dominates over it, then he eats the food not to be eaten by his caste, and his wife becomes, as if, his mother (19-21). For this purpose, I have executed this deed of land-grant (21-22). Dated the 17th Kartika, Wednesday, the twelfth day of the moon in her Bright fortnight, Sakabada year 1692 (lines 22-23).

Notes.

The notes appended to my *Dhupi Copper Plate inscription of Ramasimha* (J. and P., A.S.B., new series, Vol. XVIII, 1922, No. 1, August 5) should be referred to in this connection.

The inscription is an important land-mark in the history of Saivism in this eastern part of India. It manifests the vigorous

influence exercised by this form of Hinduism on the non-Aryan Syntengs of the Jaintia Hills.

It is noteworthy that though the Synteng kings of Jaintiapur had adopted Hinduism they followed their tribal custom as to matters of succession. The society being matriarchal, the nephew (son of the sister), and not the son of the reigning king, was the heir-apparent to the throne.

The villages Kharil and Vanasirkhala still go by the same names and are within the jurisdiction of the Jaintiapur thana in the district of Sylhet.

Appendix.

A Coin from Jaintiapur, Sylhet (Assam)

This coin is in the possession of the "raja" of Jaintiapur, and is dated Sakabda 1653 (A.D. 1731). (Sir) Edward Gait also notices a coin of this year in the *J.A.S.B., 1895*, Vol. LXIV, part 1, page 243, and ascribes it to the reign of Badagosayi Simha, the king whose inscription is published herewith.

The characters are Bengali and the language Sanskrit,

(Text).

	Obverse		Reverse
1.	श्रीश्रीज	1.	श्रीँश्रीप्रि
2.	यन्तीपुरपु	2.	व चरणा क
3.	रन्दरष्य प्रा	3.	मल मधुक
4.	के १६५३	4.	रष्य ✡

(Translation).

Obverse: Of the Purandara (i. e. king) of Sri-Sri Jayantipura. In Sakabda 1653 (A.D. 1731).

Reverse: Om (expressed in svmbol). Of the Bee of the Lotus-feet of Sri-Sri Siva. (A satkona symbol).

Weight: about 162 grains.

Metal: Silver, apparently very pure. I have not been able to get it chemically examined.

Shape: Round, the edge being plain and not milled. Around the inscriptions there are three circles, one inside another. The circle in the middle is composed of dots The “Om” symbol has been put along with the middle circle, and there is a feather- design just above the first line of the Reverse side. The diameter of the coin is 1.1".

---

* The blank spaces (...) have been left for the unreadable or untypable symbols/ characters/ words/ sentences of the original article. – Asif Ajhar

অধ্যায় তেইশ
রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল

জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রফলক (মোট সাতটি) ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তার মধ্যে চারটিই হল রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল। এসব তাম্রফলকের একটিতে তিনটি পৃথক সময়ের ভূমিদানের কথা লেখা রয়েছে। আর বাকী তিনটিতে আরও তিনটি সময়ের ভূমিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম তাম্রফলকটি ১৭১০ শকাব্দ বা ১৭৮৮ সালের। এতে রানী কর্তৃক লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। ১৭২৪ শকাব্দে (মতান্তরে ১৭২৩) রানী আরও কিছু ভূমিদান করেন। ১৭১০ শকাব্দের তাম্রফলকের উল্টোপাশে এই ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। লিপির নিচের কিছু অংশ খালি ছিল। ১৭২৫ শকাব্দে সেখানেও নতুন ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। কেন এমন করা হল সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা কিছু বলেননি। এর সম্ভাব্য কারণ তাম্রফলকের দুষ্প্রাপ্যতা (সে যুগে তামা ছিল একটি মূল্যবান ধাতু এবং তাম্রফলক খুব একটা সহজলভ্য ছিল না)।

রানী কাশাসতী কর্তৃক তিনটি আলাদা ভূমিদানের তথ্য সম্বলিত তাম্রফলকটি জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের উত্তরসূরীদের হাতে ছিল। ব্রিটিশ আমলে এটি জৈন্তিয়ার রাজবাড়ীতেই সংরক্ষিত ছিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইট ফলকটির সন্ধান পেয়েছিলেন সেখানেই। তিনি আরও চারটি ফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন যার মধ্যে দুটি ছিল রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল। এগুলো ১৭২৭ ও ১৭৩৫ শকাব্দের। এসব তাম্রফলকের কথা তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটির নাম *Some Notes on Jaintia History (1895).* এতে তিনি জৈন্তিয়া থেকে প্রাপ্ত মোট পাঁচটি তাম্রফলকের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।[56]

রানী কাশাসতী কর্তৃক তিনটি আলাদা ভূমিদানের তথ্য সম্বলিত তাম্রফলকটি (১৭১০ শকাব্দের) অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্তের নজরেও এসেছিল। তিনি

---

[56] স্যার এডওয়ার্ড গেইট জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে তিনি কোন গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেননি। তিনি কেবল একটি প্রবন্ধে তাম্রফলকগুলোর বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯২২ সালে জৈন্তিয়ার রাজবাড়ীতে গিয়ে ফলকটি দেখেছিলেন। তাকে এটি দেখিয়েছিলেন জৈন্তিয়ার শেষ প্রতীকী (পেনশনভোগী) রাজা কুমার ছত্রসিংহ নৃপ। এই ফলকটি নিয়ে তিনি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা আসাম রিসার্চ সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইট রানী কাশাসতীর অপর যে দুটো তাম্রফলকের (১৭২৭ ও ১৭৩৫ শকাব্দের) কথা বলেছেন সেগুলো কখনও অধ্যাপক গুপ্তের হস্তগত হয়েছিল কি না তা স্পষ্ট নয়। তবে তিনি রানী কাশাসতীর একটি নতুন তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন (যা এডওয়ার্ড গেইট দেখেননি) এবং বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে এর উপর একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ফলকটি ১৭২৫ শকাব্দের এবং এটি ডৌডিক গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল। তাই অধ্যাপক গুপ্ত এটিকে 'ডৌডিক তাম্রলিপি' নামে অভিহিত করেছেন।

এক. ১৭১০ শকাব্দের (১৭৮৮ সালের) তাম্রফলক

১৭১০ শকাব্দের তাম্রফলকটি তিনটি ভিন্ন সময়ের ভূমিদানের দলিল। এই ফলকটিতে প্রথম লিপি খোদাই করা হয় ১৭১০ শকাব্দ বা ১৭৮৮ সালে। জৈন্তিয়ায় তখন রাজা বিজয়নারায়ণের শাসন চলছিল। তাঁর সম্মতিতে রানী কাশাসতী লীলাপুরী সন্ন্যাসীকে কিছু ভূমি দান করেন এবং তাম্রফলকে এর দলিল লিপিবদ্ধ করেন। ১৭২৩ শকাব্দে (১৮০১ সালে)[57] এই তাম্রফলকটিকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। ওই বছর ফলকটির অপর পৃষ্ঠে রানী কাশাসতীর একটি নতুন ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ করা হয়। এই লিপির নিচে ফলকের কিছু জায়গা খালি ছিল। ১৭২৫ শকাব্দে (১৮০৫ সালে) সেখানেও একটি নতুন ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ করা হয়।

অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত এই ফলকের পাঠোদ্ধার করেছিলেন। *জার্নাল অভ দি আসাম রিসার্চ সোসাইটির ১ম খণ্ডে* প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি ফলকের লেখাগুলোকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ফলকটির এক পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে, "জয়ন্তীপুরের পুরন্দর রাজা বড়গোসাঁইয়ের রানী এই মর্মে লিখছেন যে, কালিকাদেবীর সন্তুষ্টির জন্য আমি সকল স্বত্ত ত্যাগ করে গোবিন্দপুর গ্রামের ২২

---

[57] এডওয়ার্ড গেইটের মতে ১৭২৪ শকাব্দে (১৮০২ সালে)

হাল ভূমি প্রজাসহ দান করলাম। শ্রী গৌরিকুমারী, শ্রী সোনাকুমারী, শ্রী জয়ন্তীকুমারী এবং রাজা শ্রী শ্রী বিজয়নারায়ণের সম্মতিতে শ্রী-লীলাপুরী সন্ন্যাসীর আবাসস্থলে (মঠ) প্রতিষ্ঠিত শ্রী-শ্রী-কালিকাদেবীর পূজার জন্য এই অনুদান সম্পন্ন হল। (এই অনুদানের প্রমাণ হিসেবে) ১৭১০ শকাব্দের পৌষ মাসে এই তাম্রলিপিটি রচিত হল। এই তাম্রলিপির লেখককেও (তাম্রলিপি লেখার জন্য) চার হাল ভূমি দেওয়া হল। এর মধ্যে দুই হাল নয়াবনখলা থেকে এবং বাকি অংশ দলইকান্দি গ্রামের পূর্ব থেকে দেওয়া হল। গোবিন্দপুর গ্রামের চারণভূমি ও বিল থেকেও কিছু ভূমি দেওয়া হল।" এরপর ফলকে আরও দুটি ভূমি দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফলকটির অপর পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে, "১৭২৩ শকাব্দের ২৫ আষাঢ় তারিখে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রী রানী কাশাসতী কালীর সেবার নিমিত্তে নয়াবন সংলগ্ন পূর্বফৌদ গ্রামের আড়াই হাল অর্থাৎ ত্রিশ কেদার ভূমি দান করেছেন।" এই অংশের নিচে লেখা রয়েছে, "১৭২৫ শকাব্দের ১৩ অগ্রাহায়ণ তারিখে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রী রানী কাশাসতী শ্রী-রাধা-কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য এবং উজানীনগরে অবস্থিত কালীর মঠের দুটি দোলায় চড়িয়ে (রাধা-কৃষ্ণকে) দোলযাত্রা পালনের জন্য দলইকান্দি গ্রামের দুই হাল অর্থাৎ চব্বিশ কেদার ভূমি দান করেছেন। এই ভূমি আট হাত লম্বা রড দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছে।"

কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত *জার্নাল অভ দি আসাম রিসার্চ সোসাইটির ১ম খণ্ডে* অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত ১৭১০ শকাব্দের তাম্রফলক নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটি হুবহু নিম্নরূপ।

KAMARUPA ANUSANDHAN SAMITI
THE JOURNAL OF THE ASSAM RESEARCH SOCIETY,
Vol 1 (APRIL 1933) (PAGE 6- 9)

The Jaintiapur Copper Plate Inscription of Mahadevi Kasasati

Deted Sakabda 1710 (A.D. 1788), 1723 (A.D. 1801) and 1725 (A.D. 1803)

By Dr. K.M. GUPTA, M A, Ph D.

Preliminary

This copper plate records three grants made from time to time, namely, in Sakabda 1710, 1723 and 1725. A brief reference to this plate is made by Sir Edward Gait in his *Progress of Historical Research in Assam*, page 16, and by me in the *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, new series, vol. XIX, 1923*, No 8, page 323. I came across this plate about 1922. It was then in possession of Kumar Chatra Singh Nripa Bahadur of Jaintiapur. I now edit and publish the inscription for the first time.

The plate measures 5"×6" excluding a semi-circular projection of about 1" diameter coming out of the upper side. The projection has a hole in the top and a ring passing through it evidently for the purpose suspension. The royal seal is engraved just in the middle of the upper margin and is exactly like the one described in my *Dhupi Cooper Plate inscription of Ramsimha* (J. & P., A.S.B. New series, vol. XVIII, 1922, No. 1, p. 73). The plate was in good state of preservation when I saw it about ten years ago.

On the first side of the plate (written earlier) … … … … … *

The characters are modern Bengali with almost the same peculiarities as have been noticed in my Dhupi plate reffered to above, and are on the whole well-formed. The language is Sanskrit, but a curious mixture with Bengali is noticeable here and there. Gramatical rules of Sanskrit have not been strictly followed.

The first inscription dated Sakabda 1710 (A.D. 1788) records a grant of twenty halas of land by Mahadevi Kasasati, wife of king Badagosayi of Jaintiapur to the Godess Kalika established in Sri Lilapuri Snayasi's abode (matha), apparently at Jaintiapur. Besides, four halas are made over as gift to the

writer of the plate, and later on two halas more to the Brahmana and the oil-presser attending the Godess Kalika. The grant is made with the consent of certain princes and king Vijayanarayana. This shows that that grant had formed a part of the royal domain which has been pointed out in the *Dhupi plate* (J. & P.A.S.B., New Series, 1922, vol. XVIII, No 1, p 77).

Badagosayi's reign ended in 1770 A.D., he was succeeded by Chatrasingh (1770-1781), Jatranarayana (1781-1786) and Vijaynarayana (1786-1789). At the time of making the grant, Vijaynarayana was thus the reigning king and the queen-dowager (Kasasati) had to obtain his permission. As Badagosayi is called in the inscription 'Jayantapura-Purandara' … …* it seems that he was still live and was regarded as king *de jure* although he had abdicated the throne to become a Sannyasin (mendicant) in 1770 A.D. (*J. & P.A.S.B., XIX, 1923*, No. 8, p 333). At the time of making the next two grants, namely of A.D. 1801 and 1803, Ramsimha II (1790-1833 A.D.) was the reigning king, and Badagosayi is given the simple epithet of 'narapati', showing thereby that the later was no more in the land of the living. As there is no further mention of obtaining consent of any prince or princess to these later grants, it follows that they wrere made from out of her personal possessions.

For other interesting details regarding Jaintia history and culture reference may be made to my *Dhupi plate* (J. & P.A.S.B., XVIII, 1922, No 1, pp 73-79), *Daudig plat*e (J. & P.A.S.B., XIX, 1923, No 8 pp 323-329), *Jaintiapur plate* (J. & P.A.S.B., XIX, 1923, No 8 pp 331-335), and to the *Satak plate* (J. & P.A.S.B., XXV, 1929, No 1, pp 165-169), and *Jaintiapur plate* edited by my pupil, K.G. Goswami.

TEXT (EDITED FROM THE ORIGINAL)

(First Side)

1. শ্রীশ্রীজয়ন্তীপুর পরগণার বড় গুশাঞি [1]
2. নবপদেঃ শ্রীমহাদেব্যা লিখিতং শ্রীগৌ-
3. লাপুর্ সন্ন্যাসিনো [2] মঠস্থ শ্রীশ্রীকালি-
4. কা দেব্যঃ সেবা দ চলন নিমিত্তং শ্রীগৌ-
5. রীকুমারী শ্রীশুনাকুমারী শ্রীজয়ন্তীকুমা
6. রীণামম্মমধ্য শ্রীশ্রীবিজয়নারায়ণ রা-
7. জ্ঞো স্নুমত্যা চ শ্রীকালিকাদেবীনাম

. প্রীতযে গো বন্দপুর গ্রামজন সাহত দ্বা
9. বিংশতিহল পরিমিতা ভূমিঃ সহ [3] পরি-
10. ত্যাগেন ময়া শ্রীকালিকাদেব্যৈ দত্তা। এত
11. দ্ দান জন্যে যঃ অপহরণকর্ত্তা স চণ্ডাল-
12. স্তবতি [4] এতদর্থে লিখিতং তাম্রপত্রমি-
13. ত শুভ চন্দ্রাব্দ্যকে [5] শকাব্দে [6] গুরুগোবিন্দো
14. লিখিত তাম্রপত্রঞ্চ চাপার্কে স্থ [7] ময়া প্রদত্তং ॥

[1] Read গোসাঞি (Sans গোস্বামী)

[2] Read সন্ন্যাসিনো

[3] Read স্বত্ব

[4] Read এতদ্দানজন্যং যৎ (প্রদত্তং) তদা-
পহরণ কর্ত্তা চণ্ডালো ভবতি

[5] Read শ্যা

[6] Read শকাব্দে

Read e

15. লিপিহর্থং [1] হলু [2] চতুষ্টয় পরিমিতা ভূমিং দাত
(on the right margin of the first side)

16. ব্যং [3] এতৎমধ্যে [4] ন আ বনখলায়াং হলদ্বয়ং দলইকান্দি গ্রামে পূর্ব্ব [5] চ
(below the 15th line, but apart from it)

17. তৎপশ্চাৎ গোবিন্দপুর গ্রামাৎ গোচর জলাশয় [6]
(on the left margin of the first side)

18. তৎপশ্চাৎ মঠমন্দির ব্রাহ্মণ তৈল কারয়োঃ কালিকাদেব্যা সেবা

19. ন্দংস হলদ্বয়ং [7] দাতব্যং ॥
(on top margin of the first side and on the right of the seal.)

20. তৎপশ্চাৎ
21 দেবীপুরস্থ
22. ন আবনয
23. লায়াং হল
24. দ্বয় পরিমি-
(on the left of the seal)

25. তাম্র্মঃ শ্রী
26. বিষ্ণুপ্রীতয়ে
27. শ্রীবিষ্ণবে
28. সমর্পিতা

[1] Read লিপ্যর্থং

[2] Read হল

[3] Read ভূমির্দাতব্যা

[4] Read এতন্মধ্যে

[5] Read পূর্ব্বং

[6] Read জলাশয়ঃ। There is an inverted "anunasika" sign after জলাশয়ম্। Read also প্রদত্তঃ after জলাশয়ঃ।

[7] Read কালিকাদেব্যাঃ সেবানন্দং সহলদ্বয়ং

(Second Side)

শ্রীদুর্গা

শ্রীশ্রীকালিকাদেবী

1. এতদম্ব চতুর্ব্বিংশত্যধিক সপ্তদশ
2. মিতে শকাব্দে বড়গোশাযি সিং
3. হ নরপতেঃ পত্ন্যা শ্রীশ্রীকাশা
4. য়িসংজ্ঞক মহাদেব্যা ন আবন
5. সম্বন্ধিপুর্ব্বদোদে [1] সার্দ্ধহলম্ব-
6. য়েন ত্রিংশৎ কেদারপরিমিতা
7. ভূমিঃ ৵ শ্রীতয়ে ভূমি দত্তা [2]
8. ইতি আষাঢ়স্য পঞ্চবিংশত্যৌ।

(Written apart)

৬ তিযুলি

9. তত [3] পশ্চাৎ পঞ্চবিংশত্যধিক সপ্তদশ শ
10. ত শকাব্দে বড়গোসাযি সিংহনৃপতেঃ পত্ন্যা শ্রী-
11. মতী কাশাসত্তিদেব্যা দলৈকান্দি সম্বন্ধিহল দ্ব
12. য় পরিমিতেন চতুর্ব্বিংশতি কেদার ভূমির্ব্ব
13. স্বহস্তপ্রমাণমানদণ্ডেন শ্রীমৎরাধাকৃষ্ণশ্রী-
14. তবে শ্রীমৎকালিকামঠস্থোজা ননগরস্থ ম
15. ধ্বজোর্দ্দোলযাত্রার্থং তাভ্যাং দত্তা। মার্গস্থ ত্র
16. য়োদশদিবসীয়া লিপিরিতি।

(Written apart)

সমেত সপ্তহল পরিমিত মিদ্দমুমিতি [4]

---

[1] Read পূর্ব্ব ·

[2] Read ভূমিদত্তা। one ভূমি in the line is redundant.

[3] Read তৎ

[4] The last expression is not very clear. This line is probably a later interpolation done with the purpose of illegally increasing the quantity of land already alienated.

TRANSLATION

(First Side)

(Thus) written by the queen of king Badagosayi, the Purandara of Jayantipura: land measuring twenty-two halas of Govindapur village along with (its) tennants have been given by me to Kalikadevi for her pleasure, with all (my) rights abandoned and with the permission of Sri Gaurkumari, Sri Sunakumari, Sri Jayantikumari and also of king Sri-Sri Vijayanarayana, for the discharge of worship of Sri-Sri-Kalikadevi (estiblished) in Sri-Sri-Lilapuri Sannyasi's abode (matha) (Line 1-10). The stealer of what is given as gift will become a Chandala. For this purpose (i.e. for gift) this copper-plate has been written in 1710 Sakabda when the Moon was in the place of Brihsapati. (This has been) verily writen in the month of Paush (Line 11-14). Land measuring four halas of

land is given (to the writer) for writing this (copper-plate). Of these (four halas) two halas are from Nayavanakhala and the rest from the eastern part of Dalaikandi village (Line 15-16). Later on (was given) the pasture and water-tank off Govindapur village. Later on, two halas of land have been given for Kalikadevi's pleasure derived from the service (performed) by the Brahmanas and the oil-presser (attached to) by the Brahmana and the oil-presser (attached to) the monastery (matha) and the temple (Line 17-19). Later on, land measuring two halas in Nayavanakhala (lit. New Forest Clearings) of Devipura have been given to Sri Vishnu for the pleasure of Sri Vishnu (Line 20-28).

(Second Side)

(Salutation to) Sri Durga. On the 25th of Ashadha in 1723 Sakabda (A.D. 1801) land measuring two and a half halas, (that is), thirty kedaras in (Village) Purvaphauda attached to Nayavana is given by the queen named Sri Sri Kasayi, wife of king Badagosayi for the pleasure of Sri Sri Kalikadevi (Line 1-8).

Later on, in 1725 Sakabda (A.D. 1803) two halas of land (that is), twenty-four kedaras lying in (village) Dalaikandi, and measured with the rod, eight cubits long, have been given by Srimati Kasasatidevi, wife of king Badagosayi for pleasure of Sri-Radha-Krishna and for the cremony of ‘doljatra’ of the (two) 'manchas' (cradle-beds) lying in the Kalika-matha and at Ujaninagara. Document (executed) on the 13th day of Agrahayana. (Line 9-16).

With seven halas…………………….… ?

* The blank spaces (...) have been left for the unreadable or untypable symbols/ characters/ words/ sentences of the original article. – Asif Ajhar

দুই. ১৭২৫ শকাব্দের (১৮০৩ সালের) তাম্রফলক

স্যার এডওয়ার্ড গেইট রানী কাশাসতীর তিনটি তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন। এর পরবর্তীতে অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত রানী কাশাসতীর আরও একটি তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন। এটি ছিল ১৭২৫ শকাব্দের একটি ফলক। অধ্যাপক গুপ্ত জৈন্তিয়ার ডৌডিক গ্রামে এটির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই তিনি এটিকে 'ডৌডিক তাম্রলিপি' নামে অভিহিত করেছেন। এই ফলকটি নিয়ে তিনি একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা ১৯২৩ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ফলকটি লেখা হয়েছিল ১৭২৫ শকাব্দের ২২ কার্তিক তারিখে।



চিত্র: ১৭২৫ শকাব্দের ডৌডিক তাম্রলিপি

ফলকটিতে লেখা রয়েছে, "১৭২৫ শকাব্দে (জ্যোতির্বিদ্যার ভাষায় বর্ণিত) এই জয়ন্তীপুর শহরে রাজা রামসিংহের সম্মতিতে রাজা বড়গোসাঁইয়ের স্ত্রী কাসাঙ্গাদেবী (রানী কাশাসতী) কিছু ভূমি দান করলেন যা ছিল রাজা বড়গোসাঁইয়ের রেখে যাওয়া (রানীর কাছে) সম্পত্তি। নিজ পুত্রদের সাথে আলোচনা করে কনিষ্ঠদের সম্মতি নিয়েই শ্রী বাসুদেবের ভূধর মূর্তির সেবায় এবং অবদূতদের প্রভু শম্ভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রানী এসব ভূমি দান করেন। শিব, অবদূতদের প্রভু, জগন্নাথ এবং ভূধর, ডৌডিক গ্রামে অবস্থানরত বাসুদেবের অবতারের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাজা বড়গোসাঁই সিংহের স্ত্রী মহাদেবী (রানী) শ্রীমতী কাশাসতী পিল্লাকান্দি গ্রামের আধা যষ্টি এবং ধর্মপুর গ্রামের আধা যষ্টি ভূমি দান করেন।

পিল্লাকান্দি গ্রামের সীমানা হল: পূর্বদিকের ভূমি নন্দিরাইয়ের অর্ধেকের সাথে সংযুক্ত, পশ্চিমদিকের ভূমি ধনপুরের সাথে সংযুক্ত, উত্তরদিকের ভূমি চাউরা ও ধনপুরের সাথে সংযুক্ত এবং দক্ষিণদিকের ভূমি জয়ন্তীপুর ও কাছাইরকান্দির সাথে সংযুক্ত। ধর্মপুর গ্রামের সীমানা হল: পূর্বদিকের ভূমি চাউরার সাথে সংযুক্ত, পশ্চিমদিকের ভূমি শিবনগরের সাথে সংযুক্ত, উত্তরদিকের নদীর নাম ধাড়াপাড়িয়া এবং দক্ষিণদিকের ভূমি ধনপুর এবং পিল্লাকান্দির সাথে সংযুক্ত। অতীতে বাধাঘাটের শিবলিঙ্গের সেবার জন্য এই দুই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান থেকে হরিপালকার আধা হাল ভূমিসহ চার হাল ভূমি দান করা হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে এই ভূমিটুকু বাদ দিয়ে পুরো জনপদের চব্বিশ হাল ভূমি প্রজাসহ দান করা হল।

এটাও সত্য যে, এসব ভূমির উপর আমার বা আমার ছেলের কোন মালিকানা রইল না। পরবর্তীতে কেউ এসব ভূমি কেড়ে নিতে পারবে না। এই অনুদান অবদূতদেরই কৃতিত্ব। এতে আমার কোন গৌরব নেই। বিদ্বানরাই এর বিচার করবেন। কার্তিক মাসের ২২তম দিনে এই দলিলটি রচিত হল।"

১৯২৩ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত রানী কাশাসতীর ১৭২৫ শকাব্দের তাম্রফলক নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটি হুবহু নিম্নরূপ।

JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, VOL XIX (1923) (PAGE 323–329)

Daudig Copper Plate Inscription of Kasasati, Sakabda, 1725 (A.D. 1803).

By Prof. Kishori Mohan Gupta,
Assam Educational Service

Preliminary

While collecting materials for the construction of a history of the Jaintiaraj, I came across this copper plate in a rather out-of-the-way place called Daudig (Dauyadig according to the inscription), about twenty-four miles from the headquarters station of Sylhet and within the jurisdiction of the Jaintiapur Police Station. The plate is in the possession of the Sebaits (worshippers) of the gods to whom the grant is made. This inscription is for the first time brought to notice and edited by me.

The plate measures 6" x 4" and is connected to a hook with two chains, evidently for the purpose of suspension. The royal seal is engraved just in the middle of the upper margin and represents a jumping lion within three circles placed side by side. The circle in the middle is made of dots. The lion has its face turned to the left, having in front a semi-circle of dots. The seal is almost the same as is engraved in the *Dhupi Copper Plate Inscription of Ramasimha II* (see J. and P.A.S.B.Vol. XVIII, 1922, No. 1, p. 73), with this difference however, that the bunch of water lilies is absent in this plate. The plate has suffered a little damage immediately above the right-hand portion of the third line.

The inscription consists of 17 lines, excluding the invocatory line above the royal seal, two letters carved immediately

above the first line about its end, and two other lines written on the right side of the upper margin and at right angles to the main body of the inscription. The letters above the first line are ...* and ...* 3 which imply that the former should be placed to line 3 (after ...*).

The characters are modern Bengali with slight peculiarities evidently due to the inscriber's bad hand in writing. The characters are not generally well-shaped and the inscriber is open to the charge of carelessness, e.g. he has left out ...* after ...* in line 3 and has transposed ...* and the left curve of ...* in (...*) (line 2). He also appears to have made some omissions in lines 14-15.

The language of the inscription is Sanskrit but lines 7-11are a mixture of Bengali and Sanskrit, the first three lines and part of the fourth forming two stanzas of Upajati. But the prosody is not accurate. The first stanza seems to consist of three verses (pada) of Indravajra and one verse (the third) of Indravamsya. The second and third quarters are not however regular. In the second stanza, the third verse appears to be in irregular Vamsasthavila, the fourth in Indravajra and the rest in irregular Indravajra verses. There are also other grammatical errors. Orthographical mistakes such as ....* for ....*, ...* for ....* are due to dialectic provincialism. Syntactical errors are also common, e.g. .....* or ....* in line 2, the fifth case-ending for the third (line 5), the second case-ending for the sixth (line 11), neuter gender for feminine (line 14), etc. Instances of wrong euphonic combinations (sandhi) are to be found in lines, 7 and 12.

The inscription records a grant of land by Mahadevi (queen-dowager) Kasasati, wife of King Badagosayi of Jaintiapur, to the gods Siva, Jagannatha, and Vasudeva-bhudhara of the village Dauyadig, on the 22nd kartika, Sakabda, 1725 (1803

A.D.). The grant is made with the consent of the reigning king Ramasimha II, the third in succession from Badagosayi. Now, Badagosayi reigned from 1731 to 1770 A. D. and Ramasiniha II from 1790 to 1832 A.D. (*J A.S.B. 1895*, page 242: Gait's *History of Assam*, pp. 260-261). Queen Kasasati thus appears to have enjoyed a very long life. This pious queen made immense grant of land for religious purposes as the following inscriptions prove:

1. Copper Plate Inscription dated Sakabda 1710. This grant records another grant of land made in 1725 (Sakabada). It has been briefly noticed by Sir E. Gait in his *Report on the Progress of Historical Research in Assam*, page 16; and will be shortly edited and published by me.

2. Copper Plate Inscription dated Sakabda 1727, noticed by Gait (loq. cit)

3. The Plate under review, Sakabda, 1725.

4. Copper Plate Inscription dated Sakabda 1735 noticed by Gait (loq. cit.) This plate is noteworthy in this connection. Says Gait: "This is another grant by the same lady with the consent of Raja Ramasiniha of some land for the worship of the idols, Vasudeva, Jagannatha and Bhudhara." If ...* in line 1 of our inscription be taken to mean 3 then the date of the two inscriptions is the same, but the two plates are not identical since our plate refers to Siva, Jagannatha and Vasudeva-Bhudara, whereas Gait's to Vasudeva, Jagannatha and Bhudhara.

TEXT

ॐ[1] नम[2] शिवाय ।

श्रीमती[3] काशामती महादेव्याः ।

तइ[5]

1. [4]शाकेषु चन्तुर्म्मुणि चन्द्रसंख्ये दत्तावधूतेश्वर शम्भुप्रीत्यै श्रीवासु-
देवस्य च

2. [1]बुधरमूर्त्तेः श्रीरामसिंहन्टपतौ प्रहृष्टा[2]। भूमिर्व्वड़े गासायि-
न्टपवर्ज्जा[3]

3. [4]पत्याकाशाङ्कदेव्या [5]सुगणैर्व्विमृष्य संख्या कियत्यनुज्ञैः मता श्रीमज्ज

4. यन्तीपुरपत्तनेस्मिन[6]। अस्यार्थः। अथ वड़गोषायि सिंहभूपालपत्न्या

5. श्रीमत्या काशासत्याभिधान महादेव्याः[7] । डौ आडिगसंज्ञक-
ग्रामस्य अवधू

6. तेश्वर शिवजगन्नाथवौधरवतार वसुदेवानां[8] प्रीतये च। पिर्ह्ला-
कान्दि संज्ञक

7. [9]ग्रामर्द्धचष्टिः धर्म्मपूरसंज्ञक ग्रामर्द्धचष्टिः [10] अनयोर्ग्रामयोसीमा।
पूर्व्वे अ

8. द्धनन्दिराइ सम्बन्धीभूः पश्चिमे धनपुर सम्बन्धीभूः उत्तरे चाओरा
ओ धर्म्मपुर स

9. म्बन्धीभूः दक्षिणे जयन्तीपुर ओ काचाइरकान्दि सम्बन्धीभूः। पूर्व्वे
चाओरासम्ब

[1] Expressed in symbol. [2] Read नमः.

[3] The upper curves of तौ have been left out.

[4] The preceding symbol probably implies ओम्.

[5] "त" is to be inserted after सु in line 3.

10. न्धीभूः पश्चिमे शिवनगरसम्बन्धीभूः उत्तरे धड़पड़िआसंज्ञक नदी दच्चिने ध

11. न पूर ओ पिल्लाकान्दि सम्बन्धीभूः । एतयोर्म्मध्ये वड़घाटस्थशिव-लिङ्गं[11] प्रीतये चतु

12. र्हल परिमिताभूमिः हरिपल्कस्य सार्द्धहल परिमिताभूमिः प्राक-दत्ता[12] तदतिरि

13. क्त समुदायबाटिकाभूमिः २४) चतुर्व्विंशतिर्हल परिमिता जनसमे-तार्पर[13]

14. मार्थतो दत्तमिति[1] एतयोरुपरि ममैव पुत्राषादीभूत्तं[2] नास्त्येवेति सत्य[3]

15. अनयो कस्चित[4] कालान्तरे केनापि नेतुं सक्यते[5] तदोधोतेनापि[6] वर्त्तते

16. नमे[7] दर्पोस्तीति सुधीभिः[8]। कार्त्तिकमासस्य २२ द्वाविंशति-दिवसौ आलि[9]

17. पिरिति ॥

[1] Read भूधर०. [2] Read प्रहृष्टे Meter : उपजाति.
[3] Read ०वड़गोसायि०. [4] Read पत्नग्रा.
[5] Read सुतगणै०. [6] Read ०कस्मिन् Meter उपजाति.
[7] Omit विसर्ग. [8] Read ०भूधरावतार वासुदेवानां.
[9] Read ग्रामेऽर्द्धयष्टिः [10] Read ०ग्रामेऽर्द्धयष्टिः
[11] Read ०लिङ्गस्य. [12] Read प्राग्०.
[13] Omit रेफ in "र्प".

---

[1] Read दत्ता इति. [2] Read पुत्रस्यापिप्रभूत्वं.
[3] Read सत्यम्. [4] Read कस्मिंश्चित्.
[5] Read न शक्यते. [6] Read तदावधौतेनापि
[7] Read दर्पोऽस्तीति. [8] Read सुधीभिः (विभाव्यन्).
[9] Read द्दिवसीया०.

TRANSLATION

Om. Salutation to Siva.

In Sakabada 1725 (expresed in astronomical language) king Ramasimha having given his consent (....), a few pieces of land left (to her) by king Badagosayi have been given, in this city of Jayantipura, for (the purpose of) pleasing Sambhu, Lord of the Avadhutas (religious mendicants) as well as (for the pleasure of) the Bhudhara-image of Sri-Vasudeva, by Kasangadevi, wife of (Badagosayi), after deliberations with (her) sons and with the approval of the younger (lines 1-4).

Explanation of this (as follows, line 4)

By the mahadevi (queen) named Srimati Kassasati, wife of king Badagosyi Simha (have been given) half yasti (of land) in the village named Pirlakandi, and half yasti (of land) in the village named Dharmapura for pleasing Siva, lord of the Avadhutas, jagannatha, and Budhara, the incarnation of Vasudeva (residing) in the village named Dauding (lines 4-7).

The boundary of these two village : in the East, the land attached to half of Nandirai, in the West land attached to Dhanapura in the North the land attached to Chaura and Dhanapura, and in the South land attached to Jayantiapura and Kachairkandi (lines 7-9) : In the East land attached to Chaura in the West land attached to Sivanagar, in the North the river named Dhadapadia and in the South land attached to Dhanapura and Pirlakandi (lines 9-11).

Land measuring four halas together with Haripalka's land measuring half a hala (lying) between these (two village) was formerly given away for pleasing the Siva-phallus at Badaghata (lines 11-12).

With the exceeption of this (pice of land) the whole of the inhabited region measuring twenty-four halas with tenants is given in the true sense of the term (....) (lines 12-24).

It is also true that upon these no ownership either mine or of my son, exists. No one would be able at any distance of time to take away (these). This (grant?) exists by merits of Avadhutas (....). I have no pride (in making this grant). (This is to be judged) by the learned (....). Document (written on) the 22nd day of the month Kartika (lines 14-17).

NOTES.

1. The notes appended to my *Dhupi Copper Plate Inscription* (J. and P., A.S.B. Vol. XVIII, 1922 No 1 p. 73) should be referred to in this connection. In Jaintia society being matriarchal among the Syntengs, the throne passes to the nephew after the demise of the reigning king. The reigns of Chattrasing (c. 1770-88 A.D.) and Vijayanarayana (c. 1788-1790 A.D.) intervened between those of Badagosayi and Ramasimha II (Gait: *History of Assam*, 261-262). Ramasimha II was thus the nephew of Vijayanarayana, and was only distantly connected with queen Kasasati or Kasangadevi. The memories of this pious queen as well as of Badagosayi are still cherished by thousands in Jaintia for their deeds of charity.

The places mentioned in the inscription still go by the same designations.

2. The distinct existence of two kinds of land, namely, the Royal domain and private lands in the kingdom of Jaintia, has been referred to in my paper on the *Dhupi plate*. Lines, 2-3, of the *Daudig plate* make it clear that the reigning kings used to make assignments of land to members of the royal family evidently for their maintenance; and alienations by the assignee for religious purposes at least (here as Devottara),

required the sanction of the reigning monarch and permission of the assignee's successors.

In Jaintia the following system of land-measurement was and is still, in vogue:

3 krantis = 1 kada.
4 kadas = 1 ganda.
20 gandas = 1 pana.
4 panas = 1 rekha.
4 rekhas = 1 Yasti or Jasti.
7 yastis = 1 poa.
4 poas = 1 kedara or keyara.
12 kedaras = 1 hala = 10.5 bighas = about 3.4 acres.

3. The Jaintia sovereigns were eclectic so far as the different cults of Hinduism were concerned. They paid their homage equally to Siva, Sakti and Visnu. The Jaintiapur Copper Plate Inscription of Kasasati (to be shortly published) proves their devotion to Sakti (Kalika).

* The blank spaces (...) have been left for the unreadable or untypable symbols/ characters/ words/ sentences of the original article. – Asif Ajhar

তিন. ১৭২৭ শকাব্দের (১৮০৫ সালের) তাম্রফলক

স্যার এডওয়ার্ড গেইট জৈন্তিয়ার পাঁচটি তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনটি ছিল রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল। এগুলো ছিল ১৭১০, ১৭২৭ ও ১৭৩৫ শকাব্দের তাম্রফলক। *Some Notes on Jaintia History* প্রবন্ধে তিনি বেশ সংক্ষিপ্তাকারে এসব তাম্রফলকের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। গেইট সাহেব পুরানো দলিলের পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে সাধারণত অনুবাদকদের সাহায্য নিতেন। বৃহত্তর আসাম ও সিলেট অঞ্চলের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি মূলত তাদের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। জৈন্তিয়ার

তাম্রফলকগুলোর পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি যেসব অনুবাদকদের উপর নির্ভর করেছিলেন তারা নিজেদের কাজে খুব একটা সফল হতে পারেননি।

ধারণা করা যায় যে, ফলকগুলোর পরিভাষা বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য হওয়ায় তারা এগুলোর পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারেননি; যতটুকু পাঠোদ্ধার করেছিলেন গেইট সাহেব তাঁর প্রবন্ধে ততোটুকুই উল্লেখ করেছেন। ১৭২৭ শকাব্দের ফলকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে গেইট সাহেব লিখেছেন, এটি ছিল বিধবা রানী কাশাসতী কর্তৃক নিত্যানন্দ গোস্বামীকে ভূ-সম্পত্তি দানের দলিল। গেইট সাহেব এটাও উল্লেখ করেছেন যে, নিত্যানন্দ গোস্বামী ছিলেন রাজা রামসিংহের ধর্মগুরু। গেইট সাহেব তাঁর প্রবন্ধে ফলকটি সম্পর্কে যা লিখেছেন হুবহু তা নিম্নরূপ।

(4) *Copper plate, dated* 1727 *Çaka.*

This, like No. (2), records a grant by Kāsā Satī, widow of Baṛa Guçāĩ, the donee being one Nityānanda, the Guru of Rājā Rāma-siṁha.

চার. ১৭৩৫ শকাব্দের (১৮১৩ সালের) তাম্রফলক

স্যার এডওয়ার্ড গেইট জৈন্তিয়ার পাঁচটি তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন যার মধ্যে তিনটি ছিল রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল। এগুলো ছিল ১৭১০, ১৭২৭ ও ১৭৩৫ শকাব্দের তাম্রফলক। *Some Notes on Jaintia History* প্রবন্ধে তিনি বেশ সংক্ষিপ্তাকারে এসব তাম্রফলকের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। ১৭৩৫ শকাব্দের ফলকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে গেইট সাহেব লিখেছেন, এটি একই মহিলার (কাশাসতী) আরেকটি ভূমিদানের দলিল যাতে তিনি রাজা রামসিংহের সম্মতিতে বাসুদেব, জগন্নাথ ও ভূধরের উপাসনার নিমিত্তে কিছু ভূমি দান করেছিলেন। গেইট সাহেব তাঁর প্রবন্ধে ফলকটি সম্পর্কে যা লিখেছেন হুবহু তা নিম্নরূপ।

(5) *Copper plate, dated* 1735 *Çaka.*

This is another grant by the same lady, with the consent of Rājā Rāma-siṁha, of some land for the worship of the idols of Vasudēva, Jagannātha and Bhūdhara.[1]

[1] A curious feature about all these copper plates is that the seal at the top of them is almost identical with the device on the coins of the kings of Tipperah.

অধ্যায় চব্বিশ
ছত্রসিংহের শাসনামল

(১৭৭০ সাল – ১৭৭৪ সাল)

১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০ সালের তাম্রফলকের তথ্যগুলোর ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, রাজা বড়গোসাঁই ১৭৭০ সালেই সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর কারণ, ওই তাম্রফলকে একদিকে যেমন রাজা বড়গোসাঁইয়ের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তেমনি তাঁর ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী ছত্রসিংহকে 'মহারাজাধিরাজ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাজা বড়গোসাঁই তাঁর উত্তরাধিকারী ছত্রসিংহের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাম্রফলকের গায়ে উল্লিখিত তারিখ ১৭ কার্তিক ১৬৯২ শকাব্দ। দালিলিক বিবেচনায়, এই দিনেই রাজা সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং ছত্রসিংহ নতুন রাজা হয়েছিলেন।



চিত্র: রাজা ছত্রসিংহের চালু করা মুদ্রা (কাটরা টাকা)। মুদ্রার এক পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৯২। অপর পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য।

ছত্রসিংহ ছিলেন রাজা বড়গোসাঁইয়ের বোন গৌরিকুয়ঁরীর পুত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল উরাখাদা কুওর। তাঁর বোনের নাম ছিল সোনাকুয়ঁরী এবং বোনের স্বামীর নাম ছিল যাতাকুওর। যখন তিনি সিংহাসনে বসেন তখন জৈন্তিয়া

রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উমাউপ্পার লস্কর এবং সেনাপতি ছিলেন মাণিক্য রায়। ১৬৯২ শকাব্দের তাম্রফলকটিই এসকল তথ্যের উৎস।

এক. ব্রিটিশদের জৈন্তিয়া অভিযান (১৭৭৪ সাল)

রাজা ছত্রসিংহের আমলের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের হাতে জৈন্তিয়ার রাজধানীর পতনের ঘটনা। ১৭৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যরা জৈন্তিয়ায় আক্রমণ চালিয়েছিল। এর ফলে সাময়িকভাবে জৈন্তিয়ার রাজধানী তাদের হাতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই অভিযানটি চূড়ান্ত সফলতা পায়নি। জৈন্তিয়ার রাজাকে রাজধানী থেকে হটিয়ে দিলেও শেষ পর্যন্ত তারা আবার রাজার হাতেই রাজ্য তোলে দিয়ে নিজেদের সীমানায় ফিরে গিয়েছিল। এই অভিযানের মূল হোতা ছিলেন সিলেটে নিযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কালেক্টর বা রাজস্ব কর্মকর্তা উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে। তিনি সিলেটে এসেছিলেন ১৭৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে। তিনি ছিলেন একাধারে সিলেটের রাজস্ব কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক এবং পুলিশ প্রধান। এর পাশাপাশি তিনি সিলেটের হাতি শিকারের ব্যবসার সাথেও জড়িত ছিলেন।

সিলেটের কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার পরপরই তিনি জৈন্তিয়া দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। জৈন্তিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রয়োজনীয়তা তোলে ধরে তিনি কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার চিঠি পাঠাতে থাকেন। কিন্তু কোম্পানির কর্তারা এ বিষয়ে হুট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। তাই অনেক পত্র চালাচালি চলল। শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বতন কর্তারা থেকারের আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে ক্যাপ্টেন এলিকারের নেতৃত্বে সিলেটে একদল সৈন্য পাঠালেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই দলটি ১৭৭৪ সালের মার্চ মাসে জৈন্তিয়া আক্রমণ করে। ২৪ মার্চ তারা জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে ৬ মাইল দূরবর্তী সারী নদীর তীরে পৌঁছায়। জৈন্তিয়ার রাজার বাহিনী তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে উন্নত অস্ত্র ও গোলা বারুদের সাহায্যে তারা নদী পার হতে সক্ষম হয়। এরপর তারা জৈন্তিয়ার রাজধানীর দিকে আরও ৪ মাইল অগ্রসর হয়।

সেখানে জৈন্তিয়ার সেনাবিহিনীর সাথে তাদের হালকা যুদ্ধ হয়। তাদের ব্যাপক গুলির মুখে জৈন্তিয়া বাহিনী পিছু হটে। এরপর তারা সেখানেই শিবির স্থাপন করে। ২৫ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত তারা সেখানে বিনা যুদ্ধেই অবস্থান করে। ২৯ মার্চ বিকাল তিনটায় ব্রিটিশ বাহিনী ও জৈন্তিয়া বাহিনী এক চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য

মুখোমুখি হয়। জৈন্তিয়া বাহিনীর কাছে ছিল প্রচুর হাতি যা ব্রিটিশদের কাছে ছিল না। অন্যদিকে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে ছিল প্রচুর বন্দুক-কামান এবং গোলা বারুদ যা জৈন্তিয়ার সৈন্যদের কাছে নিতান্তই অল্প পরিমাণে ছিল। জৈন্তিয়া বাহিনী কাছে আসা মাত্রই ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাদের নির্দেশে সিপাইরা গুলি ছোড়তে শুরু করল। ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য জৈন্তিয়া বাহিনী আর সামনে অগ্রসর হল না; তারা পিছু হটতে শুরু করল। ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। একপর্যায়ে জৈন্তিয়া বাহিনীর যোদ্ধারা তাদের সকল হাতি এবং যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতরে আশ্রয় নিল।

যুদ্ধে উভয়পক্ষেই খুবই কম সৈন্য আহত হয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজা তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ায় যুদ্ধের কোন চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। তবে জৈন্তিয়ার রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। সিলেটস্থ থেকারে এই সংবাদটি পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। তিনি জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশকে কোম্পানি শাসিত অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখলেন যে, যদি এই রাজ্যের সমতল অংশকে সিলেটের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে কোম্পানি বিপুলভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখলেন যে, জৈন্তিয়ার ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারটি বেশ জটিল। শত শত বছর ধরে খুবই অল্প পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের প্রচলন থাকায় জৈন্তিয়ার অধিবাসীদের কাছ থেকে রাতারাতি প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে না।

কর্তৃপক্ষ আরও বুঝতে পারলেন যে, রাজার সেনাবাহিনী যেহেতু সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাহাড়ে অবস্থান করছে সেহেতু জৈন্তিয়া সমতলে ব্রিটিশ বাহিনীর লোকবল কমে গেলে রাজার সৈন্যদের আক্রমণ ঠেকানো খুবই মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই রাজ্যটিকে স্থায়ীভাবে দখল করে রাখতে গেলে কোম্পানিকে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়নের খরচ সামলাতে হবে। জৈন্তিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সামরিক ব্যয় উপেক্ষা করার জন্য কর্তৃপক্ষ মত দিলেন যে, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের সবচেয়ে সন্তোষজনক ও দ্রুততম উপায় হল, জৈন্তিয়ার রাজার ভূমিকে এমন কোন প্রতিবেশী জমিদারের হাতে তোলে দেওয়া যিনি কোম্পানির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ শর্ত রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন। কিন্তু থেকারে এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করলেন। জৈন্তিয়া সমতলের

শাসনভার একজন জমিদারের হাতে তোলে দেওয়ার বিপদ তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন।

জৈন্তিয়ার রাজার চেয়ে একজন জমিদারকে অধিক বিশ্বাস করার কোন কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত জৈন্তিয়ার ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মত দিলেন যে, কোম্পানির জন্য অনুকূল শর্তের ভিত্তিতে রাজার সাথে শান্তিচুক্তিতে যেতে হবে এবং জৈন্তিয়া অভিযানের পেছনে কোম্পানির যে ব্যয় হয়েছে, রাজার কাছ থেকে সেটি আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। ১৭৭৪ সালের ২০ মে থেকারে এই আদেশ হাতে পেয়েছিলেন। তিনি রাজার সাথে একটি শান্তিচুক্তির জন্য জোরালো প্রচেষ্টা শুরু করে দেন। অবশেষে জুন মাসের প্রথমদিকে রাজা শান্তিচুক্তিতে সম্মত হলেন। চুক্তি অনুযায়ী রাজা তাঁর রাজ্যের সমতল অংশ ফেরত লাভের বিনিময়ে কোম্পানিকে ১৫,০০০ টাকা দিতে রাজি হন। চুক্তির শর্ত মোতাবেক কোম্পানি সৈন্যরাও রাজধানী ছেড়ে দিল। ১৭৭৪ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর বাহিনী নিয়ে সিলেটে ফিরলেন। একইসাথে রাজাও তাঁর রাজধানীতে ফিরলেন।

দুই. রাজা ছত্রসিংহের মৃত্যু (১৮ জুন, ১৭৭৪ সাল)

রাজা ছত্রসিংহ জৈন্তিয়ার ইতিহাসের প্রথম রাজা যার সুনির্দিষ্ট মৃত্যুর তারিখ জানা যায়। উইলিয়াম মেকপিস থেকারের একটি পত্র থেকে এই তথ্যটি জানা যায়। জৈন্তিয়া অভিযানের পরিসমাপ্তির কিছুদিন পরে থেকারে এই পত্রটি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জৈন্তিয়ার রাজার মৃত্যুসংবাদ জানানোর জন্যই তিনি এই পত্রটি লিখেছিলেন। প্রশ্ন হল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে জৈন্তিয়ার রাজার মৃত্যুসংবাদ কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল? এর কারণ, রাজা ছত্রসিংহের সাথে কোম্পানির শান্তিচুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী রাজা ছত্রসিংহ কোম্পানিকে ১৫,০০০ টাকা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি দিয়েছিলেন ৫,০০০ টাকা। বাকি ১০,০০০ টাকা পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজা শান্তিচুক্তির কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

যেহেতু তাঁর সাথে কোম্পানির চুক্তি বলবৎ ছিল (তাঁর কাছে কোম্পানির টাকা পাওনা ছিল) সেহেতু থেকারে তাঁর মৃত্যুসংবাদটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ১৭৭৪ সালের ২৮ জুন তিনি ঢাকা কাউন্সিলের

কাছে একটি পত্র লিখে জানান যে, জৈন্তিয়ার রাজার আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে; ১৮ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং নতুন রাজা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। সংবাদ পেয়ে কর্তৃপক্ষ থেকারের কাছে নতুন আদেশ পাঠান। এই আদেশে নতুন রাজার সাথে কোম্পানির চুক্তি বহাল রাখার কথা বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এসব দাপ্তরিক পত্র রাজা ছত্রসিংহের মৃত্যুর সঠিক সময়কালকে নিশ্চিত করলেও *১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টে* বলা হয়েছে, রাজা ছত্রসিংহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৭৮১ সালে। স্যার এডওয়ার্ড গেইট এই সালটিকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, এই সালটি সঠিক নয়।

তিন. রাজা ছত্রসিংহের ভূমি দানের তথ্য

হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী এবং *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* বইটির লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ রাজা ছত্রসিংহের কিছু ভূমিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সিলেটের দেওয়ান মাণিক চাঁদের সাথে জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের বেশ বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্বের সুবাধে রাজা ছত্রসিংহ দেওয়ান মাণিক চাঁদকে বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি উপহার দিয়েছিলেন। একটি তাম্রফলকের দলিলে এই ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। যদিও এই তাম্রফলকটি কোন গবেষকের হস্তগত হয়নি, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ তাঁর বর্ণনায় এটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, রাজা ছত্রসিংহ তাম্রপত্রের দলিল মোতাবেক দেওয়ান মাণিক চাঁদকে দুটি জায়গা থেকে ভূমি দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল আড়াইখাঁ পরগনার দেওয়ানের গ্রাম মৌজার ৩৮৪ বিঘা জমি এবং সাতবাক পরগনার রামপুর পশ্চিম মৌজার ৫৯৫ বিঘা জমি। সৈয়দ মুর্তাজা আলী রাজা ছত্রসিংহের আরেকটি ভূমিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। খাজা খিদুর নামক জনৈক মুসলমান ব্যক্তির স্ত্রীকে রাজা কিছু ভূমি দান করেছিলেন। এই ভূমির পরিমান ২০ হাল। খাজা খিদুরের স্ত্রী নমস বিবিকে ‘নিমকির জন্য’ এই ভূমি দেওয়া হয়েছিল।

অধ্যায় পঁচিশ
ব্রিটিশদের জৈন্তিয়া অভিযান
(১৭৭৪ সাল)

১৭৭৪ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যরা জৈন্তিয়া রাজ্যে আক্রমণ চালায়। সপ্তম সিপাই ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেন এলিকারের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সিলেটে নিযুক্ত কোম্পানি কর্মকর্তা উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে। তিনি নিজের ভাগ্য গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সিলেটে এসেছিলেন। সিলেটের চুনাপাথর ও হাতির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে তিনি প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছিলেন। সম্পদে ভরপুর জৈন্তিয়া রাজ্যের দিকেও তাঁর লোভাতুর দৃষ্টি পড়েছিল। তাই যেকোন মূল্যে রাজ্যটি দখলের জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৭২ সালে সিলেটে নিয়োগ লাভের পর থেকে তিনি জৈন্তিয়া আক্রমণের জন্য কোম্পানির কলকাতা সদর দপ্তরে বার বার আবেদন করতে থাকেন। ১৭৭৩ সালে নিজের বদলীর আদেশ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল হিসেবে তিনি জৈন্তিয়া অভিযানের সময়ে তাঁর সিলেটে অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সদর দপ্তরের সম্মতি অর্জন করেন।

১৭৭৪ সালের প্রথমদিকে কলকাতা সদর দপ্তর জৈন্তিয়া আক্রমণের পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে এবং ক্যাপ্টেন এলিকারকে এই অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করে। তাঁর নেতৃত্বে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ব্রিটিশ বাহিনী জৈন্তিয়ার রাজধানী অভিমুখে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু জৈন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহ ব্রিটিশদের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে গেলেন না। তিনি জৈন্তিয়ার সেনাবাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ে অবস্থান নিলেন। এতে উভয়পক্ষেরই জনবল অক্ষত থেকে যায়। ব্রিটিশ বাহিনী জৈন্তিয়ার রাজধানীতে প্রবেশ করলেও তাতে কোন চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়নি। এর কারণ, জৈন্তিয়ার সেনাবাহিনী পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় পাহাড়ে অবস্থান করছিল। তাদের আক্রমণের হুমকি মোকাবিলার জন্য জৈন্তিয়া সমতলে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির এই সামর্থ্য ছিল না। তাই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কিছুদিন পরে জৈন্তিয়া থেকে তাদের

সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় এবং জৈন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

এক. সিলেটে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা (১৭৭২ সাল)

১৭৬৪ সালে ব্রিটিশদের হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা উদ্ধারের লক্ষ্যে বাংলার নবাব মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের সাথে মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর তাদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ব্রিটিশ সৈন্যদের এক ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিহারের বক্সার নামক স্থানে সংঘটিত এ যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজয় লাভ করে। এর ফলে ব্রিটিশদের হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও হারিয়ে যায়। ওই পরিস্থিতিতে মোগল সম্রাট শাহ্ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তোলে দিতে বাধ্য হন। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে দেওয়ানীর সনদ লাভ করেছিল।

দেওয়ানী লাভের সাথে সাথেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বত্র তাদের রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। কোম্পানির সদর দপ্তর ছিল কলকাতায়; সদর দপ্তরের অধীনে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় তিনটি কাউন্সিল কাজ করতো। প্রতিটি কাউন্সিলে কয়েকজন করে সদস্য কাজ করতেন। এসব কাউন্সিল-সদস্যগণ তাদের অধীনস্থ অঞ্চলগুলো থেকে জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। অধিক হারে রাজস্ব আদায়ের জন্য তারা নবাবী আমলের বনেদী জমিদারদেরকে সরিয়ে লুটেরা ও দস্যু প্রকৃতির লোকদেরকে জমিদার নিযুক্ত করেছিলেন। এর ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাজুড়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল; দুর্বৃত্ত জমিদার শ্রেণির হাতে সাধারণ প্রজারা জিম্মি হয়ে পড়েছিল।

অল্প কিছু অঞ্চলে পুরানো জমিদারদের মাধ্যমেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের কাজ চলতে থাকে। সিলেট ছিল এমনই এক ব্যতিক্রমী অঞ্চল। বেশ দূরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় এখানে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ কিছুটা দুর্বল ছিল। ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত ঢাকা থেকেই সিলেটের রাজস্ব আদায়ের কাজ পরিচালনা করা হতো; কোন ব্রিটিশ কর্মকর্তা সরাসরি সিলেটের রাজস্ব আদায়ের কাজ করতেন না। এমতাবস্থায় কোম্পানির পক্ষে সিলেট থেকে

অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব ছিল না। এই দুর্বলতা দূর করার জন্য ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মকর্তা সিলেটে আসেন। তাঁর নাম উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে। তাঁর আগমনের পূর্বে সিলেটের রাজস্বের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ১৭,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং বা ১,৩৬,০০০ ভারতীয় টাকা। তাঁর আগমনের পরে সিলেটের রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ১,৭০,০০০ টাকায় উন্নীত হয়। থেকারে মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব নীতি কার্যকর করার জন্যই সিলেটে এসেছিলেন।

দুই. সিলেটের সম্পদের প্রতি ব্রিটিশদের লোলুপ দৃষ্টি

সিলেটে নিযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কালেক্টর উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে ছিলেন একজন সফল ব্রিটিশ কর্মকর্তা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরীর উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসে যেসব ব্যক্তি প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছিলেন তাদের মধ্যে থেকারে ছিলেন অন্যতম। সম্পদে ভরপুর একটি একটি বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণে এনে তিনি যেমন নিজের ভাগ্যের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তেমনি কোম্পানির লাভের পথও প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর পরবর্তী যুগের ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের চোখে তিনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি বড়সড় গ্রন্থও রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম *'সিলেট' থেকারে* । ১৯১১ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন ব্রিটিশ কূটনীতিক ও লেখক এফ.বি. ব্র্যাডলি বার্ট।[58] এই গ্রন্থে তিনি সিলেট কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠায় থেকারের অবদান ও ভূমিকার কথা তোলে ধরেছেন।

গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রাডলি বার্ট লিখেছেন, থেকারে তাঁর ভারতের চাকুরি জীবনের প্রথম পাঁচ বছর কাটিয়েছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সিতে। কিন্তু কলকাতায় অবস্থান করে দ্রুত সম্পদ অর্জনের কোন সুযোগ ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল বিত্ত-বৈভব অর্জনের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন দূরবর্তী স্টেশনে বদলী হওয়াটাই ছিল তাঁর জন্য উত্তম। সেকালে ইস্ট ইন্ডিয়া

---

[58] এফ.বি. ব্র্যাডলি বার্ট ছিলেন একজন ব্রিটিশ কূটনীতিক ও লেখক। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে তিনি চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলেন। খুলনা, মেদিনীপুর, হুগলি এবং কলকাতা ছিল তাঁর কর্মস্থল।

কোম্পানির প্রত্যেক তরুণ কর্মকর্তারই স্বপ্ন ছিল দ্রুত সম্পদ কামাই করা। থেকারেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই কলকাতা শহরে পাঁচ বছর চাকুরির পর থেকারে ঢাকা কাউন্সিলে বদলী হওয়ার সুযোগ বেছে নিলেন। ১৭৭১ সালের ২৫ আগস্ট তিনি ঢাকা কাউন্সিলের চতুর্থ সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তবে তিনি বেশিদিন ঢাকায় অবস্থান করেননি। অঢেল সম্পত্তি অর্জনের বাসনা নিয়ে তিনি ১৭৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা কাউন্সিলের অন্তর্গত সিলেটে পাড়ি জমান।

থেকারে ছিলেন সিলেটের প্রথম কালেক্টর। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ভারত উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কালেক্টর। একই সাথে সিলেট ছিল ভারত উপমহাদেশের প্রথম কালেক্টরেট। থেকারে সিলেটে আসার পরে 'কালেক্টর' পদটি সৃষ্টি করে তাকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাই তাঁর আগে আর কেউ 'কালেক্টর' হননি। খুব সম্ভবত, সিলেট অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে সামনে রেখেই এই নতুন প্রশাসনিক কাঠামোটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই কাঠামোর অনুসরণে পরবর্তীতে সর্বত্রই জেলা প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে সিলেটের ভূ-প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যাধিক গুরুত্ব থাকায় এই অঞ্চলকে একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে আনতে হয়েছিল।

'সিলেট' থেকারে গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এফ.বি. ব্রাডলি বার্ট লিখেছেন, বাংলার অংশ হিসেবে সিলেট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসলেও ১৭৭২ সালের আগে সেখানে কোন ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্মরত ছিলেন না। কোম্পানির স্বার্থ দেখার জন্য কেউ সিলেটে ছিল না। কিন্তু এই অঞ্চলটি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানের কাঠ পাওয়া যেতো সিলেটে। তবে কাঠের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিলেটের চুনাপাথর। এটি ছিল সিলেটের প্রধান অর্থকরী পণ্য। প্রতি বছর সিলেটের সীমান্তবর্তী উৎস থেকে এক লাখ মনেরও বেশি পাথর উত্তোলিত হতো। সিলেটের এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং যথাযথভাবে রাজস্ব আদায়ের কাজটি নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা কাউন্সিলের প্রধান কর্মকর্তা জেমস হ্যারিস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সিলেটের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সেখানে একজন স্থায়ী ব্রিটিশ প্রতিনিধি নিয়োগ করা আবশ্যক।

এই সিদ্ধান্তের পেছনে স্বজনপ্রীতির ব্যাপার ছিল। ঢাকা কাউন্সিলের চতুর্থ সদস্য থেকারে ছিলেন জেমস হ্যারিসের শ্যালক। তাই জেমস হ্যারিস তাকে ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসেবে সিলেটে পাঠিয়ে তাঁর হাতে বিপুল উপার্জনের সুযোগ তোলে দিতে চেয়েছিলেন। ওই সময়ে কোম্পানির কাউন্সিলগুলো একেকটি বিশাল অঞ্চলের রাজস্ব প্রশাসন হিসেবে কাজ করতো। কাউন্সিলের অধীনস্থ অঞ্চল বিশেষের জন্য আলাদা প্রশাসনের কোন নজির তখনও সৃষ্টি হয়নি। তাই থেকারে কী ধরণের প্রশাসনিক পদ নিয়ে সিলেটে যাবেন তা তখনও স্পষ্ট ছিল না। জেমস হ্যারিস কোম্পানির কলকাতা সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বড় কর্তাদেরকে শুধু এটুকু বলেছিলেন যে, সিলেটের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য এবং চুনাপাথর ব্যবসার অব্যবস্থাপনাসহ নানান অনিয়ম দূর করার জন্য সেখানে কোম্পানির একজন প্রতিনিধি পাঠানো প্রয়োজন। প্রতিনিধি হিসেবে তিনি থেকারের নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

কলকাতা সদর দপ্তর বা প্রেসিডেন্সি কাউন্সিলের কর্তাগণ জেমস হ্যারিসের প্রস্তাবে সাঁড়া দিয়ে থেকারেকে কোম্পানির সিলেট প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত আঞ্চলিক প্রশাসকের কোন পদ সৃষ্টি হয়নি তাই কলকাতা সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে থেকারেকে 'আমিন' নামক এক অদ্ভূত পদে নিযুক্ত করা হয় এবং বলা হয় যে, এই পদের অধিকারী হিসেবে থেকারে ঢাকা কাউন্সিলের প্রধান কর্মকর্তার কর্তৃত্বের বাইরে একজন স্বাধীন কোম্পানি প্রতিনিধি হিসেবে সিলেটের দায়িত্ব পালন করবেন। ১৭৭২ সালের মে মাসে এই আদেশ জারি করা হয়েছিল। আদেশনামায় থেকারের দায়িত্বের বিশদ বর্ণনা ছিল। দায়িত্বের জন্য তিনি কোম্পানির কলকাতা সদর দপ্তরের কাছে (ঢাকা কাউন্সিল নয়) দায়বদ্ধ থাকবেন বলেও উল্লেখ করা হয়।

আদেশ পাওয়ার পরপরই থেকারে সিলেটে পাড়ি জমান। তিনি একাধারে সিলেটের রাজস্ব কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক এবং পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এর পাশাপাশি তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য, হাতি শিকার এবং রাস্তা-ঘাট নির্মাণেও মনোযোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রচুর অর্থ আয় করতে শুরু করেন। ১৮৭২ সালের শেষের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 'কালেক্টর' পদটি সৃষ্টি করেন এবং থেকারেকে সিলেটের কালেক্টর নিযুক্ত করেন। এর ফলে থেকারের পদবীর অস্পষ্টতা দূর হয়। ছোট অঞ্চলের জন্য প্রবর্তিত এই প্রশাসনিক কাঠামোটিকে একসময়

কোম্পানির অধীনস্থ সমগ্র অঞ্চলে কার্যকর করা হয়েছিল। জেলা কালেক্টররা ছিলেন কোম্পানি শাসনব্যবস্থার প্রাণ। তাদের ক্ষমতার পরিধি ছিল অনেক বেশি। রাজস্ব আদায়সহ জেলা প্রশাসনের সকল শাখার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল কালেক্টরদের হাতে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত এই ছোট অঞ্চলভিত্তিক প্রাশাসনিক ব্যবস্থার (জেলা কালেক্টরেট বা জেলা প্রশাসন) সর্বপ্রথম সুবিধাভোগী ছিলেন উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে। বিপুল ক্ষমতা ভোগ করার পাশাপাশি তাঁর সামনে ছিল অঢেল অর্থ কামাই করার সুবর্ণ সুযোগ। তিনি এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর বদলীর আদেশ। ১৭৭৩ সালের ২২ জুলাই তারিখে জারিকৃত এক আদেশে থেকারেকে সিলেট থেকে ঢাকায় বদলী করা হয়। কলকাতা সদর দপ্তর থেকে জারিকৃত এই আদেশে থেকারেকে তাঁর আগের পদে অর্থাৎ ঢাকা কাউন্সিলের চতুর্থ সদস্য হিসেবে যোগদানের জন্য বলা হয়। খুব সম্ভবত, ঢাকা কাউন্সিলে তখন থেকারের মতো দক্ষ কর্মকর্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই কোম্পানি তাকে ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে নতুন কাউকে সিলেটে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু ঢাকা কাউন্সিলের বড় পদের চেয়ে সিলেটের ছোট পদই ছিল থেকারের জন্য লাভজনক। তাই তিনি কোম্পানির আদেশ অমান্য করার জন্য এক অদ্ভুত কৌশল বেছে নিলেন। তিনি ঢাকা কাউন্সিল এবং কলকাতা সদর দপ্তরকে বোঝালেন যে, তাঁর অবর্তমানে সিলেটের সীমান্তবর্তী জৈন্তিয়ার রাজার বিরুদ্ধে কোম্পানি কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারবে না। জৈন্তিয়ার রাজার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক অভিযান সফল করতে হলে তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ (সিলেট অঞ্চলের ব্যাপারে) কর্মকর্তার সিলেটেই অবস্থান করা উচিত। কলকাতা সদর দপ্তর এই যুক্তি মেনে নিয়েছিল। তাই বদলীর আদেশ থাকা সত্ত্বেও থেকারে বেশ কিছুদিন সিলেটে থাকতে পেরেছিলেন। যতোদিন পর্যন্ত জৈন্তিয়ার রাজার বিরুদ্ধে কোম্পানির সামরিক অভিযান শেষ হয়নি ততোদিন তিনি সিলেটেই ছিলেন। এরপর কোম্পানির জন্য হাতি সরবরাহের প্রয়োজনে তিনি আরও কিছুদিন সিলেটে অবস্থান করেছিলেন।

তিন. জৈন্তিয়ার সম্পদের প্রতি ব্রিটিশদের লোলুপ দৃষ্টি

উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে সিলেটের কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার পরপরই জৈন্তিয়া দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। জৈন্তিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রয়োজনীয়তা তোলে ধরে তিনি কলকাতা সদর দপ্তরে বার বার চিঠি পাঠাতে থাকেন। কলকাতা সদর দপ্তরের কাছে লিখিত পত্রসমূহে তিনি দাবি করেন যে, জৈন্তিয়া রাজ্যটি এমন এক ভৌগলিক অবস্থানে রয়েছে যেখান থেকে কোম্পানির স্বার্থে আঘাত করা বেশ সহজ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জৈন্তিয়ার রাজা কোম্পানির ক্ষতি করছেন। ঢাকা ও কলকাতার সঙ্গে সিলেটের নৌ-যোগাযোগের মূল মাধ্যম হচ্ছে সুরমা নদী। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কোম্পানির জাহাজগুলোকে এই নদী দিয়েই চলাচল করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জৈন্তিয়ার রাজার হাতে এই নৌ-পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। এর কারণ, নদীর তীর ঘেষেই তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি। কোম্পানির বাণিজ্যবহর ঢাকা যাওয়ার পথে প্রায়শই রাজার লোকজন বাধা দেয়। তারা চাঁদা আদায়, লুটপাট, উত্ত্যক্ত করা এবং যাত্রাপথে অহেতুক বিলম্ব ঘটানোর মতো অপকর্মে জড়িত হয়ে পড়ে।

থেকারের এসব অভিযোগ ছিল পুরোপুরি বানোয়াট ও মিথ্যা। সিলেট ও ঢাকার মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যেসব জাহাজ চলাচল করতো সেগুলোকে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও ছিল না। সিলেট শহর থেকে পশ্চিমদিকে (ঢাকার দিকে) প্রবাহিত সুরমা নদীর তীরবর্তী কোন অঞ্চল কখনোই জৈন্তিয়া রাজ্যের অংশ ছিল না। সিলেট শহর থেকে বের হয়ে সুরমা নদীটি বর্তমানের সিলেট সদর উপজেলা এবং সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। নদীর এই অংশের উভয় তীর ঘেষেই ছিল কোম্পানিশাসিত এলাকা। জৈন্তিয়া রাজ্যের কোন এলাকা সুরমা নদীর এই অংশটির ধারেকাছেও ছিল না। নদী তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। জৈন্তিয়ার রাজার পক্ষে কোম্পানির ঢাকাগামী বাণিজ্যবহরকে বাধা দেওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। তাই জৈন্তিয়ার রাজার লোকজন কর্তৃক কোম্পানির বাণিজ্যবহরকে বাধা দেওয়ার অভিযোগটি ছিল পুরোপুরি অমূলক ও ভিত্তিহীন।

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবসা করে লাভবান হওয়ার জন্যই থেকারে সিলেটে এসেছিলেন। ভারত উপমহাদেশে সিলেটের হাতি, কাঠ, চুনাপাথর প্রভৃতি অর্থকরী পণ্যের বেশ চাহিদা ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্য ছিল এসব সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার। এছাড়াও বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনে রাজ্যটি ছিল সেরা। ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির আওতার বাইরে থাকায় থেকারে এসব সম্পদকে কাজে লাগাতে পারছিলেন না। জৈন্তিয়া থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা নিয়েও তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাই সিলেটে আগমনের পরপরই থেকারে রাজ্যটি দখলের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে রাজ্যটি দখল করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি কলকাতা সদর দপ্তরের কাছে বার বার চিঠি লিখে সামরিক সহায়তা চেয়েছিলেন। কলকাতা সদর দপ্তর থেকে যখন তাকে ঢাকায় বদলী করে দেওয়া হল তখন তিনি জৈন্তিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের বিষয়টিকে সামনে এনে বদলীর আদেশ উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন।

চার. জৈন্তিয়া অভিযানের ব্যাপারে কোম্পনির সিদ্ধান্ত

উইলিয়াম মেকপিস থেকারেকে যখন সিলেটের 'আমিন' (aumeen) পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল তখন তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা সদর দপ্তরের অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা ছিলেন। এর কয়েক মাস পরে কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 'কালেক্টর অফিস' সৃষ্টি করে থেকারেকে 'কালেক্টর' পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তখনও তিনি কোম্পানির কলকাতা সদর দপ্তরের অধীনেই ছিলেন। ১৭৭৩ সালের ২২ জুলাই সিলেট কালেক্টরেটকে ঢাকার সাথে যুক্ত করে আদেশ জারি করা হয়। তখন থেকে থেকারে ঢাকা কাউন্সিলের অধীনে চলে এসেছিলেন। তবে সদর দপ্তরের সাথে তাঁর যোগাযোগ আগের মতোই ছিল। সকল ব্যাপারে তিনি ঢাকা কাউন্সিলের পাশাপাশি সদর দপ্তরের সাথেও যোগাযোগ রাখতেন। জৈন্তিয়ার রাজার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে তিনি উভয় জায়গাতেই পত্র লিখতেন। তাঁর এই আবেদনের প্রেক্ষিতে কোম্পানি একদিকে যেমন হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না তেমনি অন্যদিকে তাঁর আবেদনটিকে ফেলে দিতেও পারছিল না।

কোম্পানি থেকারেকে সিলেটে বসিয়ে রেখে বিভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সময় নিচ্ছিল। জৈন্তিয়ায় সামরিক অভিযানের সফলতা নিয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ গোড়া থেকেই সন্দিহান ছিল। অন্যদিকে তারা আবার রাজ্যটি দখলের লোভও সংবরণ করতে পারছিল না। অবশেষে লোভই বিজয়ী হল। ১৭৭৪ সালের

ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা কাউন্সিলের প্রধান কর্মকর্তা রিচার্ড বারওয়েল[59] জৈন্তিয়া অভিযানের পক্ষে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত একটি পত্রে তিনি থেকারেকে জানান যে, জৈন্তিয়া অভিযানে তাঁর পূর্ণ সম্মতি রয়েছে এবং এই কাজটিকে সফল করার জন্য ঢাকা মিলিশিয়ার কিছু সৈন্যও প্রস্তুত করা হয়েছে। ওই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন জুনিয়র সামরিক কর্মকর্তা কলকাতা থেকে ঢাকায় গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল ল্যাফটেনেন্ট এনসাইন লিক। রিচার্ড তাকেই জৈন্তিয়া অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন।

থেকারের কাছে লিখিত পত্রে রিচার্ড বারওয়েল বলেন, ঢাকা মিলিশিয়ার ৫০ জন সৈন্য ও কর্মকর্তাকে নিয়ে সিলেটের কালেক্টরের কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য ল্যাফটেনেন্ট এনসাইন লিককে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সিলেটে অবস্থানরত সৈন্যদেরকেও এনসাইন লিক নেতৃত্ব দিবেন। তবে তিনি কাজ করবেন থেকারের নির্দেশ অনুযায়ী। জৈন্তিয়া অভিযানের ব্যাপারে থেকারে যা আদেশ করবেন এনসাইন লিক সেটিই অনুসরণ করবেন। এনসাইন লিকের কাছে লিখিত একটি আদেশপত্রেও রিচার্ড বারওয়েল এসব কথা লিখেছিলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত ওই আদেশপত্রে এনসাইন লিককে বলা হয়, সিলেটের সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কাজের জন্য যত দ্রুত সম্ভব তাকে সিলেটে পৌঁছতে হবে। সিলেটে পৌঁছার পর তাকে থেকারের অধীনে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং থেকারের দেওয়া আদেশ মেনে চলতে হবে। অভিযানের আদেশ প্রদানের সাথে সাথে রিচার্ড বারওয়েল ঢাকা মিলিশিয়া থেকে ৫০ জনের একটি বাহিনীকে এনসাইন লিকের অধীনে ন্যস্ত করেছিলেন।

রিচার্ড বারওয়েল কলকাতা সদর দপ্তরকে অবহিত না করেই জৈন্তিয়া অভিযানের আদেশ দিয়েছিলেন। তাই এটি ছিল একটি বিধিবহির্ভূত পদক্ষেপ। ভারত উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথমদিকে এমন

---

[59] উইলিয়াম মেকপিস থেকারের বোনের স্বামী জেমস হ্যারিস তখন ঢাকা কাউন্সিলের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন না। জেমস হ্যারিস ১৭৭২ সালে ঢাকার দায়িত্ব হস্তান্তর করে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন মিস্টার ল্যামবার্ট। ল্যামবার্ট এই পদে বেশিদিন থাকেননি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন রিচার্ড বারওয়েল (আনুমানিক ১৭৭৩ সালে)।

বিধিবহির্ভূত পদক্ষেপের ঘটনা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। যেহেতু কোম্পানি কর্মকর্তাদের এসব কাজে পুরো কোম্পানিই লাভবান হতো সেহেতু সদর দপ্তর এসব ব্যাপারে বেশ নমনীয় ছিল। কর্মকর্তারা সাধারণত বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদের কাজের পক্ষে কলকাতা সদর দপ্তরের সমর্থন আদায় করে নিতেন। রিচার্ড বারওয়েলও একই কাজ করলেন। জৈন্তিয়া অভিযানের আদেশ প্রদানের দুদিন পর তিনি কলকাতা সদর দপ্তরে পাঠানো সরকারি কার্যবিধি সংক্রান্ত পত্রে লিখলেন যে, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যই তিনি বিধিবহির্ভূত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। সিলেটের সীমান্ত রক্ষার জন্যই তিনি এনসাইন লিকের নেতৃত্বে একদল সৈন্যকে সিলেটে পাঠিয়েছেন।

রিচার্ড আরও লিখলেন যে, কলকাতা সদর দপ্তর হতে এনসাইন লিককে অভিযান চালানোর জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমতি দেওয়া হোক অথবা তাঁর স্থলে আরেকজন অধিনায়ককে নিযুক্ত করা হোক। রিচার্ড আরও যোগ করেন, জৈন্তিয়ার রাজার কোম্পানি বিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত এবং এসব কর্মকাণ্ডের জন্য রাজার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্য। যেহেতু জৈন্তিয়ার রাজার এসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কলকাতা সদর দপ্তর অবগত আছেন সেহেতু তাদের উচিত হবে জৈন্তিয়া বিরোধী পদক্ষেপের সাথে একমত হওয়া। ইতোমধ্যে সিলেটে যে বাহিনী পাঠানো হয়েছে তারা সিলেটের বাহিনীর সহায়তায় রাজাকে পরাস্ত করতে এবং বশ্যতা স্বীকার করাতে সক্ষম হবে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সুরমা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল কোম্পানির দখলে চলে আসা উচিত।[60] যেহেতু এই অঞ্চলটি জৈন্তিয়া রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেহেতু রাজা এটি ফিরে পাওয়ার জন্য ব্রিটিশদের আরোপ করা যেকোনও শর্তই মেনে নিবেন।

পাঁচ. ক্যাপ্টেন এলিকারের সামরিক অভিযান (১৭৭৪ সাল)

[60] জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশটি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সুরমা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল- একথা সত্য। কিন্তু তা সিলেট শহরের পশ্চিমদিকের (কোম্পানির বাণিজ্যবহর যেদিকে চলাচল করতো) সুরমা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না। সিলেট শহর থেকে পূর্ব দিকে সুরমা নদীর উজানে অনেক দূর অগ্রসর হলে নদীর তীরে জৈন্তিয়ার সীমানা পাওয়া যেতো।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা সদর দপ্তর রিচার্ড বারওয়েলের জৈন্তিয়া অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। রিচার্ড ইতোমধ্যে কলকাতা সদর দপ্তরকে অবহিত না করেই জৈন্তিয়া অভিযানের জন্য সরকারি তহবিলের অর্থ খরচ করে ফেলেছিলেন। সিলেটে প্রেরিত বাহিনীর পেছনেই এই অর্থ খরচ করা হয়েছিল। এ নিয়ে রিচার্ড কিছুটা ভয়ে ছিলেন। কিন্তু কলকাতা সদর দপ্তর এ নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। জৈন্তিয়া অভিযানের ব্যাপারটিকে তারা কোম্পানির জন্য একটি লাভজনক ব্যাপার হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। তাই সদর দপ্তর থেকে রিচার্ডের জৈন্তিয়া অভিযানের সিদ্ধান্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হল। তবে তারা এনসাইন লিকের স্থলে সপ্তম সিপাই ব্যাটালিয়নের ক্যাপ্টেন এলিকারকে জৈন্তিয়া অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। এনসাইন লিককে এলিকারের অধীনেই জৈন্তিয়া অভিযানের দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া হল। নতুন অধিনায়ক ছিলেন উইলিয়াম মেকপিস থেকারের বন্ধু।

জৈন্তিয়া অভিযানের ব্যাপারে সদর দপ্তরের অনুমোদন লাভের পর রিচার্ড বারওয়েল সিলেটের থেকারের কাছে একটি পত্র লিখে জানালেন যে, জৈন্তিয়া অভিযানের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ক্যাপ্টেন এলিকার ইতোমধ্যেই সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে সপ্তম সিপাই ব্যাটালিয়নের তিন কোম্পানি সৈন্য। পত্রটি লিখিত হয়েছিল ১৭৭৪ সালের ১৭ মার্চ। এই পত্রে রিচার্ড সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে (এলিকার ও থেকারের মধ্যে) বিরোধ এড়ানোর জন্য জরুরি নির্দেশনাও দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির ঘটনা ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। জৈন্তিয়া অভিযানের ক্ষেত্রে এজাতীয় সমস্যা এড়ানোর জন্যই হয়তো কলকাতা সদর দপ্তর থেকারের বন্ধু এলিকারকে সামরিক অধিনায়কত্ব দিয়ে সিলেটে পাঠিয়েছিল।

১৭৭৪ সালের ১৭ মার্চ রিচার্ড বারওয়েল ক্যাপ্টেন এলিকারের কাছেও একটি পত্র লেখেন। পত্রে তিনি এলিকারকে বলেন, "I hope the footing on which you will act with that gentleman is such as may be agreeable to you : and, considering your acquaintance with Mr. Thackeray and your own disposition, I flatter myself nothing will arise in the course of the service which may prove disgusting to either, as a cordiality between men, who

should have the same object in view, is so necessary to insure success to every public measure, that I am pleased at the prospect, which the intimacy that subsists between you and Mr. Thackeray gives me of a mutual consideration, swaying each and obviating the possibility of a misunderstanding. To your judgment and discretion is entirely left the mode of conducting the war in the manner you should determine as most expeditious and decisive.” [61]

জৈন্তিয়া অভিযানের দায়িত্ব লাভের অল্প দিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর ব্যাটালিয়নের (একটি ব্যাটালিয়নে তিন কোম্পানি সৈন্য থাকতো) সৈন্যদেরকে নিয়ে সিলেটে পৌঁছান। কিন্তু তাদের সাথে তখন পর্যাপ্ত গোলা বারুদ ছিল না। ওই সময়ে ঢাকাস্থ ইংলিশ ফ্যাক্টরি যুদ্ধের জন্য তেমন একটা প্রস্তুত ছিল না। তাই জৈন্তিয়া অভিযানের জন্য গোলা বারুদ পাঠাতে দেরী হয়েছিল। ক্যাপ্টেন এলিকার রিচার্ড বারওয়েলের কাছে দুই হাজারের বেশি বল-কার্তুজ চেয়েছিলেন। কিন্তু রিচার্ড বারওয়েল তাকে জানান যে, ঢাকাস্থ ইংলিশ ফ্যাক্টরির গুদামে দুই হাজারের বেশি বল-কার্তুজ নেই। যা আছে তার সবই অবিলম্বে সিলেটে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। আরও জোগাড় করা গেলে সেগুলোও পাঠানো হবে। রিচার্ড আরও বলেন, সিলেটের গ্যারিসনে যথেষ্ট পরিমাণে দেশি বারুদ থাকার কথা। বেশি কার্তুজের প্রয়োজন হলে গ্যারিসনের দেশি বারুদ দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে। আর যদি সিলেটে বারুদ না পাওয়া যায় তাহলে ঢাকা থেকে তা পাঠানো হবে।

ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর বাহিনী নিয়ে সিলেটে পৌঁছার পর এনসাইন লিকের বাহিনী এবং সিলেটের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলেন। বাহিনীটি যখন জৈন্তিয়া রাজ্যে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন তাদের হাতে গোলা বারুদের চালান পৌঁছায়। পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলা বারুদের বলে উজ্জীবিত হয়ে তারা জৈন্তিয়ায় প্রবেশ করে এবং বেশ দ্রুতবেগেই জৈন্তিয়ার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়। ২৪ মার্চ তারা সারী নদীর তীরবর্তী রাজাগঞ্জে পৌঁছায়। জৈন্তিয়া রাজ্যের রাজধানী সেখান থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে ছিল।

---

[61] *‘Sylhet’ Thackeray* by F.B. Bradley Birt (1911), Chapter Seven, The Jaintia Expedition, Page-159

ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা সেখানেই প্রথম বাধাগ্রস্থ হয়। এলিকার দেখলেন, নদীর অপর পাশে শত্রুবাহিনী ঘাটি গেড়ে অপেক্ষা করছে। তাঁর বাহিনীর অগ্রবর্তী দল ইতোমধ্যেই শত্রুবাহিনীর কাছে পৌঁছেছিল। তাদের সঙ্গে শত্রুবাহিনীর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল এবং একপর্যায়ে হাতাহাতিও হয়েছিল। এরপর অগ্রবর্তী দলটি তাদের দুজন আহত সৈন্যসহ নদীর এপাশে ফিরে এসেছিল।

এলিকার তাদের কাছ থেকে সবকিছু শুনে বুঝতে পারলেন যে, নদী পার হতে গেলে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হবে। ওই সময়ে তাঁর বাহিনীর দখলে কোন নৌকা ছিল না এবং সেখানকার নদীও ছিল বেশ গভীর। জৈন্তিয়ার রাজার বাহিনী এই পরিস্থিতির পুরো সুযোগ কাজে লাগাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন এলিকার বুঝতে পারলেন, বলপ্রয়োগে নদী পার হতে গেলে ব্যর্থ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে পশ্চাৎপসরণ করলেন এবং নদীর অগভীর অংশ খুঁজতে লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি নদীর একটি অগভীর অংশ খুঁজে পেয়েও গেলেন। এলিকারের নির্দেশমতো তাঁর সৈন্যরা যখন নদীর এই অংশটি পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হল তখন তারা দেখল যে, নদীর অপর পাশে জৈন্তিয়ার সৈন্যরাও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ব্রিটিশ বাহিনীর নদী পারাপার ঠেকাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এই অবস্থায় ক্যাপ্টেন এলিকার বন্দুকের গুলি খরচ করা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পেলেন না; তিনি তাঁর বাহিনীকে বন্দুক চালাতে নির্দেশ দিলেন।

তাদের ব্যাপক গুলির মুখে জৈন্তিয়ার সৈন্যরা নদীর তীর ছেড়ে পিঁছু হটল। এর ফলে তারা বিনা বাধায় নদী পার হতে সক্ষম হল। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ বাহিনীর শেষ সৈন্যটি নদী পার হওয়ার আগেই সন্ধ্যা নেমে এসেছিল। তবুও এলিকার থামলেন না। নিজের বাহিনীকে নিয়ে তিনি জৈন্তিয়ার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন। কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর তিনি দেখলেন, প্রায় আধা মাইল দীর্ঘ একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর রচনা করে জৈন্তিয়ার সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে। তারা একে অন্যের গা ঘেঁষে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এলিকারের বাহিনীও একটি সুশৃঙ্খল লাইন ধরে জৈন্তিয়ার সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হয়। ক্যাপ্টেন এলিকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই মুহূর্তে জৈন্তিয়ার সৈন্যরাই প্রথমে ব্রিটিশ বাহিনীর দিকে গুলি ছুড়েছিল। ক্যাপ্টেন এলিকার লিখেছেন, জৈন্তিয়ার সৈন্যদের দিক থেকে তাকে লক্ষ্য করেই প্রথম

গুলিটি ছোড়া হয়েছিল। তবে গুলিটি তাঁর গায়ে লাগেনি। এই গুলির জবাবে এলিকারও সোৎসাহে পাল্টা গুলি ছুড়েছিলেন।

একই সাথে ব্রিটিশ বাহিনীর সবগুলো বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া শুরু হয়েছিল। জৈন্তিয়ার বাহিনীর তুলনায় ব্রিটিশ বাহিনীর বন্দুক, বল-কার্তুজ এবং অন্যান্য আধুনিক উপকরণের সংখ্যা ছিল অনেকগুণ বেশি। তাই ব্রিটিশ বাহিনীর গোলাগুলির মুখে জৈন্তিয়ার বাহিনী বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি। তারা পিঁছু হটতে বাধ্য হয়। জৈন্তিয়ার সৈন্যদের গুলিতে ব্রিটিশ বাহিনীর মাত্র একজন সৈন্য আহত হয়েছিল। এলিকার তাকে চিকিৎসার জন্য সিলেটে পাঠিয়ে দেন। ইতোমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই ক্যাপ্টেন এলিকার যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। সারা দিনের কষ্টকর যুদ্ধযাত্রায় তাঁর সৈন্যরা তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সিলেট থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে তাদেরকে এমন এক পাহাড়ি এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল যেখানকার ভূমি ছিল রুক্ষ, পাথুরে ও উঁচুনিচু। ওইদিনের আবহাওয়াও ছিল বেশ উত্তপ্ত। তাই ওইদিনের ধকল কাটিয়ে উঠার জন্য সৈন্যদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে একটি সুবিধাজনক স্থানে ব্রিটিশ বাহিনীর শিবির স্থাপন করা হল। ক্যাপ্টেন এলিকারের ইচ্ছা ছিল প্রথম দিনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পরের দিনই যুদ্ধের সমাপ্তি টানবেন। কিন্তু রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় তাঁর সৈন্যরা ভালোমতো বিশ্রাম নিতে পারল না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৫ মার্চ কোন যুদ্ধ হবে না এবং ওইদিন সৈন্যদেরকে বিশ্রাম নিতে দেওয়া হবে। জৈন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহ ওইদিন সকালে ব্রিটিশ আক্রমণের কোন লক্ষণ না দেখে ব্রিটিশদের মতিগতি বোঝার জন্য একজন দূত পাঠালেন। দূত ক্যাপ্টেন এলিকারের সাথে দেখা করে জানাল যে, রাজা কোম্পানি বাহাদুরের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছেন এবং এসব দাবি-দাওয়া নিয়ে ভাবার জন্য কিছু সময়ও চেয়েছেন; ততোক্ষণ পর্যন্ত যেনো ব্রিটিশরা তাঁর রাজধানীতে আক্রমণ না চালায়।

ছয়. জৈন্তিয়াপতির প্রতিরোধ এবং পশ্চাৎপসরণ

২৫ মার্চ সকালে ক্যাপ্টেন এলিকার জৈন্তিয়াপতির যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে জৈন্তিয়াপতির দূতকে বিদায় করলেন। কৌশলগত কারণেই তিনি এতে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এই সুযোগে তাঁর সৈন্যরা পর্যাপ্ত

বিশ্রাম নিক এবং নিজেদের অবস্থানকে আরও মজবুত করুক। একইসাথে তিনি জৈন্তিয়ার রাজাকেও নতি স্বীকারের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার মতো সময় দিতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, রাজা হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠাবেন। কিন্তু ২৬ ও ২৭ মার্চ চলে গেল। রাজার কাছ থেকে এমন কোন প্রস্তাব এলো না। ক্যাপ্টেন এলিকার ২৮ মার্চ বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি রাজার উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে তাঁর বাহিনীকে নিয়ে রাজধানীর দিকে অল্প একটু অগ্রসর হলেন। কিন্তু এতেও কাজ হল না। রাতভর অপেক্ষা করেও রাজার কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ২৯ মার্চ ভোরে ক্যাপ্টেন এলিকার এই যুদ্ধের একটি সফল পরিণতির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

তিনি তাঁর বাহিনীকে রাজধানী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। ভোরের আলোতে তাঁর সৈন্যরা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। রাজা ছত্রসিংহের লোকজন শুরু থেকেই ব্রিটিশ বাহিনীর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল। তাই ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা সাথে সাথেই রাজার কানে পৌঁছে গেল। রাজা তৎক্ষণাৎ দূত পাঠিয়ে ক্যাপ্টেন এলিকারকে জানালেন যে, অনতিবিলম্বে তাঁর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করবেন এবং সমঝোতার ব্যাপারে আলাপ করবেন। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য তিনি ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ জানালেন। ক্যাপ্টেন এলিকার ধরে নিলেন, রাজা হয়তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শর্তাবলী মেনে নিতে রাজি হয়েছেন। তাই তিনি রাজধানী আক্রমণের আদেশ স্তগিত ঘোষণা করলেন। এর কয়েক ঘন্টা পরে, দুপুরের দিকে রাজার একজন প্রতিনিধি ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করলেন।

কিন্তু তাঁর কথাবার্তা থেকে রাজার আত্মসমর্পণের কোন আভাষ পাওয়া গেল না। রাজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শর্তাবলী মেনে নিয়েছেন কিনা তা ওই প্রতিনিধির কথা থেকে স্পষ্ট হল না। কোম্পানির শর্তগুলোর ব্যাপারে রাজা খুবই চাতুরীপূর্ণ জবাব পাঠিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলেন, রাজা চতুরতার আশ্রয় নিয়ে সময়ক্ষেপণ করতে চাচ্ছেন মাত্র। রাজার হয়তো কোন গোপন অভিসন্ধি রয়েছে এবং সেটি হাসিল করার জন্যই তিনি সময়ক্ষেপণ করছেন। ক্যাপ্টেন পরিস্কার বুঝতে পারলেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে রাজার কোন ইচ্ছা নেই। ব্রিটিশদের সাথে শান্তি স্থাপনের জন্য যথেষ্ট সময় এবং

সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যেহেতু রাজা পরিস্কার করে কিছু জানাননি সেহেতু তাঁর ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা পরিস্কার হয়ে গেল। বিকাল তিনটার কিছু আগে ব্রিটিশ বাহিনী টের পেল, প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে একদল হাতি নিয়ে বিপুল সৈন্য ও জনতা এগিয়ে আসছে।

ব্রিটিশ শিবিরকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েই তারা এগিয়ে আসছিল। এতে পরিস্কার হয়ে গেল যে, জৈন্তিয়ার রাজার সমঝোতার কোন ইচ্ছা নেই। তিনি যুদ্ধ করেই জিততে অথবা হারতে চান। ব্রিটিশ বাহিনীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। ২৯ মার্চ বিকাল তিনটায় ব্রিটিশ বাহিনী ও জৈন্তিয়া বাহিনী এক চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হল। জৈন্তিয়া বাহিনীর কাছে ছিল প্রচুর হাতি যা ব্রিটিশদের কাছে ছিল না। অন্যদিকে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে ছিল প্রচুর বন্দুক-কামান এবং গোলা বারুদ যা জৈন্তিয়ার সৈন্যদের কাছে নিতান্তই অল্প পরিমাণে ছিল। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের এই অসমতাই একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে উভয় পক্ষকে বাঁচিয়ে দিল। জৈন্তিয়া বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া মাত্রই ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তারা সিপাইদেরকে গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিলেন। সিপাইরা তৎক্ষণাৎ গুলি ছোড়তে শুরু করল। ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য জৈন্তিয়া বাহিনী আর সামনে অগ্রসর হল না; তারা পিছু হটতে শুরু করল।

ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মাত্র একজন সৈন্যকে তাদের শিবিরের জিনিসপত্র পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে রেখে পুরো ব্রিটিশ বাহিনী সামনে অগ্রসর হল। ব্রিটিশ বাহিনীর গুলি থেকে বাঁচার জন্য জৈন্তিয়া বাহিনীর কয়েক হাজার যোদ্ধা ক্রমশ পিছু হটতে লাগল। একপর্যায়ে তারা হাতি এবং যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতরে ঢুকে যায়! জৈন্তিয়া পাহাড়ের ঘোর জঙ্গলে ব্রিটিশ বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের কোন কার্যকারিতা ছিল না। তাই তারা পাহাড়ে প্রবেশ থেকে বিরত রইল। জৈন্তিয়া বাহিনীর যোদ্ধারা নিরাপদেই পাহাড়ে অবস্থান করতে লাগল। যুদ্ধে কারও চূড়ান্ত জয় বা পরাজয় হয়নি। যুদ্ধে উভয়পক্ষেই খুবই কম সৈন্য আহত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর রিপোর্ট কিংবা ডায়েরিতে কারও নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। পুরো সামরিক অভিযানে রক্তক্ষয় হয়নি বললেই চলে। সত্যিকারের সংঘর্ষ না হওয়ায় উভয়পক্ষেরই জনবল সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।

সাত. জৈন্তিয়ার ব্যাপারে কালেক্টর থেকারের প্রস্তাব

জৈন্তিয়ার রাজা তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ায় যুদ্ধের কোন চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। তবে জৈন্তিয়ার রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। রাজা পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার পর ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর বাহিনী নিয়ে রাজধানীতে অবস্থান নেন। সিলেটস্থ থেকারে এই সংবাদটি পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। যদিও জৈন্তিয়া অভিযানের চূড়ান্ত ফলাফল তখনও বাকী ছিল, থেকারে রাজ্যটি দখলের ব্যাপারে অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে উঠেন। এপ্রিলের ৩ তারিখ তিনি কোম্পানির ঢাকা কাউন্সিল ও কলকাতা সদর দপ্তর বরাবর একটি রিপোর্ট পাঠান। এই রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, জৈন্তিয়া রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা তাৎক্ষণিকভাবেই কোম্পানির আনুগত্য মেনে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে জৈন্তিয়ার অধিকাংশ প্রজা তাদের বংশানুক্রমিক রাজার চেয়ে কোম্পানির কাছ থেকেই ভালো ব্যবহার আশা করেন। রাজ্যের নেতৃস্থানীয় লোকজন ইতোমধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে কোম্পানির প্রতি তাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন এবং তারা বার্ষিক রাজস্ব প্রদানেও রাজি হয়েছেন।[62]

থেকারে তাঁর রিপোর্টে আরও বলেন যে, জৈন্তিয়ার ব্যাপারে সদর দপ্তরের পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। যদি সদর দপ্তর মনে করেন যে, সিলেট অঞ্চলকে স্থিতিশীল করার জন্য তাঁর

---

[62] থেকারে লিখেছিলেন, “I am humbly of opinion that the Company may receive much greater advantage by annexing the whole of the flat country to Sylhet. A considerable part of it did formerly belong to the province : a short time will make amends for the deficiency of revenue occasioned by the Kaja's depredations, will fully defray the expense incurred by the march of the troops, and soon be annual increase of revenue to Government.” (*‘Sylhet’ Thackeray* by F.B. Bradley Birt, Chapter Seven, Page-165) বলাই বাহুল্য যে, থেকারের এসব দাবি ছিল পুরোপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট। মিথ্যা তথ্য দিয়ে তিনি জৈন্তিয়া অভিযানের সফলতার ব্যাপারে কোম্পানি সদর দপ্তরকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন। জৈন্তিয়া অভিযানের সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আরও কিছুদিন সিলেটে থেকে যাওয়ার অনুমতিও প্রার্থনা করেছিলেন।

সিলেটেই থাকা উচিত তবে তিনি খুশিমনে সে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। পরিশেষে তিনি জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশকে কোম্পানি শাসিত অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করার অনুরোধ জানিয়ে লিখেন যে, অতীতে জৈন্তিয়া সমতলের একাংশ সিলেটেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি এই রাজ্যের সমতল অংশকে সিলেটের সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে কোম্পানি বিপুলভাবে উপকৃত হবে। রাজার লুটপাটের কারণে কোম্পানির রাজস্বের যে ক্ষতি হয়েছে, অল্প সময়ের মধ্যে সেটি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।[63] সামরিক অভিযানের খরচও এতে উঠে আসবে এবং শিগগিরই সরকারের কোষাগারে বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

থেকারে জানতেন, জৈন্তিয়া সমতল থেকে প্রচুর রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনাটিকেই ঢাকা ও কলকাতা কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বড় করে দেখবেন এবং এজন্য তারা জৈন্তিয়া সমতলকে হাতছাড়া করতে চাইবেন না; নতুন অঞ্চলকে কোম্পানি শাসনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য তারা থেকারের মতো অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকেই সিলেটের দায়িত্বে বহাল রাখবেন। কিন্তু থেকারে জানতেন না, বড় কর্তারা তাঁর রিপোর্টে জৈন্তিয়ার রাজার কোষাগার থেকে প্রাপ্ত অর্থের কোন তথ্য না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়বেন। জৈন্তিয়ার রাজধানীতে কোন উল্লেখযোগ্য অর্থভাণ্ডারের সন্ধান না পাওয়ায় থেকারে তাঁর রিপোর্টে এজাতীয় কোন তথ্য দিতে পারেননি। এর পেছনে মূল কারণ ছিল রাজ্যটির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। রাজ্যটির অর্থনীতি বেশ প্রজাবান্ধব হওয়ায় রাজারা খুবই অল্প পরিমাণে রাজস্ব আদায় করতেন। তাই রাজকোষে খুবই অল্প পরিমাণ অর্থকড়ি সঞ্চিত থাকতো।

---

[63] থেকারে সিলেটের দায়িত্ব গ্রহণের পর কোম্পানি সদর দপ্তরকে জানিয়েছিলেন যে, জৈন্তিয়ার রাজার লুটপাটের কারণে সিলেটের রায়তদের অনেকেই যথাযথভাবে খাজনা পরিশোধ করছে না। তাই কোম্পানি সরকারের পক্ষে তিনি কাঙ্খিত পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহে ব্যর্থ হচ্ছেন। থেকারের এই অভিযোগের সত্যতা কতটুকু তা নিয়ে সন্দেহ আছে। এর কারণ, তিনি মুসলমান আমলের রাজস্বের (বার্ষিক ১,৩৬,০০০ টাকা) চেয়েও বেশি রাজস্ব (বার্ষিক ১,৭০,০০০ টাকা) আদায় করতেন। তাঁর সময়ে সিলেটের রাজস্ব হ্রাস পায়নি; বরং বেড়েছে। কিন্তু তাঁর অভিযোগ ছিল, জৈন্তিয়ার রাজার লুটপাটের কারণে কোম্পানির রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা কতটা ধূর্ত, শঠ ও মিথ্যাবাদী ছিলেন তার এক আদর্শ নমুনা হচ্ছেন সিলেটের কালেক্টর থেকারে।

জৈন্তিয়ার রাজকোষে যে পরিমাণ অর্থকড়ি থাকতো তা সহজেই স্থানান্তরযোগ্য ছিল। তাই এটি অনুমান করা কঠিন নয় যে, রাজা ছত্রসিংহ যখন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন তিনি সকল অর্থকড়ি সাথে নিয়েই চলে গিয়েছিলেন। এজন্য ব্রিটিশরা যখন রাজধানীতে ঢুকেছিল তখন রাজকোষ ছিল একেবারেই শূণ্য। এটি ছিল ব্রিটিশদের জৈন্তিয়া বিজয়ের পথে প্রথম ধাক্কা। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের এটি বুঝতে মোটেও দেরী হল না যে, শত শত বছর ধরে খুবই অল্প পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের প্রচলন থাকায় জৈন্তিয়ার অধিবাসীদের কাছ থেকে রাতারাতি প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে না। কর্তৃপক্ষ আরও বুঝতে পারলেন যে, রাজার সেনাবাহিনী যেহেতু সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাহাড়ে অবস্থান করছে সেহেতু জৈন্তিয়া সমতলে ব্রিটিশ বাহিনীর লোকবল কমে গেলে রাজার সৈন্যদের আক্রমণ ঠেকানো খুবই মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই রাজ্যটিকে স্থায়ীভাবে দখল করে রাখতে গেলে কোম্পানিকে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়নের খরচ সামলাতে হবে।

আট. জৈন্তিয়ার ব্যাপারে ঢাকা কাউন্সিলের প্রস্তাব

জৈন্তিয়া অভিযান নিয়ে থেকারের পাঠানো রিপোর্টটি ঢাকায় পৌঁছল ৮ এপ্রিল। ঢাকা কাউন্সিলের প্রধান কর্মকর্তা রিচার্ড বারওয়েল এবং তাঁর সহকর্মীরা জৈন্তিয়া অভিযানের সাফল্যের সংবাদ জেনে খুবই খুশী হলেন। যেহেতু সিলেট ছিল রিচার্ড বারওয়েলের অধীনস্থ এলাকা সেহেতু জৈন্তিয়ার ভাগ্য নির্ধারণে তাঁর মতামতের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন যে, জৈন্তিয়ার ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারটি বেশ জটিল। তাঁর সামনে তিনটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত, থেকারের প্রস্তাব অনুযায়ী জৈন্তিয়া সমতলকে সরাসরি কোম্পানি শাসনের অধীনে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত, জৈন্তিয়া সমতলকে কোন একজন ব্রিটিশ অনুগত জমিদার বা রাজার কাছে সমর্পণ করা। তৃতীয়ত, কোন উপায়ান্তর না পেলে যতটুকু সম্ভব কোম্পানি স্বার্থ হাসিল করে জৈন্তিয়া থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। থেকারের প্রস্তাব অনুযায়ী জৈন্তিয়া সমতলকে স্থায়ীভাবে দখল করতে গেলে কী কী সমস্যা ও সংকট দেখা দিবে তা রিচার্ডের চোখের সামনে একদম স্পষ্ট ছিল। ‘জৈন্তিয়া রাজ্যের অধিকাংশ প্রজা তাৎক্ষণিকভাবেই কোম্পানির আনুগত্য মেনে নিয়েছেন’ বলে থেকারে যে রিপোর্ট লিখেছিলেন তা তিনি একটুও বিশ্বাস করেননি।

তাই তিনি জৈন্তিয়ার ব্যাপারে থেকারের প্রস্তাবকে মোটেও পাত্তা দেননি। থেকারের প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর সামনে কিছু বড় ধরণের বাধা এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমত, জৈন্তিয়ার রাজা ও তাঁর সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। বিপুল সংখ্যাক পাহাড়ি যোদ্ধাও তাদের পক্ষে লড়তে রাজি ছিল। রাজার বাহিনী ও পাহাড়ি যোদ্ধাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য জৈন্তিয়া সমতলে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়েনের কোন বিকল্প ছিল না। রিচার্ড জৈন্তিয়া সমতলের জন্য একটি সেনাবাহিনী পোষার খরচ বহন করতে চাননি। দ্বিতীয়ত, জৈন্তিয়ার রাজকোষে কোন অর্থ মিলেনি। যদি রাজকোষে প্রচুর অর্থ পাওয়া যেতো তবে তা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জৈন্তিয়ার মাটিতে কোম্পানির সেনাবাহিনী পোষা যেতো। তৃতীয়ত, জৈন্তিয়ার অর্থনীতি ছিল প্রজাবান্ধব। প্রজারা নামমাত্র রাজস্ব আদায় করতেই অভ্যস্থ ছিল। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের নতুন ধার্য্যকৃত রাজস্ব আদায়ে তারা বিন্দুমাত্র উৎসাহী হবে না। দীর্ঘদিন ধরে রাজাদের শাসনের সাথে অভ্যস্থ থাকায় তারা রাজা ছাড়া অন্য কারও শাসন মেনে নিতেও উৎসাহী হবে না।

এসকল বাস্তবতার নিরিখে রিচার্ড বারওয়েল মত প্রকাশ করলেন যে, জৈন্তিয়া রাজ্যটি দীর্ঘদিন ধরে রাজপরিবারের অধিকারে থাকায় এখানকার মানুষ রাজার অন্ধভক্ত। তাই রাজার কাছ থেকে সমঝোতার প্রস্তাব পেলে তাঁর কাছে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়াটাই হতো সবচেয়ে ভালো সমাধান।[64] কিন্তু যেহেতু রাজার কাছ থেকে এমন কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি সেহেতু তাকে বিকল্প উপায় নিয়ে ভাবতে হল। জৈন্তিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সামরিক ব্যয় উপেক্ষা করার জন্য রিচার্ড মত দিলেন যে, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের সবচেয়ে

---

[64] "Richard Barwell was of opinion that it would have been undoubtedly better to restore it to the Raja of Jaintia on account of the prejudices of the people and the long time his family had held possession, if only he had shown signs of coming to terms. Failing this, in order to avoid the expense of a military establishment for its defence, he considered the most satisfactory and expeditious method of terminating the affair to be the transfer of the Raja's lands to a neighbouring zemindar, who would give guarantees to live on friendly terms with the Company." (*'Sylhet' Thackeray* by F.B. Bradley Birt, Chapter Seven, Page-167,168)

সন্তোষজনক ও দ্রুততম উপায় হল, জৈন্তিয়ার রাজার ভূমিকে এমন কোন প্রতিবেশী জমিদারের হাতে তোলে দেওয়া যিনি কোম্পানির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ শর্ত রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন। এমন একজন জমিদারকে রিচার্ড নিজেই বেছে নিলেন। এই জমিদার ছিলেন উত্তর সিলেটের একজন প্রভাবশালী জমিদার।

তাঁর নাম ছিল আহমেদ রেজা (ব্রিটিশদের উচ্চারণে আখমেত রিজা)। তাঁর জমিদারি এলাকার কেন্দ্র ছিল পান্ডুয়া।[65] মোগল আমলে তিনি একজন থানাদার ছিলেন বিধায় তাকে 'পান্ডুয়া থানাদার' নামেও ডাকা হতো। তিনি রাজা ছত্রসিংহের প্রতিবেশী জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারি এলাকাটি ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত সংলগ্ন। বর্তমান সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা এবং সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলা ছিল তাঁর অধীনস্থ এলাকা। খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় এই এলাকায় খাসিয়াদের বেশ প্রভাব ছিল। খাসিয়া প্রভাবকে মোকাবিলার জন্যই মোগলরা আহমেদ রেজাকে থানাদার নিযুক্ত করেছিল। কোম্পানি আমলেও সিলেটের উত্তর সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। খাসিয়া আক্রমণ থেকে সিলেট সমতলকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাঁর উপরেই নির্ভর করতেন।

জৈন্তিয়া রাজ্য নিয়ে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে রিচার্ড বারওয়েল তাঁর উপরেই নির্ভর করতে চাইলেন। তিনি আহমেদ রেজাকে ঢাকায় একজন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য তলব করলেন। আহমেদ রেজাকে জানানো হল যে, তাঁর কাছে জৈন্তিয়া হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোম্পানির যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো তাঁর প্রতিনিধির কাছেই ব্যাখ্যা করা হবে। এর পরদিন রিচার্ড কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি পত্র লিখে তাঁর এই জৈন্তিয়া বিষয়ক পরিকল্পনার কথা তোলে ধরেন। পত্রে তিনি লিখেন যে, আহমেদ রেজা একমাত্র ক্ষমতাধর ব্যক্তি যিনি প্রতিপক্ষ হিসেবে জৈন্তিয়ার রাজাকে মোকাবিলা করার যোগ্যতা রাখেন। যদি রাজা বলপূর্বক তাঁর রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন

---

[65] বর্তমান সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার পাড়ুয়া অঞ্চলটিকে ব্রিটিশরা 'পান্ডুয়া' নামে ডাকতো। থেকারের পরবর্তীতে রবার্ট লিন্ডসে নামক একজন কালেক্টর এখানে একটি বাণিজ্যকুটি স্থাপন করেছিলেন। তিনিও জায়গাটিকে 'পান্ডুয়া' নামেই অভিহিত করেছেন। এদেশীয় নামের সঠিক উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা বেশ উদাসীন ছিল।

তাহলে আহমেদ রেজা তা প্রতিহত করতে পারবেন। ওই অঞ্চলকে স্থিতিশীল করার জন্য এটিই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুততম পন্থা। এই পরিকল্পনাটি কার্যকর করা গেলে জৈন্তিয়া থেকে কোম্পানি সৈন্য প্রত্যাহারের পাশাপাশি অভিযানে ব্যয় হওয়া অর্থও উদ্ধার করা সম্ভব হবে। রিচার্ড বারওয়েল জৈন্তিয়ায় অবস্থানরত ক্যাপ্টেন এলিকারের কাছেও একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। ১৪ এপ্রিল তারিখে লিখিত ওই পত্রে তিনি ক্যাপ্টেনকে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

নয়. কোম্পানির জৈন্তিয়া অভিযানের ব্যর্থ পরিসমাপ্তি

রিচার্ড বারওয়েল জৈন্তিয়া নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা থেকারেকে জানালেন। কিন্তু থেকারে তৎক্ষণাৎ এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেন। জৈন্তিয়া সমতলের শাসনভার একজন জমিদারের হাতে তোলে দেওয়ার প্রস্তাবে তিনি ঘোর আপত্তি জানালেন। আহমেদ রেজার হাতে এতো বড় একটি রাজ্যের ক্ষমতা তোলে দেওয়ার বিপদ তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজার চেয়ে আহমেদ রেজাকে অধিক বিশ্বাস করার কোন কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই জমিদারকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজার চেয়েও খারাপ মনে করতেন। তাই তিনি মত দিলেন যে, এই জমিদারের হাতে নতুন অঞ্চলের কর্তৃত্ব তোলে দিয়ে তাঁর ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না; বরং তাঁর হাতে যে অঞ্চলটি রয়েছে সেটিও কেঁড়ে নেওয়া উচিত। যদি কলকাতা সদর দপ্তর জৈন্তিয়া সমতলকে কোম্পানি শাসনের অধীনস্থ না করেন তাহলে এই অঞ্চলটিকে সুনির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে জৈন্তিয়ার রাজার হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই উত্তম হবে। জৈন্তিয়াকে ব্রিটিশ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া সবচেয়ে নিরাপদ সমাধান হল, কোম্পানির সাথে ভবিষ্যতে সুসম্পর্ক বজায় রাখার শর্তের ভিত্তিতে রাজাকে পুনর্বহাল করা। এতে পাহাড়ি আদিবাসীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক প্রভাবও সৃষ্টি হবে।

জৈন্তিয়া নিয়ে রিচার্ড বারওয়েলের পরিকল্পনায় থেকারের আপত্তির পেছনে কিছু ভালো যুক্তি ছিল। রিচার্ড বারওয়েল এসব যুক্তি মেনে নিলেন। তাই আহমেদ রেজার হাতে জৈন্তিয়া সমর্পনের পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে গেল। কিন্তু হুট করে নতুন কোন সিদ্ধান্তও নেওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে জৈন্তিয়ায় মোতায়েনকৃত সৈন্যদের পেছনে কোম্পানির খরচের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছিল।

অবশেষে রিচার্ড থেকারের কাছে একটি পত্র লিখে জৈন্তিয়ার ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করলেন যে, তিনি আগের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন এবং কলকাতা সদর দপ্তরও চাচ্ছেন না যে, থেকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আহমেদ রেজাকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। জৈন্তিয়ার ব্যাপারে কলকাতা সদর দপ্তর এবং ঢাকা কাউন্সিলের মতামত হল, কোম্পানির জন্য অনুকূল শর্তের ভিত্তিতে রাজার সাথে শান্তিচুক্তিতে যেতে হবে এবং জৈন্তিয়া অভিযানের পেছনে কোম্পানির যে ব্যয় হয়েছে, রাজার কাছ থেকে সেটি আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। রিচার্ড বারওয়েল আরও লিখলেন যে, জৈন্তিয়া অভিযানের পেছনে অতিরিক্ত খরচের চাপ কোম্পানি প্রশাসনকে অধৈর্য করে তোলেছে। জৈন্তিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে বিলম্ব হলে তাকে (রিচার্ড বারওয়েল) হয়তো বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। তাই থেকারের উচিত হবে যত দ্রত সম্ভব জৈন্তিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা।[66]

থেকারের কাছে রিচার্ড বারওয়েল পত্রটি লিখেছিলেন ১৭৭৪ সালের ২৬ এপ্রিল। এটি থেকারের হাতে পৌঁছেছিল ২০ মে। এর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই থেকারে নিজ উদ্যোগে রাজা ছত্রসিংহের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছিলেন। পাহাড়ে অবস্থানরত রাজার সাথে তিনি দূত মারফৎ যোগাযোগ রাখছিলেন। রাজার সাথে শান্তি আলোচনার ব্যাপারে রিচার্ড বারওয়েলের নির্দেশ লাভের পর তিনি আটঘাট বেঁধে কাজে নেমে পড়লেন। শান্তিচুক্তির ব্যাপারে যেকোন মূল্যে রাজার সম্মতি আদায়ের জন্য তিনি জোরালো আলোচনার ব্যবস্থা করলেন। রাজার সাথে তাঁর প্রতিনিধিদের ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতে লাগল। অবশেষে জুন মাসের প্রথমদিকে রাজা শান্তিচুক্তিতে সম্মত হলেন। চুক্তি অনুযায়ী রাজা তাঁর রাজ্যের সমতল অংশ ফেরত লাভের বিনিময়ে কোম্পানিকে ১৫,০০০ টাকা দিতে রাজি হলেন। ঠিক হল, রাজধানী ফেরত লাভের কয়েকদিনের মধ্যে তিনি কোম্পানিকে ৫,০০০ টাকা দিবেন। আর বাকি টাকা দিবেন পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে। আরও ঠিক হল যে, পুরো টাকা

---

[66] "The economy of the times", wrote Richard Barwell later, "renders the administration impatient and uneasy under every extra expense, and as the delay in withdrawing the troops from Jaintia may be attended by strictures from below I should be sorry to incur, I beg you will evacuate the country as soon as possible." (*'Sylhet' Thackeray* by F.B. Bradley Birt, Chapter Seven, Page-170,171)

আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজার একজন নিকটাত্মীয় জামিন হয়ে থেকারের কাছে থাকবেন।

শান্তিচুক্তির শর্ত মোতাবেক কোম্পানি সৈন্যরাও রাজধানী ছেড়ে দিল। ১৭৭৪ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর বাহিনী নিয়ে সিলেটে ফিরলেন। একইসাথে রাজাও তাঁর রাজধানীতে ফিরলেন। শান্তিচুক্তির এই অগ্রগতির কথা জানিয়ে থেকারে তৎক্ষণাৎ কলকাতা সদর দপ্তর এবং ঢাকা কাউন্সিলে রিপোর্ট পাঠালেন। তাঁর এই রিপোর্টটি ঢাকা কাউন্সিলের হস্তগত হয় ১২ জুন। রিপোর্টে তিনি লিখেছিলেন, 'I flatter myself, gentlemen' Thackeray wrote in his official account of the agreement, 'that this will meet with the approbation of the Hon'ble the President and Council as it is agreeable to what you recommend in your letter to me under date the 7th of March, for although the sum of money which I had been able to procure does not amount to near what you expected, yet when I assure you that the Raja is not capable to satisfy these demands and that what he has now consented to pay is, in my opinion, as much as he is able to give, I hope it will be thought sufficient, more particularly as from the tenour of your letter, allowances were made for his situation and circumstances.' (*'Sylhet' Thackeray* by F.B. Bradley Birt, Chapter Seven, Page-172)

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে ক্যাপ্টেন এলিকার তাঁর অধিকাংশ সৈন্যসহ সিলেট ছেড়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন।[67] থেকারের ইচ্ছা ছিল, ল্যাফটেনেন্ট এনসাইন লিকের বাহিনীটিকে সিলেটে রেখে দেওয়া। এ ব্যাপারে তিনি আগেই রিচার্ড বারওয়েলের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রিচার্ড

---

[67] এলিকার ১৭৬৯ সাল থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। সেখানে পদোন্নতি পেয়ে তিনি কর্নেল হয়েছিলেন। ১৭৮৬ সালে বর্মী সৈন্যরা চট্টগ্রাম আক্রমণ করলে এলিকার তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি বসবাস করতেন চট্টগ্রামের জাফরাবাদে। চট্টগ্রামের 'কর্নেলের হাট' জায়গাটির সাথেও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত। কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮০২ সালে।

তাকে জানিয়েছিলেন যে, একান্ত প্রয়োজন হলে এই বাহিনীটিকে সিলেটে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের থাকাবাবদ কোনও খরচ কোম্পানি বহন করবে না। থেকারে নিজ খরচে এই বাহিনীকে সিলেটে রাখতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই জৈন্তিয়া অভিযানের পরিসমাপ্তির পর তারাও ঢাকায় চলে গেল। থেকারের নিজেরও ঢাকায় চলে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, ইতোমধ্যে তাঁর ঢাকায় বদলীর আদেশের প্রায় এক বছর হয়ে গিয়েছিল এবং জৈন্তিয়া অভিযানের পরিসমাপ্তি হওয়ায় তাঁর সিলেটে থাকার আর কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু এবারেও তিনি জৈন্তিয়ার অজুহাত দেখিয়ে আরও কিছুদিন সিলেটে থাকার সুযোগ বাগিয়ে নিলেন। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে তিনি লিখেন যে, জৈন্তিয়ার রাজা চুক্তির শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন করেন কিনা সেটি তদারকির জন্য তাঁর আরও কিছুদিন সিলেটে অবস্থান করা উচিত। যথারীতি আবারও তাকে সিলেটে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। ২৮ জুন থেকারে ঢাকা কাউন্সিলের কাছে একটি পত্র লিখে জানান যে, জৈন্তিয়ার রাজার আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। ১৮ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।[68] নতুন রাজা শান্তিচুক্তির শর্তাবলী পালনে সম্মত হয়েছেন। এই সংবাদটি কোম্পানি সদর দপ্তরে পৌঁছলে ৫ জুলাই থেকারের জন্য একটি নতুন আদেশ জারি করা হয়। এতে বলা হয়, নতুন রাজার কাছ থেকে কোম্পানির প্রাপ্য বাকি টাকা আদায়ের কাজগুলো তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থেকারের কাছেই থাকবে।

[68] রাজা ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগিনেয় যাত্রানারায়ণ সিংহাসনে বসেছিলেন। থেকারে হয়তো জৈন্তিয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারের নিয়ম জানতেন না। তাই নতুন রাজাকে ছত্রসিংহের পুত্র বলে মনে করেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, এই নিয়মটি জানা থাকলেও তিনি তাঁর পত্রে সঠিক তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।

অধ্যায় ছাব্বিশ
যাত্রানারায়ণের শাসনামল

(১৭৭৪ সাল – ১৭৮৫ সাল)

রাজা ছত্রসিংহের বোন সোনাকুয়ঁরীর পুত্র ছিলেন যাত্রানারায়ণ। ১৭৭৪ সালে রাজা ছত্রসিংহের আকস্মিক মৃত্যু হলে যাত্রানারায়ণ বেশ অল্প বয়সেই সিংহাসনে বসেন। তিনি তাঁর মামার সাথে সম্পাদিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শান্তিচুক্তির শর্তপূরণে রাজি হয়েছিলেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি কোম্পানিকে বাকি ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছিলেন। এজন্য জৈন্তিয়া রাজ্যে কিছুটা মুদ্রা সংকট কাজ করছিল। তাই যাত্রানারায়ণ তাঁর শাসনকালের অষ্টম বর্ষে আবারও মুদ্রা ছাপিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র রাজা যিনি দুবার মুদ্রা ছাপিয়েছিলেন। প্রথমবার ছাপিয়েছিলেন তাঁর সিংহাসনারোহণের বছর অর্থাৎ ১৬৯৬ শকাব্দে (১৭৭৪ সালে)। এই মুদ্রাটির একপাশে লেখা ছিল 'শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৯৬'। আর অপর পাশে লেখা ছিল 'শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য'। দ্বিতীয়বার তিনি মুদ্রা ছাপিয়েছিলেন ১৭০৪ শকাব্দ বা ১৭৮২ সালে।



চিত্র: রাজা যাত্রানারায়ণের চালু করা মুদ্রা (কাটরা টাকা)। মুদ্রার এক পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য। অপর পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৭০৪।

এক. ব্রিটিশদের সাথে যাত্রানারায়ণের সম্পর্ক

চুক্তির শর্ত পূরণ করায় ব্রিটিশদের সাথে যাত্রানারায়ণের সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক। ব্রিটিশরা তাঁর সাথে কোন আগ্রাসী আচরণ করেনি। তিনিও ব্রিটিশদের সাথে শান্তি বজায় রেখেছিলেন। ১৭৭৯ সালে জৈন্তিয়ার কিছু দুষ্কৃতিকারী কোম্পানি শাসিত এলাকায় ঢুকে লুটপাট চালায়। রাজা যাত্রানারায়ণ সাথে সাথেই তাদেরকে দমন করেন। এক্ষেত্রে সিলেটের নবাগত কোম্পানি কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসে (তিনি ১৭৭৮ সালে সিলেটের কালেক্টর হয়ে এসেছিলেন) তাকে সাহায্য করেছিলেন। রাজাকে সহায়তার জন্য লিন্ডসে হাবিলদার বিশ্বনাথের নেতৃত্বে ১০ জন সিপাইকে পাঠিয়েছিলেন। এদের সহায়তায় রাজা অপরাধীদেরকে ধরে এনে শাস্তি দিয়েছিলেন। এই ঘটনার আগে অথবা পরে যাত্রানারায়ণের আমন্ত্রণে সাঁড়া দিয়ে রবার্ট লিন্ডসে জৈন্তিয়া সফর করেছিলেন। ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যত শান্তি বজায় রাখলেও যাত্রানারায়ণ গোপনে সিলেটের ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে সাহায্য করেছিলেন। ১৭৮৩ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল (তাঁর মৃত্যুর বছর) পর্যন্ত তিনি সিলেটের বিদ্রোহীদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছিলেন।

দুই. রবার্ট লিন্ডসের জৈন্তিয়া ভ্রমণ

উইলিয়াম মেকপিস থেকারের পরে স্বল্প সময়ের জন্য সিলেটে দুজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা এসেছিলেন। তারা এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের কাজে খুব একটা স্বস্তি বোধ করেননি। তাদের কাছে মনে হয়েছিল, এখানকার মানুষ কিছুটা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন। তাই সিলেটের কর্মজীবনকে সংক্ষিপ্ত করে তারা অন্যত্র ফিরে গিয়েছিলেন। এরপর সিলেটে আসেন অত্যন্ত দক্ষ ও সাহসী ব্রিটিশ কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসে। তিনি প্রায় এক যুগ সিলেটে কাটিয়েছিলেন। এখানে তাঁর চাকুরীজীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন ও কর্মমুখর। সিলেটে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখতে গিয়ে তিনি বেশ প্রতিকূলতার মুখোমুখী হয়েছিলেন। নিজের ব্যবসা ও ক্ষমতাকে নিরাপদ রাখার জন্য তিনি প্রতিবেশীদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেছিলেন। সিলেটে আসার পরপরই তিনি জৈন্তিয়া রাজ্য ও খাসিয়া সরদারদের এলাকা সফর করেছিলেন। এসব ভ্রমণের বর্ণনা তাঁর আত্মজীবনীতে স্থান পেয়েছে। শেষ বয়সে তিনি তাঁর কন্যাদেরকে দিয়ে নিজের আত্মজীবনী লিখিয়েছিলেন। এই আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তিনি সিলেটের

কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরে জৈন্তিয়ার রাজার আমন্ত্রণে রাজ্যটি সফরে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার একটি ঐতিহ্যবাহী শিকার উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।

তিন. ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে যাত্রানারায়ণের মদদ

লিন্ডসে জৈন্তিয়াবাসীকে কতোটা অবিশ্বাস করতেন তা তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, জৈন্তিয়ার খাসিয়াদেরকে (লিন্ডসে সিন্টেংদেরকেও খাসিয়া মনে করতেন) গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর কাছে মনে হয়েছে যে, এদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত নয়। তাই জৈন্তিয়া সফরের পর খাসিয়া-সিন্টেংদের উপর আস্থা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, উল্টো তিনি খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে (পান্ডুয়া বা পাড়ুয়ায়) অবস্থিত তাঁর বাণিজ্য কুটিরের নিরাপত্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।[69] অন্যদিকে জৈন্তিয়ার রাজাও জানতেন যে, লিন্ডসে নিতান্ত বাধ্য হয়েই জৈন্তিয়ার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখছেন এবং জৈন্তিয়া দখলের চেষ্টাটি অতীতের মতো অলাভজনক হবে ভেবেই তিনি এই কাজ থেকে বিরত রয়েছেন। তাই তিনি ব্রিটিশদেরকে নিজের প্রতিপক্ষই ভাবতেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে সিলেটের মুক্তি কামনা করতেন। এমনকি গোপনে গোপনে তিনি সিলেটের ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে মদদ দানের কাজটিও শুরু করে দিয়েছিলেন।

রবার্ট লিন্ডসে কখনো ভাবতেই পারেননি যে, তাঁর অধীনস্থ অঞ্চলে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উত্থান সম্ভব। কিন্তু জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সহায়তায় সেটিই সম্ভব হয়েছিল। কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ সিলেটের বিদ্রোহীদের হাতে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র তোলে দিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা এসব আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের গোপন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে। আধুনিক ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধের জন্য

---

[69] "Upon studying the dispositions of the Cusseahs with more attention, I found (as I have already stated) that they were not altogether to be depended upon; …… In my block-house at Pondua, I had now fixed a permanent establishment of a black officer and twelve men; and fortunate was it I had taken this precaution." (*Lives of the Lindsays*, *Oriental Miscellanies*, Page-54, 55)

প্রয়োজনীয় সকল সামরিক বিদ্যাও তারা সেখান থেকেই রপ্ত করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের দুটি সামরিক অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৭৮৩ সালে। ওই বছরের প্রথমদিকে সিলেটের বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ভূস্বামী ও জমিদাররা গোপনে কাছাড়ি রাজা ও জৈন্তিয়ার রাজার সাথে মিলে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন। বিদ্রোহের মূল সমন্বয়ক ছিলেন জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের মধ্যবর্তী কোম্পানিশাসিত অঞ্চলের একজন ভূস্বামী। তাঁর নাম ছিল মীর মোহাম্মদ চৌধুরী। পূর্ব সিলেটের চাপঘাট পরগনার বরাক নদীর তীরবর্তী ভাঙ্গা অঞ্চলের একজন ভূস্বামী ছিলেন তিনি। তাঁর এলাকা থেকে জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যে অবাধেই যাতায়াত করা যেতো। এ সুবাধে তিনি সিলেটের বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি হিসেবে উভয় রাজ্যের সাথে গোপন যোগাযোগ গড়ে তোলেছিলেন।

পূর্ব সিলেটের চরগোলার জমিদার রাধারাম এবং পশ্চিম সিলেটের সেলবরষ পরগনার জমিদার মোহাম্মদ হাজির চৌধুরী ও মোহাম্মদ সাদির চৌধুরী ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। মীর মোহাম্মদের মধ্যস্থতায় তারা জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সহায়তা লাভে সচেষ্ট হন। ১৭৮৩ সালে এসব জমিদারকে নিয়ে মীর মোহাম্মদ কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। এতে জৈন্তিয়ার রাজার একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে সিলেটের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর দুই পুত্র পূর্ব সিলেটের স্বাধীনতাকামী যুবকদেরকে নিয়ে একটি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন; চরগোলার জমিদার রাধারাম একটি প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন এবং সেলবরষের জমিদার ভাতৃদ্বয়ও তাদের লোকজনকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন।

এদের সকলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন জৈন্তিয়ার রাজা যাত্রানারায়ণ। ১৭৮৩ সাল থেকে পূর্ব সিলেটের চাপঘাট, চরগোলা, প্রতাপগড়, জাফরগড় এবং পশ্চিম সিলেটের সেলবরষ অঞ্চলের বিদ্রোহী যুবকরা জৈন্তিয়া রাজ্যে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। পরের বছর থেকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৭৮৪ সালের ২৫ নভেম্বর চরগোলার জমিদার রাধারাম নিজেকে চরগোলার নবাব বলে ঘোষণা করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করে দিল্লীর মোগল সম্রাটের কাছ থেকে নবাবীর সনদ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোষাগারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং সম্ভাব্য ব্রিটিশ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। একটি দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি চরগোলার অনেক যুবককে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণের জন্য জৈন্তিয়ায় পাঠিয়ে দেন।

চার. যাত্রানারায়ণের ভূমিদানের তথ্য

পূর্ববর্তী রাজাদের মতোই যাত্রানারায়ণ বেশ কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। ১৭০২ শকাব্দে তিনি আড়াইখা রাজের দেওয়ানের গ্রাম থেকে দেওয়ান মাণিক চাঁদকে ৩৪৮ বিঘা ভূমি দান করেন। ১৭০৩ সালে তিনি একই ব্যক্তিকে সাতবাক রাজের রামপুর পশ্চিম থেকে আরও ৫৯৫ বিঘা জমি দেন। দেওয়ান মাণিক চাঁদের কোন একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ভূমিকায় খুশী হয়ে রাজা এসব জমি দিয়েছিলেন। রামকান্ত ভট্টাচার্য নামে রাজার একজন পত্রলেখক ছিল। রাজা খুশী হয়ে তাকেও বেশ কিছু ভূমি দিয়েছিলেন। ১৭০৪ শকাব্দে সাতবাক রাজের পাত্রনবীশের মাটি থেকে রাজা রামকান্ত ভট্টাচার্যকে ১৩৬ বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন। যাত্রানারাণের শাসনকাল ছিল ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত। তাঁর পরে জৈন্তিয়ার রাজা হন বিজয়নারায়ণ।

অধ্যায় সাতাশ
রবার্ট লিন্ডসের জৈন্তিয়া ভ্রমণ

সিলেটে নিযুক্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কালেক্টর ছিলেন উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে। তিনি ১৭৭৫ সাল পর্যন্ত সিলেটের দায়িত্বে ছিলেন। ওই বছরের শেষের দিকে তিনি সিলেটের দায়িত্ব ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। তাঁর স্থলে নতুন কালেক্টর নিযুক্ত হন সামনার। সামনার বেশিদিন সিলেটের দায়িত্ব পালন করেননি। ১৭৭৬ সালে উইলিয়াম হলান্ড নামক এক কর্মকর্তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে তিনি সিলেট ছেড়ে চলে যান। হলান্ড দুই বছর সিলেটের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর সিলেটে আসেন রবার্ট লিন্ডসে। তিনি প্রায় এক যুগ সিলেটের কালেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৭৭৮ সাল থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত সিলেটে তাঁর খুবই কর্মব্যস্ত সময় কেটেছিল। এটিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। শেষ বয়সে তিনি তাঁর প্রবাসজীবনের স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এতে সিলেটের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্য স্থান পেয়েছে।

লিন্ডসের বাড়ি ছিল ব্রিটেনের পূর্ব স্কটল্যান্ডের ব্যালকারেস এলাকায়। তাঁর জীবনের দুই দশক কেটেছিল নিজের দেশের বাইরে। এর মধ্যে শেষ ১২ বছর কেটেছিল সিলেটে। ১৭৮৯ সালে সিলেটের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর তাঁর প্রবাসজীবনের সমাপ্তি ঘটে। ওই বছর পূর্ব স্কটল্যান্ডে ফিরে গিয়ে তিনি বিশাল অংকের টাকা দিয়ে একটি জমিদারি কিনে নেন। 'ব্যালকারেস এস্টেট' নামক এই জমিদারির উন্নতির পেছনেই তিনি বাকি জীবন ব্যয় করেছিলেন। শেষজীবনে এসে তিনি তাঁর প্রবাস জীবনের স্মৃতিগুলো লেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে এসেছে। তাই নিজের আত্মজীবনী বা ডায়েরি রচনার কাজে তিনি তাঁর কন্যাদের সাহায্য নিলেন। অ্যান, এলিজাবেথ এবং সিসিলিয়া নামে তাঁর তিনজন কন্যা ছিল। তিনি যা মুখে বলতেন তা তারা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতো। ১৮২১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এই ডায়েরি রচনার কাজ শেষ হয়।

রবার্ট লিন্ডসের মতো প্রবাসজীবনের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা তাঁর পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে আরও অনেকের ছিল। তারাও লিন্ডসের মতো তাদের প্রবসজীবনের অভিজ্ঞতাগুলো ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এগুলোর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বিবেচনা করে এবং নিজেদের বংশের

গৌরবগাথা তোলে ধরার উদ্দেশ্যে একসময় লিন্ডসে পরিবার এসকল ডায়েরি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। তাদের উদ্যোগে উত্তর ইংল্যান্ডের উইগান শহরের একটি ছাপাখানা থেকে কয়েকটি খণ্ডে ডায়েরিগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থসিরিজটির নাম দেওয়া হয়েছিল *Lives of the Lindsays*. রবার্ট লিন্ডসের ডায়েরিটি এই সিরিজের চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্থ খণ্ডটি *Oriental Miscellanies* নামে ১৭৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে লিন্ডসে পরিবারের চারজন ব্যক্তির ডায়েরি স্থান পেয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথমেই ছিল রবার্ট লিন্ডসের ডায়েরি। ডায়েরিটি *Anecdotes of an Indian Life* নামে চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

লিন্ডসে তাঁর ডায়েরিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হল তাঁর জৈন্তিয়া ভ্রমণের ঘটনা। জৈন্তিয়ার রাজা যাত্রানারায়ণের আমন্ত্রণে তিনি জৈন্তিয়া সফর করেছিলেন। যাত্রানারায়ণ ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন (যদিও তিনি গোপনে সিলেটের ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে মদদ দিতেন)। তিনি রবার্ট লিন্ডসেকে একটি শিকার উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। লিন্ডসে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। তবে ঠিক কত সালে তিনি জৈন্তিয়া ভ্রমণ করেছিলেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। তাঁর ডায়েরির বর্ণনা পড়ে মনে হয়, সিলেটে আসার দুই-এক বছরের মধ্যেই তিনি জৈন্তিয়ায় গিয়েছিলেন। লিন্ডসের লেখা পড়ে মনে হয় না যে, তিনি জৈন্তিয়ার রাজা কিংবা জৈন্তিয়াবাসীদের প্রতি খুব একটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তবে জৈন্তিয়ার আদিবাসীদের সম্পর্কে গভীরভাবে জানার আগ্রহ থাকায় জৈন্তিয়ায় গিয়েছিলেন।

লিন্ডসের ডায়েরি পড়ে জানা যায়, তৎকালীন সিলেটের ব্রিটিশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল জৈন্তিয়া। প্রায় পঞ্চাশ মাইলজুড়ে বিস্তৃত এই রাজ্যটির রাজা ছিলেন আশেপাশের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে সভ্য ও শক্তিশালী। সেই রাজার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি নৌপথে জৈন্তিয়া গিয়েছিলেন। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। তিনি একটি বড় নৌকা এবং কিছু সহচর নিয়ে জৈন্তিয়া গিয়েছিলেন। সুচতুর লিন্ডসে তাঁর নৌকায় বসিয়েছিলেন ১৮টি ছোট ছোট কামান। নৌকা নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর দেখা গেল, তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রায় ৫০টি সুসজ্জিত নৌকা নিয়ে জৈন্তিয়ার রাজা

অপেক্ষা করছেন। এসব নৌকার সারির মধ্য দিয়ে লিন্ডসের নৌকা এগিয়ে গেলো। রাজা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চলে এলেন লিন্ডসের নৌকায়।

১৮টি কামান ছুঁড়ে রাজাকে অভিবাদন জানানো হল। রাজা বেশ আগ্রহ নিয়ে লিন্ডসের নৌকা ও কামানগুলো দেখলেন। লিন্ডসের কাছে রাজাকে সজ্জন ও সুদর্শনই বলেই মনে হয়েছিল। রাজা লিন্ডসের নৌকাটির প্রশংসা করলেন। এরপর জানালেন যে, লিন্ডসের জন্য একটি শিকারক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে এবং সবাইকে নিয়ে তিনি প্রথমে সেখানেই যেতে চান। নৌপথে কয়েক মাইল এগিয়ে সবাই একটি খাড়া জায়গায় নামল। সেখান থেকে কিছু লোক রাজা এবং আতিথিদেরকে কাঁধে বহন করে নিয়ে শিকারক্ষেত্রে পৌঁছল। শিকারক্ষেত্রটি প্রায় ৩০ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। জায়গাটি বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে রাজার লোকজন। আগে থেকে বেশ কিছু বন্য পশু এনে শিকারক্ষেত্রে জড়ো করা হয়েছিল। একটি অস্থায়ী মঞ্চ থেকে পুরো শিকারক্ষেত্রটি দেখার ব্যবস্থা ছিল।

চারদিকে ছিল উৎসুক জনতার ভীড়। রাজা তাঁর অতিথিদেরকে নিয়ে মঞ্চে বসলেন। লিন্ডসের দৃষ্টি তখন উপস্থিত জনতার পোশাকের দিকে। পাহাড় ও সমতলের লোকজন বৈচিত্র্যময় পোশাক পরে শিকার দেখতে উপস্থিত হয়েছে। পাহাড়ি আদিবাসীরা তাদের নিজ নিজ গোত্রের পোশাক পরে এসেছে। সমতলবাসীদের পোশাকও ছিল আকর্ষণীয়। কিছু লোকের পরণে ছিল সমতল ও পাহাড়ি পোশাকের মিশ্রণ। সবাই ছিল অস্ত্রসজ্জিত। ঢাল-তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্র শোভা পাচ্ছিল তাদের গায়ে। মঞ্চে লিন্ডসের সাথে বসেছিলেন রাজা, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ। তারাও ছিলেন অস্ত্রসজ্জিত; পরনে ছিল আদিবাসীদের পোশাক। তবে রাজার পোশাকটি ছিল অনেকটা মোগল ওমরাহদের মতো। তাঁর সঙ্গেও অস্ত্র ছিল। এসব অস্ত্র ছিল মূলত শিকারের জন্য।

লিন্ডসের নিজের সঙ্গেও একটি রাইফেল ছিল। মঞ্চের অতিথিদের মুখে হুকাবরদাররা (ডাবাধররা) হুকার নল তোলে দিল। অতিথিরা হুকা ফুঁকলেন। এবার শিকারের পালা। লিন্ডসে শিকারের পশুগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন। গড়ের মধ্যে ছিল প্রায় দুশো বুনো মহিষ। কয়েকশো বড় প্রজাতির হরিণ, ছোট প্রজাতির অগণিত হরিণ এবং অসংখ্য বুনো শুকর। পশুগুলো দলে দলে লাফাচ্ছিল। রাজা শান্তভাবে লিন্ডসের দিকে তাকিয়ে শিকার উদ্বোধনের

আহবান জানালেন। লিন্ডসে কিছুটা সংকোচ বোধ করলেন। তাঁর নিশানা খুব একটা ভালো ছিল না। তাই রাজার আহবান এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু রাজা ছিলেন নাছোড়বান্দা। লিন্ডসে রাইফেল কাঁধে তুলে একটি বড় মহিষের দিকে তাক করলেন। ভাগ্যক্রমে গুলি মহিষের গায়েই লাগল। মহিষটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

চারদিকে তখন উল্লাসধ্বনি। লিন্ডসে মুখে পাইপ দিয়ে নির্বিকারভাবে ধোঁয়া ছাড়লেন। এমন ভাব করলেন যেনো এই সফলতা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। লিন্ডসের পরে রাজার পালা। কিন্তু সফল হবেন কিনা ভেবে তিনি আর গুলি ছুড়লেন না। লিন্ডসের বামে বসেছিলেন রাজার লস্কর বা প্রধানমন্ত্রী। তিনি মাত্র দুটি তীর নিয়ে এসেছিলেন। এতো কম তীর নিয়ে আসার কারণ জানতে চাইলে বাঁকা হাসি দিয়ে বললেন, দুটি তীর দিয়ে যে লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয় সে কাজের অযোগ্য। বলেই একটি তীর ছুড়লেন। একটি হরিণ লুটিয়ে পড়ল। প্রধানমন্ত্রী গভীর তৃপ্তির সাথে ধূমপানে মগ্ন হলেন। হঠাৎ করে নাকাড়া বেজে উঠল। এরপর শোনা গেল শঙ্খধ্বনি। গড়ের দুয়ার গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে মাহুতসহ দশটি নর হাতি সামরিক কায়দায় অতিথিদের সামনে উপস্থিত হল।

মাহুতদের হাতে একটি করে আঁকশি। এই একটি হাতিয়ার দিয়েই তারা হাতি নিয়ন্ত্রণ করে। বুনো মহিষদের সাথে হাতির লড়াই নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে এসেছে। রাজা হাত দিয়ে ইশারা করলেন। লড়াই শুরু হল। হাতিগুলো মহিষদের দিকে তেড়ে গেলো। মহিষগুলোও যুদ্ধের ভঙ্গিতে মাথা তুলে তেড়ে এলো। সর্দার মহিষটি নাটকীয় দ্রুততায় হাতির সারির মাঝ বরাবর হামলা চালাল। হাতিগুলোর লাইন গেলো ভেঙ্গে। তারা ভয়ে এদিক সেদিক পালাল। কোনটি বেড়া ভেঙ্গে পালাল। আবার কোনটি মাহুতকে নিচে ফেলে দিল। কিন্তু একটি হাতি অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এটি রাজার বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি। সে লড়াইয়ের কলাকৌশল জানে। সে মহিষ দলের সর্দারকে এতো সহজে ছেড়ে দিল না। সর্দার মহিষটি তখন হামলা শেষ করে দল থেকে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে। হাতিটি হামলার প্রস্তুতি নিল।

লেজ ও শুড় খাড়া করে সে ভয়ংকর আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করল। তাকে এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দেখে মহিষটিও ফুঁসে উঠল। কিছুক্ষণ পা দিয়ে মাটি খুড়ে সে সবেগে ছুটল হাতিটির দিকে। এগিয়ে গেল হাতিও। সংঘর্ষের একেবারে চরম মুহুর্তে দেখা গেল, মহিষটি হাতির কাছে ধরাশায়ী হয়েছে।

প্রশিক্ষিত হাতিটি মহিষটিকে দাঁত দিয়ে তুলে প্রচণ্ড এক আছাড় মারল। এরপর সে মহিষটিকে দাঁত দিয়ে গেথে তুলে এনে রাখল রাজার পায়ের কাছে। এদিকে মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়া হাতিগুলো আবার মাঠে ফিরে এসেছে। এদের কয়েকটি ভালোই খেলল। মহিষগুলোর সাহস ছিল অবাক করার মতো। একের পর এক পালাক্রমে তারা লড়াই করে গেলো। লিন্ডসে মোট তিন দিন এমন বিনোদনের মধ্য দিয়ে কাটালেন। আরও বহু পশুর লড়াই দেখলেন। লড়াইয়ে নিহত পশুর গন্ধে চারপাশ ভারী হয়ে এসেছিল। লিন্ডসে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিলেটের পথে ফিরলেন।

Lives of the Lindsays সিরিজের চতুর্থ খণ্ডের (*Oriental Miscellanies*) ৪৮ থেকে ৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিন্ডসের নিজের লেখা জৈন্তিয়া ভ্রমণের বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনায় লিন্ডসে কিছু ভুল ও আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন; দু-একটি অর্ধসত্য তথ্যও দিয়েছন। বর্ণনাটি হুবহু নিম্নরূপ। তবে বর্ণনাটির কিছু অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য কিছু টিকা যুক্ত করা হয়েছে।

The Jointah Rajah, of the Cusseah[70] tribe, was my nearest frontier neighbour; he was by far the most powerful and the most civilised of the whole, holding large possessions, both on the mountain and the plain, about fifty miles distant. When a younger man, he had been misled by the false idea of his own power, and he had in consequence been the aggressor by entering the British territories in a hostile manner; a regiment of sepoys drove him back and convinced him of his

---

[70] সঠিক উচ্চারণ হবে Khasi (খাসিয়া)। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা সাধারণত মানুষ, জাতি, স্থান ইত্যাদির নামের ক্ষেত্রে ভুল উচ্চারণ করতেন। তবে লিন্ডসে খাসিয়া জনগোষ্ঠীর সঠিক নাম উচ্চারণ করলেও এখানে টিকার প্রয়োজন পড়তো। এর কারণ, জৈন্তিয়ার রাজারা প্রকৃত অর্থে সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও লেখক এই জনগোষ্ঠীকে খাসিয়াদেরই একটি শাখা বা অংশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই তারা জৈন্তিয়ার রাজা ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে খাসিয়া শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। তাদের অনুকরণে আজ পর্যন্তও সিন্টেংদের ক্ষেত্রে খাসিয়া শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীটি খাসিয়াদের খুবই ঘনিষ্ঠ একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী। তারা উভয়েই একই আদিগোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

insignificance,[71] and of the wisdom of remaining perfectly quiet in time to come; and he was now endeavouring to convince me of his perfect attachment to our government.

The rajah proposed my giving him an interview in his own country, to partake of a *chasse*[72] he had prepared for me; and, after arranging the preliminaries of meeting, the day was fixed. By mutual agreement, we were to be accompanied by few attendants. It was during the season of the rains, the whole country being completely overflowed, and having the appearance of an extensive lake. I embarked on board a beautiful yacht of my own building, well manned, and armed with eighteen swivel-guns; and arrived at the place of rendezvous at the appointed hour, when, to my surprise, I saw advancing towards me a fleet of boats not fewer than fifty in number, with streamers flying, and fantastically dressed. As this was contrary to our agreement, I was not well pleased at the display, but betrayed no kind of alarm. With a fine breeze, all sail set, I steered through the middle of the fleet, and with my speaking trumpet hailed the rajah, and invited him into my boat.

---

[71] লিন্ডসে এখানে কিছু অর্ধসত্য তথ্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর জানা থাকার কথা যে, যে রাজার সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধ হয়েছিল তিনি থেকারের আমলেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যে রাজা লিন্ডসেকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর সাথে ব্রিটিশদের কোন যুদ্ধ হয়নি। লিন্ডসে কেন উভয় রাজাকে গুলিয়ে ফেললেন তা বোধগম্য নয়। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তিনি অর্ধসত্য তথ্য দিয়েছেন। জৈন্তিয়ার রাজা তাঁর বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশ এলাকায় ঢুকে পড়েননি। বরং ব্রিটিশ বাহিনীই জৈন্তিয়ায় ঢুকে পড়েছিল।

[72] হাতি ধরার পদ্ধতিকে Chasse বা খেদা বলা হতো। ইতোপূর্বে থেকারে এই পদ্ধতিতে অনেক হাতি ধরেছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজা লিন্ডসেকে একটি শিকার উৎসবে (hunting party) আমন্ত্রণ জানিয়েছিলন; সেটি খেদা ছিল না। লিন্ডসে প্রথমে খেদার কথা বললেও পরে সঠিক শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।

He came accordingly, accompanied by his officers, and no sooner was he seated in the cabin than I could perceive his astonishment in finding himself enveloped in smoke in consequence of a royal salute from my Lilliputian artillery, which were well served upon the occasion; but he instantly recovered himself, and talked on indifferent subjects. I found him a handsome young man, with a good address. After examining the yacht and guns with attention, and particularly admiring the sailing of the boat, he requested me to accompany him to his barge to partake of the *shekar*, or hunting party, previously prepared for our amusement. This proved of so uncommon a nature, and so seldom witnessed by Europeans, that it is worthy of description.

We rowed for some miles towards a rising ground, on which we landed; and were then carried on men's shoulders, (their regal mode of conveyance,) to a temporary stage erected for the occasion.

On surveying the arena around us, I found that the enclosure was not less than thirty acres, surrounded by a stockade, and lined on the outside by the vassals of the rajah. They had previously driven the wild animals of the country to this place, being the highest ground in the plain, and encircled them. The sight was whimsically wild and magnificent; the concourse of people was immense, the whole population, both of the mountain and plain, having turned out on the occasion. The first thing that struck my observation, upon entering the arena, was the singularity of the dresses worn by the different tribes of Cusseahs, or native Tartars,[73] all dressed and armed

---

[73] খাসিয়া-সিন্টেং জনগোষ্ঠীদ্বয় মঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। লিন্ডসের আমলে 'মঙ্গোলীয় মহাজাতি' কথাটির প্রচলন ছিল না। তাই কেউ কেউ বোধহয় এক্ষেত্রে 'তাতার' শব্দটি ব্যবহার করতেন। লিন্ডসেও একই কাজ করেছেন। প্রকৃত সত্য হল, খাসিয়া বা সিন্টেং জনগোষ্ঠীকে তাতার বলা যায় না।

agreeable to the custom of the country or mountain from whence they came. The inhabitants of the plain were also fancifully dressed; their garb, in many instances, was a mixture of both, their arms, in general, being those of the mountain, viz., a large shield over the right shoulder, protecting nearly the whole of the body, the mountain sword, a quiver suspended over the left shoulder, full of arrows, and a large bamboo bow.

The place into which we were introduced was a species of open balcony; on either side of my chair were placed those of the rajah, his prime minister, commander-in-chief, and officers of state, who all appeared to be native Cusseahs, or Tartars, dressed and armed in the hill costume. The rajah himself affected the dress of a man more civilised, and wore the Mogul dress and arms. Upon my entering this apartment, he embraced me, and, our hookah-burdars[74] being in attendance, we took our seats, each with his hookah in his mouth. Each man now prepared his arms for the magnificent chasse about to begin.

Upon looking around me with attention, I found that there were not fewer than two hundred of the largest buffaloes enclosed, —some hundreds of the large elk deer, a great variety of deer of a smaller description, and wild hogs innumerable. These animals were now galloping around us in quick succession, when the rajah, turning politely towards me, asked me to begin the *shekar* by taking the first shot. I was a bad marks man, and afraid to betray my want of skill in so public a manner; at first, I declined the offer, —the rajah insisted; I, therefore, raised my well-loaded rifle to my shoulder, and taking a good aim, to my own astonishment

---

[74] pipe bearers

dropped a large buffalo dead upon the spot. There was immediately a general shout of admiration. I, on my part, put the pipe into my mouth, throwing out volumes of smoke with perfect indifference, as if the event was a matter of course. But no power could get the rajah to exhibit from the apprehension of not being equally successful before his own people.

On my left hand, sat his *luskhar*[75] or prime minister his quiver, I observed, only contained two arrows; "How comes it, my friend," said I, "that you come into the field with so few arrows in your quiver?" With a sarcastic smile, he replied, "If a man cannot do his business with two arrows, he is unfit for his trade;" at that moment he let fly a shaft and a deer dropped dead,—he immediately had recourse to his pipe, and smoked profusely.

The loud and hollow sound of the nagarra, or war drum, and the discordant tones of the conch shell announced a new arrival. The folding doors of the arena were thrown open, and ten male elephants with their riders were marshalled before us. If it is expected that I am to describe the gorgeous trappings and costly harness of these animals, or the sumptuous dress of the riders, disappointment must follow; my savage[76] friends were little accustomed to stage effect or luxuries of any kind. The noble animal had not even a pad on his back; a rope round his body was his only harness; the rider was dressed nearly in

---

[75] লিন্ডসের দাবি, জৈন্তিয়ার প্রধানমন্ত্রীর উপাধী ছিল লস্কর। কিন্তু সৈয়দ মুর্তাজা আলী বলেছেন, জৈন্তিয়ার পুলিশ প্রধান বা সদিওলের অধীনে লস্কর শ্রেণির কর্মচারীরা কাজ করতেন। মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ বলেছেন, লস্কররা ছিলেন হাজারকী ও জুলাই রাজের কাজে নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি।

[76] লিন্ডসে অবলীলায় এই আপত্তিকর শব্দটি ব্যবহার করতে পেরেছেন। উপমহাদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই ছিল।

the garb of nature, and the hook with which he guides the animal was his only weapon.

A motion from the rajah's hand was the signal to advance. The buffaloes at this unexpected attack, naturally turned their heads towards the elephants, and appeared as if drawn up in order of battle. The scene now became interesting in the extreme. The elephants continued to advance with a slow and majestic step, also in line, when, in an instant, the captain of the buffalo herd rushed forward with singular rapidity, and charged the elephants in the centre. Their line was immediately broken; they turned round and fled in all directions, many of them throwing their drivers, and breaking down the stockades—one solitary elephant excepted. This magnificent animal had been trained for the rajah's own use, and accustomed to the sport. The buffalo, in returning from his pursuit, attentively surveyed him as he stood at a distance, alone in the arena. He seemed for a few minutes uncertain whether to attack him or rejoin his herd. None who do not possess the talents of a Zoffany can describe the conflict that now took place. The elephant, the most unwieldy of the two, stood on the defensive, and his position was remarkable. In order to defend his proboscis, he threw it over his head—his fore-leg advanced ready for a start—his tail in a horizontal line from his body—his eager eye steadily fixed on his antagonist. The buffalo, who had hitherto been tearing the ground with his feet, now rushed forward with velocity—the elephant, advancing with rapid strides at the same moment, received the buffalo upon his tusks and threw him into the air with the same facility an English bull would toss a dog—then drove his tusks through the body of the buffalo, and in that position carried him as easily as a baby, and laid him at the rajah's feet.

The elephants that were routed were brought back to the charge, and some of them behaved well; but we had much more reason to be pleased with the courage of the male buffaloes, who attacked in succession. I consider them the fiercest animal in the world; for there is nothing they will not attack. —I continued with the rajah for three days, until the air became putrid with the dead carcases; I then bid him adieu, and returned to Sylhet.

Upon studying the dispositions of the Cusseahs with more attention, I found (as I have already stated) that they were not altogether to be depended upon; they were jealous of each other in the extreme, and a supposed indignity was seldom forgiven; it was therefore found expedient to treat them with perfect politeness but with more reserve. In my block-house at Pondua, I had now fixed a permanent establishment of a black officer and twelve men; and fortunate was it I had taken this precaution. The Cusseah though honest and open in his dealings, is extremely jealous of his honour, and apt to take umbrage upon trivial occasions where no offence is intended, and an affront to any one individual is resented by the community at large. I had therefore carefully to study their disposition, and sometimes to wink at an occasional burst of passion on their part, or apologise for the like behaviour which frequently occurred from the petulance of my own people,—even serious disputes were thus occasionally compromised without stating the case in a formal manner to government, but an affray of a more alarming nature soon occurred, which was not terminated without serious difficulty.

অধ্যায় আটাশ
বিজয়নারায়ণের শাসনামল

(১৭৮৫ সাল – ১৭৮৮ সাল)

যাত্রানারায়ণের পরবর্তী রাজার নাম বিজয়নারায়ণ। তিনি ১৭৮৫ সালে জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের পতনের বহুদিন পরেও জৈন্তিয়াবাসীদের মুখে যেসব রাজার নাম উচ্চারিত হয়েছে তাদের মধ্যে রাজা বিজয়নারায়ণ অন্যতম। জৈন্তিয়ার প্রবীণদের মুখে আজও কদাচিৎ তাঁর কথা শোনা যায়। যুগ যুগ ধরেই এটি চলে এসেছে। তাঁর সময়কার কিছু নাটকীয় ঘটনার কারণেই তিনি মানুষের স্মৃতিতে স্থান করে নিয়েছিলেন। জৈন্তিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচলিত একটি রীতি ছিল যে, তারা রাজাদের নামের সাথে 'সিংহ' শব্দটি জুড়ে দিতেন। তাই রাজা বিজয়নারায়ণ মানুষের কাছে বিজয় সিংহ নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তাকে নিয়ে প্রচলিত গল্পসমূহে এই নামটিই বার বার উচ্চারিত হয়।



চিত্র: রাজা বিজয়নারায়ণের চালু করা মুদ্রা (কাটরা টাকা)। মুদ্রার এক পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য। অপর পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৭০৭।

বিজয়নারায়ণ ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী রাজা যাত্রানারায়ণের ভাগিনেয়। যাত্রানারায়ণের মৃত্যু এবং বিজয়নারায়ণের সিংহাসনারোহণের সাল নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। ১৭০৭ শকাব্দ বা ১৭৮৫ সালের একটি মুদ্রা নিশ্চিত করে যে, ওই বছর একজন নতুন রাজা জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। রাজা বিজয়নারায়ণই ছিলেন সেই রাজা। *১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টে* বলা হয়েছে, রাজা বিজয়নারায়ণ ১৭৮৬ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। এই তথ্যটি গ্রহণ করতে গেলে প্রশ্ন উঠে যে, আগের বছরের মুদ্রাটি তাহলে চালু করল কে? তাই এক্ষেত্রে *জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টের* চেয়ে মুদ্রার সালটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। এ প্রসঙ্গে স্যার এডওয়ার্ড গেইট লিখেছেন, "Possibly Bijay Narayan succeeded in this year and not in 1786." (*A HISTORY OF ASSAM*, Second Edition, 1926, Page-266)

এক. ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে বিজয়নারায়ণের মদদ

রাজা বিজয়নারায়ণ যখন জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তখন সিলেটের কালেক্টর ছিলেন রবার্ট লিন্ডসে। যাত্রানারায়ণের মতো রাজা বিজয়নারায়ণও রবার্ট লিন্ডসের সাথে বাহ্যত স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু লিন্ডসের সাথে তাঁর এই সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক হলেও ভেতরে ভেতরে তিনি ব্রিটিশদেরকে জৈন্তিয়ার শত্রু হিসেবেই গণ্য করতেন। ব্রিটিশরা যে একটি আগ্রাসী শক্তি এবং সুযোগ পেলেই তারা জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে- এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না। তাই তিনি গোপনে সিলেটের ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে মদদ দিয়েছিলেন। এর ফলে সিলেটের ব্রিটিশবিরোধীরা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক সৈন্য নিহত হয়েছিল।

১৭৮৫ সালে ক্ষমতায় বসার পর রাজা বিজয়নারায়ণ তাঁর পূর্ববর্তী রাজার মতোই সিলেটের বিদ্রোহীদেরকে গোপন সহায়তা দেওয়ার কাজটি অব্যাহত রেখেছিলেন। সিলেটের অনেক বিদ্রোহী যুবক তখন জৈন্তিয়ার গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারসহ গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। ১৭৮৬ সালের প্রথমদিকে এসব যুবকরা আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনাসহ সমরবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। তাই তারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয়। ১৭৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির

একদল বণিক পূর্ব সিলেটের চাপঘাট পরগনার দরিদ্র কৃষকদেরকে নীলচাষে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা বাজারে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেছিল। ভাঙ্গা অঞ্চলের একদল বিদ্রোহী এই নীলকুঠিতে আক্রমণ করে। তারা এটি জ্বালিয়ে দেয় এবং জিনিসপত্র লুটপাট করে। এর ফলে চাপঘাট পরগনায় নীলচাষের উদ্যোগ থেমে যায়। চাপঘাটের এই বিদ্রোহীরা চরগোলা থানা আক্রমণেও জড়িত ছিল।

১৭৮৬ সালের ৩০ মার্চ পূর্ব সিলেটের চরগোলা অঞ্চলের বিদ্রোহী জমিদার রাধারামের বাহিনীর সাথে অন্যান্য এলাকার বিদ্রোহীরা যুক্ত হয়ে চরগোলা থানায় এক ভয়াবহ আক্রমণ চালায়। কোম্পানি সরকারের অনুগত থানাদারের বাহিনী এই আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় এবং বিদ্রোহীদের হাতে থানার পতন ঘটে। এই ঘটনা ব্রিটিশদেরকে চমকে দিয়েছিল। সিলেটের কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে সিদ্ধান্ত নেন যে, চরগোলা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পুরোদস্তুর সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হবে। ১৭৮৬ সালের ২৯ মে লেফটেন্যান্ট ডেভিডসনের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি প্রশিক্ষিত সৈন্যদল সিলেট থেকে নৌপথে চরগোলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দীর্ঘ নদীপথ পাড়ি দিয়ে তারা যখন চরগোলার উত্তরের শনবিলে পৌঁছল তখন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকা বিদ্রোহীরা তাদের ওপর মারাত্মক আক্রমণ চালায়। ডেভিডসন পিছু হটার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর বাহিনী আবারও আক্রমণের মুখে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত মাত্র ২০ জন জন সৈন্য নিয়ে ডেভিডসন পালাতে সক্ষম হন। বাদবাকী সকল সৈন্যই বিদ্রোহীদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিল। ১৭৮৬ সালের ১৭ জুলাই লেফটেন্যান্ট ডেভিডসনের নেতৃত্বে আরেকেটি সৈন্যদল সিলেট থেকে নৌপথে চরগোলার উদ্দেশে রওনা হয়। এবারে তারা নির্বিঘ্নেই শনবিলে প্রবেশ করল। কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় হল না। শ্রাবণ মাসের শনবিল হঠাৎ করেই বেশ ভয়ংকর রূপধারণ করল। প্রচণ্ড ঝড় ও ঢেউ নৌবহরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। বেশিরভাগ নৌকাই পানিতে তলিয়ে গেল। ডেভিডসনের নৌকারও সলিল সমাধি ঘটল। তিনি পানিতে ডুবে মারা গেলেন। তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই একই পরিণতি বরণ করল। চরগোলায় দ্বিতীয়বার সামরিক অভিযানের ব্যর্থতার পর কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে মনে প্রমাদ গুণলেন।

এবার তারা শনবিলের জলপথ বাদ দিয়ে স্থলপথে অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৭৮৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর কোম্পানি সৈন্যদের একটি বিশাল বাহিনী

চরগোলার উদ্দেশে রওনা হয়। এবার তারা শনবিলের দিকে না গিয়ে দোহালিয়া বা দুআইল পাহাড়ের দুর্গম পথের ভেতর দিয়ে চরগোলায় পৌছে যায়। রাধারাম এই দুর্গম পথ ধরে ব্রিটিশ বাহিনীর আগমনের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি। ব্রিটিশ বাহিনী রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। রাধারামের ঘুমন্ত ও অপ্রস্তুত সৈন্যরা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। তারা নিমিষেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ বাহিনী প্রায় বিনা যুদ্ধেই সবকিছু দখল করে নেয়। তবে তারা রাধারামকে আটক করতে পারেনি। তিনি সপরিবারে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

১৭৮৭ সালের ২৮ মার্চ তিনি বরাক নদীর বদরপুর ঘাটের নিকটে কোম্পানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। সৈন্যরা তাকে একটি সিলেটগামী জাহাজে তোলে। জাহাজটি সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা করে যখন ভাঙ্গা ঘাটের কাছে পোঁছল তখন রাধারামকে উদ্ধারের জন্য একদল বিদ্রোহী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী উভয়পক্ষের বন্দুকযুদ্ধ চলে। বিদ্রোহীদের গুলিতে জাহাজের প্রধান সেনা কর্মকর্তা মারা যান; আরও অনেকে হতাহত হন। একপর্যায়ে বিদ্রোহীদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে কোম্পানি সৈন্যরা দ্রুত গতিতে জাহাজ চালিয়ে সরে পড়ে। এই ঘটনাই ছিল বিদ্রোহীদের সাথে কোম্পানি সৈন্যদের সশস্ত্র যুদ্ধের সর্বশেষ ঘটনা। এই বিদ্রোহটি দমন করতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অনেক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের মদদেই বিদ্রোহীরা কোম্পানির এতো ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়েছিল।

দুই. গীতিকবিতায় বিজয়নারায়ণের কথা

রাজা বিজয়নারায়ণের মৃত্যু হয়েছিল ১৭৮৮ সালে। এটি কোন স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল না। রাজাকে কৌশলে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। এই মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু নাটকীয় ঘটনা। এসব নাটকীয় ঘটনার মূলে ছিলেন লক্ষ্মী সিংহ নামক এক পাহাড়ি যুবক। এই লক্ষ্মী ছিলেন নারতিয়াং পুঞ্জির সরদার উপাং দলইয়ের পুত্র। তিনি যখন বয়সে শিশু তখন তাঁর পিতার সাথে একবার জৈন্তিয়ার রাজধানীতে এসেছিলেন এবং ঘটনাক্রমে কিছুদিন রাজবাড়িতে থেকেছিলেন। রাজবাড়ির লোকজন তাকে খুবই স্নেহ করতেন। পরিণত বয়সেও তিনি তাদের পছন্দের পাত্র ছিলেন। একজন বিচক্ষণ ও

বুদ্ধিমান যুবক হওয়ায় রাজা বিজয়নারায়ণ তাকে রাজসভার সদস্য বানিয়েছিলেন। লক্ষ্মী তাঁর সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে রাজসভায় উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করে দিতেন।

তিনি যতোটা নিখুঁতভাবে রাজসভায় উত্থিত বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সুরাহা করতে পারতেন, অন্য কেউ তা পারতো না। এই দক্ষতার কারণে লক্ষ্মী সিংহ ক্রমশ রাজসভার সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন এবং একই সাথে তিনি রাজার সবচেয়ে আস্থাভাজন ব্যক্তিতেও পরিণত হন। একসময় দেখা গেলো, রাজসভায় রাজা শুধু লক্ষ্মীর কথাই শুনছেন; অন্য কারও কথা শুনছেন না। এতে অন্যদের মনে হিংসা জন্ম নিল।[77] লক্ষ্মীর বিরুদ্ধে তারা চক্রান্তে নামল। এই চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে রাজা লক্ষ্মীকে হত্যার আদেশ দিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী রাজধানী থেকে পালিয়ে নিজ পুঞ্জিতে চলে গেলেন। লক্ষ্মীর এই পলায়নে সহায়তা করার দায়ে রাজা চতুলের খাদনলস্করকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এতে পাহাড়িরা রাজার উপর অসন্তুষ্ট হয়। তারা সমতলের সাথে সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। পাহাড়ি পণ্যের অভাবে সমতলে নানান সমস্যা দেখা দেয়।

তিন বছর পর্যন্ত এই অচলাবস্থা চালু থাকার পর সমতল ও পাহাড়ের সরদাররা মিলে সিদ্ধান্ত নেন, রাজাকে হত্যা করে লক্ষ্মী সিংহকেই রাজা বানানো হবে। তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী রাজা বিজয়নারায়ণকে জয়ন্তীপুরের নিকটস্থ কেন্দ্রিবিলের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয় এবং সেখানকার একটি টিলার উপরে তাকে সমাহিত করা হয়। এরপর লক্ষ্মী সিংহ রাজা হন। তিনি চতুলের খাদনলস্করের পুত্র সোনাধনকে একটি রাজকীয় বাড়ি বানিয়ে দেন। সোনাধনকে রাজা নিজের পুত্রসন্তানের মতো স্নেহ করতেন। একবার এক ব্রাহ্মণের কন্যা সোনাধনকে প্রচণ্ড অপমান করলে রাজা সেই কন্যার সঙ্গেই সোনাধনের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এতে ব্রাহ্মণ প্রবল ক্ষিপ্ত হন। জাত হারানোর প্রতিশোধ নিতে তিনি একদিন কৌশলে এক পাটনীকে দিয়ে সোনাধনকে হত্যা করান। সোনাধনের স্ত্রী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কন্যা স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে নিজ পিতাকেই হত্যা করেন। এরপর সবকিছু শান্ত হয়ে আসে।

রাজা বিজয়নারায়ণ, খাদনলস্কর এবং সোনাধনের জীবনের নির্মম পরিণতির সাথে জড়িয়ে থাকা নাটকীয় ঘটনাগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য জৈন্তিয়ার মানুষের

---

[77] অতীতে ফতেহ খাঁ-র সাথেও এমন হয়েছিল।

স্মৃতিতে স্থান করে নিয়েছিল। মুখরোচক গল্পের উপাদান হওয়ায় এসব ঘটনার কথা জৈন্তিয়ার প্রতিটি ঘরেই আলোচিত হতো। সময়ের পরিক্রমায় এসব কাহিনী গ্রাম্য গীতিকবিতায় রূপ নিয়েছিল। জৈন্তিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য পুঁথি পাঠের আসরে এসব গীতিকবিতা পাঠ করা হতো। কবিতাগুলো থেকে তৎকালীন জৈন্তিয়া রাজ্যের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। *সোনাধনের গীত* বা *সোনাধনের কবিতা* নামে প্রচলিত এসব গীতিকবিতা সংকলনের কাজ শুরু হয় ১৯২০ এর দশকে। জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস গবেষক মাস্টার মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সর্বপ্রথম রাজা বিজয়নারায়ণ, লক্ষ্মী সিংহ ও সোনাধনকে নিয়ে প্রচলিত কিছু গীতিকবিতা সংকলিত করে একটি কাব্য-কাহিনী প্রস্তুত করেন। এই কাহিনীটি *চতুলের সোনাধনের কবিতা* নামে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মুদ্রিত হয়েছিল শ্রীহট্ট সুরমা প্রেসে।

রাজা বিজয়নারায়ণের মৃত্যু, লক্ষ্মী সিংহের উত্থান এবং খাদনলস্কর ও সোনাধনের জীবনের নাটকীয় ঘটনাসমূহ নিয়ে প্রচলিত গীতিকবিতাসমূহ সংকলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন বিশিষ্ট গবেষক রাজমোহন নাথ বি.ই. তত্ত্বভূষণ। তিনি জনৈক কানাই খলিফার কাছ থেকে একটি সুদীর্ঘ কাব্য-কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। এই কাহিনীটি ১৯৪৭ সালে *সোনাধনের গীত* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রকাশ করেছিল শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ। রাজমোহন নাথ এর মুখবন্ধে লিখেছেন, "*সোনাধনের গীত* জৈন্তা রাজপরিবারের প্রেমকাহিনীমূলক একটি কাব্য। এই গীতের আদি রচয়িতা কে জানা যায় না। জৈন্তার প্রাচীন রাজবাটীর সন্নিকটস্থ্ জাঙ্গাল হাটি নিবাসী কানাই খলিফার নিকট হইতে আমি ১৯৪২ ইংরাজীতে এই গীতটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তখন কানাই মিয়ার বয়স ছিল সত্তর বৎসর। কানাই মিয়া যৌবনে গাজীর গানের খলিফা ছিল এবং গ্রাম্য সম্মেলনে *সোনাধনের গীতটি* গাহিতে তাহার তিন রাত্রি লাগিত। কানাই মিয়া নিরক্ষর; সে তাহার ওস্তাদের নিকট হইতে মুখে মুখে এই গীতটি শিখিয়াছিল। কানাই মিয়ার বিশ্বাস, এই গীতের আদি রচয়িতা শ্রীধর বাণিয়া। শ্রীহট্টের অন্য এক গ্রাম্য গীতিতে শ্রীধর বাণিয়ার ভণিতা পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীধর বাণিয়া বঙ্গদেশের লোক। কানাই মিয়া আমাকে বলিয়াছে- শ্রীধর বাণিয়াকে সে বাল্যকালে জৈন্তায় দেখিয়াছে। জৈন্তার রাজধানীর একটি পাড়ায় তাঁহার বাড়ী ছিল।

জৈন্তা পরগণার ঢুপী পাঠশালার শিক্ষক মহম্মদ আব্দুল আজিজ কয়েক বৎসর পূর্বে সোনাধনের গীতোক্তো কাহিনী নিজের ভাষায় কবি-পাচালীর ছন্দে রচনা করিয়া সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি কানাই মিয়ার ভাব, ভাষা ও ছন্দের কোনও পরিবর্তন করি নাই। ঘরের এক কোণে বসিয়া কানাই মিয়া আপন মনে গীতটি গাহিয়া যাইতো। আমি অপর কোণে বসিয়া লিখিয়াছি। অবশ্য গীতের আসরে বহু লোকের সম্মুখে এবং ঘরে বসিয়া একজন লোকের সম্মুখে গীত গাওয়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ এইরূপ গায়ক স্বভাবতঃ কবিত্ব-গুণ সম্পন্ন; আসরে দাঁড়াইয়া গীত গাহিবার সময় সদা সর্ব্বদাই নুতন নুতন পদ রচনা করিতে সমর্থ। গীত সংগ্রহ কার্য্যে আমার অধঃস্তন কর্ম্মচারী আবু সৈয়দ মহম্মদ ইউসুফ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।”

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ রচিত *চতুলের সোনাধনের কবিতা* এবং রাজমোহন নাথ কর্তৃক সংগৃহীত *সোনাধনের গীত* মূলত একই কাহিনী হলেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবিতা দুটির বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। অধিকাংশক্ষেত্রেই কবিতা দুটির বর্ণনায় কোন মিল নেই। পরস্পরবিরোধী বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক তা নিরূপণ করার কোন উপায় নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *চতুলের সোনাধনের কবিতায়* বলা হয়েছে, রাজা বিজয় সিংহকে নৌকাদৌড় প্রতিযোগিতার ছলে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু *সোনাধনের গীতে* বলা হয়েছে, গভীর রাতে নৌ-যোগে পাখি শিকারের সময় রাজাকে কৌশলে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল জনৈক মনাই ডুম। কোন বক্তব্যটি সঠিক তা নিরূপণ করা কোন গবেষকের পক্ষেই সম্ভব নয়। শ্রোতাদেরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত নাটকীয়তা আরোপ করতে গিয়ে কবিতাগুলোর প্রকৃত রচয়িতারা হয়তো অনেক ঘটনাকেই অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। *সোনাধনের গীতের* ক্ষেত্রে এমন প্রভাব বেশ লক্ষ্যণীয়। কবিতাটির সংগ্রাহক রাজমোহন নাথ নিজেও এমন ধারণা পোষণ করতেন। তাই তিনি বলেছেন, “এইরূপ গায়ক স্বভাবতঃ কবিত্ব-গুণ সম্পন্ন; আসরে দাঁড়াইয়া গীত গাহিবার সময় সদা সর্ব্বদাই নুতন নুতন পদ রচনা করিতে সমর্থ।”

বর্তমান যুগ গীতিকবিতার যুগ নয়। জৈন্তিয়ার গ্রামাঞ্চলে এখন আর গীতের আসর হয় না বললেই চলে। তাই রাজা বিজয়নারায়ণ, লক্ষ্মী সিংহ ও সোনাধনের জীবনের নাটকীয় কাহিনীগুলি এখন আর আগের মতো সবাই জানে

না। জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে, কেন্দ্রিবিলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধিটি[78] আজ জনসাধারণের কাছে একটি বিস্ময় হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ জানেই না যে, এটি একজন রাজার সমাধি। অসচেতনতাবশত মানুষ সমাধিটির ভেতরে প্রবেশ করে এবং নানাভাবে এর মর্যাদা হানি করে।



চিত্রঃ রাজা বিজয়নারায়ণ সিংহের সমাধি

[78] রাজা বিজয়নারায়ণের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসার পর বিজয়নারায়ণের সমাধিস্থলের ওপর এই দৃষ্টিনন্দন সমাধিঘরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। এটি আজও মানুষের দৃষ্টি কাঁড়ে। সম্প্রতি কেন্দ্রিবিল এবং তৎসংলগ্ন বিলগুলি পর্যটকদের কাছে একটি আকষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে। পর্যটকরা কেন্দ্রিবিলসহ চারটি বিলকে একত্রে ‘শাপলা বিল’ নামে ডাকেন।

তিন. হযরত শাহজির মোকাম

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলি মোকাম বা সমাধিস্থল আজও মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। এসব মোকাম জৈন্তিয়া রাজ্যের পির-দরবেশদের প্রতি রাজাদের শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সাথে এগুলি জৈন্তিয়া রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। এসব মোকামের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও রাজকীয় মোকাম হচ্ছে হযরত শাহজি (রহ.)-র মোকাম। এই শাহজি কে ছিলেন তা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকে মনে করেন, তিনি ছিলেন হযরত শাহজালাল (রাহ.)-র সফরসঙ্গীদের কেউ। এই ধারণাটি ভুল। এর কারণ, হযরত শাহজালাল সিলেটে এসেছিলেন চতুর্দশ শতকে। আর শাহজির মোকাম নির্মিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। এটি নির্মাণ করেছিলেন রাজা বিজয়নারায়ণ সিংহ বা বিজয় সিংহ।



চিত্র: হযরত শাহজির মোকাম

জনশ্রুতি আছে যে, এই রাজা সকল ধর্মের গুরুদেরকেই বেশ সম্মান করতেন। তাঁর আমলে বন্দরহাটি মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন হযরত শাহজি । তিনি ছিলেন জৈন্তিয়ার বিখ্যাত দরবেশ হযরত কাশিম শাহের ছাত্র ও শিষ্য। কাশিম শাহের পরে তিনিই জৈন্তিয়ার সবচেয়ে বড় দরবেশ ছিলেন। রাজা বিজয়নারায়ণ এই মুসলমান ধর্মগুরুকে বেশ সম্মান করতেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর রাজা তাঁর সমাধিস্থলে একটি দৃষ্টিনন্দন মোকাম বা সমাধিঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজাদের হাতে নির্মিত যেসব স্থাপনা আজও পুরোপুরিভাবে অক্ষত আছে তার মধ্যে এই সমাধিঘরটি অন্যতম। জৈন্তিয়ার অন্যান্য মোকামের মতো এটিতেও মূল ব্যক্তির সাথে আরও কয়েকজন সমাহিত রয়েছেন; সমাধিঘরটির ভেতরে রয়েছে তিনজনের সমাধি আর বাইরে রয়েছে দুজনের সমাধি।



চিত্র: হযরত শাহজির মোকামের ভেতরের দৃশ্য

হযরত শাহজির সমাধিটি ঘরের ভেতরে। সেখানে তাঁর দুজন খাদেমও সমাহিত রয়েছেন। ঘরের মেঝেতে নির্মিত তিনটি সমাধি দেখতে হুবহু একই রকম। এগুলোর নির্মাণশৈলীতে কোন পার্থক্য নেই। দেখে মনে হয় যে, হযরত শাহজির দুই খাদেমও তাঁর মতোই মর্যাদাবান ছিলেন। তাই রাজা বিজয়নারায়ণ একই আকৃতিতেই সমাধিগুলোকে বাঁধাই করেছিলেন এবং একটি রাজকীয় সমাধিঘরের ভেতরে এগুলোকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত শাহজির সাথের দুই খাদেমের মৃত্যুর সময়কাল অজ্ঞাত। হতে পারে যে, তারা হযরত শাহজির আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, তারা শাহজির পরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাদের মৃত্যুর পরেই মোকামটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল।

রাজা বিজয়নারায়ণের শাসনকাল ছিল ১৭৮৫ সাল থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত। এরই মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে তিনি হযরত শাহজির মোকাম বা সমাধিঘরটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন যুগের বিচারে অত্যন্ত নান্দনিক শৈলীতে এটি নির্মিত হয়েছিল। ঘরটির দক্ষিণের দেয়ালের কারুকাজ চোখে পড়ার মতো। এই দেয়ালের মাঝখানে রয়েছে ঘরটির প্রবেশদ্বার। পশ্চিমের দেয়ালেও কিছু কারুকাজ রয়েছে। পূর্বের দেয়ালজুড়ে রয়েছে অত্যন্ত চমৎকার একটি ঘুলঘুলি বা ভেন্টিলেটর। দিনের বেলায় এই ঘুলঘুলি দিয়েই ঘরের ভেতরে আলো প্রবেশ করে। রাতের অন্ধকার দূর করার জন্য একসময় ঘরের ভেতরে প্রদীপ জ্বালানোর প্রচলন ছিল। ঘরের ভেতরের দেয়ালের গায়ে প্রদীপ রাখার কুটুরিগুলো আজও পুরোপুরিভাবে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

রাজা বিজয় সিংহের শাসনামল কিংবা তাঁর পরবর্তী কোন রাজার শাসনামলে হযরত শাহজির সমাধিঘরটির বাইরে আরও দুজনকে সমাহিত করা হয়েছিল। এদের সমাধিগুলোও রাজকীয় শৈলীতে বাঁধানো রয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত শাহজির কন্যা। অপর ব্যক্তিটি কে ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে তিনি যে খুবই মর্যাদাসম্পন্ন কেউ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাইরের দুটো সমাধির নির্মাণশৈলীর সাথে ঘরের ভেতরের সমাধিগুলোর নির্মাণশৈলীর বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঘরের ভেতরের তিনটি সমাধি আর বাইরের দুটো সমাধি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত হয়েছিল। একটি অনুচ্চ দেওয়াল দিয়ে বাইরের দুটো সমাধিকে মূল

সমাধিঘরের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এই দেওয়ালটি অবশ্য আগের আমলের দেওয়াল নয়; এটি বর্তমান আমলের।

হযরত শাহজির মোকামটির অবস্থান সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের একেবারে কাছেই। সিলেট শহর থেকে বেশ সহজেই সেখানে যাওয়া যায়। মোকামটি দেখতে হলে সিলেট শহর থেকে জৈন্তাপুর উপজেলা সদরগামী কোন গাড়িতে উঠতে হবে। গাড়ি থেকে নামতে হবে জৈন্তাপুর উপজেলা সদর বা বাসস্ট্যান্ডের সামান্য আগে (প্রায় দেড় কিলোমিটার আগে) ফেরীঘাট সেতুর দক্ষিণে। এই জায়গাটির নাম ফেরীঘাট ববরবন্দ। ফেরীঘাট সেতুর সামান্য আগে ববরবন্দ এলাকায় সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের পশ্চিমপাশে একটি মসজিদ দেখা যায়। এই মসজিদটির নাম ভিত্রিখেল জামে মসজিদ। হযরত শাহজির মোকামটির অবস্থান এই মসজিদের পাশেই (সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক থেকে মোকামটিকে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়)।



চিত্রঃ হযরত শাহজির মোকামের পূর্ব দেয়ালের ঘুলঘুলি

অধ্যায় ঊনত্রিশ
ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে জৈন্তিয়ার মদদ

(১৭৮৩ সাল – ১৭৮৭ সাল)

রাজা ছত্রসিংহের শাসনামলে ব্রিটিশরা জৈন্তিয়ায় অভিযান চালিয়েছিল। তবে সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও রাজ্যটি তারা দখলে নিতে পারেনি। জৈন্তিয়া সমতলের অধিকৃত অঞ্চল তারা আবার রাজার হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা ১৭৭৪ সালের। এর কয়েক বছর পর সিলেটের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ও কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে রাজা যাত্রানারায়ণের আমন্ত্রণে জৈন্তিয়া সফর করেছিলেন। যাত্রানারায়ণের পরবর্তী রাজা বিজয়নারায়ণও ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যত স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজের সাথে জৈন্তিয়ার এই সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হলেও ভেতরে ভেতরে যে একে অন্যকে প্রতিপক্ষ মনে করতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। জৈন্তিয়ার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা, সমতলের জৈন্তিয়াবাসীর স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং জৈন্তিয়ার দুর্গম ভূ-প্রকৃতি- প্রভৃতি কারণে রবার্ট লিন্ডসে রাজ্যটি দখলের চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন।

জৈন্তিয়া রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে নিয়ে আসার কাজটি কঠিন ও অলাভজনক হবে- এটি ভেবেই লিন্ডসে জৈন্তিয়ার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। অন্যদিকে জৈন্তিয়ার রাজারাও বুঝতেন যে, শক্তিশালী ব্রিটিশদের সাথে নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে কোন লাভ হবে না। তাই ব্রিটিশদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা ছাড়া আর কোন বিকল্প তাদের হাতে ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশরা যে একটি আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং সুযোগ পেলেই তারা জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে- এ ব্যাপারে তাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। তাই তারা ব্রিটিশদেরকে নিজেদের প্রতিপক্ষ মনে করতেন এবং মনে মনে ব্রিটিশদের হাত থেকে মোগলানের (সিলেটের) স্বাধীনতা কামনা করতেন। এদিকে মোগলানের অধিবাসীরাও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একটি আগ্রাসী বিদেশী শক্তি মনে করতেন এবং এদের হাত থেকে স্বাধীনতা কামনা করতেন।

এক. মোগলানবাসীদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভের মাত্র কয়েক বছরের মাথায়, ১৭৭০ সালে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। ছিয়াত্তরের মনন্তর নামে পরিচিত এই মহাদুর্ভিক্ষ সিলেটেও ছড়িয়ে পড়েছিল। মূলত তখন থেকেই সিলেটের মানুষ ব্রিটিশ শাসনকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। ১৭৭৬-৭৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে সিলেটের রেসিডেন্ট ও কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন উইলিয়াম হলান্ড। তিনি দুই বছরের দায়িত্বপালন শেষে কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, সিলেটের মানুষ খুবই অবাধ্য এবং এখানে খাজনা আদায়ে বেশ ঝামেলা হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সিলেটের মানুষের অবাধ্য হয়ে উঠার পেছনে মূল কারণ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব নীতি।

মহাদুর্ভিক্ষের রেশ কাটতে না কাটতেই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সিলেটের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্বের বোঝা। হলান্ডের আমলে সিলেটের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল মুসলমান আমলের বার্ষিক রাজস্বের ১৪৭ শতাংশ। এর মানে হচ্ছে, মুসলমান আমলের ১০০ টাকার রাজস্ব হলান্ডের আমলে এসে ১৪৭ টাকায় উন্নীত হয়েছিল। হলান্ডের পরবর্তী কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসের সময়ে সিলেটের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ আরও বেড়ে গিয়ে মুসলমান আমলের বার্ষিক রাজস্বের ১৮৩.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। কয়েক বছরের ব্যবধানে সিলেটের রাজস্ব এতো বেশি পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় সিলেটের মানুষ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

রবার্ট লিন্ডসে অত্যন্ত কৌশলের সাথে সিলেটের মানুষের এই বিদ্রোহী মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা পুরোপুরি সফল হয়নি। লিন্ডসে বেশ কিছু ঝামেলার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এসব ঝামেলার কথা তিনি তাঁর ডায়েরিতেও লিখেছেন। বুদ্ধিমান পাঠক এই ডায়েরি পড়লে বুঝতে পারবে, ব্রিটিশ কর্মকর্তা লিন্ডসে যেসব ঘটনাকে ঝামেলা বলে আখ্যায়িত করেছেন তা ছিল মূলত এই অঞ্চলের মানুষের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। লিন্ডসের নিজের লেখা ডায়েরি, ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিদের বংশধরদের বক্তব্য এবং কিছু ঐতিহাসিকের বিবরণী ও ব্যাখ্যা থেকে লিন্ডসের সময়কার ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

দুই. ব্রিটিশদের ভয়াবহ শোষণের চিত্র

ব্রিটিশদের পূর্বে মোগল আমলে সিলেট ছিল বাংলার সীমান্তবর্তী একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। এই অঞ্চলের মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাংলার মোগল শাসকরা রাজস্বের ক্ষেত্রে প্রচুর ছাড় দিতেন। সিলেট থেকে তারা খুব বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করতেন না এবং মানুষের উপর অত্যাচারও করতেন না। মোগলদের পূর্ববর্তী পাঠান শাসকরাও সিলেটের মানুষের ওপর রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দেননি এবং কোন অত্যাচার করেননি। পাঠান ও মোগল শাসনামলের সোয়া দুই শতকে সিলেটের রাজস্ব বেড়েছে বলে কোন প্রমাণ মিলে না। শেরশাহের আমলের সিলেটের রাজস্ব আর নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলের সিলেটের রাজস্ব প্রায় একই ছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিলেটের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সিলেটের রাজস্বের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল!

মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে রচিত *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে সিলেটের বার্ষিক রাজস্ব ১,৪৭,৫৬৫ টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সময়ে সিলেট মোগলদের অধীনে ছিল না। সিলেট ও বাংলা অঞ্চল তখন ছিল বারো ভূঁইয়াদের অধীনে। কিন্তু মোগল সম্রাট আকবর এই অঞ্চলকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত বলেই বিবেচনা করতেন। তাই তাঁর রাজস্বসচিব টোডরমল সিলেট ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজস্বের হিসেব করে রেখেছিলেন। এটিই *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, টোডরমল সিলেটের সরকারি খাজনার হিসাব সংগ্রহ করেছিলেন শেরশাহের আমলের কাগজপত্র থেকে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, শেরশাহের আমলে অর্থাৎ ১৫৪০ সাল থেকে ১৫৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সিলেটের রাজস্ব ছিল বার্ষিক ১,৪৭,৫৬৫ টাকা।

১৬১২ সালে সিলেট দখলের পরে মোগলরা এই পরিমাণেই রাজস্ব আদায় করতো। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশরা বাংলার রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব বা দেওয়ানী লাভ করে। তখন থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাগণ। ১৭৭২ সালে সিলেটের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা উইলিয়াম মেকপিস থেকারে। তাঁর আগমনের পূর্বে সিলেটের রাজস্বের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ১৭,০০০ পাউন্ড

স্টার্লিং বা ১,৩৬,০০০ টাকা।[79] মুসলমান আমলের শেষ দিকে এই পরিমাণেই রাজস্ব আদায় করা হতো।

থেকারে সিলেটে আসার পর রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। তিনি সিলেট থেকে বার্ষিক ১,৭০,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় করতেন।[80] ১৭৭৬ সালে সিলেটের রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্ব লাভ করেন উইলিয়াম হলান্ড। তিনি সিলেটের রাজস্ব বাড়িয়ে বার্ষিক ২,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করেন। ১৭৭৮ সালে সিলেটের রাজস্ব কর্মকর্তার দায়িত্বে আসেন রবার্ট লিন্ডসে। তিনি এখানকার রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ২,৫০,০০০ টাকায় উন্নীত করেন।[81] মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাগণ সিলেটের রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ১,১৪,০০০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লিন্ডসের সময়কার সিলেটের রাজস্বের পরিমাণ ছিল থেকারের পূর্ববর্তী সময়ের রাজস্বের ১৮৩.৮ শতাংশ। ব্রিটিশ পূর্ববর্তী মুসলমান আমলে কখনোই এমন অস্বাভাবিক হারে সিলেটের রাজস্ব বেড়ে যায়নি।

ব্রিটিশ কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসে নিজেই তাঁর এক চিঠিতে সিলেটের মুসলমান আমলের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, সিলেটে প্রচুর লাখেরাজ অর্থাৎ নিষ্কর জমি রয়েছে। বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক কমলাকান্ত গুপ্ত তাঁর *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: পূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা* গ্রন্থে লিখেছেন

---

[79] এফ. বি. ব্র্যাডলি বার্ট রচিত *'সিলেট' থেকারে* গ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যায়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে (১২৮ পৃষ্ঠা) ব্র্যাডলি বার্ট লিখেছেন, "The land-tax due to the Company from Sylhet amounted to the equivalent of seventeen thousand pounds sterling, and the whole of this sum was paid in cowries, which still formed the recognised currency of this remote district."

[80] সৈয়দ মুর্তাজা আলী তাঁর *হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস* গ্রন্থের *ইংরেজ আমল* অধ্যায়ে (দ্বিতীয় উৎস সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা-১০৩) এই তথ্য দিয়েছেন।

[81] ১৮৪০ সালে প্রকাশিত *Oriental Miscellanies* গ্রন্থের *Anecdotes of an Indian Life* অংশে রবার্ট লিন্ডসে তাঁর সময়কার রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ২,৫০,০০০ টাকা বলে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর পূর্ববর্তী কর্মকর্তা হলান্ডের সময়কার রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ২৫,০০০ পাউন্ড বলে উল্লেখ করেছেন যা ওই সময়কার ভারতীয় ২,০০,০০০ টাকার সমান ছিল।

যে, সিলেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমি বন্দোবস্তের কারণে এর খাজনা ছিল এতো কম যে, রূপা বা স্বর্ণের বিনিময়ে খাজনা দেয়া হতো না। জমিদার ছিলেন খুবই অল্পসংখ্যাক। তিন হাজারের মতো ভূস্বামী ছিলেন যারা তালুকদার, তাপাদার, মিরাশদার নামে অভিহিত হতেন। এরা খাজনা দিতেন অত্যন্ত স্বল্প। অনেকসময় খাজনা দেওয়ারই প্রয়োজন হতো না।

মোগল আমলে সিলেটের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অনেকটাই প্রজাবান্ধব। কয়েক হাজার ভূস্বামী নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে কিংবা বিনা খাজনায় সিলেটের অধিকাংশ কৃষিজমির মালিক হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি কিছু জমিদারও ছিলেন যারা বড় বড় ভূখণ্ডের মালিক ছিলেন। এসব জমিদাররা ছিলেন অনেকটা স্বাধীন সামন্ত নৃপতিদের মতো। সামান্য খাজনার বিনিময়ে তারা তাদের জমিদারী ভোগ করতেন। যেহেতু মোগল সরকারকে তারা সামান্য খাজনা দিয়েই সন্তুষ্ট করতেন সেহেতু তারাও তাদের প্রজাদের কাছ থেকে সীমিত কর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। এসব জমিদাররা প্রজাদের রক্তচোষা জমিদার ছিলেন না।

মোগল আমলে সিলেটের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরে ছিলেন প্রজাগণ, তাদের উপরে ছিলেন ভূস্বামী বা জমিদারগণ এবং তারও উপরে ছিলেন মোগল ফৌজদার ও দেওয়ান। এই তিনটি শ্রেণির মধ্যে শ্রেণি সংঘাতের তেমন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রাজস্বের ব্যাপারে মোগলদের উদারনীতিই এর কারণ। কিন্তু ব্রিটিশরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পেল তখন সিলেটের চিত্র বদলে গেল। ব্রিটিশরা ভূস্বামী ও জমিদারদেরকে বেশি বেশি খাজনা পরিশোধে বাধ্য করতে শুরু করল। এতে ভূস্বামী ও জমিদাররাও নিরূপায় হয়ে প্রজাদের কাছ থেকে বেশি বেশি কর আদায় করতে শুরু করলেন।

সিলেটের ভূস্বামী ও জমিদাররা এমন কাজে অভ্যস্থ ছিলেন না। তাদের কেউ কেউ ছিলেন আবার প্রচণ্ড প্রজাদরদী। তাই ব্রিটিশদের এমন রাজস্ব নীতি তারা মেনে নিতে পারলেন না। নানান দুরভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের বাংলা দখলের ঘটনাকেও তারা অপছন্দ করতেন। ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের ঘটনা, সিলেটের মাটিতে নীলচাষের প্রচেষ্টা, সিলেটের ব্রিটিশ রাজস্ব কর্মকর্তাদের বেপরোয়া ও অত্যাচারী মনোভাব এবং সর্বোপরি ব্রিটিশদের রাজস্ব নীতি তাদেরকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্রোহী করে তোলেছিল। তাই

রবার্ট লিন্ডসের আমলে সিলেটের কিছু স্বদেশপ্রেমিক ভূস্বামী-জমিদার পরিবার ও তাদের প্রজারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ জড়িয়ে পড়েছিলেন।

তিন. মোগলানের গণ-অসন্তোষের ঘটনা

লিন্ডসে ১৭৭৮ সাল থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত সিলেট শাসন করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দুটি গণ-অসন্তোষের ঘটনা ঘটে এবং একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রথম গণ-অসন্তোষের ঘটনাটি সংঘটিত হয় সিলেট শহরের ভেতরেই। এটি ১৭৮২ সালের ঘটনা। এই ঘটনায় সিলেট শহরের দুই তৃতীয়াংশ বাসিন্দা জড়িত ছিল। ১৭৮২ সালের ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে লেখা এক পত্রে লিন্ডসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "For some days past since the two-thirds of the inhabitants of Sylhet have shown signs of the most turbulent and unruly disposition till this day they continued assembling in numerous bodies and being armed held consultations upon the plan." (*শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত-পূর্বাংশ , দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম খণ্ড, ইংরেজ প্রভাব, প্রথম অধ্যায়, মোহরমের হাঙ্গামা*)

এর পরের বছর, ১৭৮৩ সালে লিন্ডসের প্রহরীদের হাতে জনৈক খাসিয়া সরদারকে প্রহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সীমান্তবর্তী খাসিয়ারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। লিন্ডসে সিলেটের উত্তর সীমান্তবর্তী খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে একটি দূর্গ স্থাপন করেছিলেন এবং দূর্গ এলাকায় খাসিয়াদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। বর্তমান কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার পাড়ুয়া গ্রামে এই দূর্গটির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। ১৭৮৩ সালে এই দূর্গের প্রহরীরা জনৈক খাসিয়া সরদারকে লাঠিপেটা করেছিল। এতে খাসিয়া জনগোষ্ঠীর লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে দূর্গটি অবরোধ করে এবং এর দায়িত্বে নিয়োজিত হাবিলদারকে হত্যা করে। ওই এলাকায় লিন্ডসের চুনাপাথর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিছু লোকজনকেও তারা হত্যা করেছিল।

চার. সংগঠিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উদ্ভব (১৭৮৩ সাল)

১৭৮২-৮৩ সালে সিলেট শহর ও খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি খুবই বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সিলেটের প্রায় সকল মানুষের মনোভাব এমনই ছিল। জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যেও ব্রিটিশদের ব্যাপারে একই মনোভাব পোষণ করা হতো। শীঘ্রই এই মনোভাব একটি সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনায় রূপ নিল। সিলেটের যেসব ভূস্বামী-জমিদার পরিবার ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরক্ত ছিলেন তারা জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সহায়তায় ১৭৮৩ সালে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। ওই বছরের প্রথমদিকে কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ ও জৈন্তিয়ার রাজা যাত্রানারায়ণের প্রতিনিধির সঙ্গে সিলেটের বিদ্রোহী ভূস্বামী-জমিদারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয় রাজ্যের পক্ষ থেকে তাদেরকে সব ধরণের সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপর তারা একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

বৃহত্তর সিলেটের অধিকাংশ ভূস্বামী-জমিদার এই বিদ্রোহী পরিকল্পনার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক শক্তির দিকটি বিবেচনা করে তারা নিজেদের অঞ্চলে বিদ্রোহের ঝুঁকি নেননি। বিদ্রোহের জন্য দুর্গম ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোকেই বাছাই করা হয়। পূর্ব সিলেটের চাপঘাট পরগনা ও চরগোলা অঞ্চল ছিল বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের জন্য খুবই সুবিধাজনক এলাকা। পশ্চিম সিলেটের সেলবরষ পরগনাও ছিল বিদ্রোহী তৎপরতার জন্য বেশ সুবিধাজনক এলাকা। সিলেট সদর থেকে অনেক দূরবর্তী এসব অঞ্চল বিভিন্ন স্বাধীন জনগোষ্ঠী বা রাজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। চরগোলা ছিল ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী একটি সুরক্ষিত (প্রাকৃতিকভাবে) অঞ্চল। চাপঘাট ছিল জৈন্তিয়া ও কাছাড়ের সীমান্তবর্তী অঞ্চল; সিলেট শহর থেকে জাহাজে চড়ে এখানে যেতে হলে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়েই যেতে হতো। সেলবরষ ছিল খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি হাওর পরিবেষ্টিত অঞ্চল। এই তিনটি অঞ্চলের ভূস্বামী-জমিদাররা সিলেট থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে সরাসরি বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

পূর্ব সিলেটের চাপঘাট পরগনার জনৈক বৃদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন এই বিদ্রোহের মূল সমন্বয়ক। তাঁর নাম ছিল মীর মোহাম্মদ চৌধুরী।[82] তিনি চাপঘাট পরগনার ভাঙ্গা অঞ্চলের একজন ভূস্বামী ছিলেন। তাঁর এলাকা থেকে বেশ সহজেই জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করা যেতো। ব্রিটিশ শাসিত সিলেট জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও ভৌগলিকভাবে ভাঙ্গা অঞ্চলটি ছিল জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সংযোগস্থল। মীর মোহাম্মদ এখানকার রাহাতপুর গ্রামে বসবাস করতেন। সিলেটে ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই তিনি বিদ্রোহের কথা মাথায় রেখে উভয় রাজ্যের রাজপরিবারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখছিলেন। ১৭৮৩ সালে তিনি চরগোলার জমিদার রাধারাম, সেলবরষের জমিদার মোহাম্মদ হাজির চৌধুরী ও মোহাম্মদ সাদির চৌধুরী এবং নিজের দুই পুত্র মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরীকে নিয়ে কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকে জৈন্তিয়ার রাজা যাত্রানারায়ণের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর বৈঠকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ-

১) তিনটি জমিদার পরিবারের উদ্যোগে তাদের নিজস্ব অঞ্চলের পাশাপাশি সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্রোহী জনবল সংগৃহীত হবে। সিলেটের

---

[82] ব্রিটিশ শাসিত সিলেট জেলার চাপঘাট পরগনার ভাঙ্গা অঞ্চলের ভূস্বামী মীর মোহাম্মদ চৌধুরী মোগল আমল থেকেই ভাঙ্গা অঞ্চলের ভূস্বামী ছিলেন। সিলেটের মোগল কর্তৃপক্ষ এবং বাংলার নবাব পরিবারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। তাই ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতনের ঘটনা তিনি মেনে নিতে পারেননি। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশদের হাতে সিলেটের দেওয়ানী কর্তৃত্ব চলে গেলে মীর মোহাম্মদ সিলেটের ভূস্বামী-জমিদারদের প্রতিনিধি হিসেবে জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) পর সিলেটের জমিদার ও প্রজারা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে শুরু করে। মীর মোহাম্মদ তখন জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সহাতায় সিলেটের জমিদার-প্রজাদের বিদ্রোহ বাস্তবায়নের চেষ্টায় নেমে পড়েন। প্রবল ঝুঁকি থাকায় সিলেটের অধিকাংশ ভূস্বামী-জমিদার তাঁর এই পরিকল্পনাকে দূর থেকে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। তবে সীমান্তবর্তী জমিদাররা এই পরিকল্পনায় সরাসরি জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ১৭৮৩ সালে জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্য থেকে সর্বাত্মক সহায়তার নিশ্চয়তা পেয়ে তারা প্রবল উদ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্বাধীন জনগোষ্ঠীর লোকজনকেও বিদ্রোহী দলে যুক্ত করা হবে।

২) কাছাড়ি রাজ্য থেকে বিদ্রোহীদেরকে সকল আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলাবারুদ সরবরাহ করা হবে।[83]

৩) জৈন্তিয়া রাজ্যের গোপন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে বিদ্রোহীদেরকে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণসহ সকল ধরণের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

চরগোলার জমিদার রাধারাম ছিলেন মীর মোহাম্মদের খুবই অনুগত একজন শিষ্য। তিনি বৃদ্ধ মীর মোহাম্মদকে নিজের ধর্মপিতা হিসেবে মান্য করতেন; ধর্মপিতার মতো তিনিও ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ব্রিটিশদের হাত থেকে সিলেটের স্বাধীনতা উদ্ধারের স্বপ্ন দেখতেন। ১৭৮৩ সালের বৈঠকের পর তিনি নিজ এলাকায় বিদ্রোহী জনবল সংগঠিত করার কাজ শুরু করে দেন। তাঁর এলাকাটি ছিল ব্রিটিশ শাসিত সিলেট জেলার সবচেয়ে দুর্গম ও সুরক্ষিত অঞ্চল। বর্তমান ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ছিল তাঁর জমিদারী এলাকার অন্তর্ভুক্ত। চরগোলা নামে পরিচিত এই এলাকাটির দক্ষিণে ছিল ত্রিপুরা রাজ্য আর পূর্বে ছিল কাছাড়ি রাজ্য। পশ্চিমে ছিল প্রতাপগড়ের দুর্গম দু-আইল বা দোহালিয়া পাহাড় আর উত্তরে ছিল ভারত উপমহাদেশের বৃহত্তম জলাভূমি শনবিল। শনবিলের দক্ষিণের বিস্তৃত অঞ্চলটি ছিল চরগোলার স্থলভাগ (এই স্থলভাগে বর্তমানে রাতাবাড়ি থানা অঞ্চলটি রয়েছে)।

সেলবরষ পরগনার জমিদার মোহাম্মদ হাজির চৌধুরী ও মোহাম্মদ সাদির চৌধুরী ছিলেন মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর আত্মীয়। অত্যন্ত সাহসী ও স্বাধীনচেতা এই দুই ভাই ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সিলেটের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে নিজস্ব জনবল নিয়ে লড়তে রাজী ছিলেন। ১৭৮৩ সালের

---

[83] ভাঙ্গা অঞ্চলের জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ একবার রাজকীয় বজরা নৌকায় করে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি বরাক নদীর তীরবর্তী ভাঙ্গা বাজারের পূর্ব পাশের গ্রামে নেমেছিলেন। এই আগমনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মীর মোহাম্মদ চৌধুরী সেই গ্রামটির নতুন নাম দিয়েছিলেন 'কৃষ্ণপুর'। আজ অবধি গ্রামটির এই নামের কোন পরিবর্তন হয়নি। ভাঙ্গা বাজারের ঠিক পূর্বপাশেই গ্রামটির অবস্থান।

বৈঠকের পর তারা নিজ এলাকায় বিদ্রোহী দল গঠনের কাজ শুরু করে দেন। বর্তমান বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা ছিল তাদের জমিদারী এলাকা। মেঘালয়ের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে ধর্মপাশা উপজেলার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত তাদের জমিদারী এলাকা বিস্তৃত ছিল। লোকমুখে শোনা যায়, নেত্রকোনা জেলার কংস নদীর তীর পর্যন্ত তাদের জমিদারী এলাকা ছিল। সেলবরষ নামে পরিচিত এই এলাকাটি ছিল ব্রিটিশ শাসিত সিলেট জেলার একটি দুর্গম অঞ্চল। সুগভীর ও সমুদ্রসম হাওরবেষ্টিত হওয়ার কারণেই এলাকাটি বেশ দুর্গম ছিল। বর্তমান ধর্মপাশা উপজেলার সেলবরষ ইউনিয়নটি আজও সেই পুরানো দুর্গম জনপদের নামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর নিজের এলাকাও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য কৌশলগতভাবে খুবই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। বর্তমান ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানার অন্তর্গত এই অঞ্চলটি ছিল সিলেট জেলা সদর থেকে খুবই দূরবর্তী একটি অঞ্চল। সিলেট সদর থেকে এখানে যেতে হলে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হতো।[84] অঞ্চলটির উপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজরদারী ছিল খুবই দুর্বল। এই সুযোগে মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর দুই পুত্র মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরী এখানে প্রশিক্ষিত বিদ্রোহীদের একটি শক্ত ঘাটি গড়ে তোলেন। ১৭৮৩ সালের বৈঠকের পরে অত্যন্ত মেধাবী ও চৌকষ এই দুই ভাই বিদ্রোহী জনবল সংগ্রহের কাজে নেমে গিয়েছিলেন। তারা সিলেটের সাহসী ও স্বাধীনতাকামী যুবকদেরকে গোপনে সংগঠিত করে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য জৈন্তিয়ায় পাঠাতেন। স্বাধীনতাকামী যুবকদেরকে নিয়ে তারা ‘শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘ’ নামে একটি ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেছিলেন। প্রথমদিকে চাপঘাট, প্রতাপগড়, জফরগড় এবং সেলবরষ অঞ্চলের যুবকরা এই সংগঠনে যুক্ত হয়েছিলেন। একসময় সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের যুবকরাও এতে যুক্ত হন। এই বিপ্লবী সংগঠনের অধিনায়ক ছিলেন মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী।

---

[84] ব্রিটিশ আমলে সিলেট সদর থেকে চাপঘাট পরগনার বদরপুর ঘাট পর্যন্ত একটি নৌপথ প্রচলিত ছিল। বরাক ও সুরমার মিলিত প্রবাহই ছিল এই নৌপথ। এর কিছু অংশ জৈন্তিয়ার মুলাগোল ও সাতবাক পরগনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

ব্রিটিশ রাজের অভ্যন্তরে এই সংগঠনটি একটি জনসেবামূলক সংগঠন হিসেবে কাজ করলেও এর সদস্যরা অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ব্রিটিশ সীমান্ত অতিক্রম করে জৈন্তিয়া রাজ্যে প্রবেশ করতেন এবং সেখান থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে আবারও ব্রিটিশ সীমানার ভেতরে নিজেদের এলাকায় ফিরে যেতেন। ওই সময়ে জৈন্তিয়ার রাজার অধীনস্থ লোকজনদের মধ্যে অভিজ্ঞ পাহাড়ি যোদ্ধারা যেমন ছিলেন তেমনি আধুনিক যুদ্ধে অভিজ্ঞ লোকজনও ছিলেন। তাদের কেউ কেউ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন।[85] তাই জৈন্তিয়া রাজ্যে সিলেটের বিপ্লবী যুবকদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ও উৎসাহী লোকের অভাব ছিল না। শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের যুবকরা ১৭৮৩ সাল থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত এদের কাছ থেকেই অস্ত্র পরিচালনা ও আধুনিক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। জৈন্তিয়ার রাজা যাত্রানারায়ণ ও বিজয়নারায়ণ বেশ গোপনীয়তার সাথেই শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের কর্মীদের জন্য এই সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাটি চালু রেখেছিলেন।

কোন কোন গবেষকের মতে, এই ব্রিটিশ বিরোধী গোপন বিপ্লবী তৎপরতার সাথে কোম্পানি সরকারের একটি অংশও জড়িয়ে পড়েছিল। এরা ছিলেন কোম্পানি সরকারের এদেশীয় কর্মচারী। নামে সরকারি কর্মচারী হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই ছিল না। পুরানো মোগল সরকারের কর্মচারী হওয়ায় কোম্পানি সরকার তাদেরকে নামেমাত্র সরকারি পদে বসিয়ে রেখেছিল। কিছু কৌশলগত কারণে কোম্পানি সরকার তাদের পুরানো পদ-পদবীকে স্বীকৃতি দিলেও নয়া সরকার-ব্যবস্থায় এর কোন মূল্যই ছিল না; ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হাতেই ছিল সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি। লাতু ডিহির সরকারি প্রতিনিধি জালাল মোহাম্মদ চৌধুরী ছিলেন এমনই এক ভাগ্য বিড়ম্বিত কোম্পানি কর্মচারী। স্থানীয় গণসমাজকে নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা তাঁর পুরানো পদবীটি বহাল রাখলেও প্রকৃত ক্ষমতার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

---

[85] ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতনের পর এরা সেখান থেকে জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন। ১৭৬০ এর দশকে যারা জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন তাদের অনেকেই মোগলানের সিপাহী বা লস্কর ছিলেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ পলাশী, বক্সার কিংবা মুঙ্গেরের যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধও করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৭৭৪ সালে জৈন্তিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

বাহ্যিকভাবে স্থানীয় ব্রিটিশ কর্মচারীরা তাকে কুর্নিশ জানাতো। জালাল মোহাম্মদ জানতেন, এই মেকী কুর্নিশের আড়ালে ব্রিটিশরা তাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়। তাই তিনি নিজেও বাহ্যিকভাবে কোম্পানি সরকারের অনুগত ছিলেন, কিন্তু আড়ালে আড়ালে সিলেটের বিদ্রোহীদেরকে বিভিন্ন প্রশাসনিক তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছিলেন। পূর্ব সিলেটের ভূস্বামী-জমিদারদেরকে তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এমনকি নিজ পুত্র জান মোহাম্মদ চৌধুরীকেও তিনি শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের সদস্য জোগাড়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, ১৭৮৩ সালে তিনি কাছাড়ি রাজার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর হাতে একটি গোপন চিরকুট তোলে দিয়েছিলেন। এতে লেখা ছিল, "কোম্পানি আজ সিলেটে, কাল কাছাড়ে। যদি আমরা আজ বিভক্ত থাকি তাহলে কাল কারও রক্ষা হবেনা।"

পাঁচ. চরগোলায় সৈন্যদল গঠন

শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের কেন্দ্র ছিল চাপঘাট পরগনার ভাঙ্গা অঞ্চলে। কিন্তু ভাঙ্গা অঞ্চল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল না; প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে উপযোগী অঞ্চল ছিল চরগোলা। ব্রিটিশ সীমান্তবর্তী চরগোলার দক্ষিণে ছিল ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ছিল কাছাড়ি রাজ্য, উত্তরে ছিল সমুদ্রের মতো বিশাল জলরাশি নিয়ে বিস্তৃত শনবিল আর পুরো পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সারি সারি জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়। সিলেট থেকে চরগোলায় যেতে হলে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাভূমি শনবিল পাড়ি দিয়ে যেতে হতো। রাধারাম এই দুর্গম এলাকাটির জমিদার হয়েছিলেন ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মনন্তরের পরে।[86] ভাঙ্গা অঞ্চলের ভূস্বামী মীর

---

[86] চরগোলার জমিদার রাধারাম কোন বনেদী জমিদার ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত একজন ব্যবসায়ী। প্রতাপগড়ের বনেদী জমিদার গোলাম আলী চৌধুরীর জমিদারীর একাংশ লাভ করায় তিনি জমিদার হয়েছিলেন। ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মনন্তরের সময় গোলাম আলী চৌধুরী ব্যবসায়ী রাধারামের কাছ থেকে বাকীতে খাদ্যসামগ্রী কিনে প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এই পাওনা পরিশোধের সামর্থ্য না থাকায় তিনি রাধারামের হাতে নিজ জমিদারী তোলে দিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ চৌধুরী ওই সময় থেকেই রাধারামকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছিলেন। রাধারাম এই বয়োবৃদ্ধ প্রজাহিতৈষী জমিদারকে খুবই পছন্দ করতেন এবং তাঁর ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবকে পুরোপুরি সমর্থন করতেন।

এই ব্রিটিশবিরোধীতার সাথে রাধারামের নিজস্ব স্বার্থও জড়িত ছিল। একটি দুর্গম ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জমিদার হওয়ায় রাধারাম ভেবেছিলেন, পর্যাপ্ত অস্ত্র ও লোকবলের জোরে তিনি ব্রিটিশ রাজ থেকে বেরিয়ে নিজেই একটি ছোটখাটো স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। ১৭৮০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতাস্থ দেওয়ানী আদালতের এক রায়ে রাধারাম তাঁর জমিদারীর একাংশ হারান। তখন থেকে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। প্রতিবেশী পার্বত্য জনগোষ্ঠী কুকীদের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং দখলদার ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সহযোগিতা চান। স্বাধীনচেতা কুকী সরদাররা রাধারামকে সহযোগিতা করতে রাজী হন। এর ফলে রাধারাম বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর পুত্ররাও তাকে প্রভূত সাহায্য করতেন। এরা হলেন- জয়মঙ্গল, রণমঙ্গল ও রাজমঙ্গল।[87]

রণমঙ্গল ছিলেন রাধারামের সেনাপতি। তাঁর বাহিনীর মধ্যে কুকী যোদ্ধারাই ছিল সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত। কিন্তু তাদের জ্ঞান ছিল তীর-ধনুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে রাধারামের লোকজনের কোন পরিচয় ছিল না। বন্দুক চালনা কিংবা আধুনিক যুদ্ধ-কৌশল সম্পর্কে তারা কিছুই জানতো না। এই যোদ্ধাদল নিয়ে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে কিছুতেই পরাজিত করা সম্ভব নয়- এটা রাধারাম জানতেন। তাই তিনি কিছু লোককে বাছাই করে আধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের অধীনে জৈন্তিয়ায় পাঠালেন। সেখানকার গোপন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তারা আধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ-কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ নিল। এরপর রাধারাম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। ১৭৮৪ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি নিজেকে চরগোলার স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা

[87] বীরমঙ্গল নামে রাধারামের আরেক পুত্র ছিলেন। বয়সে শিশু হওয়ায় তখন তিনি কোন কিছুতে অংশ নেননি।

করলেন।[88] এরপর তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোষাগারে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং সম্ভাব্য ব্রিটিশ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

চরগোলা থেকে যারা জৈন্তিয়া রাজ্যে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি তাঁর বাহিনীর গোলন্দাজ শাখা গড়ে তোললেন। ১৭৮৫ সালের মধ্যে তিনি তীরন্দাজ, গোলন্দাজ ও নৌ-সেনা সহকারে একটি সত্যিকারের সৈন্যদল গড়ে তোলতে পেরেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার ত্রিপুরায় যান এবং সেখানকার রাজা ও রানীকে নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলতে সক্ষম হন। এদিকে কুকী সরদাররাও তাঁর পুরোপুরি অনুগত হয়ে পড়েছিলেন। সিলেটের ব্রিটিশ কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসে রাধারামের এসব গোপন তৎপরতা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাননি। তাই রাধারামের বিরুদ্ধে তিনি কোন সামরিক পদক্ষেপ নেননি। ১৭৮৬ সালের মার্চ মাসে রাধারাম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা করলে ব্রিটিশদের টনক নড়ে।

ছয়. সশস্ত্র বিদ্রোহের সূচনা (১৭৮৬ সাল)

১৭৮৬ সালে শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘ এবং রাধারামের বাহিনী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও সহিংস বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ে। ওই বছরের জানুয়ারি মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একদল বণিক চাপঘাট পরগনার দরিদ্র কৃষকদেরকে নীলচাষে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা বাজারে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেছিল। মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরীর নেতৃত্বে শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের কর্মীরা এই নীলকুঠিতে আক্রমণ করেন। তারা এটি জ্বালিয়ে দেন এবং জিনিসপত্র লুটপাট করেন। এর ফলে চাপঘাট পরগনায় নীলচাষের উদ্যোগ থেমে যায়। এ ঘটনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিলেটস্থ আদালতে একটি মামলা হয়েছিল। কিন্তু কোন সাক্ষী না পাওয়ায় এবং প্রমাণ না থাকায় চৌধুরী ভাতৃদ্বয় এ মামলা থেকে বেঁচে যান।

[88] ওই সময়কার পূর্ব ভারত ব্রিটিশদের দখলে থাকলেও দিল্লীকে কেন্দ্র করে ভারতের একটি বড়ো অংশে তখনও মোগল শাসন চলছিল। রাধারাম নিজেকে দিল্লীর মোগল সম্রাটের অনুগত একজন স্থানীয় নবাব বলে ঘোষণা করেছিলেন।

চরগোলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের একটি থানা ছিল। ১৭৮৬ সালের ৩০ মার্চ রাধারামের বাহিনী এই থানায় আক্রমণ করে। আক্রমণকারি বাহিনীতে চরগোলার স্থানীয় যোদ্ধারা যেমন ছিলেন তেমনি সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের যুবকরাও ছিলেন। শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের যেসব যুবক জৈন্তিয়া রাজ্যে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই চরগোলা থানা আক্রমণে জড়িত ছিলেন। কাছাড়ি রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রগুলোকে তারা এই আক্রমণে কাজে লাগিয়েছিলেন। এর ফলে তাদের হাতে থানাদারের বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। থানা দখলের ফলে তাদের হাতে নতুন কিছু অস্ত্রশস্ত্রও আসে। নবাব রাধারামের বাহিনী এসব অস্ত্রের মালিক হয়। শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের নেতৃবৃন্দের কাছেও কিছু অস্ত্র পাঠানো হয়। এর মধ্যে ছিল দুটি টোটা বন্দুক ও বেশ কিছু কার্তুজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিজিত অঞ্চলে এমন সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি। তাই এই ঘটনা ব্রিটিশদেরকে চমকে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা কখনোই ভাবতে পারেনি, পূর্ব সিলেটের দুর্গম অঞ্চলে এমন আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত একটি বিদ্রোহী দলের অস্তিত্ব থাকতে পারে। চরগোলা থানার পতনের পর তাদের টনক নড়ে।

সাত. চরগোলায় ব্রিটিশদের প্রথম সামরিক অভিযান

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিলেটস্থ কর্মকর্তা রবার্ট লিন্ডসে সিদ্ধান্ত নেন যে, চরগোলা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পুরোদস্তুর সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হবে। দুই মাস ধরে এই অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ১৭৮৬ সালের ২৯ মে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ২০০ জন প্রশিক্ষিত সৈন্যের একটি দল সিলেট থেকে নৌপথে চরগোলার উদ্দেশে রওনা হয়। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট ডেভিডসন। রবার্ট লিন্ডসের নির্দেশ অনুযায়ী ডেভিডসনের দলের লক্ষ্য ছিল প্রথমে রাধারামকে পরাজিত করা এবং এরপর চরগোলার গ্রামগুলিকে জনশূন্য করা। চরগোলাকে জনশূন্য করার জন্য লিন্ডসে গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে সকল গবাদী পশুকে তোলে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অভিযান সফল হয়নি। ডেভিডসনের নৌবহর দীর্ঘ নদীপথ পাড়ি দিয়ে যখন শনবিলে পৌঁছল তখন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকা বিদ্রোহীরা তাদের ওপর মারাত্মক আক্রমণ চালায়।

শনবিলের তীরবর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা রাধারামের সৈন্যরা ডেভিডসনের নৌবহর লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলি ও তীর ছুড়তে শুরু করে। এতে ডেভিডসনের প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়। আহত ও নিহত সৈন্যদেরকে নিয়ে ডেভিডসন পিঁছু হটার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও তেমন লাভ হয়নি। সিলেট থেকে যখন কোম্পানি সৈন্যরা চরগোলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তখন সেই সংবাদটি বিদ্রোহীদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরী কোম্পানি সৈন্যদেরকে প্রতিরোধের একটি পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ডেভিডসনের নৌবহরকে দুই দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিলেন। ডেভিডসন তাঁর নৌবহর নিয়ে যখন সুরমা নদীর উজানে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সুরমা, কুশিয়ারা ও বরাক নদীর মিলনস্থলে পৌঁছান তখন সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরের ভাঙ্গা ঘাটে অপেক্ষারত বিদ্রোহীরাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নৌকায় চড়েছিলেন।

ডেভিডসনের নৌবহর যখন কুশিয়ারার ভাটির দিকে অল্পদূর এগিয়ে শনবিলের উদ্দেশে কচুয়া নদীতে প্রবেশ করে তখন তারা জানতোই না যে, ভাঙ্গা অঞ্চল থেকে শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী তাদেরকে অনুসরণের জন্য নৌকায় করে রওনা হয়েছেন। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরী। তাঁরা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে কচুয়া নদীতে ডেভিডসনের নৌবহরকে অনুসরণ করছিলেন। দীর্ঘ নদীপথ পাড়ি দিয়ে যখন নৌবহরটি শনবিলে প্রবেশ করে তখন তারা রাধারামের সৈন্যদের আকস্মিক আক্রমণের মুখে পড়ে। এতে ডেভিডসনের সকল পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে কোম্পানি সৈন্যরা পিঁছু হটার চেষ্টা করে। কিন্তু এতেও কোন লাভ হল না। পেছন দিক থেকে তাদের ফেরার পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ভাঙ্গা অঞ্চল থেকে আগত সশস্ত্র দলটি।

ডেভিডসনের সৈন্যরা কোন উপায়ান্তর না দেখে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে এবং বিদ্রোহীদের তীর ও বন্দুকের নিশানার ভেতর দিয়েই পিঁছু হটার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত মাত্র ২০ জন জন সৈন্য নিয়ে ডেভিডসন পালাতে সক্ষম হন। বাদবাকী সকল সৈন্যই বিদ্রোহীদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিল। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা শত্রুপক্ষের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র লাভ করেছিল। ডেভিডসন পালিয়ে যাওয়ার পর রাধারামের বাহিনী এসব অস্ত্র নিয়ে চরগোলায় ফিরে যায়।

মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরীর দলটিও কিছু অস্ত্র সাথে নিয়ে ভাঙ্গা অঞ্চলে ফিরে আসে। তাদের দখলে এসেছিল ৮টি বন্দুক ও বেশ কিছু কার্তুজ। এই যুদ্ধে কোম্পানি সৈন্যদের এমন শোচনীয় পরাজয় ব্রিটিশদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় যে, নবাব রাধারামের বিরুদ্ধে চরগোলায় আরও বড় সামরিক অভিযান চালানো হবে।

আট. চরগোলায় ব্রিটিশদের দ্বিতীয় সামরিক অভিযান

দেড় মাস পর রবার্ট লিন্ডসে আবারও চরগোলায় সৈন্য পাঠান। ১৭৮৬ সালের ১৭ জুলাই লেফটেন্যান্ট ডেভিডসনের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি সৈন্যদল আবারও সিলেট থেকে নৌপথে চরগোলার উদ্দেশে রওনা হয়। আগেরবারের তুলনায় এই দলের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রবল ছিল অনেক বেশি। সুরমা নদীর উজানে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা তিন নদীর মোহনায় এসে পৌঁছায় এবং যথারীতি কুশিয়ারার ভাটির দিকে অল্পদূর এগিয়ে কচুয়া নদীতে প্রবেশ করে। এই অভিযানের সংবাদ যথাসময়ে না পাওয়ায় ভাঙ্গা অঞ্চলের বিদ্রোহীরা এবার কোম্পানি সৈন্যদের পিঁছু নিতে পারেননি। এ ব্যাপারে ডেভিডসনও সতর্ক ছিলেন। কচুয়া নদীতে প্রবেশের পর থেকেই তিনি খবর নিচ্ছিলেন যে, তাদেরকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা। শনবিলে প্রবেশের আগেও তিনি খবর নিয়েছিলেন যে, প্রবেশমুখে কেউ লুকিয়ে আছে কি না। কাউকে না পাওয়ায় তাঁর নৌবহর নির্বিঘ্নেই শনবিলে প্রবেশ করল। কিন্তু এবারও ভাগ্য তাদের সহায় হল না। এবার প্রকৃতিই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল।

ডেভিডসন জানতেন না যে, শ্রাবণ মাসের শনবিল কতোটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই জলাভূমিটি আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রীতিমতো সমুদ্রে পরিণত হয় এবং এই সময়ে এখানে যেসব ঝড় সৃষ্টি হয় তার সাথে সমুদ্রঝড়ের তেমন কোন তফাৎ নেই। ডেভিডসনের নৌবহর যখন শনবিলের বুকে ভাসতে ভাসতে চরগোলার স্থলভূমির দিকে এগিয়ে চলছে তখন হঠাৎ করেই তারা এক প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে যায়। ঝড়ের ফলে যেসব ঢেউ সৃষ্টি হয় তা উপেক্ষা করার শক্তি তাদের নৌকাগুলোর ছিল না। প্রচণ্ড ঝড় ও ঢেউ তাদের নৌবহরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ঢেউ ও বাতাসের গতি

নৌকাগুলোকে এদিক-সেদিক ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং বিপজ্জনকভাবে দুলতে দুলতে বেশিরভাগ নৌকাই পানিতে তলিয়ে যায়। ডেভিডসনের নৌকারও সলিল সমাধি ঘটল। তিনি পানিতে ডুবে মারা গেলেন। তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই একই পরিণতি বরণ করল। ঝড় থেমে যাওয়ার পর যেসব সৈন্য বেঁচে ছিল তারাও প্রাণ নিয়ে আর সিলেটে ফিরতে পারল না। রাধারামের সৈন্যদের হাতে তাদের প্রাণ গেল। এই অভিযানে কতজন কোম্পানি সৈন্য নিহত হয়েছিল এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সংখ্যাটা কয়েকশো হবে- তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নয়. চরগোলায় ব্রিটিশদের তৃতীয় সামরিক অভিযান

চরগোলায় দ্বিতীয় সামরিক অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ যখন সিলেট ও ঢাকায় পৌঁছল তখন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে মনে প্রমাদ গুণলেন। তারা বুঝতে পারলেন, যদি এই বিদ্রোহ দমন করা না যায় তাহলে ক্রমশ পুরো সিলেট তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, যেকোন মূল্যে চরগোলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে এবার তারা শনবিলের জলপথ বাদ দিয়ে স্থলপথে অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ চরগোলায় পৌঁছার জন্য প্রাণপণে একটি স্থলপথের সন্ধান করতে লাগল। চরগোলার দুই পাশেই ছিল দুটি স্বাধীন রাজ্য আর বাকি দুই পাশে ছিল শনবিল ও জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়। চরগোলায় যাওয়ার জন্য তখনও কোন স্থলপথের প্রচলন হয়নি। তাই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও চরগোলায় যাওয়ার কোন স্থলপথ খুঁজে পায়নি। কিন্তু হঠাৎ করেই তাদের ভাগ্য খুলে গেল।

রাধারামের জনৈক বিদ্রোহী সভাসদ চরগোলা থেকে পালিয়ে সিলেটে গিয়ে রবার্ট লিন্ডসের সাথে দেখা করেন এবং একটি পাহাড়ি পথের সন্ধান বলে দেন। লিন্ডসে এই তথ্যটিকে গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করেন এবং ওই সভাসদকেই কোম্পানি সৈন্যদের গাইড হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর কোম্পানি সৈন্যদের একটি বিশাল বাহিনী চরগোলার উদ্দেশে রওনা হয়। তবে এবার তারা শনবিলের দিকে না গিয়ে ভিন্ন পথে অগ্রসর হল। রাধারামের ওই বিদ্রোহী সভাসদের সহায়তায় তারা দোহালিয়া বা দুআইল পাহাড়ের দুর্গম পথের ভেতর দিয়ে চরগোলায় পৌছে যায়। এই দুর্গম পথ ধরে ব্রিটিশ বাহিনীর

আগমনের কথা রাধারাম ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি। ব্রিটিশ বাহিনী রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। রাধারামের ঘুমন্ত ও অপ্রস্তুত সৈন্যরা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি। তারা নিমিষেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ বাহিনী প্রায় বিনা যুদ্ধেই রাধারামের বাড়ি, সেনানিবাস, দুর্গ, বিচারালয় ও কয়েদখানাসহ সবকিছুই দখল করে নেয়। তবে তারা রাধারামকে আটক করতে পারেনি। তিনি সপরিবারে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

পরিবার-পরিজনকে কোন এক নিরাপদ স্থানে রেখে রাধারাম তাঁর পুত্রদেরকে নিয়ে চাপঘাট পরগনার ভাঙ্গা অঞ্চলে চলে যান। সেখানে মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর বাড়িতে তারা কয়েকদিন গোপনে অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে শলাপরামর্শ করেন। এই শলাপরামর্শ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরী রাধারামের ছত্রভঙ্গ লোকজনের সাথে গোপনে গোপনে যোগাযোগ করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজার সহায়তায় তারা চরগোলা মুক্ত করে রাধারামকে আবারও নবাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আরও পরিকল্পনা হয় যে, রাধারাম ও তাঁর পুত্ররা ছদ্মবেশে বিভিন্ন জায়গায় চষে বেড়াবেন এবং বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাধারাম সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরতে থাকেন। তাঁর পুত্র জয়মঙ্গল তুতিপাখি শিকারীর বেশে ঘুরতে থাকেন; আরেক পুত্র রাজমঙ্গল ডোমের বেশে ঘুরতে থাকেন।[89] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা এভাবে বেশিদিন আত্মগোপনে থাকতে পারেননি। জয়মঙ্গল ও রাজমঙ্গল অল্পদিনের মধ্যেই কোম্পানি সরকারের চরদের হাতে ধরা পড়ে যান। এরপর রাধারাম নিজেও ধরা পড়েন।

দশ. বরাক নদীর ভাঙ্গা ঘাটের যুদ্ধ

বিদ্রোহীদেরকে পুনরায় সংগঠিত করার কাজের ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশী রাধারাম একদিন মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর বাড়িতে আসেন। এখানে অল্পসময় অবস্থানের পর তিনি বেরিয়ে চলে যান। কিন্তু বেশি দূর গেলেন না। ভাঙ্গা ঘাটের সামান্য উজানে বরাক নদীর অন্যপাশে (জায়গাটির নাম সিদ্ধেশ্বর। এটি বদরপুর ঘাটের নিকটবর্তী) তখন বারুণীর মেলা চলছিল। রাধারাম

---

[89] সেনাপতি রণমঙ্গল তখন জীবিত ছিলেন না।

সেখানেই গেলেন। পরদিন সকালে মেলায় ঘুরাঘুরির সময় তিনি কোম্পানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যান। দিনটি ছিল ১৭৮৭ সালের ২৮ মার্চ। কোম্পানি সৈন্যরা তাকে একটি লোহার খাচায় বন্দী করে বদরপুর ঘাটে নিয়ে আসে।

বদরপুর ঘাট ও সিলেট শহরের মধ্যে নিয়মিত একটি জাহাজ চলাচল করতো। খাচায় বন্দী রাধারামকে এই জাহাজে তোলা হয়; সাথে ছিল প্রচুর কোম্পানি সৈন্য। রাধারামের গ্রেফতারের এই সংবাদটি চারদিকে বেশ দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের কর্মীরা এই সংবাদ পেয়ে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তাকে মুক্ত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরী সকল গোপনীয়তা বাদ দিয়ে এবার প্রকাশ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাধারামকে বহনকারি ব্রিটিশ জাহাজে আক্রমণের জন্য বিদ্রোহীদের একটি সশস্ত্র দল নিয়ে তারা ভাঙ্গা ঘাটে অবস্থান নেন।

এই দলের হাতে ছিল ৩০টি টোটা রাইফেল এবং প্রচুর দেশীয় অস্ত্র। কয়েকটি ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে তারা ভাঙ্গা ঘাটের কাছে অবস্থান নেন এবং ব্রিটিশ জাহাজটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। রাধারামকে নিয়ে ব্রিটিশ জাহাজটি দুপুরের দিকে সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। জাহাজটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন দুজন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা। তারা ভাঙ্গা ঘাটের নিকটে বিদ্রোহীদের অবস্থানের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। বদরপুর ঘাট থেকে যাত্রা শুরুর পর ভাঙ্গা ঘাটের কাছে পৌঁছতেই তাদের জাহাজটি বিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ে। বিদ্রোহীরা জাহাজটির পথ রুদ্ধ করে গুলি চালাতে শুরু করেন। এছাড়াও তারা জাহাজের দিকে তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করেন। জাহাজে অবস্থানরত কোম্পানি সৈন্যরাও সাথে সাথে পাল্টা গুলি শুরু করে।

প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী উভয়পক্ষের বন্দুকযুদ্ধ চলে। মোহাম্মদ জাবির চৌধুরীর অব্যর্থ নিশানায় জাহাজের প্রধান সেনা কর্মকর্তা গুলিবিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যান। এছাড়াও উভয় পক্ষের আরও অনেকে হতাহত হন। একপর্যায়ে বিদ্রোহীদের গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে তাদের পক্ষ থেকে খুব কম গুলি আসতে থাকে। এই সুযোগে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে এবং বেশ দ্রুত গতিতে জাহাজ চালিয়ে কোম্পানি সৈন্যরা সরে পড়তে সক্ষম হয়। ভাঙ্গা ঘাট থেকে ভাটির দিকে সামান্য এগিয়েই বরাক নদীটি সুরমা ও কুশিয়ারায় ভাগ হয়েছে।

সিলেট শহরে পৌঁছার সহজ পথ হল সুরমা নদী। কিন্তু জাহাজটি সেদিকে গেল না।

এগারো. ব্রিটিশদের হাতে রাধারামের মৃত্যু (১৭৮৭ সাল)

বরাক নদী থেকে উৎপত্তি লাভের পর সামান্য এগিয়ে সুরমা নদীটি প্রবেশ করেছে জৈন্তিয়া রাজ্যে। কিছুদূর যাওয়ার পর নদীটি আবার জৈন্তিয়া থেকে বেরিয়ে জৈন্তিয়া ও ব্রিটিশ রাজের মধ্যবর্তী সীমানা হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বদরপুর ঘাট ও সিলেট শহরের মধ্যে যেসব ব্রিটিশ জাহাজ বা নৌকা চলাচল করতো সেগুলোকে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়েই যেতে হতো। রাজা ছত্রসিংহের আমল থেকে ব্রিটিশরা এই সুবিধা পেয়ে আসছিল।[90] কিন্তু ১৭৮৭ সালের ২৮ মার্চ রাজবন্দী রাধারামকে নিয়ে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হওয়া জাহাজটি সুরমা নদীর পথ বাদ দিয়ে কুশিয়ারা নদীর পথ ধরল। সেই দিনের ভাঙ্গা ঘাটের ঘটনায় ব্রিটিশ জাহাজের বেঁচে থাকা সেনা কর্মকর্তাটি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।

তিনি ভেবেছিলেন, রাধারামকে নিয়ে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে গেলে সেখানেও কোন বিপদ হতে পারে। তাই তিনি সুরমায় প্রবেশ না করে জাহাজটি নিয়ে কুশিয়ারায় প্রবেশ করলেন। এই নদীটির দুই পাশেই ছিল ব্রিটিশ রাজের এলাকা। তবুও ওই সেনা কর্মকর্তা ভয় পাচ্ছিলেন যে, ভাঙ্গা অঞ্চলের মতো

---

[90] বর্তমান ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলা ছিল মোগল ও তৎপরবর্তী ব্রিটিশশাসিত সিলেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। মোগলরা সিলেট শহর থেকে সুরমা নদী হয়ে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে করিমগঞ্জ যেতো। সুরমা নদীর একটি অংশ জৈন্তিয়া রাজ্যের সাতবাক ও মুলাগুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মোগলরা এই অংশটি অতিক্রম করেই করিমগঞ্জের বরাক নদীতে পৌঁছত। এতে জৈন্তিয়ার রাজারা কখনো আপত্তি করেননি। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন নদীর এই অংশটি ব্যবহার করতে শুরু করল তখন জৈন্তিয়া রাজ্য এর প্রতিবাদ করে। জৈন্তিয়ার রাজা ছত্রসিংহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌযানগুলোকে সুরমা নদীর এই অংশটি ব্যবহারে বাধা দিয়েছিলেন। ১৭৭৪ সালে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে ব্রিটিশরা নদীর এই অংশটি ব্যবহারের অনুমতি পায়। এরপর জৈন্তিয়ার কোন রাজা ব্রিটিশদেরকে নদীর ওই অংশে প্রবেশে আর বাধা দেননি।

ব্রিটিশ রাজের অন্যান্য স্থানেও হয়তো গোপনে বিদ্রোহীরা সংগঠিত হয়ে আছে এবং রাধারামকে উদ্ধারের জন্য এরা কুশিয়ারা নদীপথেও জাহাজে হামলা করবে। তাই রাধারামকে হত্যা করেই তিনি এই সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। বরাক থেকে কুশিয়ারায় প্রবেশের পর তিনি খাচায় বন্দী রাধারামকে হত্যার আদেশ দিলেন। তাঁর সৈন্যরা এই আদেশ পালনে মোটেও বিলম্ব করল না। এরপর এই মৃত্যুসংবাদটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ জাহাজটি বিয়ানীবাজারের বৈরাগীবাজার ঘাটে ভিড়ল। তখন আনুমানিক বিকাল পাঁচটা বাজে।

সেখানে ভীড় করা উৎসুক জনতাকে জানানো হল যে, রাধারাম কোম্পানি সরকারের সাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য জাহাজেই আত্মহত্যা করেছেন। এই সংবাদকে যাতে কেউ ধোঁকা মনে না করে সেজন্য উৎসুক জনতার সামনে রাধারামের লাশও প্রদর্শন করা হল। কিছুক্ষণ বিরতির পর রাধারামের লাশ নিয়ে জাহাজটি আবারও যাত্রা শুরু করে। পরের দিন তারা রাধারামের লাশ নিয়ে সিলেট শহরে পৌঁছে। রবার্ট লিন্ডসে রাধারামের লাশ সৎকারের আদেশ দেন এবং ভাঙ্গা বাজারের ঘটনায় জড়িতদেরকে অতিসত্বর বন্দী করার জন্য পূর্ব সিলেটে প্রচুর সৈন্য পাঠান। শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের নেতৃবৃন্দ তখন আত্মগোপনে চলে গিয়েছেন। তাই কয়েক মাস অনুসন্ধান করেও তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে ১৭৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরী কোম্পানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন।

বারো. বিদ্রোহী নেতাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

১৭৮৭ সালের ২৮ মার্চ ব্রিটিশরা রাজবন্দী রাধারামকে বিনা বিচারে হত্যা করে। এরপর সিলেটের বিদ্রোহ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী নেতারা তখন পুরোপুরিভাবে আত্মগোপনে চলে যান। রবার্ট লিন্ডসে ভেবে দেখলেন, এসব বিদ্রোহী নেতারা সুযোগ পেলে আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেন। তাই তিনি যেকোন মূল্য তাদেরকে গ্রেফতারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। নেতাদের অবস্থান শনাক্ত করার জন্য তিনি চারদিকে অসংখ্য চর নিযুক্ত করলেন। এ কৌশলে কাজ হল। প্রায় আট মাস পরে লিন্ডসের চররা সেলবরষের বিদ্রোহী জমিদার ভাইদের অবস্থান শনাক্ত করে ফেলে।

সেলবরষের জমিদার মোহাম্মদ হাজির চৌধুরী এতোদিন 'তোতা মিয়া' নামে আত্মগোপনে ছিলেন। তাঁর ভাই মোহাম্মদ সাদির চৌধুরী এতোদিন 'ময়না মিয়া' নামে আত্মগোপনে ছিলেন।[91] ১৭৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা কোম্পানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন। এরপর তাদেরকে সিলেটের সালুটিকরে অবস্থিত ব্রিটিশ কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হয়। রাধারামের দুই পুত্র জয়মঙ্গল ও রাজমঙ্গল আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। গ্রেফতারের বাকী ছিলেন শুধু মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরী।[92] কয়েকদিনের মধ্যে তারাও ধরা পড়ে গেলেন। সেলবরষের জমিদার ভাইদেরকে গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পরে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং যথারীতি সালুটিকরের ব্রিটিশ কয়েদখানায় এনে বন্দী করে রাখা হয়।

১৭৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লিন্ডসের আদালতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা রুজু করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী লিন্ডসে নিজেই ছিলেন একজন বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট। লিন্ডসে নিজের আদালতের রায়ে সকল বিদ্রোহী নেতার ফাঁসির রায় দিয়ে দেন। এতে সিলেটের বনেদী জমিদারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সিলেটের অনেক প্রভাবশালী ও বনেদি জমিদার পরিবার বিদ্রোহে অংশ নেয়নি বটে কিন্তু সেলবরষ ও ভাঙ্গা অঞ্চলের জমিদার পরিবারগুলোর সাথে তাদের দীর্ঘদিনের

[91] তোতা মিয়া ও ময়না মিয়াদের বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস আজও পূর্ণাঙ্গভাবে উদঘাটিত হয়নি। চরগোলা ও ভাঙ্গা অঞ্চলের মতোই সেলবরষেও তাদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সেই বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় সামান্যই। সেলবরষের মানুষের মুখে মুখে আজও জমিদার তোতা মিয়া ও ময়না মিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প প্রচলিত আছে। এসব গল্প থেকে অনেক কিছু আঁচ করা গেলেও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তাদের জমিদারী বাড়িটির সামান্য কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও টিকে আছে। বাড়িটির কোথায় কী ছিল তা আজও বাড়িটির আশেপাশের মানুষ বলে দিতে পারেন। তাদের কথাবার্তা থেকে কতগুলো বিষয় জানা যায়। প্রথমত, ছিয়াত্তরের মনন্তরের সময় এই বাড়িতে অসংখ্য মানুষের জন্য খাবার রান্না করা হতো। দ্বিতীয়ত, জমিদার তোতা মিয়া ও ময়না মিয়া ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে জেল খেটেছিলেন।

[92] তাদের পিতা মীর মোহাম্মদ চৌধুরী রাধারামের মৃত্যুর এক মাস পরেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। লিন্ডসের রায় তাদেরকে অবাক করে দেয়। তারা এর প্রতিবাদ করেন।

এমতাবস্থায় লাতু ডিহির সরকারি প্রতিনিধি জালাল মোহাম্মদ চৌধুরী লিন্ডসের সাথে দেখা করে বলেন যে, বিদ্রোহী নেতাদেরকে ফাঁসি দিলে পুরো সিলেটের জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে পারে। যদি লিন্ডসে এমন পরিণাম ডেকে আনতে না চান তাহলে যেনো অবিলম্বে নেতাদের ফাঁসির রায় বাতিল করা হয়। সুচতুর লিন্ডসে সিলেটের জমিদার পরিবারগুলোর মনোভাব বুঝতে পারলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্বব্যবস্থা অনেকাংশেই এসব জমিদার পরিবারের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই লিন্ডসে একটি সম্ভাব্য অসহযোগ আন্দোলন এড়ানোর জন্য বিদ্রোহী নেতাদের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করলেন। এতে উভয় কূল রক্ষা হল। সিলেট পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেল।

তেরো. গোপন কৌশলে বিদ্রোহী নেতাদের মুক্তি

১৭৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিলেটের বিদ্রোহী নেতাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর তাদেরকে সিলেট কেন্দ্রিয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। সেখানকার জেলসুপার ছিলেন মুজিবুর রহমান নামের এক বিহারী ভদ্রলোক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী করলেও তিনি মনেপ্রাণে একজন স্বাধীনতাকামী ছিলেন। বিদ্রোহী নেতাদেরকে মুক্ত করার জন্য তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বিদ্রোহী নেতাদেরকে জানালেন যে, কিছুদিন পর জেলের নবাগত আসামীদের হাতের আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হবে। এর পূর্বে নেতাদেরকে গোপনে বের করে দিয়ে তাদের পরিচয়ে অন্য কিছু লোককে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তবে এর জন্য দরকার হবে স্বেচ্ছায় জেল খাটতে রাজী- এমন লোককে খুঁজে বের করা। জেলের কর্মচারীদেরকেও মোটা অংকের উৎকোচ দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্রোহী নেতাদের পরিবারের লোকজন এই দুটো সমস্যারই সমাধান করলেন। সেলবরষ এবং ভাঙ্গা অঞ্চলের নেতাদের স্থলে চারজন লোক স্বেচ্ছায় জেল খাটতে রাজী হল। উৎকোচের অর্থেরও ব্যবস্থা করা হল। এরপর সুবিধামতো একদিন গভীর রাতে সেলবরষের জমিদার

ভাইদেরকে জেলের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দুজন স্বেচ্ছাসেবীকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এর কয়েকদিন পর মোহাম্মদ মনিয়র চৌধুরী ও মোহাম্মদ জাবির চৌধুরীকে বের করে দিয়ে আলু মিয়া ও মালি মিয়া নামে দুজন স্বেচ্ছাসেবককে ভেতরে ঢুকানো হল। এরা উভয়েই শ্রীহট্ট জনসেবা সংঘের কর্মী ছিলেন।

জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর বিদ্রোহী নেতারা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে নীরবে নিভৃতে বাকি জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ১৭৮৯ সালে লিন্ডসে সিলেটের চাকুরী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাদের নতুন করে ধরা পড়ার ভয় আর ছিল না। ১৭৯০ সালে চারজন স্বেচ্ছাসেবকও মুক্তি লাভ করেছিলেন। সেই বছর সিলেটে কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল এবং জেলের ভেতরেও কলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। জেলসুপার মুজিবুর রহমান তাদেরকে ‘কলেরায় মৃত কয়েদী’ সাজিয়ে বাইরে বের করে দেন। সিলেট কেন্দ্রিয় কারাগারের রেকর্ড অনুযায়ী কলেরায় মৃত এই ব্যক্তিরা বাস্তবে অনেকদিন বেঁচেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

[রাধারামের পুত্র জয়মঙ্গল দীর্ঘদিন কারাভোগ করেছিলেন। এরপর কিছু কৌশলগত কারণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তাঁর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে জয়মঙ্গলের মুক্তি ও তাঁর প্রতাপগড়ে প্রত্যাবর্তনের কথা লিখেছেন। তাঁর বংশধরদের সম্পর্কেও তিনি কিছু তথ্য দিয়েছেন। শ্রী চৌধুরীর এসব তথ্য যথাযথ বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রাধারামের বিদ্রোহের যে ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন তাতে অনেক অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে। এই বিদ্রোহের প্রকৃত ইতিহাস আজও অনেকের অজানা। এই অজ্ঞতা দূর করার উদ্দেশ্যেই জৈন্তিয়ার ইতিহাসের এই বইতে বিদ্রোহটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তোলে ধরা হয়েছে। বিবরণে যেসব তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে তা এসেছে চারটি পরিবারের ইতিহাস থেকে। রাধারামের পুত্র জয়মঙ্গলের পরিবার, লাতু ডিহির সরকারি প্রতিনিধি জালাল মোহাম্মদ চৌধুরীর পরিবার, চাপঘাট পরগনার ভাঙ্গা অঞ্চলের ভূস্বামী মীর মোহাম্মদ চৌধুরীর পরিবার এবং সেলবরষের জমিদার মোহাম্মদ হাজির চৌধুরী ও মোহাম্মদ সাদির চৌধুরীর পরিবারের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে যাচাই-বাছাই ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এই বিবরণটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বিবরণটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্রিটিশ দলিলপত্র ও ইতিহাস গ্রন্থ থেকেও সহায়তা নেওয়া হয়েছে।]

অধ্যায় ত্রিশ
চতুলের সোনাধনের কবিতার গদ্যরূপ

(মূল গীতিকবিতার রচয়িতা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ। গীতিকবিতাটিকে গদ্যরূপ প্রদান করেছেন আসিফ আযহার।)

সোনাধনের বাড়ি ছিল জৈন্তিয়ার চতুলে। তাঁর পিতার নাম ছিল খাদনলস্কর। তিনি একজন মান্যগণ্য লোক ছিলেন। সেকালে স্থল ও পর্বতের ২২ রাজজুড়ে ছিল জৈন্তিয়ার রাজার রাজত্ব। স্থলে ছিল ১০ রাজ আর পর্বতে ছিল ১২ রাজ। দলই, শিকদার, চৌধুরী, নক্তি, হুষ্টি, হেউতি, মাঝি, বাদুয়া, পাজি, পাইক, ভান্ডারী প্রভৃতি লোকেরা রাজার কাজ করতেন।

রাজবাড়িতে ছিল চণ্ডীমণ্ডপ আর বিচারের কাছারী। খবর বলার বিনিময়ে বাদুয়া পেতো ভাতা। তখতে ভার দিয়ে বসতেন রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা। যতক্ষণ ইচ্ছা তারা দরবার চালিয়ে যেতেন। দরবারে বসার জন্য পর্বত ও স্থলের সরদারের জায়গা নির্দিষ্ট করা ছিল। পাথরের আসনেই সবাই বসতেন। রাজার সুবিচারে রাজ্যের প্রজারা ছিলেন সুখী।

তখনকার সময়ের রাজার নাম ছিল বিজয় সিংহ।[93] আর রাজার বোন মহারানী বড়কুওরীকেও প্রজারা ভক্তি করতো। স্থলের প্রজারা ছিল হিন্দু আর মুসলমান। পর্বতে ছিল খাসিয়া জাতির বসবাস। পর্বতের ১২টি পুঞ্জির একটি ছিল নারতিয়াং পুঞ্জি। সেই পুঞ্জিতে বাস করতেন উপাং দলই। তাঁর ঘরে একটি পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রের কপালে ছিল একটি রাজটিকা।

দলই এ পুত্রের নাম রাখলেন লক্ষ্মী সিংহ। পুত্রের বয়স যখন তিন মাস, তার মা তাকে নিয়ে একটি পাহাড়ে গেলেন। পুত্রকে গাছের তলায় শুইয়ে রেখে তিনি লেগে গেলেন জুম চাষের কাজে। বেলা দ্বিপ্রহর হলে মা পুত্রের কাছে ফিরে এসে দেখেন, শিশুটি ঘুমিয়ে আছে আর একটি অজগর তাকে ছায়া দিচ্ছে! এ দৃশ্য দেখে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

---

[93] জৈন্তিয়ার রাজাদের উপাধী ছিল ‘সিংহ’। জনসাধারণ রাজাদের নামের সাথে এই শব্দটি জুড়ে দিতো। রাজা বিজয়নারায়ণকে জনসাধারণ ‘বিজয় সিংহ’ নামেই সম্বোধন করতো।

চিৎকার শুনে আশেপাশের খাসিয়ারা ছুটে আসল। তারা এসে দেখল, সাপটি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। তখন লোকজন যে যার ঘরে চলে গেল। পরে তাদের কাছ থেকে আরও অনেকে এই খবরটি শুনল। খবর শুনে খাসিয়ারা সমবেত হয়ে লক্ষ্মীর মা-বাবাকে বলল, এই খবরটি যেনো কোনভাবেই রাজার কানে না যায়। আর শিশুটিকে যেনো অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখা হয়।

এছাড়াও শিশুটিকে কখনো জৈন্তিয়ার হাট জয়ন্তীপুরে না নিয়ে যেতে তারা পরামর্শ দিল। এতো সতর্কতার কারণ হচ্ছে, এই শিশুটি একদিন রাজা হবে যদি তা বর্তমান রাজা জানতে পারেন তাহলে দুশমন ভেবে এ শিশুটিকে তিনি হত্যা করবেন। শিশুটির বয়স যখন ১২ হল, তখন সে একদিন কাউকে কিছু না বলেই পিতার পিছু পিছু জয়ন্তীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

কেউই বুঝতে পারেনি যে, পিতাকে অনুসরণ করে লক্ষ্মী জয়ন্তীপুরের দিকে চলে যাচ্ছে। জয়ন্তীপুরের কাছাকাছি পৌঁছে লক্ষ্মীর পিতা কোন কারণে একবার রাস্তায় থামলেন। আর তখনই তিনি দেখতে পেলেন যে, লক্ষ্মী তাঁর পিছু পিছু চলে এসেছে। এমতাবস্থায় কী করতে হবে তিনি ভেবে পেলেন না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি কোলে করে লক্ষ্মীকে বাজারে নিয়ে গেলেন।

জয়ন্তীপুরে দূর্গা খাইনী নামে উপাং দলইয়ের একজন আত্মীয়া ছিল। সেই দূর্গার বাড়িতে লক্ষ্মীকে লুকিয়ে রেখে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু দূর্গা যখন লেনদেন ও বেচাকেনার কাজে ব্যস্থ হয়ে পড়লেন, লক্ষ্মী বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। দূর্গার অগোচরেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল। সেখানে সে ঘুরাফিরা ও খেলাধুলা করতে লাগল।

একপর্যায়ে রাজার বোন বড়কুওরী তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। তিনি শিশুটিকে পুত্রের মতো স্নেহ করলেন এবং তার পরিচয় বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এদিকে দূর্গার বাড়িতে যখন লক্ষ্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন তার সন্ধানে তল্লাশী শুরু হল। উপাং দলই দূর্গার বাড়িতে ফিরে এ ঘটনার কথা শুনে কান্না শুরু করলেন।

দূর্গাও কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মীকে খুঁজছিলেন। একপর্যায়ে তাকে রাজবাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেল। দূর্গা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, লক্ষ্মী বড়কুওরীর খাটের উপর বসে আছে। হারানো বালকটিকে ফিরে পেয়ে দূর্গা খুবই খুশী

হলেন। তিনি ঠাকুর মা অর্থাৎ বড়কুওরীর কাছে লক্ষ্মীর পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, "এই শিশুটি আমার ভাতিজা।"

কুয়ঁরী দূর্গাকে বললেন, শিশুটি পরবর্তী হাট বার পর্যন্ত রাজবাড়িতেই থাকুক। উপাং দলই যেনো পরবর্তী হাট বারে এসে শিশুটিকে নিয়ে যান। দূর্গা বাড়িতে ফিরে উপাং দলইর কাছে সবকিছু খুলে বললেন। উপাং দলই শিশুটির প্রতি বড়কুওরীর প্রবল স্নেহের কথা শুনে দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন এবং খুশী মনে পাহাড়ে চলে গেলেন।

লক্ষ্মীও আনন্দচিত্তে রাজবাড়িতে থেকে খেলাধুলা করতে থাকল। পরবর্তী হাট বারে তার পিতা এসে তাকে ফেরত নিয়ে গেলেন। কিন্তু রাজবাড়ির সাথে তার সম্পর্কটি শেষ হল না। জয়ন্তীপুরে আসলেই সে রাজবাড়িতে যেতো এবং বড়কুওরীর স্নেহ লাভ করতো। এভাবে চলতে চলতে একদিন এই শিশুটি বড় হয়ে গেল। রাজপরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ হওয়ায় যুবক লক্ষ্মী সিংহ রাজসভায় স্থান পেয়ে গেলো।

রাজাও লক্ষ্মীকে খুবই পছন্দ করতেন। সবকিছুতে তিনি এই বুদ্ধিমান যুবকের পরামর্শ নিতে লাগলেন। রাজসভার অন্যরাও লক্ষ্মীর বুদ্ধি দেখে চমকিত হলেন। রাজসভার বিচারিক কাজে লক্ষ্মী খুবই নিখুঁতভাবে সমাধান দিতে পারতো। রাজসভায় উত্থিত অভিযোগ বা দেন-দরবার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্মী এমন সিদ্ধান্ত দিত যে, ষোল আনাই ন্যায়বিচার রক্ষা হতো।

এভাবে দিন যেতে লাগল। একপর্যায়ে দেখা গেল, দরবারে বসার পর রাজা দশরাজের কাউকে (সমতলের দশরাজের সরদারগণ) জিজ্ঞাসা না করে কেবল লক্ষ্মীর পরামর্শই নিতে লাগলেন। এটা অন্যদের মনে হিংসার জন্ম দিল। তারা লক্ষ্মীকে নিশ্চিহ্ন করার মতলব আটলেন। রাজার অগোচরে দশরাজের সরদারগণ মিলিত হলেন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারা বাদুয়ার বাড়িতে গেলেন।

বাদুয়াকে বখশীশ দিয়ে তারা নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসলেন এবং পরবর্তী রাজসভায় লক্ষ্মী ও বড়কুওরীর মধ্যে এক গুপ্তপ্রেমের সংবাদ তোলে ধরার জন্য তাকে সম্মত করালেন। বাদুয়া টাকা পেয়ে খুশী হয়ে এই ষড়যন্ত্রে সামিল হল। দুদিন পরে রাজসভা বসলে বাদুয়া পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সবার সামনে লক্ষ্মী ও বড়কুওরীর মধ্যে গুপ্তপ্রেমের সংবাদ তোলে ধরল!

বাদুয়া রাজসভায় দাঁড়িয়ে সবাইকে ছালাম জানিয়ে জোড়হাতে বলল, বড়কুওরীর সাথে লক্ষ্মীর অনৈতিক সম্পর্ক চলছে এবং সে নিজে এসবের সাক্ষী! এতে রাজা সবার সামনে খুবই লজ্জা পেলেন। লজ্জায়, অপমানে তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। তিনি রাজসভায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। চতুলের লস্কর রাজসভার নিস্তব্ধতা ভেঙে রাজার কাছে জানতে চাইলেন, এই মূহুর্তে করণীয় কী?

রাজা বললেন, "তোমার মনে যা আসে তা-ই কর, ভাই। তুমি যা বলবে আজ সেটাই হুকুম বলে গণ্য হবে।" রাজার কথা শুনে লস্কর কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বললেন, সভাজনদের উচিত হবে এখনই রাজবাড়ি থেকে শত্রুকে (লক্ষ্মীকে) ধরে নিয়ে আসা। তারপর তাকে হাতির পাঁয়ের সাথে বেধে সাত হাটি ঘুরাতে হবে। শুধু তাই নয়, "অঙ্গ পেছাইয়া নরইন দিয়া তাতে মরিচ দিতে হইবে।"

খাদনলস্করের এই হুকুম শুনে মহা হুলস্থুল শুরু হল। পলাতক লক্ষ্মীর সন্ধানে সবাই বেরিয়ে পড়ল। লক্ষ্মী যাতে লুকিয়ে রাজধানী থেকে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য সবগুলো ফটকে পাহারা বসানো হল। পশ্চিমের ফটকের পাহারায় রইলেন খাদনলস্কর নিজেই। এদিকে লক্ষ্মীর কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছিল না। সে রাজধানীর ভেতরেই লুকিয়ে ছিল।

রাজসভায় লক্ষ্মীকে হত্যার সিদ্ধান্ত হওয়ার পরেই রণ খাইনী নামক এক মহিলা রাজবাড়িতে গিয়ে ঠাকুর মাকে (বড়কুওরীকে) সবকিছু অবহিত করেন। এই খবর শুনে ঠাকুর মা বড়কুওরী চমকে ওঠেন! তাঁর মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি মনে মনে প্রমাদ গুণলেন এবং রণ খাইনীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই অবস্থায় কী করা যেতে পারে?

সময়টা তখন ছিল রাত্রিবেলা। রণ খাইনী লক্ষ্মীকে বাঁচানোর একটা পথ বের করলেন। তিনি রাতের আঁধারে লক্ষ্মীকে নিয়ে দূর্গার বাড়িতে লুকিয়ে রাখার একটা বুদ্ধি বের করলেন। এই বুদ্ধি অনুযায়ী রণ খাইনী রাতের অন্ধকারে লক্ষ্মীকে নিয়ে দূর্গার বাড়িতে চলে গেলেন এবং সেখানে ঘরের মধ্যে একটি গর্ত করে তার ভেতর লক্ষ্মীকে লুকিয়ে রাখা হল।

অধিক নিরাপত্তার জন্য গর্তের উপরে একটি মাচাঙ বানিয়ে তাতে কিছু জিনিসপত্রও রেখে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, দূর্গা বমি করে ওলাউটা (কলেরা) রোগীর ভাণ ধরলেন যাতে কেউ এই ভয়ংকর ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে

দূর্গার ঘরে প্রবেশ না করে! পরের দিন সারা রাজধানী খুঁজেও লক্ষ্মীকে আর পাওয়া গেল না। দিন গড়িয়ে রাত হল। রাজধানীর ফটকের পাহারাও জোরদার করা হল।

বড়কুওরী ভেবে দেখলেন লক্ষ্মীকে বেশিক্ষণ এভাবে আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। যদি এই রাতের অন্ধকারে লক্ষ্মীকে রাজধানীর বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া না যায় তাহলে তার প্রাণ বাচানোর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়বে। লক্ষ্মীর জীবন রক্ষার জন্য তিনি গভীর রাতে একটি থলেতে করে সোনা-রূপা নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

এরপর লক্ষ্মীকে নিয়ে হাজির হলেন রাজধানীর পশ্চিমের ফটকে, যেখানে খাদনলস্কর পাহারায় ছিলেন। খাদনলস্করের কাছে তিনি সোনা-রূপার নজরানা পেশ করলেন। এরপর বললেন, "ভাই খাদনলস্কর। লক্ষ্মীর সাথে আমার কী সম্পর্ক তা তুমি জান। তুমি জান যে, লক্ষ্মী আমার কাছে পুত্র সন্তানের মতো। আমি তাকে সন্তানের মতোই স্নেহ করি।"

এরপর তিনি খাদনলস্করের কাছে এই নির্দোষ যুবকের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। আরও বললেন, "তুমি হয় এই যুবকের পথ ছেড়ে দাও নয়তো আমাকে হত্যা করো।" খাদনলস্কর কুয়ঁরীর সব কথাই বুঝলেন। লক্ষ্মীকে যে আসলে ফাঁসানো হয়েছে তা বুঝতে তাঁর দেরী হলো না। বিবেকের তাড়নায় তিনি লক্ষ্মীকে বাঁচিয়ে দেওয়ারই সিদ্ধান্তই নিলেন।

ফটক খুলে দিয়ে তিনি লক্ষ্মীকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন। লক্ষ্মী রাজধানী থেকে বেরিয়ে নয়াগাঙ্গ পাড়ি দিয়ে পাহাড়ে ঢুকে গেল। কিন্তু পরের দিন লক্ষ্মীর পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আর গোপন রইল না। রাজা এই বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন। তদন্ত করে দেখা গেল, পশ্চিম দিকের ফটকে লক্ষ্মীর পালিয়ে যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে।

খাদনলস্কর এই চিহ্নটি মুছে ফেলার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এই অসতর্কতাই তাঁর জীবনহানির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। রাজসভায় খাদনলস্কর নিজের দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। মন্ত্রীরা রাজার কাছে জানতে চাইলেন, এই দোষী ব্যক্তির ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত হবে? রাজা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, লক্ষ্মীর বেলায় খাদনলস্কর যে হুকুম দিয়েছিলেন সেই শাস্তি এখন তাঁর নিজেরই পাওয়া উচিত।

যেই কথা সেই কাজ। জল্লাদ এসে খাদনলস্করকে হাতির পায়ের সাথে বেঁধে ফেলল। এই অবস্থায় হাতিকে সাত হাটি হাঁটানো হল। হাতির পাঁয়ের নিচে পড়ে লস্কর মারা গেলেন। এই মর্মান্তিক খবরটি যখন তাঁর চতুলের বাড়িতে পৌঁছল, পরিবার-পরিজন কেঁদে-কেটে সারা হলেন। সবচেয়ে বেশি কাঁদল লস্করের আট বছরের পুত্র সোনাধন।

এদিকে জয়ন্তীপুরে যখন এসব ঘটনা ঘটছে লক্ষ্মী তখন নারতিয়াং পুঞ্জির উদ্দেশ্যে হেঁটে চলেছে। সে নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছল। বাড়িতে পৌঁছে সে বাবা-মায়ের কাছে সব ঘটনা খুলে বলল। লক্ষ্মীর মাতা ভবানী খাইনি সব কিছু শুনে খাদনলস্করকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে 'সাত থাবা' টাকা নিয়ে জয়ন্তীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

চাড়াল ঢেকী নামক স্থানে পৌঁছে তিনি লোকজনের কাছ থেকে খবর পেলেন যে, রাজা খাদনলস্করকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এই সংবাদ ভবানী খাইনিকে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ করল। সাত থাবা টাকা তিনি পাহাড়ের ঢালের একটি গর্তে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এরপর নিজ বাড়িতে ফিরে এসে বারো পুঞ্জির সরদারদের বৈঠক ডাকলেন।

সরদাররা ভবানী খাইনির বাড়িতে সমবেত হলে তিনি সবকিছু খুলে বললেন এবং রাজা বিজয় সিংহকে বয়কটের আহবান জানালেন। ভবানীর আহবানে সাড়া দিয়ে সরদাররা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যতোদিন রাজা বিজয় সিংহ জীবিত থাকবেন ততোদিন সমতলের সাথে পাহাড়িদের আর কোন বাণিজ্য বা লেনদেন হবে না এবং জয়ন্তীপুরের হাটেও কোন পাহাড়ি আর যাবে না।

এতে পাহাড়িদের কোন আর্থিক ক্ষতি হলে ভবানী খাইনি নিজের সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। বয়কটের বারো বছর পর্যন্ত তিনি এই ভর্তুকি দিয়ে যাওয়ার কথা দিলেন। পাহাড়িরা এই প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হয়ে দেবতার নামে শপথ করলেন যে, পাহাড় থেকে কোন পণ্যসামগ্রী আর জয়ন্তীপুরে পাঠানো হবে না।

বয়কট কার্যকর হলে রাজধানী জয়ন্তীপুর ও জৈন্তিয়া সমতলে বড় ধরণের সংকট দেখা দিল। জৈন্তিয়া সমতল পাহাড়ি দ্রব্যের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। তিন বছর ধরে বয়কট চালু থাকার পর পাহাড়ি খাদ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন

পণ্যসামগ্রীর অভাবে সমতলবাসী অতিষ্ঠ হয়ে গেল। সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য তারা পথ খুঁজতে লাগল।

এদিকে লক্ষ্মী সিংহ ভেবে দেখলেন, রাজা হওয়ার এটিই মোক্ষম সময়। রাজ্যের অচলাবস্থা দূর করার জন্য এটিই সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে হল তাঁর। সমতলেও রাজা বিজয় সিংহকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন ষড়যন্ত্র শুরু হল। সমতলের দশ রাজের সরদারগণ গোপনে মিলিত হলেন। পাহাড়িদের মনোভাব বোঝার জন্য তারা পাহাড়ে দূত পাঠালেন।

দূত ফিরে এসে জানাল, রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা গেলে পাহাড়িরা বয়কট তুলে নেবে। এবার দশরাজের সরদারগণ গোপন পরিকল্পনা মোতাবেক রাজার বাড়িতে গেলেন। তারা রাজাকে জানালেন যে, প্রজাদের আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে তারা একটি নৌকা দৌড়ের আয়োজন করতে চান। এই উৎসবে রাজাকেও অংশ নিতে হবে। রাজা সানন্দেই এই প্রস্তাবে রাজি হলেন।

উৎসবের দিন-ক্ষণ ঠিক হলো। নির্দিষ্ট দিনে জৈন্তিয়া পাহাড়ের ঠিক পাদদেশে অবস্থিত কেন্দ্রি বিলে নৌকা দৌড়ের আয়োজন করা হল। গোপন পরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্মী সিংহ নৌকায় করে কেন্দ্রি বিলে উপস্থিত হলেন। এদিকে রাজাও তাঁর মন্ত্রীদেরকে নিয়ে বড়কুওরীর কাছে বিদায় নিয়ে কেন্দ্রি বিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

বড়কুওরী রাজাকে নৌকায় চড়তে মানা করেছিলেন। কিন্তু রাজা সেকথা শুনলেন না। লোকজনের অনুরোধে তিনি একটি নৌকায় চড়ে বসলেন। নৌকাটি দৌড়ে অংশ নিল। আরেকটি নৌকার সাথে রাজার নৌকাটির প্রতিযোগিতা শুরু হল। কিন্তু মাঝবিলে পৌঁছার পর হঠাৎ করে রাজার নৌকাটি ডুবে গেল। হতভাগ্য রাজা সাতার জানতেন না।

তাই অন্য লোকজন সাতরে বিলের পারে চলে গেলেও রাজা পানিতে ডুবে গেলেন। বিলের পানিতে সলিল সমাধি হল তাঁর। রাজার মৃত্যু নিশ্চিত হলে লক্ষ্মী সিংহের নৌকাটি জয়ন্তীপুরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রজাদের ব্যাপক আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে লক্ষ্মী জয়ন্তীপুরের রাজদরবারে পৌঁছলেন। রাজ্যের সকল সরদার, আমলা-মন্ত্রীগণ এবং সেনাপতিও এসে উপস্থিত হলেন।

লক্ষ্মী সিংহ বাইশ রাজকে সালাম জানালেন। বাইশ রাজের সরদারগণ তাকে সিংহাসনে আরোহনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী সিংহাসনে বসলেন না।

তিনি খাদনলস্করের বংশধরের খোঁজে একজন মাঝি ও তিনজন মাতব্বরকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা চতুলস্থ খাদনলস্করের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন সোনাধন নামে তাঁর একটি অল্পবয়সী পুত্রসন্তান রয়েছে।

তারা খাদনলস্করের স্ত্রী অর্থাৎ সোনাধনের মাকে বললেন, রাজার হুকুমে সোনাধনকে জয়ন্তীপুরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সোনাধনের মা এতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "সোনাধন আমার একমাত্র সন্তান। তোমরা তাকে কেন জৈন্তাপুরে নিয়ে যেতে চাও? লস্করকে হত্যা করেও কি তোমাদের আশা পূরণ হয়নি? সোনাধনকে আমি কোনভাবেই রাজবাড়িতে যেতে দিব না।"

মাঝি এবং মাতব্বররা দীর্ঘ সময় নিয়ে সোনাধনের মাকে সব কিছু খুলে বললেন। এতে তিনি রাজি হলেন। সোনাধনকে তাদের সঙ্গে যেতে দিলেন। এমনকি রাজার জন্য উপহারস্বরুপ এক ছড়া সুপারিও সঙ্গে দিলেন। রাজা সোনাধনকে দেখে খুবই খুশী হলেন। তাকে কোলে করে নিয়ে তিনি সিংহাসনে বসলেন।

সিংহাসনে বসে রাজা বাইশ রাজের উদ্দেশ্যে বললেন, "এই সোনাধনকে আমি সারাজীবন পুত্রের মতো সযতনে লালন-পালন করব।" এই ঘোষণা দিয়ে রাজা সভা ভেঙ্গে দিলেন। সবাই যার যার মতো বাড়ি চলে গেলো। প্রচুর টাকা-পয়সা সঙ্গে দিয়ে সোনাধনকেও বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।



চিত্রঃ বড়চতুল গ্রামে অবস্থিত সোনাধনের বাড়ি

এরপর রাজা সোনাধনের বাড়িতে পাকা দালান নির্মাণ ও পুকুর খননের নির্দেশ দিলেন। রাজার নির্দেশমতো সবকিছু তৈরী হলো। এতে সোনাধনের মন খুশীতে ভরে উঠল। সে নিশ্চিন্তমনে জয়ন্তীপুর ও চতুলের মধ্যে যাওয়া আসা করতে লাগল। যেখানে তার ভালো লাগতো সেখানেই সে থাকতো। এভাবে দিন যেতে লাগল।

একদিন প্রচণ্ড গরমের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে সোনাধন জয়ন্তীপুরের পুকুরে হাত মুখ ধুতে গেল। এমন সময় পুকুর ঘাটে এসে বসল বড়দলই বাজিত খা-র কন্যা মানিক বি। বাজিত খা ছিলেন রাজ্যের সেনাপতি এবং জাতিতে একজন ব্রাহ্মণ। সেনাপতির কন্যা 'ছুরতরী ব্রাহ্মণ' মানিক বি-র পুকুর ঘাটে অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য্য ছিল না।

সে সোনাধনকে প্রচণ্ড অপমান করে বলল, "বাঙালির পুতের জ্বালা আর সহ্য হয় না। ঘাট জুড়ে বসে আছিস। এতক্ষণেও ছাড়ছিস না। স্নান করতে এসে এতো বেলা হয়ে গেলো। রাজার সামান্য কৃপায় তোর মনে এতো গর্ব হয়ে গেছে যে, আমাকে তাচ্ছিল্য করছিস। নয়া রাজপুত্র হয়েছিস তুই।"

এসব কটু কথা শুনে সোনাধন মনে প্রচণ্ড ব্যাথা পেলো। অবিলম্বে সে রাজার কাছে গিয়ে বলল, "বাপ ঠাকুর, আজ থেকে আমি আর জৈন্তাপুরে আসব না। এতো অপমাণ প্রাণে সহে না। আমি বাড়ি চলে যাব। আমি এখন বিদায় চাই।" রাজা বললেন, "বাছা সোনাধন। আগে আমাকে খুলে বল, কেন এতো দুঃখী হয়েছ? আমি এর বিচার করব। তোমাকে ব্যাথা দেয় এমন সাধ্য কার আছে?"

সোনাধন সবকিছু খুলে বলল। শুনে মহারাজ মনে প্রচণ্ড ব্যাথা পেলেন। পরের দিন দরবারে গিয়ে তিনি সোনাধনের ঘটনা খুলে বললেন। দরবারের আমলাগণ সবকিছু শুনে পণ করলেন, সেনাপতির কন্যার সাথে সোনাধনের বিয়ে দিতে হবে। তারা রাজাকে পরামর্শ দিলেন, "আজ বাজিদ খা দরবারে এলে তাকে বেয়াই বলে সম্বোধন করবেন।"

এরপর বাজিত খা-র কাছে পাইক পাঠিয়ে তাকে দ্রুত দরবারে আসতে বলা হল। বাজিত খা দরবারে ঢুকতেই রাজা বলে উঠলেন, "বেয়াই, আজ এতো দেরী হলো কী কারণে?" বাজিত খা বললেন, "আমি তো ব্রাহ্মণ হে রাজা,

আমাকে বেয়াই বলে ডাকছেন কেন?" একথা শুনে রাজা প্রচণ্ড রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

রাজা বাজিত খা-কে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। বাজিত কন্যা মানিক বি সুন্দরীকেও দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এ সংবাদ শুনে বাজিত খা-র স্ত্রী তাঁর কন্যাকে ধরগাম পুকাশে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। রাজার আদেশে পেয়াদারা বাজিত খা-কে বন্দী করল বটে কিন্তু তাঁর বাড়িতে গিয়ে কন্যাকে পেল না।

অনেক খুঁজাখুঁজি করেও কন্যাকে না পেয়ে তারা রাজার কাছে ফিরে এলো। অবশেষে জানা গেল, কন্যা পুকাশে আছে। রাজা বেশ কিছু লোক-লস্কর সঙ্গে দিয়ে সোনাধনকে পুকাশে পাঠিয়ে দিলেন। সোনাধন পুকাশে পৌঁছে দলই কন্যার মামাকে বলল, অবিলম্বে ভাগিনীকে সমর্পন করুন। নিরুপায় হয়ে মামা তা-ই করলেন।



চিত্রঃ সোনাধনের বাড়ির অভ্যন্তরভাগ

সোনাধন এবং তার লোকজন খুশী মনে মানিক বিকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্তীপুরে ফিরে এলো। জয়ন্তীপুরের সভাজন সিদ্ধান্ত দিলেন, সোনাধনের সঙ্গে মানিক বি-র বিয়ে হবে। যেই কথা সেই কাজ। তাড়াতাড়ি মোল্লা এনে ইসলামী রীতি মোতাবেক উভয়ের বিবাহ সম্পাদন করা হলো। সোনাধন স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরল এবং সুখে শান্তিতে সংসার করতে থাকল।

কিন্তু বাজিত খা-র মনে কোন শান্তি ছিল না। তিনি দিবানিশি প্রতিশোধের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর মুখে কোন হাসি ছিল না; দরবারে হাজির হতেন গোমড়া মুখ নিয়ে। এভাবেই দিন যাচ্ছিল। এরমধ্যে হঠাৎ করে একদিন নবাবী সৈন্যদের* হাতে জৈন্তিয়া আক্রান্ত হলো। জৈন্তিয়ার সাতবাক চলে গেল তাদের হাতে। সেখানকার মনিপুরের টিলায় তারা কেল্লা নির্মাণ করল।

নবাবী সৈন্যদের ভয়ে লোভা নদীর মুখের নিকটস্থ চরিপাড়া মৌজার লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলো। এসব খবর শুনে রাজা বাজিত খা-কে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন। কিন্তু বাজিত খা বললেন, তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি এই কাজের উপযুক্ত নন। সোনাধনই এখন এই কাজের জন্য উপযুক্ত।

একথা যখন সোনাধনের কানে গেল, সে সাহসের সঙ্গে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অনুমতি চাইল। রাজা তাকে একাজে নিষেধ করলেন। কিন্তু সোনাধন নাছোড়বান্দা। অবশেষে তাকেই যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। লোক-লস্কর নিয়ে সে লোভার উজানে পৌঁছল। কিন্তু কোন যুদ্ধ হল না। বুদ্ধি দিয়েই সোনাধন প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে দিল।

সোনাধনের বুদ্ধিতে লোভার উজান থেকে রাতের বেলা হাজার হাজার প্রদীপ ভাসিয়ে দেওয়া হল। প্রতিপক্ষের লোকজন দূর থেকে দেখে ভাবল রাজার সৈন্যভর্তি হাজার হাজার নৌকা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। ভয়ে তারা কেল্লা ছেড়ে পালিয়ে গেল। সোনাধন খুশী মনে তার লোক-লস্কর নিয়ে জৈন্তাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বিজয়ীর বেশে সে জয়ন্তীপুরে প্রবেশ করতে চায়।

কিন্তু হায়! নিয়তির লিখন ছিল ভিন্ন। বাজিত খা-র ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তাকে পথিমধ্যেই আক্রান্ত হতে হল। সোনাধন জানতো না, যখন তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল তখন থেকেই বাজিত খা গোপনে তাদের সঙ্গী হয়েছিল। অতীতের অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য কৌশলে সোনাধনকে হত্যা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল।



চিত্রঃ সোনাধনের বাড়ির একটি নান্দনিক স্থাপনা

বিজয়ীর বেশে জয়ন্তীপুরে ফিরে যাওয়ার সময় সোনাধনের বাহিনী যখন দেবরা নদীর বাঁধে এসে পৌঁছল তখন রাত হয়ে গেছে। সেখানে তারা যাত্রাবিরতি করল। সোনাধন বিছানা পেতে আরাম করে শুয়ে পড়ল। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন এক পাটনীকে সঙ্গে নিয়ে বাজিত খা সোনাধনের কাছে গেল।

সে ঘুমন্ত সোনাধনকে দেখিয়ে পাটনীকে বলল, এই ছেলেটি রাজার শত্রু; একে হত্যা করলেই তোমার ভাগ্য খুলে যাবে। বোকা ডুম বাজিত খা-র কথায় বিশ্বাস করল। সে রাজার বখশিশ পাওয়ার লোভে জাটা দিয়ে ঘুমন্ত সোনাধনকে বিদ্ধ করে ফেলল। সোনাধনের চিৎকারে সবাই জেগে উঠল। তারা দেখল সোনাধন জাটাবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে আর হতবুদ্ধি হয়ে নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে এক পাঠনী।

জেরার মুখে সে স্বীকার করল, ঘটনাস্থলের পাশেই তার বাড়ি। সে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিল। বাজিত খা দলই গভীর রাতে তাকে ডেকে তোলে বুঝিয়েছে, রাজার শত্রু বাড়ির ধারেই ঘুমাচ্ছে। এই শত্রুকে বধ করা গেলে রাজার কাছ থেকে অনেক বড় বখশিশ মিলবে। এরপর ঘুমন্ত সোনাধনকে দেখিয়ে বাজিত খা চলে গেছে। বখশিশের লোভেই সে বিষাক্ত জাটা দিয়ে সোনাধনকে আঘাত করেছে।

পাটনীকে বন্দী করা হল। এদিকে সোনাধন বিষের জ্বালায় ছটফট করছিল। তাকে তড়িঘড়ি করে জয়ন্তীপুরে নিয়ে যাওয়া হল। তার অবস্থা দেখে রাজার মাথায় যেনো বাজ পড়ল। তিনি হায় হায় করে কাঁদতে লাগলেন। এরপর জানতে চাইলেন, সোনাধনের এই দশা কী করে হলো? তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলা হলো।

সবকিছু শুনে তাঁর মন বিষাদে ভরে গেলো। সোনাধনের কণ্ঠের কাছে জাটা গিথে ছিল। টান দিয়ে সেটি খুলা হল। কিন্তু সোনাধন আর বাঁচল না। তার প্রাণবায়ু উড়ে গেলো। রাজ্যজুড়ে বিষাদ নেমে এলো। রাজা সোনাধনের মৃতদেহকে দাফনের উদ্দেশ্যে বড় চতুলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তার দাফনের সময় প্রচুর লোকসমাগম হলো।

এদিকে সোনাধনের স্ত্রী মানিক বি পুরো ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বাক্যহারা হয়ে, মাথার চুল এলোমেলো করে সে বাপের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। মাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল, পিতা কোথায়? মা বললেন, বাজিত খা এখন ঠাকুর ঘরে। মানিক বি ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখল, বাজিত খা সেখানে মাথা নীচু করে বসে আছেন।

পিতাকে দেখতে পেয়ে মানিক বি প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল। বলছিড়া তোলে নিয়ে সে পিতার ঘাড়ে এক প্রচণ্ড কোপ বসিয়ে দিল। বাজিত খা মারা গেলেন। এবার মা ও কন্যা উভয়েই বিধবা হলেন। উভয়েই বিধবার পোষাক পরলেন।

জৈন্তিয়া রাজ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, সেনাপতি দলই নিজ কন্যার হাতে নিহত হয়েছেন। রাজা এই সংবাদ শুনে মনে মনে বললেন, উচিত বিচারই হয়েছে।

(এরপর আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। *চতুলের সোনাধনের কবিতা* এখানেই শেষ। কবিতায় বর্ণিত ঘটনাসমূহ জনপ্রিয় কাব্য-কাহিনী হিসেবে যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে প্রচলিত ছিল। ১৩৩৩ বাঙ্গলা সনে মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ কবিতাটি সংকলন করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় ১৯২৬ সালে কবিতাটি শ্রীহট্ট সুরমা প্রেসে মুদ্রিত হয়।)



চিত্রঃ সোনাধনের বাড়ির একটি ফটক

অধ্যায় একত্রিশ
সোনাধনের গীতের মূলকথা

বিংশ শতকের জৈন্তিয়া অঞ্চলে প্রচলিত গীতিকবিতাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল *সোনাধনের গীত*। এটি ছিল খুবই দীর্ঘ একটি কাব্য-কাহিনী। রাজা বিজয়নারায়ণের মৃত্যু, লক্ষ্মী সিংহের উত্থান এবং খাদনলস্কর ও সোনাধনের জীবনের নানান নাটকীয় ঘটনায় ভরপুর এই কাব্য কাহিনীটি এক বৈঠকে (গ্রাম্য কবিতা বা পুঁথি পাঠের আসর) পাঠ করা সম্ভব হতো না। সাধারণত, একজন কবি তিনটি বৈঠকে এই কাব্য-কাহিনীটি পেশ করতেন। জৈন্তিয়ার নিজপাট (সাবেক জয়ন্তীপুর) নিবাসী কানাই খলিফা নামক এক ব্যক্তি *সোনাধনের গীত* পাঠের জন্য বেশ বিখ্যাত ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁর কাছ থেকে এই গীতটি সংগ্রহ করেছিলেন বিশিষ্ট গবেষক রাজমোহন নাথ বি.ই. তত্ত্বভূষণ। এর কয়েক বছর পর, ১৯৪৭ সালে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় রাজমোহন নাথ পুরো কাব্য-কাহিনীটির সারাংশ তোলে ধরেছেন। 'গীতোক্ত কাহিনী' শীর্ষক এই সারাংশটি হুবহু নিম্নরূপ।

গীতোক্ত কাহিনী

গীতোক্ত কাহিনী আনুমানিক ১৭৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। জয়ন্তিয়া রাজ ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যাত্রানারায়ণ রাজা হন।[94] ইনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার এক কন্যা ও এক পুত্র ছিল। কন্যা জেষ্ঠ্যা কিন্তু অবিবাহিতা, কাজেই কনিষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ ভগিনীর প্রতিনিধিরূপে রাজ কার্য্য চালাইতে থাকেন।

পার্বত্য অঞ্চলের সাতপাথরপুঞ্জির (মতান্তরে নার্ত্তিয়াং পুঞ্জি) জাতাদলই (মতান্তরে উপাংদলই) নামক একজন খাসিয়ার পুত্র লক্ষ্মীসিংহ রাজবাড়ীর পার্শ্বের রাস্তা দিয়া জয়ন্তিয়ার বাজারে যাতায়াত করিত। রাজ-অন্তঃপুর হইতে বালককে দেখিয়া রাজকুমারী তাহার রূপমুগ্ধ হন। একদিন চারচক্ষুর মিলন

---

[94] সিলেটের প্রথম ব্রিটিশ কালেক্টর উইলিয়াম মেকপিস থেকারের একটি পত্র থেকে জানা যায় রাজা ছত্রসিংহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৭৭৪ সালে। তাই রাজমোহন নাথের দেওয়া সালটি সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

হওয়াতে বালকও রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হইল। দুর্গামালিনীর সহায়তায় লক্ষ্মীসিংহ রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীর সহিত মিলিত হয় এবং তদবধি উভয়ের মধ্যে গুপ্ত প্রেমের অভিনয় চলিতে থাকে। একদিন সারারাত রাজকুমারীর গৃহে কাটাইয়া প্রভাতে লক্ষ্মীসিংহ দুর্গার গৃহে চলিয়া আসিবার সময় রাজ দরবারের একজন দলইর দৃষ্টিতে পতিত হয়। রাজার অনুগ্রহ লাভের আশায় দলই ভগিনীর কলঙ্কের কথা রাজার নিকট প্রকাশ করে।

রাজকুমারী বয়স্কা। উপযুক্ত যুবকের প্রেমমুগ্ধ হইয়া বিবাহ করা খাসিয়া বা ছিন্টেংদের মধ্যে দোষণীয় নহে। কিন্তু রাজপরিবারে ইহা রীতিবিরুদ্ধ। উপযুক্ত রাজবংশীয় যুবককে নির্বাচিত করিয়া কতদিন রাজধানীতে রাখা হয় এবং এখানে তাহাকে শিক্ষা দিক্ষা দিয়া ক্ষত্রিয়োচিত বিধানানুসারে পরে রাজকুমারীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে একজন অজ্ঞাত কুলশীল পার্বত্য খাসিয়ার সহিত গুপ্তপ্রেম করা কুলের কলঙ্ক বিবেচনা করিয়া রাজা ভগিনীর প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সুবিবেচক মন্ত্রী রাজাকে বাধা দিলেন। সত্য মিথ্যা নিজে বিচার না করিয়া এরূপ হঠকারিতার সহিত কাজ করিলে নিজেরই কলঙ্ক হইবে। কাজেই মন্ত্রী বুদ্ধি দিলেন, রাজবাড়ীর চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত করা হউক। লক্ষ্মীসিংহকে ধরিতে পারিলে চোর অপবাদে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে। রাজকুমারীর কোনও অপবাদ হইবে না।

এ রাত্রে আবার লক্ষ্মীসিংহ বড়কুমারীর গৃহে আসিয়াছেন। সারারাত্র প্রমোদ ক্রীড়ার পর শ্রান্ত হইয়া উভয়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখা গেল বেলা হইয়া গিয়াছে। তখন আর গোপনে পলায়ন করিবার উপায় নাই। কাজেই রাজকুমারী প্রেমিককে পোটরাতে পুরিয়া মাচানে লুকাইয়া রাখিলেন। রাজার গুপ্তচর সমস্তই লক্ষ্য করিল। এবার রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে কাঠের গড় বান্ধিয়া রাজ্যের সামন্তদিগকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। চতুল অঞ্চলের সামন্ত মুসলমান কুলতিলক কাদন লস্কর রাজার খুব বিশ্বাসের পাত্র। তাহাকেই পাহারা কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। রাজার হুকুম- যাহার অঞ্চল দিয়া চোর পলায়ন করিবে, জয়ন্তেশ্বরীর সম্মুখে তাহাকে বলি দেওয়া হইবে।

গুপ্তচর রাজকুমারীর নিকট এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ বহন করিল। রাজকুমারী কাধন লস্করকে সংবাদ দিয়া অন্তঃপুরে নিলেন এবং তাঁহাকে ধর্মের ভাই

সম্বোধন করিয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাজকুমারী কাধন লস্করকে অর্থ উপহার দিতে চাহিলে উন্নত হৃদয় লস্কর উহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় সুবিবেচক লস্করের অজ্ঞাত ছিলনা। তিনি আশ্বাস দিলেন, লক্ষ্মীসিংহকে নিরাপদে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

কাধন লস্কর তামাকের সহিত আফিম মিশ্রিত করিয়া প্রহরীদিগকে রাজদত্ত উপহারস্বরূপে প্রদান করিলেন। প্রহরীরা সানন্দে ধূম্রপান করিয়া নেশার ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। শুধু কাধন লস্কর জাগ্রত এবং তাহার সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। পূর্বের নির্দেশমতো লক্ষ্মীসিংহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি লক্ষ্য করিয়া কাধন লস্করের অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন এবং কাঠের গড় উত্তোলন করিয়া সেইদিকেই নির্গত হইয়া গেলেন। নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া মূর্খ লক্ষ্মীসিংহ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সেই চিৎকার শুনিয়া প্রহরীরা জাগিয়া উঠিল। সকলেই লক্ষ্য করিল কাধন লস্করের সীমানার মধ্যে গড়ের খুঁটি উত্তোলিত এবং চোর ঐদিকেই পলায়ন করিয়াছে।

কাধন লস্করের বিচারঃ রাজার নিকট অভিযোগ করা হইল কাধন লস্করের অঞ্চলেই চোর পলায়ন করিয়াছে। সুতরাং রাজাজ্ঞা অনুসারে কাধন লস্করকে প্রাণদণ্ড দিতে হইবে। রাজা বিপদে পড়িলেন। কাধন লস্কর পিতার দিন হইতে বিশ্বস্থ বন্ধু এবং বর্তমানে সকল প্রহরীদের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপরই ন্যাস্ত ছিল। রাজা বলিলেন, গড়ের খুঁটি উত্তোলন করিতে বা চোর পলায়ন করিতে কেহ নিজ চক্ষে দেখিয়াছে কি না। ইহা কেহই প্রত্যক্ষভাবে দেখে নাই। কাজেই কাধন লস্করকে সাক্ষীর অভাবে শাস্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য সামন্তরা শুধু রাজার আজ্ঞার দোহাই দিল। রাজাজ্ঞা প্রচার করিবার সময় সাক্ষীর কথা ছিল না। শুধু কথা ছিল যাহার সীমানা দিয়া চোর পলায়ন করিবে তাহারই প্রাণদণ্ড হইবে। কাধন লস্কর নিজপক্ষ সমর্থন করিলেন না। কোনরূপ আপত্তিও উত্থাপন করিলেন না। নিরূপায় হইয়া দুঃখীত হৃদয়ে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া রাজা বিজয় সিংহ কাধন লস্করের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

যথারীতি স্নানাদি করাইয়া কাধন লস্করকে জয়ন্তেশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে বলির মঞ্চে তোলা হইল।[95] এমন সময় সংবাদ আসিল পূর্বরাত্রে কাধন লস্করের প্রথম পুত্রসন্তান জাত হইয়াছে।[96] পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইবার কথা। রাজা গলবস্ত্র হইয়া সামন্তদিগের অনুমতি চাহিলেন, লস্কর একবার গৃহে গিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিয়া আসুক। কিন্তু বিধানের জের, চণ্ডীর থালায় (ফাঁসিকাষ্ঠে) একবার তুলিয়া আবার নামানো যাইতে পারে না। আবার একবার নামাইলে আবার তুলিতে পারা যায় না। রাজার হৃদয়ে দারুণ তোলপাড় চলিতে লাগিল। রাজা জোর করিয়া হুকুম দিতে চাহিলেন। কিন্তু সামন্তরা ক্ষেপিয়া উঠিল। রাজা যদি নিজের বিধান নিজে অমান্য করেন তাহা হইলে রাজবাড়ীতে আর কেহই আসিবে না। পরিস্কারভাবে বুঝা গেল, রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিবে। অগত্যা কাধন লস্করের প্রাণদণ্ড হইল।

---

[95] 'জয়ন্তেশ্বরীর মন্দির' বলতে লেখক জৈন্তেশ্বরী বাড়িটিকে বুঝিয়েছেন। এই বাড়িটি ছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজের জন্য নির্ধারিত একটি জায়গা। প্রশাসনিক দপ্তর, জেল-হাজত, বলির পাঠাতন প্রভৃতি স্পর্শকাতর স্থাপনাসমূহকে এর ভেতরে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই বাড়িটি জয়ন্তেশ্বরী দেবীর পীঠস্থান নয়। তাই এখানে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়ার কোন প্রচলন ছিল না। জৈন্তিয়ার রাজসভায় যেসব অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড বা বলির জন্য সাব্যস্ত করা হতো তাদেরকে জৈন্তেশ্বরী বাড়ির অভ্যন্তরে (বলির পাঠাতনে) এনে বলি বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। এটি ছিল স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় বিচারকাজেরই অংশ (বলি উৎসব নয়)। জৈন্তেশ্বরী বাড়িটি 'বলি দেওয়ার স্থান' হলেও তা 'জয়ন্তেশ্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার স্থান' ছিল না। জয়ন্তেশ্বরীর পীঠস্থান ছিল জৈন্তিয়ার অন্য দুটি জায়গায়। এগুলো হল- নারতিয়াং দূর্গা মন্দির ও ফালজুরের বামজঙ্ঘা মহাপীঠ। এসব পীঠস্থানে প্রতি বছর দু-একজন অপরাধীকে নিয়ে বলি দেওয়া হতো। জৈন্তিয়ার রাজধানীতে অবস্থিত জৈন্তেশ্বরী বাড়ির সাথে এই বলির কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই লেখকের 'জয়ন্তেশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে বলির মঞ্চে তোলা হইল' কথাটি ভ্রমাত্মক।

[96] ওই দিনে কাধনলস্করের প্রথম পুত্রসন্তান অর্থাৎ সোনাধনের জন্মের ব্যাপারটি একপ্রকার অতিরঞ্জন বলেই মনে হয়। এর কারণ, লক্ষ্মী সিংহ মাত্র এক বছরের কম-বেশী সময় (১৭৮৮-৮৯ সাল) ক্ষমতায় ছিলেন। সোনাধনের গীত এবং চতুলের সোনাধনের কবিতার বর্ণনা অনুযায়ী, লক্ষ্মীসিংহের আমলে সোনাধন একজন সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাই এটি ধরে নেওয়াই উচিত হবে যে, লক্ষ্মীসিংহ যখন জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় বসেন তখন সোনাধন একজন অল্পবয়সী তরুণ ছিলেন।

ক্ষুদ্ধা প্রেমিকা: রাজকুমারীর নিকট সংবাদ গেল, তাহার ধর্ম্মের ভাই কাধন লস্করকে তাহার ভ্রাতা চণ্ডীর থালায় বলি দিয়াছেন। ক্ষুদ্ধা প্রেমিকার হৃদয় প্রতিশোধের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। মনাই ডোমের সহিত পরামর্শ করা হইল রাজাকে বধ করিতে হইবে। টাকার লোভে মনাই ডুম একদিন রাজকে হাওরের মধ্যে একা কোড়াপক্ষী শিকার করিতে লইয়া গেল এবং সেখানে কৌশলে নৌকা ডুবাইয়া রাজাকে বধ করিল। কেন্দ্রিহাওর বিলের একটি চরে অদ্যাপিও বিজয় সিংহ মহারাজের ইষ্টক নির্ম্মিত স্মৃতিমন্দির জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

নূতন রাজা: এবার রাজ্যের ভার রাজকুমারীর হাতেই পড়িল এবং কালে লক্ষ্মীসিংহের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। কিন্তু সিংহাসনারোহণ করিবার পূর্বে লক্ষ্মীসিংহ তাঁহার প্রাণদাতা কাধন লস্করের শিশু পুত্রকে আনাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং কাধন লস্করের বাড়ীতে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কাধনের শিশুপুত্র সোনাধন লস্কর আবার চতুলের সামন্ত রাজা হইলেন। কিন্তু রাজবাড়ীতেই তিনি অধিকাংশ সময় থাকিতেন।



চিত্র: বড়চতুল গ্রামে অবস্থিত সোনাধনের বাড়ি

সোনাধনের বিবাহ: রাজপুরীর সন্নিকটে বাজিত খাঁ দলইর সুন্দরী যুবতী কন্যা বখতার সোনাধনের প্রেমমুগ্ধা। পুস্করিণীর ঘাটে উভয়ের দেখা হয়। কিন্তু সোনাধন বখতারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয় না। একদিন ক্ষোভে বখতার সোনাধনকে কটু কথা শুনাইয়া দিল। সোনাধন রাজা-রাণীর নিকট অভিযোগ করিল। ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া রাজা সোনাধনের সহিত বখতারের বিবাহ দিতে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মুসলমানের সহিত কন্যাকে বিবাহ দিতে বাজিত রাজী হইলেন না। বরঞ্চ কটু কথা শুনাইয়া দিলেন। ক্রোধভরে লক্ষ্মীসিংহ বাজিত খাঁ দলইর বাড়ীতে সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন জোর করিয়া বখতারকে আনিবার জন্য। বাজিত খাঁ-ও সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় দলে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন বখতার চুপে চুপে রাজার প্রেরিত পাল্কিতে উঠিয়া রাজবাড়ী চলিয়া আসিল। ক্ষুদ্ধ বাজিত খাঁ অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া গেলেন। সোনাধন লস্করের সহিত বখতার খাসিয়ানীর মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

ক্ষুদ্ধ পিতার প্রতিশোধ: একবার মণিপুরের রাজার সহিত ব্রহ্মদেশের রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং ব্রহ্মরাজ জয়ন্তিয়া-রাজের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সোনাধন লস্কর সৈন্য-সামন্ত লইয়া ব্রহ্মরাজের সাহায্যের জন্য চলিয়া গেলেন এবং সেখানে কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। কিন্তু অনেকদিন ধরিয়া সোনাধনের কোন খবর বার্ত্তা না পাওয়াতে রাজা ও রাণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং সোনাধনের খবর লইবার জন্য লোক-লস্করসহ বাজিত খাঁকে পাঠাইয়া দিলেন।

এবার বাজিত খাঁর সুযোগ মিলিল। মুখে বলিলেন, জামাতার অনুসন্ধান করা তাহার কর্তব্য। কিন্তু হৃদয়ের গোপন কোণে তাঁহার প্রতিহিংসার আগুন তোষানলের মত জ্বলিতেছিল। নির্দিষ্ট দিনে সৈন্য সামন্ত লইয়া সোনাধনের অনুসন্ধানে বাজিত খাঁ রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, আনিল পর্বতের পূর্বদিকে গৃহাভিমুখী সোনাধনের বিশ্রামের ছাউনী পড়িয়াছে। বাজিত খাঁ পর্বতের পশ্চিম সানুদেশে নিজের বিশ্রামের ছাউনী পাতিলেন। নিজের বিশ্বস্ত দুই মল্ল তিলাই ও মালাইর সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া শেষ রাত্রে বাজিত খাঁ দুই সহচরসহ বর্শাহাতে সোনাধনের ছাউনীতে প্রবেশ করিলেন। সুযোগও মিলিল। শেষরাত্রে সোনাধনের সৈন্যরা শিকার করিতে চলিয়া গিয়াছে। সোনাধন মাত্র একা ঘরে নিদ্রিত। এই সুযোগে তিলাই ও মালাই তীক্ষ্ণ বর্শা নিদ্রিত সোনাধনের বুকে বিদ্ধ করিয়া পালাইয়া আসিল।



চিত্রঃ সোনাধনের বাড়ির একটি নান্দনিক স্থাপনা

শেষবিচারঃ বাজিত খাঁ বড়দলই ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট আবেদন করিলেন, সাতদিন ঘুরিয়াও সোনাধনের কোনও খবর পাওয়া গেল না। রাজা দুঃখিত হইলেন। ব্রহ্মদেশ প্রবাসী সোনাধনের খবর করিতে গিয়া সাতদিন পরে ফিরিয়া আসার কোনও যুক্তি নাই। প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মদেশে যাওয়া উচিত ছিল। পরদিন সোনাধনের সৈন্যেরা বর্শাবিদ্ধাবস্থায় প্রভুর মৃতদেহ রাজার সম্মুখে

উপস্থিত করিয়া তাহাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিল। রাজার সন্দেহ হইল ইহা বাজিত খাঁর কর্ম্ম এবং রাজ্যের অন্যান্য সামন্তেরাও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় রাজার অনুমান সত্য বলিয়া মত দিল।

মৃত স্বামীর রক্তাক্ত দেহ সম্মুখে দেখিয়া ও পিতাই স্বামীহন্তা জানিতে পারিয়া বখতার ক্রোধে উন্মাদিনীর ন্যায় একহাতে একখানা খড়গ ও অপর হাতে একগাছি রশি লইয়া পিতার নিকট ছুটিয়া গেল এবং রশি দিয়া জড়াইয়া পিতাকে রাজবাড়ীর দরজার সম্মুখে আনিয়া খড়গ দ্বারা তিনখণ্ড করিয়া ফেলিল। উন্মাদিনী চীৎকার করিয়া বলিল, "এই স্বামী হত্যার প্রতিশোধ। আজ মা ও ঝি একসঙ্গে বিধবা। আমরা একসঙ্গেই থাকব।"

অধ্যায় বত্রিশ
দ্বিতীয় রামসিংহের শাসনামল

(১৭৯০ সাল – ১৮৩২ সাল)

জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় সিংহাসনে ছিলেন রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ। তিনি একাধারে ৪২ বছর জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। রাজা বিজয়নারায়ণের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি ১৭৯০ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন।[97] রাজা বিজয়নারায়ণকে হত্যার পর যদি লক্ষ্মী সিংহ সিংহাসনে না বসতেন তাহলে দ্বিতীয় রামসিংহের শাসনকাল হয়তো আরও এক বা দুই বছর দীর্ঘ হতো। লক্ষ্মী সিংহ জৈন্তিয়ার কোন নিয়মতান্ত্রিক রাজা ছিলেন না। তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়ে জৈন্তিয়ার সিংহাসন দখল করেছিলেন। এজন্য এডওয়ার্ট গেইটসহ কিছু ঐতিহাসিক তাকে জৈন্তিয়ার রাজা হিসেবে গণ্য করেননি। তাঁর শাসনকালও তেমন দীর্ঘ ছিল না।

সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, লক্ষ্মী সিংহের শাসনকাল ১৭৮৮ সাল থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও মনে করেন, তাঁর শাসনকাল দু-এক বছরের বেশি দীর্ঘ ছিল না। উত্তরাধিকার বহির্ভুত উপায়ে সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হলেও তিনি বেশিদিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। রাজপরিবারের সদস্য বা উত্তরাধিকারী না হওয়ায় লক্ষ্মী সিংহকে জৈন্তিয়াবাসী মেনে নিতে চায়নি। এজন্য ক্ষমতা দখলের কিছুদিন পর রাজা বিজয়নারায়ণের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় রামসিংহের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের পুঞ্জিতে (নারতিয়াং) ফিরে গিয়েছিলেন। রামসিংহের ক্ষমতারোহণের মধ্য দিয়ে জৈন্তিয়ার চিরায়ত উত্তরাধিকারের নিয়মটি আবারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এক. ১৭১২ শকাব্দের সিকিমুদ্রা ও পূর্ণমুদ্রা

[97] *১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টের* সূত্র ধরে স্যার এডওয়ার্ড গেইট দাবি করেছেন, রামসিংহ ১৭৮৯ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে, রামসিংহ ১৭৯০ সালে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। রামসিংহের নামাঙ্কিত মুদ্রার সূত্র ধরেই তারা এমন দাবি করেছেন।

জৈন্তিয়ার রাজারা সাধারণত নিজেদের নামে মুদ্রা চালু করতেন না। মুদ্রার গায়ে রাজাদের নামের স্থলে রাজধানীর নাম লিখা থাকতো। জৈন্তিয়ার রাজধানীর নাম ছিল জয়ন্তাপুর বা জয়ন্তীপুর। মুদ্রার গায়ে রাজাদের নামের স্থলে লেখা থাকতো 'জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য'। পুরন্দর শব্দের অর্থ রাজা আর 'জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য' কথাটির অর্থ হল 'জয়ন্তাপুরের রাজা'। জৈন্তিয়ার সকল পূর্ণমুদ্রা বা কাটরা টাকার গায়ে এই কথাটি লিখা ছিল। ব্যতিক্রম হল সিকিমুদ্রাগুলো। সিকিমুদ্রাগুলোর গায়ে এই কথাটি লিখা থাকতো না। এর স্থলে রাজাদের নাম ও উপাধি লিখা থাকতো। ঐতিহাসিকরা মাত্র দুজন রাজার আমলের সিকিমুদ্রার সন্ধান পেয়েছেন। এরা হলেন- রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁই এবং রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ।



চিত্র: রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের চালু করা মুদ্রা (কাটরা টাকা)। মুদ্রার এক পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী শিবচরণকমল মধুকরস্য। অপর পাশে লেখা রয়েছে: শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক **১৭১২**।

জৈন্তিয়ার ইতিহাসের অত্যন্ত প্রভাবশালী এই দুই রাজার শাসনকাল ছিল অন্যান্য রাজাদের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। অন্যান্য রাজাদের আমলের শুধু পূর্ণমুদ্রা পাওয়া গেলেও এই দুই রাজার আমলের পূর্ণমুদ্রা এবং সিকিমুদ্রা দুটিই পাওয়া গিয়েছে। অতিদীর্ঘ শাসনকাল হওয়ায় তারা হয়তো মুদ্রার অভাব বা সংকট দূর করার জন্য পূর্ণমুদ্রা চালুর দীর্ঘদিন পরে সিকিমুদ্রা চালু করেছিলেন। কিন্তু তাদের আমলের পূর্ণমুদ্রা আর সিকিমুদ্রার গায়ের সাল একই। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, সিকিমুদ্রা পরে চালু হলেও তারা তাদের সিংহসনারোহণের বছর উল্লেখ করেই তা চালু করেছিলেন (চালু করার বছরের স্থলে)। এজন্য

পূর্ণমুদ্রা আর সিকিমুদ্রার গায়ের সালে কোন পার্থক্য থাকেনি। রাজা রামসিংহের চালু করা পূর্ণমুদ্রা ও সিকিমুদ্রার গায়ের লেখা নিম্নরূপ।

১৭১২ শকাব্দের পূর্ণমুদ্রা
এপিঠ: শ্রীশ্রী জয়ন্তাপুর পুরন্দরস্য শক ১৭১২
ওপিঠ: শ্রীশ্রী শিবচরণ কমল মধুকরস্য

১৭১২ শকাব্দের সিকিমুদ্রা
এপিঠ: শ্রীশ্রী রামসিংহ নৃপবরস্য
ওপিঠ: শক ১৭১২

দুই. রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধি নির্মাণ

দ্বিতীয় রামসিংহ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে আরোহনের পর পরই তাঁর মামার সমাধি নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তাঁর মামা অর্থাৎ রাজা বিজয়নারায়ণ বা বিজয় সিংহকে সমাহিত করা হয়েছিল কেন্দ্রিবিল ও ডিবির হাওরের মধ্যবর্তী একটি টিলার ওপর। রামসিংহ সেখানে একটি দৃষ্টিনন্দন সমাধিসৌধ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আনুমানিকভাবে, ১৭৯০-৯১ সালে এই সৌধটির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিল। সৌধটি এতোটাই মজবুত করে নির্মাণ করা হয়েছিল যে, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পেও তা ভেঙ্গে পড়েনি। বর্তমানেও এটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। জৈন্তিয়ার রাজাদের হাতে নির্মিত যেসব স্থাপনা আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৬ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট। কেন্দ্রিবিল এবং এর আশেপাশের বিলগুলো বর্তমানে 'শাপলা বিল' নামে পরিচিত। এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যেসব পর্যটক এখানে ঘুরতে আসেন তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধিসৌধটিও পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু এর ইতিহাস জানা না থাকায় তারা এটিকে একটি মন্দির বলেই ধারণা করেন।



চিত্রঃ রাজা বিজয়নারায়ণ সিংহের সমাধি

তিন. ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ (১৭৯৭ সাল)

দ্বিতীয় রামসিংহের আমলে জৈন্তিয়া রাজ্যে বেশ কিছু স্থাপনা গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দির। রাজা রামসিংহ এই মঠ বা মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন ১৭৯৭ সালে। ভূমি থেকে প্রায় ৪০০ হাত উঁচুতে নির্মিত এই মন্দিরটি ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর স্থাপনা। রাজা রামসিংহ কেন এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন তার কারণ জানা যায় একটি শিলালিপি থেকে। শিলালিপিটি হচ্ছে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্মারক। এতে বলা হয়েছে, "রাজা রামসিংহ নিজের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং পাপ মোচনের উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।" শিলালিপিতে আরও বলা হয়েছে, রাজা যেখানে মন্দির নির্মাণ করেছেন সেখানে আগে থেকেই শিবের পূজা হতো।



চিত্র: ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের প্রধান ফটক

মন্দিরটির অবস্থান হচ্ছে জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ঢুপি গ্রামের একটি পাহাড়ের মাথায়। বর্তমানে এই পাহাড়ের নিচেই রয়েছে সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক। সিলেট শহর থেকে জৈন্তাপুর উপজেলা সদরে যাওয়ার পথে সারী নদী পার হলেই পাহাড়টি দেখা যায়। সারীঘাট সেতু পার হওয়ার পর হাতের ডানপাশে এর দেখা মেলে। বর্তমানে এটি ঢুপির পাহাড় নামেই পরিচিত। তবে অতীতে এই পাহাড়ের একটি আলাদা নাম ছিল। সেই নামের কথা জানা যায় একটি তাম্রলিপি থেকে। তাম্রলিপিটি হচ্ছে ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের জন্য দানকৃত সম্পত্তির দলিল। এতে বলা হয়েছে, "কপোত পাহাড়ের উপরে শ্রীল রামেশ্বর নামক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর এই মন্দিরের নিত্য পূজার জন্য রাজা রামসিংহ কিছু ভূমি দান করেন।"

তাম্রলিপিটি ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালের। এই লিপির ভাষ্য অনুযায়ী, রাজা রামসিংহ রামেশ্বর শিবলিঙ্গটিকে মন্দিরের ভেতরে স্থাপন করেছিলেন ১৭২০ শকাব্দে। কিন্তু শিলালিপিটির ভাষ্য অনুযায়ী, রাজা রামসিংহ মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন ১৭১৯ শকাব্দে। এই বেমিলের কারণ হয়তো লিপিকরদের অবহেলা বা ভুল। মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে তাম্রলিপিতে কিছু বলা হয়নি। তবে শিলালিপিতে বলা হয়েছে, "মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ১৭১৯ শকাব্দের শ্রাবণ কিংবা ফাল্গুন মাসে। পাহাড়ের চূড়ায় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে বৃক্ষ পরিবেষ্ঠিত স্থানে সৌধ আকারে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। রাজা এই মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন তা আগে থেকেই পূজিত ছিল।"

শিলালিপির পাঠ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঢুপির পাহাড়ের উপরের নির্জন পরিবেশে শিবলিঙ্গটি উন্মুক্তভাবেই পূজিত হতো। ধর্মপ্রাণ রাজা এটিকে সংরক্ষণের জন্য 'রামেশ্বর শিবমন্দির' বানিয়েছিলেন। বর্তমানে এই মন্দিরের ভিত্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মূল মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলেও মন্দির এলাকার দুটি ফটক এবং আরও কিছু স্থাপনা আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। মূল মন্দিরটি ছিল অনেক বড় ও উঁচু। তাই ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এটি ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে মন্দিরের ছোট স্থাপনাগুলো ভূমিকম্পের হাত থেকে অনেকটাই বেঁচে গিয়েছিল। মন্দির এলাকার দক্ষিণের ফটকটি কিছুটা হেলে পড়লেও আজও তা প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বের ছোট ফটকটিও একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

ভূমিকম্পের আগে মন্দিরের সুউচ্চ চূড়াটিকে ১০-১২ মাইল দূর থেকেও দেখা যেতো বলে শোনা যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হতো, এটি যেনো আকাশের গায়ে ভেসে আছে। পাহাড়ের উচ্চতার কারণেই চূড়াটিকে এতদূর থেকে দেখা যেতো। মন্দিরের আরেকটি জিনিস ছিল বেশ আকর্ষণীয়। এটি ছিল একটি বৃষ বা ষাড়ের মূর্তি। পাথরে নির্মিত এই মূর্তিটি এতোটাই নিখুঁত ছিল যে, দূর থেকে দেখলে এটিকে একটি সত্যিকারের ষাড়ের মতোই জীবন্ত মনে হতো। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই পাথরের ষাড়ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঐতিহাসিক শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী দাবি করেছেন যে, ষাড়ের মূর্তিটি মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের নিচেই আছে। ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে শিবলিঙ্গটিকে উদ্ধার করা হলেও ষাড়টিকে উদ্ধার করা হয়নি।



চিত্র: ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের প্রধান ফটক

ভূমিকম্পের পর ঢুপির পাহাড়ের আশেপাশের মানুষ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের ইট সংগ্রহ করতো। তাই ইটের স্তুপ কমে গিয়ে একসময় সামান্য দেয়ালসহ মন্দিরের ভিত্তিটির অবয়ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এক শ্রেণির মানুষ এখনও এখান থেকে ইট সরিয়ে নিচ্ছে। এমনকি গুপ্তধনের আশায় কেউ কেউ মন্দিরের ভিত্তিতে অযথা খুঁড়াখুঁড়িও করে থাকে। এসব অপকর্ম বন্ধ না হলে মন্দিরের ভিত্তিটি চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। মূল মন্দির ছাড়া অন্যান্য যেসব স্থাপনা আংশিক বা পূর্ণভাবে টিকে আছে সেগুলোও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। তা না হলে গুপ্তধনের আশায় কেউ এগুলোর

ক্ষতিসাধন করতে পারে। ঘন জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে চরম অবহেলায় পড়ে থাকা এসব স্থাপনা প্রাকৃতিকভাবেও বিনষ্ট হচ্ছে।

স্থানীয়দের মতে, ব্রিটিশ আমলে পাহাড়ের মাথায় পুরো মন্দির এলাকাটি প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং পাহাড়ের নিচ থেকে উপরে উঠার জন্য পাথরে বাঁধানো একটি পথও ছিল। এই পথে 'নয় কুড়ি নয় খান' অর্থাৎ ১৮৯টি সিঁড়ি ছিল। পথের পাশে একটি পানির কূপ ছিল বলেও তারা দাবি করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে পাথরের সিঁড়ি, পানির কূপ কিংবা প্রাচীরের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে পাহাড়ে উঠার মাটির পথটি এখনও টিকে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে উঠতে এটি একপর্যায়ে চুলের কাটার মতো কতগুলো বাঁক নিয়ে উপরে পৌঁছেছে। যেখানে পৌঁছেছে সেখানে একটি ছোট ফটক রয়েছে। এই ফটকটিকে মন্দির প্রাঙ্গনের প্রধান ফটক বলে মনে হয় না।



চিত্র: ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরের একটি অক্ষত ভবন

এই ফটকটির তুলনায় দক্ষিণ পাশের ফটকটি অনেক বড় এবং কারুকাজসমৃদ্ধ। দেখে মনে হয় যে, দক্ষিণের ফটকটিই মন্দির প্রাঙ্গনের প্রধান ফটক ছিল। পাহাড়ের গায়ের প্রশস্থ রাস্তাটি হয়তো ঘুরে ঘুরে দক্ষিণের ফটকেই পৌঁছেছিল এবং সেদিকেই মানুষ মন্দিরে প্রবেশ করতো। আর প্রশস্থ রাস্তা থেকে হঠাৎ

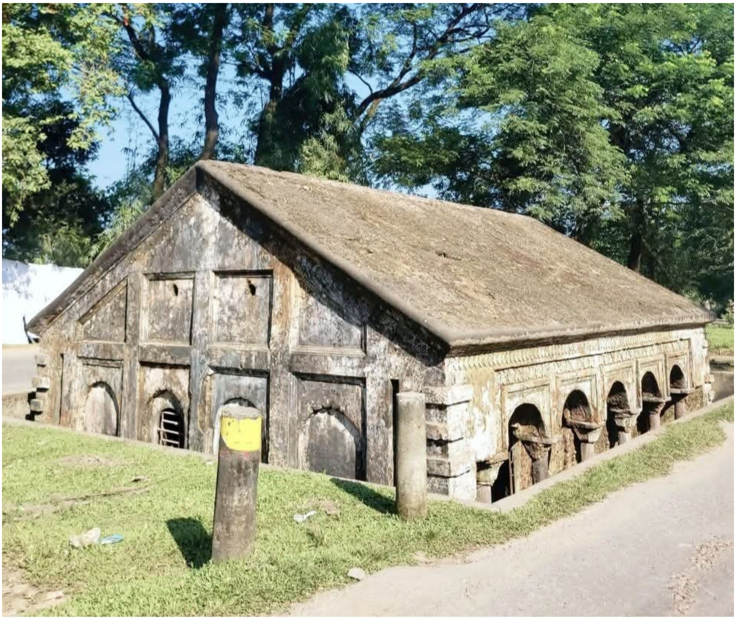
করে চুলের কাটার বাঁক নিয়ে নিয়ে যে রাস্তাটি উপরে উঠেছে সেটি ছিল মন্দিরে ঢুকার একটি বিকল্প ও ছোট রাস্তা। দুটি ফটক ছাড়া মন্দিরের অন্যান্য যেসব স্থাপনা টিকে আছে সেগুলোর কোনটি কী কাজে ব্যবহৃত হতো তা বলার মতো কোন লোক আজ আর বেঁচে নেই। ছোট ফটকটির পাশেই যে দালানঘরটি অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেটির ভেতরে কেউ বসবাস করতো বলেই মনে হয়। কিছু স্থাপনা বা স্থাপনার ধ্বংসাবশেষের উপর এতো ঝোপ-জঙ্গল জন্মেছে যে এগুলোর আকার-প্রকার কিছুই বোঝা যায় না। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে যদি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো যায় তাহলে এই মঠ বা মন্দির সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।



চিত্র: ঢুপির মঠের প্রধান ফটকের দেয়ালের গায়ে চুন-সুরকির কারুকাজ

চার. ঢুপির সরাইখানা নির্মাণ (১৭৯৭ সাল)

রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের হাতে নির্মিত যেসব স্থাপনা আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে তার মধ্যে ঢুপির সরাইখানা বা পান্থশালাটি অন্যতম। ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে, সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত এই স্থাপনাটি বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত স্থাপনা হয়ে উঠলেও বেশিরভাগ মানুষ এর সঠিক ইতিহাস জানেন না। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১৭৯৭ সালে ঢুপির মঠ নির্মাণের সময়েই রাজা রামসিংহ এই সরাইখানাটি নির্মাণ করেছিলেন। দূর-দূরান্ত থেকে আগত মানুষদের বিশ্রামের সুবিধার্থেই রাজা এটি নির্মাণ করেছিলেন। সরাইখানা নির্মাণের জন্য রাজা কেন ঢুপি গ্রামকেই বেছে নিয়েছিলেন তার উত্তর নিহিত রয়েছে তৎকালীন সময়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে।



চিত্র: সারী নদীর তীরবর্তী ঢুপির সরাইখানা

জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অঞ্চলে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা। সমতলের মানুষ মূলত নৌকায় বা ভেলায় চড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতো। পুরো জৈন্তিয়া সমতলকে সংযুক্ত রেখেছিল অসংখ্য খাল-বিল, হাওর ও নদী-নালা (এখনও রেখেছে)। এই নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ঢুপি গ্রামের সারিঘাট। এখানে সারী নদীর সাথে দুটি ছোট নদী যুক্ত রয়েছে। দক্ষিণ ও পূর্ব জৈন্তিয়ার মানুষ নৌকা যোগে এই তিন নদীর সংযোগস্থলে এসে ভীড়তো এবং এখান থেকে কয়েক মাইল হেঁটে রাজধানীতে পৌঁছত। ফেরার বেলায়ও তারা একই পথেই ফিরতো। এদের অনেকেই ছিলেন ব্যবসায়ী। তারা জয়ন্তাপুরী হাট থেকে বিভিন্ন পাহাড়ি পণ্য-সামগ্রী এনে সারীঘাটের নৌকায় বোঝাই করতেন এবং সেখান থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব জৈন্তিয়ার বিভিন্ন হাটে পৌঁছে দিতেন।



চিত্র: সারী নদীর তীরবর্তী ঢুপির সরাইখানা

সারীঘাট ছিল জৈন্তিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত ‘ঘাট’ বা নৌ-বন্দর। জৈন্তিয়া-মোগলানের যেসব পূণ্যার্থী ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিব মন্দিরে আসতেন তারাও সারীঘাট হয়েই আসতেন এবং সারীঘাট হয়েই ফিরতেন। যেসব ব্যবসায়ী, পূণ্যার্থী, সাধারণ মানুষ এবং রাজস্ব কর্মচারী দূর-দূরান্ত থেকে সারীঘাটে এসে নামতেন তারা আহার, বিশ্রাম ও শুচিতার জন্য সেখানে থামতেন। ফেরার বেলায়ও তাদেরকে সেখানে থেমে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হতো। নৌকায় মাল বোঝাই করতে কিংবা নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে করতে কারও কারও দু-এক দিন চলে যেতো। এসব যাত্রীদের সুবিধার জন্য সারীঘাটে একটি উন্নত বিশ্রামাগার বা সরাইখানা নির্মাণ করা ছিল সময়ের দাবি। রাজা রামসিংহ এই দাবিটি পূরণ করেছিলেন।



চিত্র: ঢুপির সরাইখানার দৃষ্টিনন্দন খিলান

পূণ্যার্থী এবং অন্যান্য যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য তিনি অত্যন্ত চমৎকার একটি সরাইখানা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সারীঘাটের উত্তরপাশে ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত এই সরাইখানায় একসাথে ২০-২৫ জন লোক থাকার ব্যবস্থা ছিল। জৈন্তিয়া রাজ্যের অক্ষত স্থাপনাগুলোর মধ্যে আয়তনে এটিই সবচেয়ে বড়। এটি মূলত একটি দোচালা ঘর। এর পূর্বপাশে একটি বারান্দাও রয়েছে।

বারান্দার পাঁচটি খিলানের গায়ে অনন্য কারুকাজ রয়েছে।[98] ঘরের দক্ষিণের দেয়ালেও চমৎকার কারুকাজ রয়েছে। অত্যন্ত মজবুত হওয়ায় এই দোচালা ঘরটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পেও ধ্বংস হয়নি। ঘরটি প্রায় পুরোপুরিভাবেই অক্ষত আছে। তবে ঘরের সাথে সংযুক্ত একটি জলাধার বিলুপ্ত হয়েছে। পাথরে বাঁধানো এই জলাধারটি ছিল সরাইখানায় আগত অতিথিদের গোসলের পানির উৎস।



চিত্র: ঢুপির সরাইখানার খিলানের গায়ে চুন-সুরকির কারুকাজ

ব্রিটিশ আমলে সিলেট-শিলং রাস্তা তৈরীর সময় জলাধারটি ভরাট করে এর উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন দোচালা ঘরটির অবস্থান ছিল রাস্তার পশ্চিমে। সিলেট-শিলং রাস্তাটি বর্তমানে দুই দেশে বিভক্ত। রাস্তার যতটুকু বাংলাদেশে আছে তা সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক নামে পরিচিত। এই

---

[98] আকৃতির বিচারে এই পাঁচটি খিলান হচ্ছে গোলাকার খিলান (Roman/Circular Arch)। এগুলো ছয়টি খুঁটির উপরে নির্মিত। এগুলোর গায়ে চমৎকার ফুল ও পাতার নকশা রয়েছে।

রাস্তাটিকে প্রশস্থ করার সময় দোচালা ঘরটিকে ভেঙ্গে ফেলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। স্থানীয়রা এতে আপত্তি জানালে ঘরটিকে বাঁচিয়ে রেখে এর পশ্চিমপাশ দিয়ে রাস্তা বানানো হয়। তখন থেকে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের যানবাহনসমূহ ঘরটির দুই পাশের দুটি আলাদা লেন দিয়ে চলাচল করছে। তবে যেকোন সময়ে ভারী যানবাহনের ধাক্কায় (দূর্ঘটনাবশত) এই মূল্যবান পুরাকীর্তিটি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

পাঁচ. রাধা-গোবিন্দের মন্দির নির্মাণ (১৮১৬ সাল)

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস থেকে কয়েকজন প্রভাবশালী ধর্মগুরুর কথা জানা যায়। নিত্যানন্দ গোস্বামী এদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন বৈষ্ণব ধর্মগুরু। তাঁর মূল বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলার উঠনী গ্রামে। সেখান থেকে জৈন্তিয়ায় এসে তিনি বৈষ্ণব মতবাদের প্রচার শুরু করেছিলেন। তাঁর এই ধর্মীয় মিশন বেশ সফল হয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ এই ধর্মগুরুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা রাধা-গোবিন্দের একটি মন্দিরও বানিয়েছিলেন। ১৮১৬ সালে রাজা নিত্যানন্দ গোস্বামীর কাছ থেকে বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং এরপর এই ধর্মগুরুর উপদেশে ডৌডিক গ্রামে একটি মন্দির বানিয়ে এর ভেতরে রাধা-গোবিন্দের যুগল মূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

এই মন্দিরের সেবায়েতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিত্যানন্দ গোস্বামী। মন্দিরের উপাসনার জন্য রাজা তাঁর নামে ৩৮ হাল দেবোত্তর ভূমিও দান করেছিলেন। ১৮১৬ সালের একটি তাম্রফলকের গায়ে এই ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল।[99] ব্রিটিশ আমলে নিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র জগবন্ধু গোস্বামী এই তাম্রফলকের দলিল দেখিয়ে এসব ভূমির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। *১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টে* এই তাম্রফলকটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজা রামসিংহ ১৭৩৮ শকাব্দের (১৮১৬ সাল) ২৫ অগ্রাহায়ণ তারিখে রাধা-গোবিন্দের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং জগবন্ধু গোস্বামীর পিতা নিত্যানন্দ গোস্বামীকে চিকনাগুল মৌজা থেকে

[99] এই তাম্রফলকটি কোন গবেষকের হস্তগত না হওয়ায় এর পাঠোদ্ধার হয়নি।

সিংহমোহরের তাম্রপত্রে এক কিত্তায় ২৬ হাল এবং আরেক কিত্তায় ১২ হাল দেবোত্তর ভূমি দান করেছিলেন।

[রাজা রামসিংহের আমলে রাজা বড়গোসাঁইয়ের পত্নী কাশাশতী দেবী জীবিত ছিলেন। তিনিও নিত্যানন্দ গোস্বামীর দ্বারা বেশ প্রভাবিত ছিলেন। সবচেয়ে বেশি ভূমি তিনি তাকেই দান করেছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি এই ধর্মগুরুকে চিকনাগুল মৌজা থেকে ৩৫ হাল ভূমি দেন। এছাড়াও ১৮০৫-০৬ সালে তাকে বাজেরাজের অন্তর্গত ধর্মপুর থেকে ২৪ হাল ভূমি, রাধানগর থেকে এক দফায় ৩৭ হাল ভূমি এবং আরেক দফায় ২৬ হাল ১০ কেদার ভূমি দেন। নিত্যানন্দ গোস্বামীর পুত্র জগবন্ধু গোস্বামী ব্রিটিশ আমলেও নিষ্কর মহাল হিসেবে এসব ভূমি ভোগদখলের অধিকার পেয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালের ২৯ মার্চ তিনি সিলেটের ডেপুটি কালেক্টর জর্জ লক সাহেবের সামনে (কানাইঘাটস্থ ক্যাম্পে) উপস্থিত হয়ে তাম্রপত্রে এসব ভূমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন।]

ছয়. সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির নির্মাণ

জৈন্তিয়া রাজ্যের একটি মন্দিরের কথা আজও কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় স্থান পায়নি। এর অবস্থান জৈন্তিয়ার রাজধানী থেকে বেশ দূরে। বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের ভিত্রিখেল গ্রামের বাঘেরখেড় এলাকায় এর অবস্থান। ভিত্রিখেল গ্রামটি আকারে বেশ বড়। চতুলবাজার-লালাখাল রাস্তাটি এই গ্রামের এক পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই রাস্তার পশ্চিমপাশে বাঘেরখেড় এলাকার একটি পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এক জোড়া পুরাতন রাজকীয় মন্দির। স্থানীয়দের কাছে এটি সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির নামে পরিচিত। সুদূর অতীতে সতনাথ ছিলেন ভিত্রিখেল গ্রামেরই একজন সন্ন্যাসী। তাকে নিয়ে কিছু বিস্ময়কর গল্প প্রচলিত আছে। এসব গল্প থেকেই মন্দিরটির ইতিহাস জানা যায়। মন্দিরটির ইতিহাসের আর কোন সূত্র নেই।

কথিত আছে, সতনাথ একদিন রাজা রামসিংহের সাথে দেখা করার জন্য রাজবাড়িতে হাজির হন। কিন্তু রাজা তখন অন্দরমহলে ব্যস্ত ছিলেন। রাজবাড়ির এক লোক সতনাথকে একথা জানালে তিনি বললেন যে, রাজা আসলে ব্যস্ত নন; তিনি হাতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। ওই লোকটি রাজাকে একথা জানালে রাজা বেশ অবাক হয়ে যান। তিনি সতনাথকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আপ্যায়ন করালেন এবং কৌশলের সাথে এই সন্ন্যাসীকে একটি পরীক্ষায়

ফেলে দিলেন (তাঁর বিশেষ ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য)। সতনাথ এতেও উত্তীর্ণ হলেন। সতনাথের প্রকৃত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে রাজা তাকে খুবই সমাদর করেন এবং পরদিনই ভিত্রিখেল গ্রামে এসে তাঁর জন্য একটি জোড়া মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। এটিই সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির। এই জোড়া মন্দিরের একটি চূড়া আকারে বেশ বড় হলেও অপরটি খুবই ছোট।



চিত্র: সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির

সাত. মণিপুরী রাজার জৈন্তিয়ায় আশ্রয়গ্রহণ (১৮১২-১৮১৭ সাল)

জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর মধ্যে মণিপুর ছিল একটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য। তবে এই রাজ্যের সাথে জৈন্তিয়ার সরাসরি কোন সীমান্ত ছিল না। তাই মণিপুরী রাজাদের সাথে জৈন্তিয়ার রাজাদের কখনো শত্রুতা বা মিত্রতা হয়নি। তাদের সাথে জৈন্তিয়ার রাজাদের সম্পর্ক কেবল প্রতিবেশীসুলভ সৌজন্যতার

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জৈন্তিয়ার ইতিহাসে মণিপুরের কোন প্রসঙ্গ নেই। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন* বইটি থেকে জানা যায়, রাজা রামসিংহের আমলে মণিপুরের ক্ষমতাচ্যুত রাজা চৌরজিৎ সিং জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই আশ্রয়গ্রহণের কারণ ছিল মণিপুরী রাজপরিবারের অন্তর্কোন্দল। চৌরজিৎ সিং ১৮০৬ সাল থেকে মণিপুরের রাজা ছিলেন। ১৮১২ সালে তাঁর ভাই মারজিৎ সিং তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসনে বসেছিলেন। চৌরজিৎ তখন তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে কাছাড়ি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চৌরজিৎ ও মারজিৎ ছাড়াও তাদের আরেক ভাই গম্ভীর সিং-ও এই কোন্দলে জড়িত ছিলেন। মারজিৎ-এর সিংহাসন দখলের পর তিনিও চৌরজিৎ-এর সাথে কাছাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে মারজিৎ-এর কাছ থেকে মণিপুরের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য কাছাড়ি রাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণের সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু কাছাড়ি রাজা মণিপুরী ভাইদের এই অন্তর্কোন্দলের সাথে নিজেকে জড়াতে চাননি। তাই তিনি চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিং-কে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। এতে চৌরজিৎ খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং কাছাড়ি রাজ্য ছেড়ে জৈন্তিয়া রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে কিছু কুকি ও নাগা সৈন্যও ছিল। কুকি ও নাগাদেরকে নিয়ে তিনি ব্রিটিশদের পক্ষে বর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কোন লক্ষণ তখনও দেখা যাচ্ছিল না। তাই চৌরজিৎ জৈন্তিয়ার আশ্রয়ে থেকে কাছাড়ি রাজাকে শায়েস্তা করার কাজে মনোনিবেশ করেন।

১৯৪২ সালে প্রকাশিত *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন* বইটির ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "১৮১২ হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পযর্ন্ত ছয় বৎসর কাল মণিপুরেব শান্তি অব্যাহত ছিল, কিন্তু চৌরজিত সিংহ গোবিন্দ চন্দ্রের ভাগ্যে রাহুস্বরূপ হইয়াছিলেন। কি কারণে তাহার সহিত গোবিন্দ চন্দ্রের মনান্তর হয় তাহা আমরা জানি না। গোবিন্দ চন্দ্র বলেন যে মারজিতের বিরুদ্ধে কাছাড়ের সাহায্য না পাইয়া চৌরজিত তাহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। মণিপুরের রাজারা নির্ব্বাসনেও চুপ করিয়া থাকিতেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চৌরজিত ইংরাজ সরকারকে পত্র লিখিয়া (১৩৭ নং) জানাইয়াছিলেন যে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিলেন যে তাঁহারা ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে তিনি নাগা ও কুকি সৈন্য লইয়া ইংরাজ পক্ষে যোগদান

করিবেন। গোবিন্দ চন্দ্রের সহিত মনোমালিন্য হইবার পর তিনি জৈন্তিয়া রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া কাছাড়ের সীমান্তে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দ চন্দ্র শুনিলেন যে জৈন্তিয়া রাজা অগৌণে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তিনি ভ্রাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ২৫ জন সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলেন এবং বড়লাটের নিকট আসন্ন বিপদের কথা লিখিয়া জানাইলেন। ইতিমধ্যে চৌরজিত কয়েকজন কাছাড়ী কর্ম্মচারীর সহিত রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন (গোবিন্দ চন্দ্রের পত্র নং ১৬৩)। এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে তুলারাম ও তাঁহার পিতা খাসাডেওর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

গোবিন্দ চন্দ্র আবার ইংরাজ সরকারের নিকট ২৫ জন সিপাহী প্রার্থনা করিলেন, শেষে লিখিলেন যে তাঁহার নিকট ২০ জন সিপাহী মোতায়েন করিলেই তিনি বিপদমুক্ত হইতে পারেন। যখন এই প্রার্থনাও মঞ্জুর হইল না তখন তিনি কোম্পানীর সিপাহীর আশা পরিত্যাগ করিয়া একজন 'বাজে ইংরাজ' ও কিছু সিপাহী চাহিয়া পাঠাইলেন। ১৬৩ নং পত্রের কেরি সাহেব বোধ হয় 'বাঁজে ইংরাজ' হিসাবে কাছাড়ের রাজ সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্র যখন চৌরজিত ও তুলারাম প্রভৃতির চক্রান্তে বিব্রত তখন সহসা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর মারজিত সসৈন্যে কাছাড়ে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ সরকার মণিপুর ও কাছাঁড়ের বিরোধে নিরপেক্ষ রহিলেন, কেবল আপনাদের সীমান্তের শান্তি রক্ষার জন্য তাঁহারা বদরপুরে কাপ্তেন ডেভিডসনের সহিত একদল ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। মারজিত ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে তাঁহার পিতার সময় হইতে কাছাড়ের রাজা তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছেন। সেইজন্য তিনি গোবিন্দ চন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই । তাঁহারা গোবিন্দ চন্দ্রকে ও তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতাকে নিরস্ত করিয়া কাছাড় শাসনের জন্য ফিরিঙ্গি থানাদার নিযুক্ত করুন। দূর্বল গোবিন্দ চন্দ্র আবার লাট সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। "বাজে ইংরাজ" কেরি সাহেব বিপদের কালে কাজে লাগিলেন না। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তিনি মণিপুরীদিগের ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তখনও গোবিন্দ চন্দ্রের ভাগ্যে কিছুদিন রাজত্ব ছিল। মারজিতের অভিযানের সংবাদ পাইয়া চৌরজিত জৈন্তিয়া দেশ হইতে কাছাড়ের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। গোবিন্দ চন্দ্রের সেনাপতি গম্ভীরসিংহ কেরির পলায়নে নিরুদ্যম না হইয়া শত্রু সেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মারজিত পরাজিত

হইয়া মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু কাছাড়ের দুর্ভাগ্যের অবসান হইল না।

আট. জৈন্তিয়া-ব্রিটিশ মৈত্রীসম্পর্ক (১৮২৪-১৮৩২ সাল)

রাজা রামসিংহের শাসনামলে জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলো হঠাৎ করে একটি আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তির হাতে আক্রান্ত হয়। এই শক্তিটির নাম বার্মা বা বর্মী সাম্রাজ্য। ইতোপূর্বে কখনো এই শক্তিটি এই অঞ্চলে এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই রামসিংহের আগের রাজাদের ইতিহাসে বার্মা বা বর্মী সাম্রাজ্যের কোন প্রসঙ্গ নেই। রামসিংহের শাসনামলে এই শক্তিটি খুবই আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ১৮১৯ সাল থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে বর্মীরা একে একে দখল করে নেয় মণিপুর, আহোম ও কাছাড়ি রাজ্য। ১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে তারা জৈন্তিয়া ও সিলেটেও প্রবেশের পরিকল্পনা করে। এমতাবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়। এতে বর্মীরা সাময়িকভাবে থমকে গেলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে তাদের একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

এই যুদ্ধে জৈন্তিয়াকে পক্ষে রাখার জন্য উভয়পক্ষই চেষ্টা করে। জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহ সার্বিক দিক বিবেচনা করে ব্রিটিশদেরই পক্ষে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি ১৮২৪ সালের ১০ জানুয়ারী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে একটি মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেন। এই যুদ্ধটি ইতিহাসে 'প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ' বা 'প্রথম বার্মা যুদ্ধ' নামে পরিচিত। রাজা রামসিংহ এই যুদ্ধে ব্রিটিশদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুবিধা দিয়েছিলেন। এতে ব্রিটিশরা বেশ সহজেই বর্মীদের উপর আক্রমণ চালাতে পেরেছিল। ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই যুদ্ধটি শেষ হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিল। আহোম, মণিপুর ও কাছাড়ি রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ডসমূহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে জৈন্তিয়া তখন একা হয়ে পড়েছিল। রাজ্যটির স্বাধীনতা কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিল। এর কারণ,

জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলো ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ায় এর কৌশলগত শক্তি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। রাজ্যটি কার্যত ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই এর স্বাধীনতা নির্ভর করছিল ব্রিটিশদের মর্জির ওপর। এক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে রামসিংহের মৈত্রীসম্পর্ক বা চুক্তিটি ছিল একমাত্র রক্ষাকবচ। এই চুক্তির কারণে রামসিংহের জীবদ্দশায় ব্রিটিশরা রাজ্যটি দখলের চেষ্টা থেকে বিরত ছিল (যদিও কৌশলগতভাবে রাজ্যটি তাদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিল)। রামসিংহের জীবদ্দশায় চুক্তি লঙ্ঘন করতে না চাইলেও পরবর্তীতে তারা ঠুনকো ও বানোয়াট অজুহাতে রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিল।

নয়. রাজা রামসিংহের ভূমিদানের তথ্য

হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী এবং *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* বইটির লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ রাজা রামসিংহের কিছু ভূমিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৭৯০ সালে সিংহাসনে বসার পরপরই সিলেটের দেওয়ান মাণিক চাঁদ এবং তাঁর পুত্র দেওয়ান মুরারী চাঁদকে রাজা রামসিংহ বেশ কিছু ভূমি উপহার দিয়েছিলেন। ব্রিটিশশাসিত সিলেটের এই দেওয়ান পরিবারের সাথে জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[100] পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের সুবাধে রাজা রামসিংহ সিলেটের এই দেওয়ান পরিবারকে বর্ণফৌদ পরগনার ফতেহগঞ্জ মৌজা থেকে ৪৩৯ বিঘা ভূমি উপহার দিয়েছিলেন। রাজা রামসিংহের অন্যান্য ভূমিদানের তথ্য নিম্নরূপ।

১৭৯২ সালে রাজা রামসিংহ পিয়াইনগুল পরগনার ফুলতৈলছগাম থেকে জনৈক নিমাই দাসকে ৯ বিঘা ভূমি দান করেছিলেন। ১৭৯৪ সালে রাজা রামসিংহ জয়ন্তাপুরী রাজ পরগনার বৌলাখেল মৌজা থেকে তাঁর বন্দুক চালনার উস্তাদ

[100] Dewan Manik Chand was an influential Dewan (Revenue Sheristadar) under the British regime. His son Murarichand won great ascendancy in Sylhet society for his refinement. Raja Girish Chandra who was adopted by the childless daughter of Dewan Murarichand founded the Murarichand college at Sylhet in 1893. It was taken over by Government in 1912. (T*he History of Jaintia,* Syed Murtaza Ali)

বিজয় মুন্সেফকে ৮ বিঘা বা ১০ কেদার ভূমি দান করেছিলেন। *১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টে* এই ভূমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের পর এই ভূমির মালিকানা নিয়ে একটি বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন জৈন্তিয়ার ভূমি বন্দোবস্তের কাজে নিয়োজিত ছিলেন সিলেটের ডেপুটি কালেক্টর জর্জ লক। তাঁর কাছে দুটি পক্ষ এসে নিজেদেরকে ওই ভূমির উত্তরাধিকারী বলে দাবি করে এবং উভয়পক্ষই ওই ভূমির বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করে। জর্জ লক এই বিবাদ নিস্পত্তির জন্য জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের ৩৭ নং মামলা রুজু করেন এবং এই মামলার তদন্ত শেষে বিজয় মুন্সেফের উত্তরাধিকারীকেই ভূমিটি বন্দোবস্ত দেন।[101]

১৭৯৮ সালে রাজা রামসিংহ সাতবাক পরগনার লালারচক থেকে জনৈক হরি শর্মাকে ৩২৫ বিঘা দেবোত্তর ভূমি দান করেছিলেন। মদনমোহন এবং অন্যান্য প্রভুদের উপাসনার জন্য এই ভূমি দান করা হয়েছিল। হরি শর্মা ছিলেন সিলেট শহরের রায়নগরের ভট্টাচার্য পরিবারের এক গুণী সন্তান। তাঁর অপর নাম ছিল হরি শঙ্কর ভট্টাচার্য। তিনি নবদ্বীপে পড়াশোনা করে বিদ্যালঙ্কার উপাধী অর্জন করেছিলেন। এরপর তিনি জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহের সভা-পন্ডিত হয়েছিলেন। হরি শর্মার পূর্বপুরুষ ভবানীবল্লব ও রামবল্লব ছিলেন গোলাপগঞ্জ টিলার অধিনায়ক। গোলাপগঞ্জ টিলা ছিল একটি সীমান্ত চৌকি। জৈন্তিয়ার অধিবাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার এই চৌকিটি বসিয়েছিল। পাকিস্তান আমলে এটি একটি ইন্সপেকশন বাংলো ছিল।

১৭৯৮ সালে রাজা রামসিংহ রামেশ্বর শিব মন্দির বা ঢুপির মঠের জন্য বেশকিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। মন্দিরের সেবায়েত ও গুরু রুখড় সন্ন্যাসীর নামে এসব ভূ-সম্পত্তি দান করা হয়েছিল। একটি তাম্রফলকের দলিলে এই সন্ন্যাসীর নামে আটটি ভূমি দানের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই আটটি ভূমি ছাড়াও রাজা এই সন্ন্যাসীকে আরও কিছু ভূমি দান করেছিলেন। সাতবাক পরগনার পশ্চিম রামপুর থেকে এই সন্ন্যাসীকে ২৮৪ বিঘা ভূমি দেওয়া হয়েছিল। তাম্রফলকের দলিলে

---

[101] *১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্টে* এই মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজা রামসিংহ বিজয় মুন্সেফের কাছ থেকে বন্দুক চালনার কৌশল রপ্ত করার পর তাকে বৌলাখেল মৌজা থেকে ১০ কেদার ভূমি দান করেন। সিংহমোহরের পত্রে এই ভূমি দান করা হয়েছিল। (*১৮৩৯ সালের জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্ট*, মোকদ্দমা নং ৩৭, পৃষ্ঠা ৫৫)

তাঁর নামে যেসব ভূমির বর্ণনা রয়েছে সেগুলো দরবস্ত (৯৯ বিঘা), নয়াবাড়িখলা (১৬৭ বিঘা), নয়াখেল (৪ বিঘা), চৈলাখেল (৮৬ বিঘা) প্রভৃতি জায়গায় অবস্থিত।

১৮০৯ সালে রাজা রামসিংহ ব্রজেশ্বরী ও ব্রজেশ্বরের (রাধা-কৃষ্ণের) মন্দিরের উপাসনার জন্য গোসাঁইনপুর ও সুতারগ্রামের দুটি ভূমি দান করেছিলেন। এই দুটি ভূমির পরিমাণ ছিল ২৪ কেদার। ব্রজেশ্বরী ও ব্রজেশ্বরের (রাধা-কৃষ্ণের) মন্দিরের সেবায়েত বলরাম বৈষ্ণবাধিকারীর (বলরাম গোস্বামী) নামে এই দুটি ভূমির দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল। একটি তাম্রফলকের গায়ে এই দলিলটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। ১৮১৩ সালে রাজা রামসিংহ রামেশ্বর শিবের উপাসনার জন্য জনৈক যাদব রায় এবং তাঁর স্ত্রী বিদ্যা দাসীকে পাঁচভাগ পরগনার কহাইগড় থেকে ১২৪ বিঘা ভূমি দিয়েছিলেন। এই ভূমি দানের শর্ত ছিল যে, যাদব রায় এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যতদিন এসব ভূমি ভোগ-দখল করবেন ততোদিন তারা রামেশ্বর শিবের উপাসনার খরচ বহন করবেন।

১৮১৬ সালে রাজা রামসিংহ ডৌডিক গ্রামের রাধা-গোবিন্দের মন্দিরের উপাসনার জন্য নিত্যানন্দ গোস্বামীকে পাঁচভাগ পরগনার চিকনাগুল থেকে ৩৮ হাল ভূমি দিয়েছিলেন। এই মন্দিরের ভেতরে রাধা-গোবিন্দের যুগল মূর্তিটি রাজা রামসিংহ নিজেই স্থাপন করেছিলেন। ১৮২১ সালে রাজা রামসিংহ চতুল পরগনার রাউতগ্রামের রাজবল্লভ চৌধুরীকে দূর্গাপুর থেকে ৫ হাল এবং রায়পুর থেকে ২ হাল ভূমি দিয়েছিলেন। ১৮২৪ সালে রাজা রামসিংহ পিয়াইনগুল পরগনার ফুলতৈলছগাম থেকে জনৈক হীরা শিকদারকে ৩ বিঘা ভূমি দান করেছিলেন। ১৮২৪ সালে রাজা রামসিংহ খরিল পরগনার মুক্তাপুর থেকে জনৈক হরিশ চন্দ্র রায়কে ৬৪ বিঘা ভূমি দান করেছিলেন। পরবর্তীতে হরিশ চন্দ্র রায় জনৈক গৌড় কিশোর অধিকারীকে এই ভূমি উপহার দিয়েছিলেন। চন্দ্রগ্রামের সেনাপতি পরিবারের সন্তান বিজয় সিংহ সেনাপতিকে রাজা রামসিংহ গড়াইগ্রাম থেকে ৫ হাল ভূমি দিয়েছিলেন। এই ভূমি দানের সময়কাল অজানা। বিজয় সিংহ ছিলেন হরচন্দ্রের ভাতিজা মাণিক্য রায়ের নাতি।

দশ. রাজা রামসিংহের ভূমিদানের দলিল

রাজা রামসিংহের ভূমিদানের তালিকা অনেক দীর্ঘ। অনেকগুলো তাম্রফলকে তাঁর ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এসব দলিলের বেশিরভাগই ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়নি। ঐতিহাসিকরা রামসিংহের ভূমিদানের দুটি দলিলের সন্ধান পেয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল ১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ সালের) তাম্রফলক এবং অপরটি ছিল ১৭৩১ শকাব্দের (১৮০৯ সালের) তাম্রফলক। ১৭২০ শকাব্দের ফলকটি সম্পর্কে স্যার এডওয়ার্ড গেইট বলেছেন, "In this plate is set forth the grant by Raja Rama-simha of some land for the temple of Siva which had been erected by him at Dhupi." এই ফলকটি অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্তেরও হস্তগত হয়েছিল। তিনি এটির পূর্ণ পাঠোদ্ধারের পাশাপাশি এটি নিয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৭২০ শকাব্দের ফলকটিতে লেখা রয়েছে, রাজা রামসিংহ কপোত পাহাড়ের (বর্তমানে এটি ঢুপির টিলা বা ঢুপির পাহাড় নামে পরিচিত) উপরে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন এবং ১৭২০ শকাব্দে তিনি এই মন্দিরের ভেতরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তদুপরি ১৭২০ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি এই মন্দিরের রুখড়কে (সেবায়েত) বেশ কিছু ভূমি দান করেন। কপোত পাহাড়ের উপরে নির্মিত মন্দিরটির নাম রামেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও রুখড়ের ভরণপোষণের জন্য রাজা আটটি চাষযোগ্য ভূমি দান করেছিলেন। অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত এই তাম্রফলকটিকে 'ঢুপি তাম্রলিপি' নামে অভিহিত করেছেন। ১৯২২ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি এই ফলকের লেখাগুলোর যে ইংরেজি অনুবাদ তোলে ধরেছেন তা হুবহু নিম্নরূপ।

The Dhupi Copperplate Inscription of Ramasimha, Sakabda, 1720 (A.D. 1798)

By Prof. Kishori Mohan Gupta
Assam Educational Service
TRANSLATION
(Salutation to) Sri-Durga

Om (expressed in symbol). A temple of Siva named Sri-la-Ramesvara having been established on the Kapota hill, some amount of land was endowed on Him by king Ramasimha on Sunday in Sakabda, 1720 (expressed in astronomical language) for the purpose of His daily service (to be performed) by Rukhada (lines 1-4).

Having established a temple on the Kapota hill in 1720 and having set up a Siva-phallus called Ramesvara (therein) the Purandara (i. e. king) of Jayantipura, Sri Sri Ramasimha, the chief among kings, gave him eight plots of land for his maintenance (4-7).

This duty of maintaining (Him) should be discharged with (the income from) this land by Mendicant (paribrajaka) Sri Rukhada or by his disciples or by the disciples of his deciples. The description of this land (consisting) of eight plots is as follows (7-9):—

To the north of this hill is the First plot which adjoins the land of Murtidhara, the Desammukha (literally, the chief of desa or district) in the east, and has in the west a ridge of earth (setu), in the north the land known as Dauyatalabhitti and in the south this (very) hill. This plot of land was purchased from the inhabitants of Chaila-khela in the province (rajya) of Jayantipura for Two hundred Karsapanas (9-13).

The Second plot (lying) south of this hill has ridges in the east and west, the land of the inhabitants of Naya-khela in the north and the houses of the inhabitants of that khela (i.e. village) in the south. This plot was taken away from the inhabitants of that khela (13-15).

To the west of this hill is the Third plot to the amount of six kedaras purchased from Murtidhara for one hundred and forty karsapanas; the Fourth plot measuring Six kedaras was but

taken from the inhabitants of Naya-khela; and the Fifth plot to the amount of Four kedaras was purchased from the Brahmana Sri-Juda for Sixty karsapanas (15-19).

The Sixth plot to the extent of Twelve halas is known as Jagaduviyakhala in the province (rajya) of Kharil (which is) changeable for lands attached to the settled parts (khalangani) in the woody region of Tapaibil near Baravakra (20-22).

The Seventh plot to the extent of four halas in the land known as Vanabaurbhaga was taken from the Commander-in-Chief (22-23).

The Eighth plot has the marshy tract (vil) called Haulisa in the east, the land called Gobhada (? govata) in the west, the region called Sripura in the north : in the south it is the northern boundary of the land called Briddhala. This plot was taken from the queen (mahadevi) (23-26).

He, by whom the endowments of Siva are seized, would eat what is improper to eat and he would become a destroyer of good in this world (26-28).

Dated Sakabda 1720, in the month of Jyaistha, on full moon day (28).

রাজা রামসিংহের ভূমিদানের অপর দলিল অর্থাৎ ১৭৩১ শকাব্দের (১৮০৯ সালের) তাম্রফলকটির পাঠোদ্ধার করেছিলেন বিশিষ্ট গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী। এই গবেষকের পৈতৃক বাড়ি ছিল ছাতকের একটি গ্রামে। সেখানেই তিনি এই ফলকটির সন্ধান পেয়েছিলেন (নিজ গ্রামের এক প্রতিবেশী তাকে ফলকটি দেখিয়েছিলেন)। এজন্য তিনি ফলকটিকে 'ছাতক তাম্রফলক' নামে অভিহিত করেছেন। এই ফলকে রাজা রামসিংহ কর্তৃক জনৈক বলরাম বৈষ্ণবাধিকারীকে ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। বলরাম ছাতক থেকে জৈন্তিয়ায় গিয়ে একটি বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিজে এর সেবায়েত হয়েছিলেন। ধার্মিকতা ও তপস্যার জন্য তিনি স্থানীয় লোকজনের কাছে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। রাজা রামসিংহ এই সাধুপুরুষের

গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক মূল্যবান জিনিসের পাশাপাশি কিছু ভূমিও দান করেছিলেন।

‘ছাতক তাম্রফলক’ হচ্ছে এই ভূমিদানেরই দলিল। ফলকটিকে বলা হয়েছে, ১৭৩১ শকাব্দে রাজা রামসিংহ ভগবান বিষ্ণুর সেবক বলরাম বৈষ্ণবাধিকারীকে গোসাঁইনপুর ও সুতারগ্রামের দুটি ভূমি দান করেন। ব্রজেশ্বরী ও ব্রজেশ্বরের আরাধনার জন্য রাজা বলরামকে এ দুটি গ্রামের ২৪ কেদার ভূমি দান করেন। প্রথম ভূমিটির পূর্বদিকে রয়েছে মহিহারণ্য ভূমি। পশ্চিমদিকে রয়েছে গরু চলাচলের পথ। উত্তরদিকে রয়েছে আমিরঘরনের দিকে যাওয়ার পথ। আর দক্ষিণ দিকে এই ভূমিটি গুল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। দ্বিতীয় ভূমিটির পূর্বদিকে ভোগখর নামক ভূমি অবস্থিত। পশ্চিমদিকে রয়েছে নক্তির নান। উত্তরদিকে রয়েছে মহিহারণ্য। দক্ষিণ দিকেও রয়েছে মহিহারণ্য। ১৯২৯ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি এই ফলকের লেখাগুলোর যে ইংরেজি অনুবাদ তোলে ধরেছেন তা হুবহু নিম্নরূপ।

The Satak Copper Plate Grant of King Rama Simha II, of Jaintia of 1809 A.D

By KUNJA GOVINDA GOSWAMI
TRANSLATION

Om (expressed by a symbol)! Salutation to Viajeswara.

In the Saka year *seventeen hundred* increased *by thirty-one*, — land, measuring *twenty-four Kedaras* in two plots (included) in the villages of *Gosainpur* and *Sutara* has been granted by the great King *Ram Simha* (who flourished) like Purandara (Indra) in the city of *Jayanti* (mod. *Jaintia*) to *Balarama Vaisnavadhikarin*, a descendant of Vani (who is) the devotee of god Visnu, for the worship of the deities, Vrajeswari and Vrajeswara.

Now the land is bounded on four sides as follows: to the east of the first plot lies the land, called the Mahiharanana; to the west the path used by the cattle; to

the north the path which leads to the house, called Amiragharana; to the south as far as the land called the gula. Now to the east of the second plot lies the land called the bhogakhara, to the west the land called the Naktinana, to the north the land called the Mahiharana, to the south the same.

এগারো. রাজা রামসিংহের সময়কার আরও কিছু তথ্য

রাজা রামসিংহ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বিচক্ষণ এক রাজা। তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে জৈন্তিয়ার মানুষ বেশ সুখী ছিল; রাজ্যে কোন বড় সংকট সৃষ্টি হয়নি। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে রাজ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে ব্রিটিশদেরকে সহায়তা করলেও তিনি কোন সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াননি। এই যুদ্ধটি ব্রিটিশদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল হলেও তা জৈন্তিয়ার অর্থনীতিতে কোন প্রভাব ফেলেনি। রামসিংহের আমলে জৈন্তিয়ার কোষাগার ছিল পরিপূর্ণ; রাজ্যে কোন অভাব-অনটন ছিল না। তিনি রাজ্যের ব্যাপক উন্নয়ন করেছিলেন। তাঁর হাতে নির্মিত স্থাপনাগুলো আজও তখনকার সময়ের সমৃদ্ধির কথা মনে করিয়ে দেয়। জৈন্তিয়ার ইতিহাসের সকল রাজাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ভূমি দান করেছিলেন। তাঁর সময়কার দানপত্র বা তাম্রলিপিগুলো রাজ্যের কৃষিজমির প্রাচুর্য্যতার প্রমাণ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৃষিজমিই ছিল রাজ্যটির স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির মূল উৎস।

রাজা রামসিংহ নিজেও একজন সুখী মানুষ ছিলেন। খরিল পরগনার শ্রীখেলের বিদ্যা দাসী ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী। এই স্ত্রীর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল এবং ময়নাধন রামরতন নামে তাঁর একটি পুত্রসন্তানও ছিল। রাজা এই শিশুটিকে জয়ন্তীপুরে এনে নিজের পুত্রসন্তানের মতোই বড় করেছিলেন। রাজার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল গৌরী। গৌরীর বাড়ি ছিল চতুল পরগনার রাউতগ্রামে। রাজার পছন্দের খেলা ছিল মল্লযুদ্ধ এবং বাঘ শিকার। তিনি বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করতেন এবং মৃত বাঘের চামড়া সংগ্রহ করতেন। হাতির সামনে মৃত বাঘকে ফেলে রেখে তিনি হাতির বাঘ-ভীতি দূর করতেন। দৈহিকভাবেও তিনি বেশ শক্তিশালী ছিলেন। দৈহিক অনুশীলনের সময়ে তিনি অবলীলায় একটি লোহার

নেহাই ছুড়ে মারতে পারতেন। *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থের লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী যখন জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কাজে জৈন্তিয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন তিনি এই ভারী বস্তুটিকে জৈন্তিয়া রাজবাড়ির চত্বরে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন।

রামসিংহের আমলে জৈন্তিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাই তাঁর সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যে অনেকগুলো মসজিদ ও ঈদগাহ নির্মিত হয়েছিল। রাজা বড়গোসাঁই কর্তৃক বন্দরহাটি মসজিদটি নির্মিত হওয়ার পর থেকে জয়ন্তাপুরীরাজের মুসলমানরা সেখানেই নামাজ আদায় করতেন। রামসিংহের আমলে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জয়ন্তাপুরীরাজে অনেকগুলো মসজিদ নির্মিত হয়; জৈন্তিয়ার অন্যত্রও অনেকগুলো মসজিদ নির্মিত হয়। ব্রিটিশ আমলের বন্দোবস্তের সময়ে এসব মসজিদের জন্য রাজার দেয়া কৃষিজমিগুলোকে 'চেরাগী মহাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় হল, সংস্কার ও নবনির্মাণের ফলে এসব মসজিদের পুরানো ঘরের কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই; মসজিদগুলোর আওতাধীন 'চেরাগী মহালসমূহও' বিভিন্ন ব্যক্তির মালিকানায় চলে গিয়েছে।

রামসিংহের আমলে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিবেশীদের সাথে জৈন্তিয়া রাজ্যের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। ১৮২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব সিলেটের বালাউট পরগনার দুজন জমিদার (মোহাম্মদ জমা এবং মোহাম্মদ আমিন) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে একটি পিটিশন দাখিল করেন যে, তারা জৈন্তিয়ার রাজার এক প্রজার কাছে কিছু ভূমি হারিয়েছেন। এই ঘটনা জৈন্তিয়া-ব্রিটিশ সম্পর্কে কোন প্রভাব ফেলেনি। জৈন্তিয়া রাজ্যের সাতবাক পরগনার পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ এলাকার দু-একটি জায়গা জৈন্তিয়াপুরীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল (বালাউট পরগনার জমিদারদের অভিযোগ এবং দূর্গাদলইর দীঘির অস্তিত্ব থেকে তা প্রমাণিত হয়)। এসব জায়গা ছিল জনবসতিশূণ্য পশুচারণভূমি কিংবা শিকারের এলাকা। তাই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এসব এলাকায় জৈন্তিয়াপুরীদের উপস্থিতি নিয়ে কখনও বিচলিত হননি।

১৭২৫ শকাব্দ বা ১৮০৩ সালে রাজা রামসিংহ আহোমের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে আহোমরাজের কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। এই দূতের নাম ছিল রামচন্দ্র মজুমদার। তিনি আহোমরাজ কমলেশ্বর সিংহের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দুর্গম পাহাড়ি পথ (গোভার পথ) পাড়ি দিয়ে কুলং নদী

অতিক্রম করেছিলেন। কমলেশ্বর সিংহের সাথে রামসিংহের এই সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা খুব একটা কার্যকর হয়নি। আহোমরাজের মৌন সম্মতিতেই আহোম সীমান্তের নিকটবর্তী নারতিয়াং পুঞ্জির দলই বর্মণ কুওর রাজা রামসিংহের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তিনি জয়ন্তীপুর ও আহোমের মধ্যবর্তী গোভার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। আহোমরাজের অনুগত কিছু গারো, কাছাড়ি এবং মিকির সরদার বর্মণ কুওরের এসব বিদ্রোহী কার্যকলাপে মদদ দিয়েছিলেন। অবশ্য বর্মণ কুওরের এই বিদ্রোহ ছিল একটি তুচ্ছ বিদ্রোহ এবং জৈন্তিয়া রাজ্যে এর তেমন কোন প্রভাব পড়েনি।

অধ্যায় তেত্রিশ
জৈন্তিয়া-ব্রিটিশ মৈত্রীসম্পর্ক

(১৮২৪ সাল – ১৮৩২ সাল)

রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের শাসনামলে জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলো এমন এক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় যা ইতোপূর্বে কখনও এই স্বাধীন রাজ্যগুলোর অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে ওঠেনি। এই নতুন শক্তিটির নাম ছিল বার্মা (বর্তমানের মিয়ানমার)। জৈন্তিয়া এবং এর প্রতিবেশী রাজ্যগুলো বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ালেও এতে কোন রাজ্যের অস্তিত্ব বিলীন হয়নি। সাময়িক জয়-পরাজয়ের পর রাজ্যগুলোর সীমানা ও সম্পর্ক আগের অবস্থায়ই ফিরে যেতো। কিন্তু বর্মী আক্রমণ ছিল ভিন্ন ব্যাপার। বার্মা কোন ছোটখাটো রাজ্য ছিল না। এটি ছিল একটি আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তি। ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের দখলে রেখে দেওয়ার সক্ষমতা বর্মীদের ছিল।

তাদের আধিপত্যবাদী নীতির প্রথম শিকার হয় মণিপুর। এরপর হয় আহোম। একসময় কাছাড়ি রাজ্যও তাদের দখলে চলে যায়। এরপর তারা জৈন্তিয়া ও সিলেটেও প্রবেশের পরিকল্পনা করে। এমন পরিস্থিতিতে বর্মীদের আঞ্চলিক আধিপত্য ঠেকানোর জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা বর্মীদের সাথে একটি বড় ধরণের যুদ্ধের প্রস্তুতি আগেই নিয়ে রেখেছিল। ১৮২৪ সালের ৫ মার্চ তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বর্মী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বর্মীরা জৈন্তিয়া ও সিলেটে প্রবেশের আগেই তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের অভিযান শুরু হয়ে যায়। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল আহোম, মণিপুর ও কাছাড়ি রাজ্য থেকে বর্মীদেরকে বিতাড়িত করা।

ব্রিটিশদের এই অভিযানে জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহের সহায়তা ছিল খুবই জরুরী। তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি ডেভিড স্কট অনেক চেষ্টার পর রাজা রামসিংহের সাথে একটি কার্যকর মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে তোলতে পেরেছিলেন। ১৮২৪ সালের ১০ জানুয়ারি 'রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তি' নামে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক মৈত্রীসম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে রাজা রামসিংহ একদিকে যেমন ব্রিটিশদের মিত্র হয়েছিলেন তেমনি অন্যদিকে তিনি বর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জৈন্তিয়ার সাথে

ব্রিটিশদের এই মৈত্রীসম্পর্ক অটুট ছিল। তবে তাঁর মৃত্যুর পর সম্পর্কের এই চিত্র বদলে গিয়েছিল।

এক. মণিপুর, আহোম ও কাছাড়ি রাজ্যে বর্মী আগ্রাসন (১৮১৭-১৮২৪ সাল)

১৮১৩ সালে বর্মীরা মণিপুর রাজ্যটিকে তাদের অনুগত রাজ্যে পরিণত করেছিল। ১৮১৯ সালে মণিপুরের রাজা মারজিৎ সিং বর্মীদের আনুগত্য অস্বীকার করে বসেন। এর পরিণাম হয় ভয়াবহ। বর্মী সেনাপতি মহাবান্দুলা এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে মণিপুরে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনীর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসের মুখে টিকতে না পেরে হাজার হাজার মণিপুরী নিজ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের একটি বড় অংশ আশ্রয় নেয় কাছাড়ি রাজ্যে। অনেকে ব্রিটিশশাসিত সিলেটেও আশ্রয় নেয়। মণিপুরের রাজা মারজিৎ সিং আশ্রয় নিয়েছিলেন কাছাড়ি রাজ্যে। বর্মীদের হাতে মণিপুরের পতনের এই অধ্যায়টি মণিপুরীদের ইতিহাসে 'চাহি তারেত খুনতাকপা' (সাত বছরের ধ্বংসলীলা) নামে পরিচিত।

মণিপুরের মতো আহোম রাজ্যটিও বর্মী আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল। ১৮১৭ সালে বর্মীরা আহোমে আক্রমণ চালিয়ে বিপুল অর্থ লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। ১৮১৯ সালে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা রাজ্যটিতে আবারও আক্রমণ চালিয়েছিল। ১৮২১ সালে তারা রাজ্যটিকে স্থায়ীভাবে দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করে। বর্মী সেনাপতি তিলওয়ার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। ১৮২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আহোমের রাজধানী গড়গাঁও দখল করে নিয়েছিলেন। আহোমের রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ (সুদিংফা) বর্মী আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিঁছু হটেছিলেন। তিনি রাজ্যের পশ্চিমদিকে সরে গিয়ে নিজের সৈন্যদেরকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। রাজধানী পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি শিখদের সহায়তা চেয়েছিলেন।

শিখদের সহায়তায় তিনি গৌহাটিতে একটি সৈন্যদল গড়ে তোলেছিলেন। ১৮২১ সালের মে মাসে এই সৈন্যদল ভুটান থেকে বর্মীদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনার পর, ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্মী সেনাপতি তিলওয়া একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে সুদিংফার বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

এতে সুদিংফার বাহিনী পিঁছু হটে প্রথমে আসাম চকি এবং এরপর ব্রিটিশ রাজে আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা পুনর্গঠিত হয়ে (মূলত শিখদের যোদ্ধাদের নিয়ে) শীঘ্রই পাল্টা অভিযান শুরু করে। তারা অক্টোবর মাসের মধ্যে আসাম চকি এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে গড়গাঁও পুনরুদ্ধার করে। ১৮২২ সালের ১৫ মার্চ তারিখে তারা জড়হাটের নিকটস্থ মহাগড়ে শিবির স্থাপন করে।

এই সংবাদ পেয়ে বর্মী রাজা তাঁর অপর সেনাপতি মহাবান্দুলার নেতৃত্বে ২০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী পাঠান (যারা ইতোপূর্বে মণিপুর দখল করেছিল)। এই বাহিনী সুদিংফার বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৮২২ সালের এপ্রিল মাসে সুদিংফার বাহিনী মহাবান্দুলার সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়ে প্রথমে গুয়াহাটি এবং পরে আসাম চকিতে পিঁছু হটে। সেখানেও বর্মীদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। ১৮২২ সালের জুন মাসে বর্মী সেনাপতি তিলওয়ার বাহিনী সুদিংফার বাহিনীকে পরাজিত করে আসাম চকি থেকে হটিয়ে দেয়। দু-দুবার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুদিংফা তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে ব্রিটিশ রাজে আশ্রয় নেন। এরপর বর্মী সেনাপতি তিলওয়াকে আহোমের রাজা ঘোষণা করা হয়। এর ফলে রাজ্যটিতে ছয় শতকের পুরানো আহোম শাসনের অবসান ঘটে এবং এটি সরাসরি বর্মী সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায়।

বর্মীদের হাতে আহোম ও মণিপুরের পতনের ঘটনা কাছাড়ি রাজ্যের নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। কাছাড়ি রাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল একজন রাজা। নিজের রাজ্যের ওপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তিনি ইতোপূর্বে মণিপুরীদের হাতে রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন। মণিপুরী রাজা মারজিৎ সিং-এর ভাই চৌরজিৎ সিং ও গম্ভীর সিং কাছাড়ি রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। বর্মীদের হাতে মণিপুরের পতনের পর মারজিৎ সিং-ও কাছাড়ে এসে একটি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলটি ছিল হাইলাকান্দি। মণিপুরী রাজপরিবারের তিন ভাই কাছাড়ি সমতলকে এমনভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে, বর্মীদের হাত থেকে এই রাজ্যটিকে রক্ষার দায়িত্ব তাদের কাঁধেই পড়েছিল।

১৮২০ সালের প্রথমদিকে কাছাড়ি রাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণ নিজের রাজ্য ছেড়ে ব্রিটিশ শাসিত সিলেটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি সম্ভাব্য বর্মী আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য এবং মণিপুরী ভাইদের হাত থেকে রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানির সহায়তা চেয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানি কর্তৃপক্ষ হুট করে কাছাড়ি রাজ্যে কোন হস্তক্ষেপে রাজি ছিলেন না। তারা জানতেন, এতে করে বর্মীদের সাথে একটি বড় ধরণের আঞ্চলিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তারা দূর থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলেন। বর্মীরা মণিপুর দখলের পর কাছাড়ের পাহাড়ি অঞ্চলেও প্রবেশ করেছিল। তারা সেখানকার ঘর-বাড়ি, মন্দির এবং শস্যক্ষেত্রের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল যা পাহাড়ি জনগণের জন্য চরম দুর্ভোগের কারণ হয়েছিল।

১৮২১-২২ সালে কাছাড়ি রাজ্যে তাদের উপস্থিতি আরও সুদৃঢ় হয়। এতে রাজ্যটির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে যায়। শুধু তাই নয়, পার্শ্ববর্তী জৈন্তিয়া ও ব্রিটিশ শাসিত সিলেটের জন্যও এটি হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাছাড়ি রাজ্যে বর্মী সৈন্যদের প্রবেশের ঘটনা কলকাতার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করেছিল। তারা এটিকে তাদের সীমান্ত নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন (যেহেতু কাছাড়ি রাজা তাদের 'আশ্রিত' ছিলেন)। তাই বর্মীদের উত্থান ঠেকানোর জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ১৮২৩ সালে কাছাড়ের পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটে। বর্মীরা তখন কাছাড়ি সমতলেও ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেছিল। মণিপুরী ভাইরা এসব আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হচ্ছিলেন।

তাই কাছাড়ি রাজার মতো তারাও ব্রিটিশদের সহায়তা চাইলেন এবং সিলেট শহরে একটি অস্থায়ী আবাস গড়ে তোললেন। তাদের সাথে মণিপুরী জাতির শত শত মানুষও সিলেট শহরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ১৮২৩ সালে চৌরজিৎ সিং, মারজিৎ সিং এবং গম্ভীর সিং সিলেট শহরের মির্জাজাঙ্গাল ও লামাবাজার এলাকায় বিশাল জায়গা কিনে শত শত মণিপুরীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা সেখানে একটি রাজবাড়ি বানিয়েছিলেন এবং মণিপুরী মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজবাড়িটির কিছু অংশ আজও অবশিষ্ট আছে। এটি স্থানীয়ভাবে 'মণিপুরী রাজবাড়ি' নামে পরিচিত। মন্দিরটি বর্তমানে 'তিন মন্দির' নামে পরিচিত। এটি মূলত তিন মনিপুরী দেবতা লাইরেম্বি, পাখংপা ও নোংশাবার মন্দির।

১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বর্মী সৈন্যরা কাছাড়ের ভেতর দিয়ে জৈন্তিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। এতে ব্রিটিশরা বুঝতে পারল, বর্মীদের সাথে একটি বড় ধরণের যুদ্ধের সময় চলে এসেছে। তাই তড়িঘড়ি করে তারা তাদের প্রতিরক্ষা

কৌশল নির্ধারণ করল। জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সাথে দুটি প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং মণিপুরের গম্ভীর সিং-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী (মনিপুর লেভি) গঠন ছিল এই প্রতিরক্ষা কৌশলের অংশ। ১৮২৪ সালের ৬ মার্চ কাছাড়ি রাজার সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়। এটি বদরপুর চুক্তি (Treaty of Badarpur) নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে ব্রিটিশরা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণকে কাছাড়ি রাজ্যের বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৮২৪ সালের ১০ মার্চ জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আরেকটি চুক্তি হয়েছিল। এটি রামসিংহ-ডেভিট স্কট চুক্তি (Treaty of Ram Singh-David Scott) নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে ব্রিটিশরা রামসিংহকে জৈন্তিয়ার বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।



চিত্রঃ সিলেট শহরস্থ মণিপুরী রাজবাড়ি

দুই. ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে জৈন্তিয়ার ভূমিকা (১৮২৪-১৮২৬ সাল)

১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কাছাড়ি রাজ্যে অবস্থানরত বর্মী সৈন্যরা জৈন্তিয়ার সীমানার দিকে অগ্রসর হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, বর্মী সৈন্যরা জৈন্তিয়া ও সিলেটের ভেতর দিয়ে আহোমের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন চাঞ্চল্যকর সংবাদ পেয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তড়িৎ প্রতিক্রিয়া দেখান। কোম্পানির গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি ডেভিড স্কট সাথে সাথেই বর্মীদেরকে সতর্ক করেন। বর্মী সেনাপতির কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি এমন কাজ করতে নিষেধ করেন। শুধু তাই নয়, জৈন্তিয়া ও সিলেটে বর্মী সৈন্যদের প্রবেশ ঠেকাতে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে জৈন্তিয়ার রাজার সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। তাই ডেভিড স্কট অতিসত্বর জৈন্তিয়ার রাজার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করলেন।

বর্মীদের হাত থেকে ব্রিটিশশাসিত সিলেটের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ডেভিড স্কট একটি নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করেছিলেন। এই কৌশল অনুযায়ী তিনি জৈন্তিয়া, কাছাড়ি রাজ্য ও মণিপুরকে সিলেট ও বার্মার মধ্যবর্তী 'বাফার এলাকা' বানাতে চেয়েছিলেন। এই কৌশলের মধ্যে রাজ্যগুলোর অস্তিত্ব বিলোপ করার কোন পরিকল্পনা লুকিয়ে ছিল না। তবে এই কৌশলটি কার্যকর হলে রাজ্যগুলো যে বর্মী ও ব্রিটিশদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে তাতেও কোন অস্পষ্টতা ছিল না। তাই জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহ হুট করে ব্রিটিশদের পক্ষ নিতে চাচ্ছিলেন না। যেহেতু তাঁর রাজ্যটি তখনও বর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়নি, তিনি ডেভিড স্কটের সাথে সুসম্পর্ক রাখলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে কোন প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাচ্ছিলেন না।

রাজা রামসিংহ ডেভিড স্কটকে কথা দিলেন যে, যদি তাঁর রাজ্যটি বর্মী সৈন্যদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার চূড়ান্ত সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে তিনি অবশ্যই ডেভিড স্কটের প্রস্তাবে সাঁড়া দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। ডেভিড স্কটও কথা দিলেন যে, যদি বর্মীদের মোকাবিলায় রাজা তাঁর লোকবল মোতায়েন করেন তাহলে তাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে কিছু সৈন্য দিয়ে সহায়তা করা হবে। একইসাথে তিনি রাজাকে এই মর্মে সতর্ক করলেন যে, বর্মীদের সাথে আঁতাতের চেষ্টা করলে কিংবা তাদেরকে জৈন্তিয়ায় প্রবেশের সুযোগ দিলে রাজা ব্রিটিশদের শত্রু বলে বিবেচিত হবেন। রাজা এমন সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিলেন। এরপর তিনি একটি নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলার দিকে মন দিলেন।

স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি রচিত *মেমোরেন্ডাম অন দ্য নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অভ বেঙ্গল* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাজা রামসিংহ তাঁর রাজ্যে সম্ভাব্য বর্মী আক্রমণ ঠেকানোর জন্য কয়েক হাজার তীরন্দাজ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বাহিনীটিকে তাদের পক্ষের বাহিনী হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। এদিকে কাছাড়ে অবস্থানরত বর্মী সেনাপতিও জৈন্তিয়ার রাজাকে নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করছিলেন। তিনি রাজার কাছে দূত মারফৎ একটি পত্র পাঠালেন। এই পত্রে তিনি জৈন্তিয়ার সাথে আহোমের পুরানো সম্পর্কের দোহাই দিয়ে রাজাকে অনুরোধ করলেন যে, আহোমে যেহেতু এখন বর্মীদের শাসন চলছে সেহেতু রাজার উচিত হবে 'আহোমের শাসক হিসেবে' বর্মীদের সাথেই সম্পর্ক রাখা। বর্মী সেনাপতি রাজাকে তাঁর কাছাড়স্থ সৈন্যশিবিরে গিয়ে সাক্ষাৎ করার অনুরোধও জানিয়েছিলেন।

রাজা রামসিংহ বর্মী সেনাপতির এসব উদ্ভট প্রস্তাবে কোন সাঁড়া দিলেন না। বরং তিনি নিজ রাজ্যবাসীদেরকে নিয়ে রাজ্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেকোন ধরণের লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। বর্মী সেনাপতির প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার কিছুদিন পর বর্মী সৈন্যদের একটি ছোটখাটো দল জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়। এই জায়গাটি ছিল ব্রিটিশ শাসিত সিলেটেরও সীমান্তবর্তী জায়গা। তাই একজন ব্রিটিশ অফিসারের নেতৃত্বে ১৫০ জন সৈন্যের একটি দল তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এসব কোম্পানি সৈন্যের সাথে জৈন্তিয়ার কিছু সৈন্যও যোগ দিয়েছিল। উভয়পক্ষই পূর্ব জৈন্তিয়া বা পূর্ব সিলেটের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। এই ঘটনার পর ডেভিড স্কট রাজা রামসিংহকে আবারও ব্রিটিশদের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিলেন।

রাজা রামসিংহ এবার আর ডেভিড সাহেবের কথা ফেলতে পারলেন না। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে রাজি হলেন। চুক্তির শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য ডেভিড স্কট নিজেই জৈন্তিয়ায় হাজির হন। তৎকালীন সময়ে জৈন্তিয়ার সাথে সিলেট শহরের যোগাযোগের মূল মাধ্যম ছিল সারী-গোয়াইন নদী। সিলেটের সালুটিকর থেকে নৌপথে জৈন্তিয়ায় যেতে একদিন সময় লাগতো। সিলেট থেকে জৈন্তিয়ায় আগত নৌকাগুলো প্রথমে সারী নদীর তীরবর্তী রাজাগঞ্জে থামতো। এটি ছিল জৈন্তিয়ার একটি ব্যস্ত ঘাট বা নৌ-বন্দর। ১৮২৪ সালের ১০ মার্চ ডেভিড স্কট এখানেই রাজা রামসিংহের সাথে

সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের দীর্ঘ আলোচনার পর চুক্তির শর্তসমূহ নির্ধারিত হয় এবং উভয়েই তাতে স্বাক্ষর করেন।

এই চুক্তি অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বর্মীদের সাথে যুদ্ধের প্রয়োজনে জৈন্তিয়ার ভূমি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে। এটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য অনেক বড় কৌশলগত সুবিধা। মূলত আহোমে অভিযান চালানোর জন্যই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জৈন্তিয়ার রাজার কাছ থেকে এই কৌশলগত সুবিধাটি আদায় করে নিয়েছিল। যদি রাজা এই সুবিধাটি না দিতেন তাহলে ব্রিটিশদেরকে আহোম অভিযানের জন্য প্রথমে কাছাড়ি রাজ্য দখল করতে হতো এবং এরপর কাছাড়ি রাজ্যের ভেতর দিয়ে আহোমে অভিযান চালাতে হতো। এতে তাদের যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা অনেক কমে যেতো। জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতরের রাস্তা (জয়ন্তীপুর-গোভা গিরিপথ) দিয়ে আহোমে অভিযানের অনুমতি লাভ করায় ব্রিটিশরা তাদের সুবিধামতো রণক্ষেত্রে বর্মীদেরকে মোকাবিলার সুযোগ পেয়ে যায়।

বর্মীরা কাছাড়ি রাজ্য দখল করে সেখানকার সমতলে এমনভাবে শক্তি সংহত করেছিল যে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া ব্রিটিশদের পক্ষে সেখানে প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। আর ব্রিটিশরা কাছাড়ি সমতল দখল করলেও যাতে আহোমের দিকে অগ্রসর হতে না পারে সেজন্যও বর্মীরা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিল। কাছাড় ও আহোমের মধ্যবর্তী দুর্গম অঞ্চলে তারা বেশ শক্ত অবস্থান গড়ে তোলেছিল। 'রামসিংহ-ডেভিট স্কট চুক্তি' তাদের এই পুরো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই অকার্যকর করে দেয়। চুক্তিটি ব্রিটিশদেরকে জৈন্তিয়ার ভেতর দিয়ে আহোমে প্রবেশের অভাবনীয় সুযোগ এনে দিয়েছিল। তাই তারা দেরী না করে চুক্তি সম্পাদনের পরপরই আহোমে অভিযান শুরু করে দেয়। মার্চ মাসেই কোম্পানি সৈন্যরা জৈন্তিয়ায় প্রবেশ করে গোভার গিরিপথে 'একটি সামরিক সরবরাহ লাইন' প্রতিষ্ঠা করে।

এপ্রিল মাসে ক্যাপ্টেন ফ্লর্সবার্গের নেতৃত্বাধীন ৩ কোম্পানি সৈন্য নিয়ে ডেভিড স্কট গোভার গিরিপথ অতিক্রম করেন। এই সৈন্যরা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ২৩ তম রেজিমেন্টের আওতাধীন দেশীয় পদাতিক সৈন্য। রাজা রামসিংহ তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্রিটিশদের এই আহোম অভিযানের প্রস্তুতিতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন। যতোদিন ব্রিটিশরা আহোম অভিযানে ব্যস্ত ছিল ততোদিন রাজা চুক্তি মেনে তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিলেন। রাজার

একদল সৈন্যও ব্রিটিশদের সাথে আহোম অভিযানে যোগ দিয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষই একে-অপরের প্রতিরক্ষায় সামরিক সহযোগিতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। রাজা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তবে তুচ্ছ একটি বিষয়ে ব্রিটিশদের সাথে তাঁর দ্বিমত হয়েছিল।

ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে বর্মীদের এই যুদ্ধটি প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ নামে পরিচিত) সময়ে রাজা রামসিংহ আহোমের চাপারমুখে একটি সেনা-চৌকি স্থাপন করেছিলেন। ডেভিড স্কট এটি সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রাজা তা শুনেননি। এরপর রবার্টসন নামে আরেকজন ব্রিটিশ কর্মকর্তাও এটি সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রাজা তা-ও শুনেননি। এই ঘটনাটি ব্রিটিশদের সাথে তাঁর সম্পর্কে কোন প্রভাব ফেলেনি। ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের সময়ে তিনি যেমন ব্রিটিশদের মিত্র ছিলেন, যুদ্ধের পরেও তেমনি তাদের মিত্র ছিলেন। যুদ্ধে ব্রিটিশরা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল। পুরো আহোম উপত্যাকা তাদের দখলে চলে গিয়েছিল। এই সাফল্যের পেছনে রাজার মূখ্য অবদান ছিল। তাই তিনি আমৃত্যু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন মিত্র বিবেচিত হয়েছিলেন।

ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছিল ১৮২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন বার্মা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে ইয়ানদাবো চুক্তি (Treaty of Yandabo) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে আহোম, মণিপুর, কাছাড়ি রাজ্য, আরাকান ও তেনাসারিম এর নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করেছিল। ওই দিন থেকে এসব অঞ্চল প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরই আওতায় চলে গিয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধু জৈন্তিয়া রাজ্য। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যে এই রাজ্যটি তাদের একটি মিত্র রাজ্য হিসেবে স্বাধীন থেকে গিয়েছিল। তবে রাজা রামসিংহের মৃত্যুর তিন বছর পর জৈন্তিয়ার এই স্বাধীনতা আর থাকেনি। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশরা রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তি লঙ্ঘন করে রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিল।

তিন. রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তি (১৮২৪ সাল)

১৮২৪ সালের ১০ মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তির ধারা ছিল পাঁচটি। উভয়পক্ষ কী কী শর্তে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন তা এই পাঁচটি ধারায় বর্ণিত ছিল। তৎকালীন যুগে আজকের মতো শত শত পৃষ্ঠার বর্ণনা সম্বলিত

রাষ্ট্রীয় চুক্তির কোন প্রচলন ছিল না; এক বা দুই পৃষ্ঠার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় চুক্তি হয়ে যেতো। রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তি ছিল এমনই একটি চুক্তি। চুক্তিটির প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং রাজার মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য সর্বদা বজায় থাকবে। রাজা কোম্পানির অনুগত থাকলে কোম্পানি জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রতিরক্ষা (তৃতীয় পক্ষের আক্রমণ থেকে) নিশ্চিত করবে। চুক্তির দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে, জৈন্তিয়া রাজ্যের সরকারব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে রাজার অধীনেই থাকবে এবং সেখানে ব্রিটিশ আইন-আদালতের কোন এখতিয়ার থাকবে না। রাজা তাঁর প্রজাদের কল্যাণের প্রতি মনোযোগী থাকবেন এবং চিরায়ত প্রথা ও রীতি-নীতি অনুসারেই শাসনকাজ পরিচালনা করবেন। তবে যদি তিনি শাসনব্যবস্থার অপব্যবহার করেন (যা কোম্পানির জন্য আপত্তিকর) তবে তিনি কোম্পানির গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী তা সংশোধন করবেন।

চুক্তির তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জৈন্তিয়া রাজ্যকে বহিরাগত শত্রুদের হাত থেকে রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে। জৈন্তিয়ার রাজা এবং অন্য কোন রাজ্যের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানেও কোম্পানি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করবে। রাজা কোম্পানিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মেনে চলবেন এবং ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ছাড়া তিনি কোনো বিদেশী শক্তির সাথে রাজনৈতিক চিঠিপত্র চালাচালি করবেন না বা যোগাযোগ রাখবেন না। চুক্তির চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছে, যদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ববর্তী অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে রাজা তাঁর সকল জনশক্তি দিয়ে কোম্পানিকে সহযোগিতা করবেন। এমন সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে রাজা (তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব) কোম্পানিকে অন্যান্য সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করবেন। চুক্তির পঞ্চম ধারায় বলা হয়েছে, জৈন্তিয়ার রাজা স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিচার বিভাগ এবং আফিম ও লবণ বিভাগের কার্যাবলী বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

চুক্তির শেষ ধারাটি খুবই বিস্ময়কর! ব্রিটিশ শাসিত একটি অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় কাজে জৈন্তিয়ার রাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার শর্ত কেন চুক্তিতে যুক্ত করা হল তা কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেননি। খুব সম্ভবত, সিলেট জেলার ব্রিটিশ প্রশাসনের লোকজনকে ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের ময়দানে পাঠানোর প্রয়োজন দেখা

দিয়েছিল। তাই সিলেট জেলার স্বাভাবিক সরকারি কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মচারীদের (বিষয়ধরদের) সহায়তা নিয়েছিলেন। চুক্তির এই ধারা থেকে পরিস্কার হয় যে, ব্রিটিশরা একতরফাভাবে জৈন্তিয়ায় প্রবেশ করেনি; জৈন্তিয়ার বিষয়ধররাও সিলেটে প্রবেশ করেছিলেন এবং কোম্পানির সরকারি কাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে সিলেটের সরকারি কাজের দায়িত্ব যেভাবে জৈন্তিয়ার রাজাকে দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয় যে, চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র ছিল না। জৈন্তিয়ার রাজা অত্যন্ত কার্যকরভাবেই ব্রিটিশদের মিত্র ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় লিখিত মূল চুক্তিটি হুবহু নিচে তোলে ধরা হল।

Treaty with Rajah Ram Sing of Jynteah, 1824

Treaty concluded between David Scott, Esq., Agent to the Governor-General, on the part of the Honorable East India Company and Rajah Ram Sing, ruler of Jy-Jynteepore of Jynteah.

Article 1

Rajah Ram Sing acknowledges allegiance to the Honorable Company, and places his country of Jynteah under their protection. Mutual friendship and amity shall always be maintained between the Honorable Company and the Rajah.

Article 2

The internal government of the country shall be conducted by the Rajah and the jurisdiction of the British Courts of Justice shall not extend there. The Rajah will always attend to the welfare of his subjects, and observe the ancient customs of government, but should any unforseen abuse arise in the administration of affairs, he agrees to rectify the same agreeably to the advice of the Governor-General in Council.

Article 3

The Honorable Company engages to protect the territory of Jynteah from external enemies, and to arbitrate any differences that may arise between the Rajah and other States. The Rajah agrees to abide by such arbitration, and to hold no political correspondence or communication with foreign powers, except with the consent of the British Government.

Article 4

In the event of the Honorable Company being engaged in war to the eastward of the Berhampooter, the Rajah engages to assist with all his forces, and to afford every other facility in his power in furtherance of such military operations.

Article 5

The Rajah agrees, in concert with the British local Authorities, to adopt all measures that may be necessary for the maintenance, in the district of Sylhet, of the arrangements in force in the Judicial, Opium and Salt Departments.

Executed this 10th of March 1824, corresponding with the 28th of Fagoon 1230 B.S., at Rajahgunge.

Seal and Signature of Rajah Rah Sing of Jynteah

D. Scott, Agent to the governor general

অধ্যায় চৌত্রিশ
জৈন্তিয়া রাজ্যের শিলালিপি

(ঢুপির পাহাড়ের নিচে প্রাপ্ত ১৭১৯ শকাব্দের শিলালিপি)

জৈন্তিয়ার রাজাদের হাতে সৃষ্ট যেসব দলিল ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো চিঠি, কিছু মুদ্রা এবং সাতটি তাম্রফলক। একাবিংশ শতকে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের এসব মূল্যবান দলিলের সাথে আরেকটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। এর নাম শিলালিপি। ২০০৭ সালে এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে জৈন্তিয়া রাজ্যের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কিংবা ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানে এটি আবিষ্কৃত হয়নি। এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল পুরোপুরি কাকতালীয়ভাবে। সারীঘাটের নিকটস্থ ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রামেশ্বর শিবমন্দিরের আঙ্গিনার মাটির নিচে এর সন্ধান মিলেছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি বেলগাছের নিচে মাটি খননের সময় এটি পাওয়া গিয়েছিল।



চিত্র: ঢুপির মঠের শিলালিপি

ঢুপির পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত মন্দিরটি একটি স্থানান্তরিত মন্দির। বিগত শতকের গোড়ার দিকে ঢুপির মঠ বা রামেশ্বর শিবমন্দিরে রক্ষিত শিবলিঙ্গটিকে পাহাড়ের নিচে স্থানান্তর করে নতুন মন্দির চালু করা হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঢুপির মঠের সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরটি (রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ কর্তৃক নির্মিত) ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেখানে ধর্মীয় কার্যক্রম চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরে উপাসনা করতে এসে পূণ্যার্থীরা বেশ অসুবিধায় পড়তেন। তাই একসময় মন্দিরটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে পাহাড়ের দক্ষিণ পাশের সমতল ভূমিতে একটি নতুন মন্দির চালু করা হয় এবং ভগ্নপ্রায় মন্দিরের শিবলিঙ্গটিকে এখানেই স্থাপন করা হয়। নতুন মন্দিরটিকে পুরাতন মন্দিরের নামেই (রামেশ্বর শিবমন্দির) চালু করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে একটি সাধারণ মাটির ঘরেই এই নতুন মন্দিরের কার্যক্রম চলতো। ২০০৬ সালে মন্দিরটিকে পাকা করা হয় এবং এর চারপাশের মাটি কেটে সমান করা হয়। ২০০৭ সালের ২২ মার্চ রাতে তিনদিন ব্যাপী অষ্টপ্রহর কীর্তন উপলক্ষে এখানে বেশ কিছু পূণ্যার্থী ভীড় করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় তারা কিছুটা অসুবিধায় পড়ে যান। মন্দির প্রাঙ্গনে পানি জমা হওয়ায় তাদের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই পানি অপসারণের জন্য কয়েকজন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক রাতের আধারেই একটি নালা খননের কাজ শুরু করে দেন। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বেল গাছের নীচ পর্যন্ত নালাটি অগ্রসর হওয়ার পর তারা মাটির নিচে একটি ভারী পাথর বা শিলার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

একটি সাধারণ পাথর ভেবেই তারা এটিকে নালার পথ থেকে উঠিয়ে মাটির স্তুপের সাথে ফেলে রাখেন। যে স্বল্প আলোর সাহায্যে তারা কাজ করছিলেন তাতে এই পাথরটির কোন বিশেষত্ব তাদের চোখে পড়েনি। পরদিন ২৩ মার্চ সকালে লোকজন দেখতে পায় যে, পাথরটির গায়ে কিছু একটা লেখা রয়েছে। রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় পাথরটির গায়ের কাঁদা কিছুটা পরিস্কার হয়েছিল। তাই পাথরের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলো সবার চোখে ভাসছিল। পুরো লেখাটি বেশ দুর্বোধ্য হলেও প্রথম দুটি শব্দ থেকে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথম দুটি শব্দ ছিল “নমঃ শিবা”। তাই মন্দিরের পূণ্যার্থীর ভাবলেন যে, এই পাথরটির গায়ের লিপিতে হয়তো কোন ধর্মীয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই তারা পাথরটিকে পুরোপুরিভাবে পরিস্কার করে মন্দিরের সামনে এনে রাখেন। ইতোমধ্যে এই অদ্ভুত পাথরটির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় শত শত লোক এসে ভীড় করেছিল। তারা গভীর আগ্রহে দেখল যে, নয়টি ঢেউ খেলানো লাইনে এই পাথরটির গায়ে কিছু একটা লেখা রয়েছে। লেখায় ব্যবহৃত শব্দগুলো ছিল দুই শতক আগের প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। বাংলা ও সিলেটি নাগরী হরফের সংমিশ্রণে লিখিত এই সংস্কৃত শব্দগুলোর বেশিরভাগই ছিল দুর্বোধ্য। তবে দু-একটি শব্দ বেশ স্পষ্টভাবে পড়া যাচ্ছিল। যেমন- নমঃশিবা, মন্দির, স্থাপিত, শৈলশীর্ষ, কূজনকলি, শক ১৭১৯ ইত্যাদি। লিপিটি বেশ দুর্বোধ্য হলেও সবাই বুঝতে পারছিল যে, এই লিপিতে জৈন্তিয়ার রাজাদের আমলের কিছু মূল্যবান তথ্য রয়েছে।

জৈন্তিয়ার পুরাকীর্তিসমূহের চিত্রধারণের কাজে অভিজ্ঞ স্থানীয় আলোকচিত্রী ও কলেজ শিক্ষক মো. খায়রুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব ক্যামেরায় লিপিটির চিত্রধারণ করে তা সাংবাদিকদের হাতে তোলে দেন। স্থানীয় সাংবাদিক নূরুল ইসলাম বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছবিসহ লিপিটির সংবাদ প্রেরণ করেন। একই সাথে এর পাঠোদ্ধারের জন্যও চারদিকে যোগাযোগ চলতে থাকে। শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ লিপিটির কথা জানতে পেরে এর অর্থ উদ্ধারের আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লিপিটির কথা জানাজানি হওয়ার পরদিনই (২৪ মার্চ) শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের উপদেষ্টা এডভোকেট সন্তোষ কান্তি ভট্টাচার্য এর অর্থ উদ্ধারের জন্য সিলেট শহর থেকে জৈন্তাপুরে যান। তিনি লিপিটির পাঠোদ্ধার করে সবাইকে জানালেন যে, এটি মূলত ঢুপির পাহাড়ের উপরে স্থাপিত রামেশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্মারক।

এতে লেখা রয়েছে, “রাজা রামসিংহ পালের অনুমতিতে তদীয় স্মৃতি রক্ষার্থে পাপ বিমোচনের উদ্দেশ্যে অত্র শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হইল। রাম সিংহ রাজার পূর্বেই এই শিব পূজিত হইতেন। পাহাড়ের চূড়ায় অতি সুন্দর মনোরম পরিবেশে বৃক্ষাদি পরিবেষ্ঠিত স্থানে সৌধ আকারে শিবমন্দির নির্মিত হয়। বৈশাখদি মাস বিচারে সম্ভবত শ্রাবণ মাসে তা নির্মিত হয়। অগ্রাহয়নাদি মাস বিচারে তা সম্ভবত ফাল্গুন মাসে নির্মিত হয়। কৈলাশতীর্থ সমতূল্য এই স্থানটি সর্বদায় পাখির কলরবে মুখরিত বৃক্ষাদি শোভিত সিন্ধুর ন্যায় উচ্চাষিত স্থানে কীর্তনাদি হইত। শ্রী রামসিংহ পাল নামক ভূপাল অর্থাৎ নৃপতির অনুমতিতে তাহা লিখিত হইল। ইতি। ১৭১৯ শকাব্দ।”



চিত্র: ঢুপির মঠের শিলালিপি

লিপিটির অর্থ উদ্ধারের পর এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এটিকে সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তোলে দেওয়া হয়। তৎকালীন জৈন্তাপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন জিল্লুর রহমান। রামেশ্বর শিবমন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমূল্য চরণ পাল এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ তাঁর কাছে পাথরটি হস্তান্তর করেন। তিনি এই মূল্যবান পাথরটিকে সংরক্ষণের দায়িত্ব দেন জৈন্তাপুর থানা কর্তৃপক্ষকে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম পাথরটিকে থানায় নিয়ে যান। পাথরটিকে দেখার জন্য সেখানেও শত শত লোক ভীড় করেছিল। জৈন্তাপুর থানা কর্তৃপক্ষ প্রায় তিন বছর ধরে এই শিলালিপিটিকে নিজেদের হেফাজতে রাখেন।

এরপর আদালতের এক আদেশে পাথরটিকে সিলেট শহরস্থ ভাষাসৈনিক মতিন উদদীন আহমদ জাদুঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই জাদুঘরের পরিচালক ডাক্তার মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী বাহারের কাছে পাথরটি হস্তান্তর করেছিলেন তৎকালীন সিলেট জেলার পুলিশ সুপার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তখন থেকে পাথরটি এই জাদুঘরেই রয়েছে। জাদুঘরটির বর্তমান অবস্থান সিলেট শহরের দরগা গেইট এলাকায় অবস্থিত মুসলিম সাহিত্য সংসদের মাহবুব ভবনের সবচেয়ে উপরের তলায়। (বৃহত্তর সিলেটের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাদুঘর এটিই)

এখানে সংরক্ষিত পাথরটিকে পরিমাপ করে দেখা যায় এর ওজন প্রায় ৩৫ কেজি, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯.২৫ ইঞ্চি, প্রস্থ প্রায় ১৩.৭৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩ ইঞ্চি। পাথরের গায়ের লিপিটির চার দিকে ফুল ও পাতার নকশা খোদাই করা রয়েছে। দুটি চতুর্ভুজের মধ্যে এই নকশাটি আবদ্ধ রয়েছে। ছোট চতুর্ভুজের সীমানার মধ্যে লিপিটি খোদাই করা হয়েছে। এটি একটি ত্রিভুজ তরঙ্গ আকৃতির লিপি (triangle waveform script)। এর লাইনগুলো সরল নয়; এগুলো তরঙ্গাকৃতির। প্রতিটি লাইন বা তরঙ্গ চারটি ত্রিভুজ নিয়ে গঠিত হয়েছে। লিপিতে মোট লাইন বা তরঙ্গের সংখ্যা ৯ এবং মোট ত্রিভুজের সংখ্যা ৩৬। এমন অদ্ভুত আকৃতিতে লিপিটি কেন খোদাই করা হল তার কারণ অস্পষ্ট। হয়তো সৌন্দর্য্যের জন্যই এমন করা হয়েছে।

লিপিটি কবে খোদাই করা হয়েছিল তা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এর কারণ লিপির মধ্যেই এর সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে। লিপির শেষ লাইনের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, 'শক ১৭১৯'। 'শক' মানে হল 'শকাব্দ'। জৈন্তিয়া রাজ্যের বিভিন্ন চিঠিপত্র, মুদ্রা ও তাম্রফলকেও শকাব্দকে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশপূর্ব সময়ে ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী রাজ্যগুলোতে এই বর্ষপঞ্জিটির ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। একসময় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানেও এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জি বা খ্রিষ্টাব্দের সাথে এর ব্যবধান ৭৮ বছর। শকাব্দের সাথে ৭৮ বছর যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই হিসেব অনুযায়ী ১৭১৯ শকাব্দ মানে হল খ্রিষ্টীয় ১৭৯৭ সাল।

জৈন্তিয়ার রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ ১৭১৯ শকাব্দ বা ১৭৯৭ সালে ঢুপির পাহাড়ের উপরে একটি দৃষ্টিনন্দন শিবন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা স্মারক হিসেবে তিনি আলোচ্য শিলালিপিটি খোদাই করিয়েছিলেন। এই মন্দিরের কথা আরেকটি লিপিতেও উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি একটি তাম্রলিপি। তাম্রলিপি মানে হল তাম্রফলকে খোদাইকৃত লিপি। ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালে রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ এমন একটি লিপি খোদাই করিয়েছিলেন। এই লিপিতে ঢুপির পাহাড়কে 'কপোত পাহাড়' এবং এর উপরে স্থাপিত মন্দিরটিকে 'রামেশ্বর শিবমন্দির' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জনসাধারণের কাছে এই মন্দিরটি 'ঢুপির মঠ' নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ এই মন্দিরের চূড়াগুলো আজও যথাস্থানেই পড়ে আছে।

অধ্যায় পঁয়ত্রিশ
দ্বিতীয় রামসিংহের ভূমিদানের দলিল

জৈন্তিয়া রাজ্যের মোট সাতটি তাম্রফলক ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে। এসব ফলকে মোট নয়টি ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ রয়েছে (একটি ফলকে তিনটি দলিল রয়েছে)। রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের আমলের একটি এবং রাজা বিজয়নারায়ণের আমলের একটি ছাড়া বাদবাকি সবগুলো দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছে রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের আমলে। তবে এসব দলিলের বেশিরভাগই তাঁর নিজের ভূমিদানের দলিল নয় (বেশিরভাগই রানী কাশাসতীর ভূমিদানের দলিল)। রামসিংহের আমলের যেসব তাম্রফলক বা ভূমিদানের দলিল ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তার মধ্যে দুটি তাঁর নিজের। এর মধ্যে একটি ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালের এবং অপরটি ১৭৩১ শকাব্দ বা ১৮০৯ সালের।

স্যার এডওয়ার্ড গেইট জৈন্তিয়ার পাঁচটি তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ সালের ভূমিদানের দলিল। এই ফলকটি সম্পর্কে গেইট সাহেব তাঁর *Some Notes on Jaintia History* প্রবন্ধে বলেছেন, "In this plate is set forth the grant by Raja Rama-simha of some land for the temple of Siva which had been erected by him at Dhupi." এই ফলকটি অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্তেরও হস্তগত হয়েছিল। তিনি এটির পূর্ণ পাঠোদ্ধারের পাশাপাশি এটি নিয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেছিলেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধ থেকে ফলকটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায়।

ফলকটিতে লিপিবদ্ধ তথ্য অনুযায়ী, রাজা রামসিংহ কপোত পাহাড়ের উপরে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং ১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ সালে) জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই মন্দিরের সেবায়েতকে বেশ কিছু ভূমি দান করেছিলেন। ফলকে উল্লিখিত এই কপোত পাহাড়টি জৈন্তিয়ার ঢুপি গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে এটি ঢুপির টিলা বা ঢুপির পাহাড় নামে পরিচিত। ১৭২০ শকাব্দে রাজা রামসিংহ এই পাহাড়ের উপরে নির্মিত মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন

করেছিলেন এবং এর সেবায়েতকে আটটি উর্বর ভূমি দান করেছিলেন। ফলকটিতে মন্দিরের সেবায়েতকে 'রুখড়' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[102]

ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে, কপোত পাহাড়ের উপরে নির্মিত মন্দিরটির নাম রামেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও রুখড়ের ভরণপোষণের জন্য রাজা আটটি চাষযোগ্য ভূমি দান করেছিলেন। ফলকটিতে জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রদেশ বা পরগনাগুলোকে বলা হতো 'রাজ'। জয়ন্তীপুর রাজ ও খরিল রাজ এর উদাহরণ। ফলকে উল্লিখিত 'দেশমুখ' (অর্থাৎ দেশের প্রধান) শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, 'দেশ' নামে আরও উপবিভাগ বা জেলা ছিল, যার প্রত্যেকটি 'দেশমুখ' (দেশমুখ্য) উপাধিধারী একজন প্রশাসকের অধীনে ছিল।

১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ সালের) তাম্রফলক ছাড়াও আরেকটি তাম্রফলকে রাজা রামসিংহের ভূমিদানের দলিল লিপিবদ্ধ হয়েছিল। স্যার এডওয়ার্ড গেইট এবং অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত এটির সন্ধান পাননি। এটির সন্ধান পেয়েছিলেন বিশিষ্ট গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী।[103] তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল ছাতকের একটি গ্রামে। সেখানেই তিনি রাজা রামসিংহের ভূমিদানের তাম্রফলকের সন্ধান পেয়েছিলেন। নিজ গ্রামের এক প্রতিবেশী তাকে ফলকটি দেখিয়েছিলেন। এটি ছিল ১৭৩১ শকাব্দের (১৮০৯ সালের) একটি তাম্রফলক। এই ফলকে রাজা

[102] রুখড় (Rukhar) হলো শৈব দশনামী সম্প্রদায়ের অঘোরপন্থী সন্ন্যাসীদের একটি বিশেষ শাখা। এরা নাগা সন্ন্যাসীদের মতো আখড়ার সাথে যুক্ত থাকেন এবং শিবের উপাসক হিসেবে কঠোর নিয়ম ও সাধনা পালন করেন। এরা সাধারণত অন্ন বা সংসারের মায়া ত্যাগ করে কঠোর যোগী বা অবধূত হিসেবে জীবনযাপন করেন।

[103] শ্রী কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী এম.এ. ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক। একই সাথে তিনি ছিলেন ওই বিশ্ববিদ্যায়ের অফিসার ইনচার্জ অভ এক্সক্যাভেশন (প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যেসব খননকার্যের উদ্যোগ নেওয়া হতো তা কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো)। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে তিনি কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম হল- *প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দড়ো, Excavations at Bangarh, A Study of Ancient Indian Religions.*

রামসিংহ কর্তৃক জনৈক বলরাম বৈষ্ণবাধিকারীকে ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ ছিল।

এই বলরাম ছিলেন ছাতকের অধিবাসী। তাঁর মূল নাম ছিল বলরাম গোস্বামী। তিনি সংসারবিমুখ হয়ে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ছাতক থেকে জৈন্তিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন এবং লোকজনের কাছে বৈষ্ণবাধিকারী উপাধী লাভ করেছিলেন। ধার্মিকতা ও কঠোর তপস্যার জন্য বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠায় তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ তাকে ২৪ কেদার ভূমি দান করেছিলেন। এই ভূমিদানেরই দলিল হল ১৭৩১ শকাব্দের (১৮০৯ সালের) তাম্রফলক। বলরাম গোস্বামীর পরিবারের উত্তরসূরীরা এই ফলকটিকে বেশ যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে রাখতেন। গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীকে যিনি ফলকটি দেখিয়েছিলেন তিনি ছিলেন বলরাম গোস্বামীর ভাইয়ের বংশধর।

এক. ১৭২০ শকাব্দের (১৭৯৮ সালের) তাম্রফলক

১৯২১ সালের মার্চ মাসে অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত জানতে পারলেন যে, জৈন্তিয়াপুর থানার ঢুপির মন্দিরের (ভগ্নপ্রায়) মোহন্তের কাছে একটি তাম্রফলক রয়েছে।[104] এই খবর পাওয়ার পর পরই তিনি জৈন্তিয়াপুর চলে যান এবং ঢুপির মন্দিরের মোহন্তের কাছে রক্ষিত তাম্রফলকটি পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তিনি সিলেট শহরে ফিরে গিয়ে এই ফলকটির উপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি পরের বছর *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল এর জার্নালে* প্রকাশিত হয়। এর শিরোনাম ছিল "রামসিংহের ঢুপি তাম্রলিপি, ১৭২০ শকাব্দ"। অধ্যাপক গুপ্ত এই প্রবন্ধে তাম্রফলকটির যে পাঠোদ্ধার করেছেন তা নিম্নরূপ।

কপোত পাহাড়ের উপরে শ্রীল রামেশ্বর নামক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর এই মন্দিরের নিত্য পূজার জন্য রাজা রামসিংহ কিছু ভূমি দান করেন। ১৭২০

---

[104] রাজা রামসিংহ নির্মিত এই মঠ বা মন্দিরটি ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে মন্দিরের কয়েকটি চূড়া অক্ষত থেকে গিয়েছিল (আজও আছে)। অধ্যাপক গুপ্ত যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন হয়তো মন্দিরের অক্ষত চূড়াগুলিতেই ধর্মীয় উপাসনার কাজ চলতো।

শকাব্দের এক রবিবারে মন্দিরের রুখড়কে এসব ভূমি দেওয়া হয়। (লাইন ১-৪) ১৭২০ শকাব্দে কপোত পাহাড়ের মন্দিরে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপনের পর জয়ন্তীপুরের পুরন্দর (অর্থাৎ রাজা) রাজশ্রেষ্ঠ শ্রী শ্রী রামসিংহ তাঁর (রুখড়ের) ভরণপোষণের জন্য আটটি ভূমি দান করেন। (লাইন ৪-৭) এসব ভূমির আয় দিয়ে যাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে তারা হলেন: পরিব্রাজক শ্রী রুখড়, তাঁর শিষ্যগণ এবং শিষ্যদের শিষ্যগণ। আটটি খণ্ডে বিভক্ত এসব ভূমির বর্ণনা নিম্নরূপ। (লাইন ৭-৯) প্রথম ভূমিটি এই পাহাড়ের উত্তরে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে মূর্তিধর নামক এক দেশমুখের (আক্ষরিক অর্থে, দেশ বা জেলার প্রধান) ভূমি রয়েছে। এর পশ্চিম পাশে একটি মাটির শৈলশিরা (সেতু) রয়েছে। এর উত্তরের এলাকাটি দুইতলাভিটি নামে পরিচিত আর দক্ষিণে রয়েছে এই পাহাড়। এই ভূমিটি জয়ন্তীপুর রাজের (প্রদেশ বা পরগনা) অন্তর্গত চৈলাখেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে দুইশত কর্ষণ মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। (লাইন ৯-১৩) দ্বিতীয় ভূমিটি এই পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত। এর পূর্ব ও পশ্চিমে শৈলশিরা রয়েছে। উত্তরে নয়াখেলের অধিবাসীদের ভূমি রয়েছে এবং দক্ষিণে তাদের ঘরবাড়ি রয়েছে। এই ভূমিটি তাদের কাছ থেকেই অধিগ্রহণ করা হয়েছে। (লাইন ১৩-১৫) ছয় কেদারের তৃতীয় ভূমিটি এই পাহাড়ের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এটি মূর্তিধরের কাছ থেকে একশত চল্লিশ কর্ষণ মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। ছয় কেদারের চতুর্থ ভূমিটি নয়াখেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ছয় কেদারের পঞ্চম ভূমিটি ষাট কর্ষণ মূল্যের বিনিময়ে শ্রী-যুদা নামক এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। (লাইন ১৫-১৯) বারো হালের ষষ্ঠ ভূমিটি জগাদুভিয়াখলা নামে পরিচিত। এটি খরিল রাজে (প্রদেশ বা পরগনা) অবস্থিত। এই ভূমিটি অন্য একটি ভূমির সাথে বদল করা যাবে। সেটি বরবক্রের নিকটবর্তী তপাইবিলের বনভূমি অঞ্চলের বসতিপূর্ণ অংশের (খলাংগনি) সাথে সংযুক্ত রয়েছে। (লাইন ২০-২২) চার হালের সপ্তম ভূমিটি বনবাউরভাগে অবস্থিত। এটি সেনাপতির কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। (লাইন ২২-২৩) অষ্টম ভূমিটির পূর্বপাশে হৌলিসা নামক জলাভূমি (বিল) রয়েছে। পশ্চিমে রয়েছে গোভাদা নামক একটি জায়গা। উত্তরে রয়েছে শ্রীপুর এলাকা আর দক্ষিণদিকে রয়েছে বীরধলের উত্তর সীমানা। এই ভূমিটি রাণীর (মহাদেবী) কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। (লাইন ২৩-২৬)। যদি কেউ শিবের জন্য দানকৃত এসব ভূমি দখল করেন তাহলে তিনি হবেন একজন

হারামখোর এবং এই জগতের মঙ্গল বিনাশকারী। তারিখ: শকাব্দ ১৭২০, জ্যৈষ্ঠ মাসে, পূর্ণিমা তিথিতে (লাইন ২৮)।

১৯২২ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* অধ্যাপক কিশোরী মোহন গুপ্ত ১৭২০ শকাব্দের তাম্রফলক বা ঢুপি তাম্রলিপি নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটি হুবহু নিম্নরূপ।

JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, VOL XVIII (1922) (PAGE 73–79)

The Dhupi Copperplate Inscription of Ramasimha, Sakabda, 1720 (A.D. 1798)

By Prof. Kishori Mohan Gupta
Assam Educational Service

Preliminary

In March, 1921, I got information of a copperplate lying in the possession of the Mohanta of the temple (now in ruins) at Dhupi within the jurisdiction of the Jaintiapur Thana in the District of Sylhet and 23 miles from the Headquarters station. I at once availed myself of a holiday to visit the place and see the owner of the plate and as a result I am able to edit and publish this inscription for the first time. On examination I found it to be the same as was briefly noticed by Sir E. A. Gait in his "Report on the Progress of Historical Research in Assam" (page 16) in the following words: "In this plate is set forth the grant by Raja Ram Simha of some land for the temple of Siva which had been erected by him at Dhupi."

The *plate* measures 8" x 5.75" and bears the royal seal on the upper right hand corner. The seal is round in shape, having a circle of dots inscribed within two others. Inside the smallest circle is the device of a lion jumping over a bunch of water-lilies. The lion has its face turned towards the left hand side.

The inscription is in twenty-eight lines, excluding the short invocatory line at the top and a few letters inscribed immediately above the first line. These letters were omitted by the inscriber from the main body of the inscription apparently through oversight. One of the omissions is মিতা to be added after পরি in line 7, and the other তা to he placed before the word শকাব্দা in line 28. Two parallel lines run along the four sides of the plate; and there is a small ornamental creeper design slightly below, or almost in a line with the last line, preceding the sentence bearing the date. This creeper apparently indicates the place of তা just as the "anunasika" sign in line 7 indicates that of মিতা. The lower part of the plate has sustained slight damage in two places, without, however, injuring any letter. Otherwise the plate is in good state of preservation, and the inscriber has certainly the credit of a good hand.

The *characters* are modern Bengali with a few exceptions. The *ra* is written as in Assaniese without the dot and with a line drawn across the upper part of the triangle. The conjuncts *Bhu* (e.g. in line 2), *Sri* in line 19, *nda* (line 9), *Sta* (line 9), *nna* (lines 7, 8. 22) and *rna* line 28 are slightly unusual and peculiar. The anusvara is written as in modern Nagri with a dot placed along, or sometimes above, the base line. The characters are all well-formed and beautiful to look at. The *language* of the inscription is Sanskrit. The opening four lines are a verse in the famous Sragdhara meter and the concluding lines a verse in Anustup. The rest are in prose. Grammatical mistakes are few in number and are probably due to the inscriber's ignorance of the language. Correct readings have been given at foot along with the text.

The inscription refers itself as already pointed out to Ramasimha II, who is the twentieth king in the List of Jaintia kings given by Sir Edward Gait (see *Journal of the Asiatic*

Society of Bengal, 1895, Vol. LXIV, part 1, page 246). His regnal years appear to have been from 1790 to 1813 A.D. The king, after having built a temple for Ramesvara-Siva on the Kapota tila (a small hill) in the existing village of Dhupi, makes a grant of land for the carrying on of his daily worship by Sri-Rukhada Paribrajaka or his disciples.

The inscription is dated Sunday, the month of Jyaistha, full moon day, sakabda 1720 (1798 A.D.).

TEXT.

(Edited from the original.)

শ্রীদুর্গা।

মিতা ৭[1]

তা ২৮[2]

1. ওম্[3] সংস্থাপ্যাদ্রৌ কপোতেস্মরহরবিপুলঃ[4] শ্রীনরামেশ্বরাথ্যস্তং[5] সেবাদার্থ
2. ভূমিঃ কিয়তি পরিমিতা প্রার্পিতাস্মৈবুধার্কে। ভূপশ্রীরামসিং
3. হৈঃ খযুগলজলধিক্ষ্মাবিমানে[6] শকাব্দে সেবাদ্যাঃ কারণীয়াঃ
4. প্রতিদিনমনয়ারুখড়েনাস্যশম্ভোঃ ॥[7] বিংশত্যধিকসপ্তদশশত
5. শকাব্দে কপোতাদ্রৌ মঠমন্দিরং দত্বা রামেশ্বরাখ্য শিবলিঙ্গং সং
6. স্থাপ্য জয়ন্তীপুরপুরন্দরশ্রী শ্রীরামসিংহনৃপবরেণাষ্টখণ্ড
7. [8]পরি˚ ভূমিস্তন্নির্বাহার্থং তস্মৈ [9]সমপিতানয়া ভূম্যা শ্রীরুখড়পরি
8. ব্রাজকেন তংশিষ্যোপশিষ্যেনাপি তন্নির্বাহাদিকং কর্ত্তব্যং কারয়িত

---

[1] To be inserted after পরি in line 7.

[2] To be inserted in line 28 in place of the creeper design.

[3] Expressed by a symbol.

[4] Read ˚বিপুলঃ

[5] Read ˚আখ্যস্তং

[6] The curve above the base line in বি has been omitted.

[7] Meter: স্রগ্ধরা

[8] Read পরিমিতা˚

[9] Read সমর্পিতা˚

9. ব্যঃ[1] তদ্ভূমেরষ্টখণ্ডেন বিবরণং যথা । তদদ্রেরুত্তরস্যাং প্রথম
10. খণ্ডস্য পূর্ব্বদিশি [5]মুর্ত্তিধরদেশম্মুখ সম্বন্ধিভূঃ পশ্চিমস্যাং
11. সেতুঃ উত্তরস্যাং ডোয়াতলভিট্যাখ্যভূর্দক্ষিণস্যাং তদদ্রিরেতৎ[2]
12. ভূখণ্ডং জয়ন্তীপুররাজ্যান্তর্গত চৈলাখেলিনঃ সকাশাৎ শ
13. তদ্বয়কার্ষাপনেন[3] ক্রীতমিতি তদদ্রের্দক্ষিণস্থদ্বিতীয়খণ্ডস্যপূর্ব্বপ
14. শ্চিময়োঃ সেতুরুত্তরস্যাং নয়াখেলিনোভূর্দক্ষিণস্যাং তৎ
15. খেলিনো বাটিকৈ তৎভূখণ্ডং[4] তৎখেলিন আত্তং তদদ্রেঃ প
16. শ্চিমস্যাং তৃতীয়খণ্ডং [5]মূর্ত্তিধরসকাশাৎ চত্বারিংশদধিক
17. শতকার্ষাপণেন ষট্‌কেদারপরিমিতং ক্রীতং চতুর্থখণ্ডন্তনয়াখে
18. লিনঃ সকাশাৎ ষট্‌কেদারপরিমিতমাত্তং পঞ্চম খণ্ডং চতুষ্কে
19. দারপরিমিতং শ্রীজুড়াব্রাহ্মণাৎ ষষ্ঠিকার্ষাপণেন ক্রীতং
20. ষট্‌খণ্ডং খরিলরাজ্যান্তর্গতজগডুবীয়খলাখ্য দ্বাদশহলপ
21. রিমিতমেতস্যপরিবর্ত্তার্থাং[6] বরবক্রস্য সমীপবর্ত্তীয় তাপা
22. ই বিলাখ্যাবস্থাং খলাঙ্গন্নেতৎ[7] খণ্ডমর্পিতং সপ্তমখণ্ডংবনবাউ
23. রভাগাখ্যভূমৌ চতুষ্কহলপরিমিতং সেনাপতি সকাশাদাত্তমষ্ট
24. মখণ্ডস্য পূর্ব্বস্যাং হাউলিষাসঙ্গকবিলং[8] পশ্চিমস্যাং গোভাডাখ্য ভূরুত্ত
25. রস্যাং শ্রীপুরাখ্যাবনির্দক্ষিণস্যাং বৃদ্ধলাখ্যভূমেরুত্তরসীমৌ [9]ত
26. ৎ ভূখণ্ডং মহাদেব্যাঃ সকাশাদাত্তমিতি ॥ শিবার্পিয়াং[10] যে
27. নাস্যামধিকারঃ ক্ষিতৌ নরঃ কর্ত্তব্যোঽভক্ষং[11] ভোক্তব্যং ভবিতা শিব
28. হাপি সঃ ॥[12] শকাব্দা[13] ১৭২০ মাসি জৈষ্ঠে[14] পূর্ণমাস্যাং

[1] Read কারয়িতব্যাং
[2] Read °এতদ্
[3] Read °কার্ষাপণেন
[4] Read °এতদ্°
[5] Read মূর্ত্তি°
[6] Read °অর্থং
[7] Read °অঙ্গান্যেতৎ
[8] Read °সংজ্ঞক°
[9] Read তদ্°
[10] Read °অর্পিতায়াং
[11] Read °অভক্ষ্যং
[12] অনুষ্টুপ্
[13] Read তা, the omitted word, before শকাব্দা
[14] Read জ্যৈষ্ঠে

TRANSLATION

(Salutation to) Sri-Durga

Om (expressed in symbol). A temple of Siva named Sri-la-Ramesvara having been established on the Kapota hill, some amount of land was endowed on Him by king Ramasimha on Sunday in Sakabda, 1720 (expressed in astronomical language) for the purpose of His daily service (to be performed) by Rukhada (lines 1-4).

Having established a temple on the Kapota hill in 1720 and having set up a Siva-phallus called Ramesvara (therein) the Purandara (i. e. king) of Jayantipura, Sri Sri Ramasimha, the chief among kings, gave him eight plots of land for his maintenance (4-7).

This duty of maintaining (Him) should be discharged with (the income from) this land by Mendicant (paribrajaka) Sri Rukhada or by his disciples or by the disciples of his deciples. The description of this land (consisting) of eight plots is as follows (7-9):—

To the north of this hill is the First plot which adjoins the land of Murtidhara, the Desammukha (literally, the chief of desa or district) in the east, and has in the west a ridge of earth (setu), in the north the land known as Dauyatalabhitti and in the south this (very) hill. This plot of land was purchased from the inhabitants of Chaila-khela in the province (rajya) of Jayantipura for Two hundred Karsapanas (9-13).

The Second plot (lying) south of this hill has ridges in the east and west, the land of the inhabitants of Naya-khela in the north and the houses of the inhabitants of that khela (i.e. village) in the south. This plot was taken away from the inhabitants of that khela (13-15).

To the west of this hill is the Third plot to the amount of six kedaras purchased from Murtidhara for one hundred and forty karsapanas; the Fourth plot measuring Six kedaras was but taken from the inhabitants of Naya-khela; and the Fifth plot to the amount of Four kedaras was purchased from the Brahmana Sri-Juda for Sixty karsapanas (15-19).

The Sixth plot to the extent of Twelve halas is known as Jagaduviyakhala in the province (rajya) of Kharil (which is)

changeable for lands attached to the settled parts (khalangani) in the woody region of Tapaibil near Baravakra (20-22).

The Seventh plot to the extent of four halas in the land known as Vanabaurbhaga was taken from the Commander-in-Chief (22-23).

The Eighth plot has the marshy tract (vil) called Haulisa in the east, the land called Gobhada (? govata) in the west, the region called Sripura in the north : in the south it is the northern boundary of the land called Briddhala. This plot was taken from the queen (mahadevi) (23-26).

He, by whom the endowments of Siva are seized, would eat what is improper to eat and he would become a destroyer of good in this world (26-28).

Dated Sakabda 1720, in the month of Jyaistha, on full moon day (28).

NOTES

Political and Topographical.– The title “Purandara” assumed by the kings of Jaintia, is also to be found in their silver coins. The queen similarly had the title "Mahadevi." This is further clear from an inscription of queen Kasasati of Jaintia (to be shortly published).

The kingdom of Jaintia appears to have been organised into provinces called "rajyas." Thus, for example, this inscription tells us of two rajyas, namely, Kharil and Jayantipura. The term "Desammukha" (i.e. the Chief of Desa) suggests that there were further subdivisions or districts called "desas," each under a ruler designated "Desammukha" (desamukhya). The Marhatta government appointed officials under this designation (see also Sukraniti I, 374). In the districts or desas were groups of settlements called "khelas" or "khalas"

corresponding to villages. The word "grama" (village) or "gama" is also in vogue. I think there is distinction between a "khela" or "khala" and a grama. The former being usually situated on elevated lands called tilas, lacks the compactness of the latter, and the homesteads of a khela are often scattered in the midst of cultivable tracts.

Almost all the places mentioned in the inscription, I am told, still go by the same names. I myself have visited some of these places. Baravakra is the old name of the modern Barak River. The mention of this river may help us in forming an idea of the east and south-east boundary of the Jaintia-raj.

Economic.— The inscription makes it clear that the king was not the absolute owner of the whole land. He apparently exercised the right of ownership with regard to his "demesne" land only, such as the 2nd, 4th, 6th, 7th and 8th plots of land mentioned in the inscription, since he took away or resumed those lands from their occupants without paying a price. But on the other hand he had to purchase the lands taken from the inhabitants of Chaila-khele, Murttidhara, and Juda-brahmana.

The gift as recorded in the plate is unconditional, the absolute ownership being transferred to god Siva, i.e. the property is inalienable and free from any rent ordinarily payable to the king. This is thus an instance of Devottara.

Measurement of land according to Kedara or Keyara and Hala or hala is still recognised thus:—

3 krantis = 1 kada
4 kadas = 1 ganda

20 gandas = 1 pana
4 panas = 1 rekha
4 rekhas = 1 jasthi
7 jasthis = 1 poa
4 poas = 1 kedara or keyara
12 kedaras = 1 hala = 10.5 bighas = 3.4 acres.

The ordinary medium of exchange in the kingdom of Jaintia, was karsa or cowries. There was also a silver money (coin) called Katra taka, which was priced at 4 as. according to the East India Company's standard of a sicca rupee (see *J.A.S.B.*, 1895, Vol. LXIV, Part I, pp. 242-3). Local custom fixes the value of a taka or rupee in terms of cowrie thus:—

4 karsa or cowries= 1 ganda
20 gandas = l anna or pana
(Therefore, 80 cowries = 1 pana of karsa or 1 karsapapa)
16 panas (or karsapanas) = 1 kahana (karsapana or kahapana of silver) or taka.

Karsapana or kahapana was a very ancient form of money and it was issued both in silver and copper. The silver issues were called "rupyarupa" during the age of the Mauryyas (see Kautilya's Arthasastra, translation p. 92 and footnote 3). The copper issues are referred to in the Dharmasastras (Manu, viii, 134-8 : Yajnavalkya, I, 362-364 : Visnu IV, 8-14). As far as my information goes no copper coin has yet been discovered in Jaintia, and the probability is that the Jaintia kings issued no copper coin, although they minted the silver pieces (katra taka).

From the above data we may ascertain the value of land at that time in Jaintia in terms of the E.I. Co.'s money (sicca rupee) or roughly in our money (rupee) which is, however, a debased coin in comparison with the Company's:—

6 kedāras at 140 kārṣāpaṇa (lines 16–17) or Rs 8. 12 as.
∴ 1 kedāra at Rs 1. 7⅓ as.
Again, 4 kedāras at 60 kārṣāpaṇa (ll. 18–19) or Rs 3. 12 as.
∴ 1 kedara at 15 as.

Now, if the kahana or taka imply sicca rupee and not the katra taka then the value of the kedara would be reduced to 1/4 of the amount, i.e. about 4 as. This is not very surprising, for, even now a bigha (7/8 of a kedara or 1/3 of an acre) sells at from Rs. 5 to Rs. 10. Price has gone up only twenty times after the lapse of a century and a quarter. Money has also become much cheaper now.

Religious.—This inscription together with a few more of the series shows the great influence exercised by the cults of Siva and Sakti in this part of India, especially at a time when Bengal was being shaken to the very foundation, as a result of the waves of Christianity breaking upon her ancient superstructure of religious beliefs. This was the time when Raja Ram Mohan Roy was founding a new system of religious thought and the Christian Missionaries were making converts in number.

The inscription also shows the firm hold of Hinduism upon the non- Aryan Syntengs or at least upon their kings.

The present Mohanta tells me that Parivrajaka Rukhada was, as indeed the very name suggests, an up-countryman. Ju-da Brahmana, (line 19) who was already a settler in Jaintia, is also apparently of the same nativity. The inscription of Badagosayi (to be shortly published) too makes mention of a third up-countryman as the spiritual preceptor of the king. From these it would not be unreasonable to assume that the

exponents of Hinduism in the Jaintia court were to a certain extent Brahmins from Upper India.

দুই. ১৭৩১ শকাব্দের (১৮০৯ সালের) তাম্রফলক

জৈন্তিয়া রাজ্যের যে সাতটি তাম্রফলক ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশেষ ফলকটির সন্ধান মিলেছিল ১৯২৯ সালে। ওই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশিষ্ট গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী খবর পেলেন যে, তাঁর নিজ গ্রামের (ছাতকে অবস্থিত) প্রতিবেশী শ্রী মদন মোহন গোস্বামীর কাছে জৈন্তিয়ার একটি তাম্রফলক রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ওই প্রতিবেশীর বাড়িতে ছুটে যান এবং গভীর আগ্রহের সঙ্গে ফলকটি পর্যবেক্ষণ করেন। ফলকটি ছিল জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহ কর্তৃক ছাতকের শ্রী বলরাম গোস্বামীকে ভূমিদানের দলিল। মদন মোহন গোস্বামী ছিলেন এই বলরাম গোস্বামীর ভাইয়ের বংশধর। এই পরিবারটির সাথে জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল।

শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী রচিত *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড* (পৃষ্ঠা ২৭৯) থেকে জানা যায়, বলরাম গোস্বামীর পূর্বপুরুষ শ্রী রাম গোবিন্দ গোস্বামী ছিলেন একজন বিখ্যাত যোগী বা যোগ সাধক। তিনি রাজা বড়গোসাঁইয়ের আমন্ত্রণে ছাতক থেকে জৈন্তিয়ায় গিয়েছিলেন এবং রাজাকে যোগ ব্যায়ামের আটটি উপাদান (যোগাঙ্গ) শিখিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে রাজা তাকে গুরুদক্ষিণাস্বরুপ অনেক ধনসম্পদ দান করেছিলেন। এর কয়েক দশক পরে জৈন্তিয়ায় পদার্পণ করেছিলেন বলরাম গোস্বামী। মদন মোহন গোস্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী, বলরাম সংসারজীবন ত্যাগ করে ছাতক থেকে জৈন্তিয়ায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার পার্বত্য অঞ্চলে ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন।

বলরাম জৈন্তিয়ায় ভগবান বিষ্ণুর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজে এর সেবায়েত ছিলেন। সম্ভবত একারণেই তাঁকে বৈষ্ণবাধিকারী বলা হতো। ধার্মিকতা ও ধর্মীয় তপস্যার জন্য তিনি স্থানীয় লোকজনের কাছে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং অনেকে তাঁর শিষ্যও হয়েছিল। তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের কানে এসব খবর পৌঁছলে তিনি এই নিবেদিতপ্রাণ ধর্মসাধকের প্রতি উদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই সাধুপুরুষের গুণাবলীতে

আকৃষ্ট হয়ে অনেক মূল্যবান জিনিসের পাশাপাশি কিছু ভূমিও দান করেছিলেন। মদন মোহন গোস্বামীর কাছে রক্ষিত তাম্রফলকটি ছিল এই ভূমিদানেরই দলিল।

গোস্বামী পরিবারের সাথে জৈন্তিয়ার রাজপরিবারের সম্পর্কটি মদন মোহন গোস্বামীর সময়েও অটুট ছিল। তখন অবশ্য স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে রাজপরিবারের উত্তরসূরী কুমার ছত্রসিংহ নৃপ জৈন্তিয়াবাসীর কাছে একজন রাজা হিসেবেই গণ্য ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও তাকে একজন প্রতীকী রাজার মর্যাদা দিয়েছিল। মদন মোহন গোস্বামী এই প্রতীকী রাজার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি যখন জৈন্তিয়ায় যেতেন তখন রাজপরিবারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও তাকে বেশ আন্তরিকতা দেখাতো। বলরাম গোস্বামীর মন্দিরটিও তখন পর্যন্ত পুরোপুরি সচল ছিল। রাজা রামসিংহ অতীতে বলরাম গোস্বামীকে যেসব ভূমি দিয়েছিলেন সেগুলো তখনও মন্দিরের আওতায় ছিল এবং এসব ভূমির আয় দিয়েই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও ধর্মীয় কার্যক্রম চলতো।

গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী রাজা রামসিংহ কর্তৃক বলরাম গোস্বামীকে ভূমিদানের দলিলটির সংক্ষিপ্ত পাঠোদ্ধার করেছেন। *জার্নাল অভ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল*-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি এই ফলকটিকে 'ছাতক তাম্রফলক' নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি ফলকটির যে পাঠোদ্ধার করেছেন তা হল: ১৭৩১ শকাব্দে রাজা রামসিংহ ভগবান বিষ্ণুর সেবক বলরাম বৈষ্ণবাধিকারীকে গোসাঁইনপুর ও সুতারগ্রামের দুটি ভূমি দান করেন। ব্রজেশ্বরী ও ব্রজেশ্বরের আরাধনার জন্য রাজা বলরামকে এ দুটি গ্রামের ২৪ কেদার ভূমি দান করেন। প্রথম ভূমিটির পূর্বদিকে রয়েছে মহিহারণ্য ভূমি। পশ্চিমদিকে রয়েছে গরু চলাচলের পথ। উত্তরদিকে রয়েছে আমিরঘরনের দিকে যাওয়ার পথ। আর দক্ষিণ দিকে এই ভূমিটি গুল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। দ্বিতীয় ভূমিটির পূর্বদিকে ভোগখর নামক ভূমি অবস্থিত। পশ্চিমদিকে রয়েছে নক্তির নান। উত্তরদিকে রয়েছে মহিহারণ্য। দক্ষিনদিকেও রয়েছে মহিহারণ্য।

১৯২৯ সালে *দি এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গলের জার্নালে* গবেষক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামী ১৭৩১ শকাব্দের তাম্রফলক বা 'ছাতক তাম্রফলক' নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেটি হুবহু নিম্নরূপ।

JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, VOL. XXV (1929), NO. 3 (PAGE 165-169)

The Satak Copper Plate Grant of King Rama Simha II, of Jaintia of 1809 A.D

By KUNJA GOVINDA GOSWAMI

In February last, I was informed, at my village home at Satak, District Sylhet, that one of our neighbours, Sj. Madan Mohan Goswami had a copper plate inscription in his possession. I at once hastened to his place and saw the plate. The plate records the grant of twenty-four *kedaras* of land in two plots to one, Balarama Goswami (here mentioned as Vaisnavadhikarin), by King Rama Simha II, (1789-1832 A.D.) of Jayantipura (modern Jaintia) in the North Sylhet subdivision of the Sylhet district, for the worship of Radha and Krisna under the name of Vrajesvari and Vrajesvara. I am told that this Balarama, out of aversion towards the world, renounced it and went to the hilly tract of Jaintia for meditation and spiritual advancement. There he founded a temple of god *Visnu* and himself became a *Sevait* there. Hence probably, he is called a Vaisnavadhikarin here. Very soon he became famous in the locality for his piety and religious austerities and people began to become his disciples. In no time, this news reached the ears of the reigning king, Rama Simha II. He being attracted by the virtues of this holy man, made a grant of the land under discussion besides many other valuable donations. We learn also from the *Srihatter Itivritta* (*The History of Sylhet*, Part II, p. 279) by Mr. Achyuta Charan Choudhury that King Bada Gosayi II (1729-1770 A.D.) of Jaintia, invited Rama Govinda Goswami, one of the ancestors of the donee of this plate, to his capital, learnt yogangas (eight constituents or parts of the yoga) from him and gave much wealth in the shape of *Guru daksina* (preceptor's fee). So we see that there had been a religious influence of the family of Balarama upon the royal family of Jaintia for a long time, and this grant also bears testimony to

this fact. The present holder of the grant, Sj. Madam Mohan Goswami, is a descendant of the original donee through his brother's line and is still held in high esteem both by the people and the Raja at Jaintia whenever he goes there. The temple is maintained even now and worship of the deities is carried on by an appointed *Sevait* who manages the affairs there from the income of the property of the temple.

The plate roughly measures 7" x 4". The inscription opens at the top with the invocatory line *"namo Vrajesvaraya"* preceeded by a symbol which seems to be a very late form of the symbol representing *om* according to Hoernle (*Intro. Bower MSS. In. Ant.* reprint, page 22) and Fleet (*Corp. Ins. Ind.*, page 46, n 3) but *Siddhirastu* or *Siddham* according to N. K. Bhattasali, supported by Krishna Sastri (*Ep. Ind.*, Vol. XVII, p. 352). This symbol is called *anji* by the older generation in Bengal. Curiously enough, this sign precedes also the right hand side line of the inscription under discussion. Just below the invocatory line, is engraved the royal seal representing a jumping lion in the midst of a roughly shaped circle. Similar seals with slight variations were now and then used by the Kings of this place. This statement will find corroboration if we compare some other inscriptions of the Jaintia Kings, edited by Dr. K. M. Gupta (*vide* (i) *J.A.S.B., 1922*, p. 73 f., (ii) *ibid*., 1923, pp. 323 f., (iii) *ibid*., 1923, pp. 331 f.).

The plate is in a good state of preservation and every letter is distinct and legible. It contains seventeen lines besides the invocatory top line and two side lines—one to the right-hand side of the plate and the other to the left in the upper margin.

The characters are well shaped Bengali with some peculiarities. The language is Sanskrit prose throughout with the exception of the words *Kitavat* (derived from Arabic and

means writing of) occurring on the left hand side, and *Sahi* (probably Perso-Arabic and here perhaps means "signed by,") on the left hand side.

There are a few orthographical inaccuracies due to ignorance and carelessness of the scribe; e.g. (i) in some places s (...*) has been used for ś (...*), viz. *saptadasa-sata* for *sapta-daśa-śata* (line 8), *disi* for *diśi* (line 10) and *vimsati* for *vimśati* (line 17), (ii) *datva* for *datta* (line 9), (iii) *simavacchinva* for *Simavacchinna* (line 16). The use of the word *livi* (document) (line 17) is peculiar here. Although both the forms *livi* and *lipi* are correct according to Sanskrit dictionaries, the former is hardly met with in Sanskrit books. Another point we should note here. There is no distinction in the use of *b* and *v* in Bengali, either in writing or in pronunciation. The former is rather frequently used in place of the latter. This observation holds good for the present inscription also. But I have given *v* in its proper places in my transliteration without giving the Bengali *b* first and then changing it to the correct form *v* for the sake of convenience.

Early mention of the tract of Jaintia is found in the Pauranic and Tantric literature as containing one of the famous shrines sacred to Durga. "It was known as Narirajya, mentioned in Jaimini's Mahabharata," says Mr. Achyuta Charan Choudhury in his *Srihatter Itivritta* (*History of Sylhet*), Part I, Sec. IV, Ch. I. He being supported by MM. Padmanath Vidyavinoda (*vide Ind. His. Quarterly,* Vol III, No. 4, pp. 848-49) throws a ray of light on a mediaeval king of Jaintia by stating that the famous Kavya, Raghava Pandaviya of Kaviraja was composed during the reign of King Kamadeva of Jayantiapura in the 11th century A.D. The book itself does not contain any reference to a definite date and so scholars are not at one with regard to this point. But from the internal evidence we learn that this poetical work was composed by Kaviraja during the reign of

Kamadeva in the city of Jayantiapura (Canto I, verse 25). And Mr. Choudhury and Mahamahopadhyaya Vidyavinoda are inclined to identify this Jayantiapura with modern Jaintia of the Svlhet district.

According to tradition the ancient rulers of the Jaintia plains were Brahmins by caste. They ruled the region for several generations, and we do not exactly know how they met with their fall. But this much we learn from Sir E. Gait that a group of the Khasi tribes called the Syntengs inhabited and ruled the hilly part, namely, the Jaintia Hills for a long time; and after the fall of the traditional Hindu Kings of the Jaintia plains, a scion of this tribe, named Parvat Ray took possession of the plains about 1500 A.D. (*History of Assam* by Sir E. Gait, New Edition, page 261). After that this small principality had to pass through successive invasions of the Kochas, the Kacharis, and the Ahoms. In spite of these repeated attacks the Synteng line could maintain its own independence for more than three centuries till at last the kingdom was annexed to the British Empire in 1835 A.D. Gait supposes from the nomenclature of the founder of the dynasty and his successors that from this time forward they began to feel gradually the influence of the Hindu religion and finally identified themselves with it in its Tantric form of worship. The Kings with certain laxity in matter of food and drink became champions of Sakti worship in that part of the country; and the holy shrines at Jaintia as also at Faljur bear sufficient evidence of it. Although the rulers belonged mainly to the Tantric sect, they were patrons of all other branches of the Hindu religion. This statement will be borne out by the fact that Mahadevi *Kasasati*, wife of Bada Gosayi, made grants of land to the gods *Siva*, *Jagannatha*, *Vasudeva,* and *Bhudhara* during the reign of Rama Simha II, who is the donor of the plate under review, in the Saka year 1725 (=1803 A.D.) (*J.A.S.B.*, 1923, pp. 323-27). That this

Rama Simha was also a devotee of Durga and Siva is set forth in his Dhupi Copper plate grant of the Saka year 1720 (=1798 A.D.) (*J.A.S.B*., 1922, p. 73). The present plate shows that he had reverence for the Vaisnava deities Vrajeswara and Vrajeswari also. Similarly, instances from Epigraphic and other sources can be multiplied in favour of our assertion. Researches of scholars are now bringing to light many inscriptions which among other things show that the princes of this line have always shown religious toleration. Rama Simha II has been taken by Gait to be the twentieth king in descent from Parbat Ray and his period has been fixed at from 1789 A.D. to 1832 A.D. He was the nephew of his predecessor Vijaya-Narayana. It is also important to note here that though the rulers became Hinduised, society is still matriarchal and the throne passes to the nephew (sister's son) and not to his son after the death of the ruling king.

The plate was issued on the 23rd day of Magha of the Saka year 1731 (=which corresponds to February, 1809 A.D.).

READING OF THE PLATE

Oṃ[1] *Namo Vrajesvarāya.*

1 ekatriṃsadadhika-saptadasa-sata[2]-śakābde Śrī-
2 majjayantīpura-purandara-Śrīla Śrī Rāma ⌘
3 Siṃha nṛpavareṇa Gosāinapurākhya grāmā-
4 ntargata sutāragrāmāntagatayoś-catur-viṃśa-
5 ti kedāra parimitā bhūmiḥ khandadvayena
6 Śrīmad Vrajeśvarī-Vrajeśvarayor-arcanārthaṃ
7 Vāṇī vaiṣṇava santataye Śrī Balarāma Vaiṣṇavā-
8 dhikāriṇe datvā.[3] Tat prathama khandasya pū-
9 rvva disi[4] mahiharanānākhya bhūḥ, tat paśćā-
10 t gocaraḥpanthāḥ taduttare āmira-ghara-
11 nākhya vātikāyāḥ panthāḥ taddakṣiṇe gu-
12 lākhya bhūryyāvat tadvitīya[5]-khandasya pūrvva-
13 disi[6] bhogākhārākhya bhūḥ, tata[7] paścāt
14 naktinānākhya bhūḥ taduttare mahīharanā
15 nākhya bhūḥ dakṣiṇepyevaṃ itthaṃ catuḥ
16 sīmāvachinvā[8] bhūmiḥ māghasya trayaviṃ-
17 sati[9] divasīyā libir-iti.

On the left hand side :—

Kitāvat Śrī Rāma Majundhāra.

On the right hand side :—

Sahi Śrī Vijaya Siṃ Senāpati.

---

[1] Expressed by a symbol. [2] Read ekatriṃśadadhika-saptadaśa śata. [3] Read dattā. [4] Read diśi. [5] Read taddvitīya. [6] Read diśi. [7] Read tataḥ. [8] Read Sīmāvacchinnā. [9] Read—viṃśati.

ENGLISH TRANSLATION

Om (expressed by a symbol)! Salutation to Viajeswara.

In the Saka year *seventeen hundred* increased *by thirty-one*, — land, measuring *twenty-four Kedaras*[1] in two plots (included) in the villages of *Gosainpur*[2] and *Sutara*[3] has been granted by the great King *Ram Simha* (who flourished) like Purandara[4] (Indra) in the city of *Jayanti* (mod. *Jaintia*) to *Balarama Vaisnavadhikarin*, a descendant of Vani (who is) the devotee of god Visnu, for the worship of the deities, Vrajeswari and Vrajeswara.

Now the land is bounded on four sides as follows: to the east of the first plot lies the land, called the Mahiharanana[5]; to the west the path used by the cattle; to the north the path which leads to the house, called Amiragharana; to the south as far as the land called the gula[6]. Now to the east of the second plot lies the land called the bhogakhara, to the west the land called the Naktinana, to the north the land called the Mahiharana, to the south the same.

The document is written on the *twenty-third day of the month of Magha.*

3 krantis = 1 kada
4 kadas = 1 ganda
20 gandas = 1 pana
4 panas = 1 rekha
4 rekhas =1 yasti or jasti
7 yasti =1 poa
4 poas =1 kedara, kera, keyara, kiyara
12 kedaras ras=1 hala or hala =10.5 bighas = about 3.5 acres

NOTES TO THE TRANSLATION

1) In Jaintia as in other parts of the Sylhet district the following land-measurement is in vogue: —

2 and 3) these villages are still existing and are still known by their former respective names.

4) The Kings of Jaintia used the title, Jayantipura purandara in their coins and inscriptions. (i) cf. Jaintiapur Copper Plate Inscription of Bada Gosayi, line 3. *J.A.S.B.*, 1923, p. 332. (ii) A coin from Jainti-pur, ibid., p. 335. (iii).

5) Mahihara, I am told by an educated gentleman of Jaintia, means a surveyor. But I cannot understand what the portion *nana* in Mahiha-rananakhya, and Naktinanakhya actually means. My authority also could not throw any light on that point.

6) Gula, in some parts of Sylhet, stands for a plain which is surrounded almost on all sides by hillocks.

* The blank spaces (...) have been left for the unreadable or untypable symbols/ characters/ words/ sentences of the original article. – Asif Ajhar

অধ্যায় ছত্রিশ

রাজেন্দ্র সিংহ বা ইন্দ্র সিংহের শাসনামল

(১৮৩২ সাল – ১৮৩৫ সাল)

জৈন্তিয়ার ইতিহাসের শেষ রাজার নাম রাজেন্দ্র সিংহ। লোকজন তাকে ইন্দ্র সিংহ নামেও ডাকতো। ব্রিটিশ দলিলপত্রেও এই নামটির উল্লেখ আছে। তাই দুটি নামই সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। ১৮৩২ সালে রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের মৃত্যু হলে তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজেন্দ্র সিংহ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র আড়াই বছর জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় ছিলেন। ১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ ব্রিটিশরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশ দখল করে নেয়। এরপর তাকে গৃহবন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে জমিদার মুরারী চাঁদের বাড়িতে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী থাকার পর ১৮৬১ সালে এই দুর্ভাগা রাজা সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অল্পসময় ক্ষমতায় থাকায় তিনি কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে পারেননি। তাঁর সময়কার কোন মুদ্রাও পাওয়া যায়নি।

এক. রাজেন্দ্র সিংহের ক্ষমতারোহণ (১৮৩২ সাল)

১৮৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাজা দ্বিতীয় রামসিংহ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় বসেন রাজেন্দ্র সিংহ বা ইন্দ্র সিংহ। তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। একজন অল্পবয়সী তরুণ হলেও রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের সঠিক উত্তরাধিকারী হিসেবে তাকেই জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসতে হয়। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ছিলেন রাজা রামসিংহের নাতি। তাঁর পিতা ছিলেন রামসিংহের একমাত্র ভাগিনেয় যিনি রামসিংহের আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী (সিন্টেং প্রথা অনুসারে) কোন রাজার মৃত্যু হলে তাঁর ভাগিনেয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতেন। যেহেতু রামসিংহের উত্তরাধিকারী হওয়ার মতো কোন ভাগিনেয় জীবিত ছিলেন না সেহেতু ভাগিনেয়ের পুত্র হিসেবে রাজেন্দ্র সিংহকেই জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসতে হয়েছিল।

দুই. রাজেন্দ্র সিংহের বৈষ্ণব সাধনা

রাজা রামসিংহের মতো রাজেন্দ্র সিংহও বৈষ্ণব ধর্মের বেশ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন এবং একাদশী ব্রত পালন করতেন। তিনি সবসময় ধর্ম-কর্ম নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন। যেহেতু জৈন্তিয়ার চারপাশে তখন শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছিল এবং ব্রিটিশদের সাথে জৈন্তিয়ার কোন বিরোধ ছিল না সেহেতু রাজেন্দ্র সিংহ রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতেন না। তিনি নিশ্চিন্ত মনেই ধর্মে-কর্মে সময় দিচ্ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের ঝুলন সঙ্গীত এবং হরি সংকীর্তন তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি নিজেও কিছু ঝুলন সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এর একটি উদাহরণ নিম্নরূপ।

ঘুঙ্গুরোয়া (ঘুঙ্গুর) ঝন ঝন বাজে,
দঁহু ঝোলনা ঝোলে।
রঙ্গে রঙ্গিনী রঙ্গিয়া গোপীয়ানা (গোপীগণ) বিছে (মধ্যে),
ক্যাবলি আচানক ছাজে (সাজে)।।
ছোওয়া (পুষ্প বিশেষ) বেলি, কুন্দন কেওয়ালী,
জাই জুই দল বেল চাম্বেলি,
মত্ত চিত্ত মধুপান মগনমে,
ভ্রমরা ভন ভন গাজে (গুঞ্জন করে)।।
রূপ রঙ্গ কি ঘটা বানিয়ে (নির্মিত হওয়া),
এওছে ছিঙ্গরোয়া (এরূপ বেশ) বরণ নাহি যাওয়ে,
নিরখি নিরখি বলি যাউ,
চরণকো রাজা রাজেন্দ্র সিংহ মহারাজে।।

তিন. ব্রিটিশদের সাথে রাজেন্দ্র সিংহের সম্পর্ক

রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের শাসনামলের শেষের দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে জৈন্তিয়ার সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও মৈত্রীতাপূর্ণ। এই সম্পর্কের ভিত্তি ছিল রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তি। এই চুক্তিতে ব্রিটিশরা জৈন্তিয়া রাজ্যের অস্তিত্বকে আজীবনের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী তারা জৈন্তিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। চুক্তিতে এমনও শর্ত যুক্ত ছিল যে, জৈন্তিয়ার অস্তিত্ব বিপন্ন হলে কোম্পানির পক্ষ থেকে সুরক্ষা দেওয়া হবে। রামসিংহ এই চুক্তির শর্ত মেনে ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে ব্রিটিশদেরকে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। এতে খুশি হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির বড় লাট (গভর্নর জেনারেল) রামসিংহকে একটি তাবু এবং একটি সঙ্গীত সৃষ্টিকারী নস্যাধার উপহার পাঠিয়েছিলেন। এর প্রতিদানে রামসিংহও বড় লাটের কাছে চারটি হাতি এবং কিছু মূল্যবান বস্ত্র উপহার পাঠিয়েছিলেন।

ব্রিটিশদের সাথে রামসিংহের এই সুসম্পর্ক তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে রাজেন্দ্র সিংহও এই সুসম্পর্ক বহাল রেখেছিলেন। সিলেটের বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী (ছাতকের চুনাপাথর ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা) জর্জ ইংলিশের পুত্র ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশের সাথে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। হ্যারি ইংলিশ ভ্রমণের নামে কয়েকবার জৈন্তিয়া সফর করেছিলেন এবং রাজেন্দ্র সিংহের সাথে বেশ ভাব জমিয়েছিলেন। রাজেন্দ্র সিংহ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি, হ্যারি ইংলিশ এবং তাঁর উর্ধ্বতন স্থানীয় কর্মকর্তারা তখন তলে তলে জৈন্তিয়া দখলের পরিকল্পনা করছেন। মূলত জৈন্তিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও স্থানীয়ভাবে রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্যই কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জৈন্তিয়ার প্রতি লোভী হয়ে উঠেছিলেন।

চার. কোম্পানি কর্তৃপক্ষের জৈন্তিয়া দখলের দূরভিসন্ধি

ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের শুরুতে নিজেদের প্রয়োজনেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জৈন্তিয়ার সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তখনকার পরিস্থিতিতে জৈন্তিয়ার কৌশলগত সাহায্য ব্রিটিশদের জন্য খুবই জরুরী ছিল। কিন্তু যুদ্ধে তাদের নিরংকুশ বিজয় অর্জনের পর পরিস্থিতি গেল বদলে। এই অঞ্চলে ব্রিটিশদের শক্তিকে মোকাবিলা করার মতো কেউ আর ছিল না। বর্মীরা পরাজিত হয়ে নিজেদের সীমান্তের ভেতরে চলে যাওয়ায় সিলেট থেকে চীন ও বর্মী সীমান্ত পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিরংকুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ দুটি বিজিত রাজ্যকে চিরতরে বিলুপ্ত করে সেখানে নিজেদের শাসন চালু করেন। বিলুপ্ত রাজ্যদ্বয় হল আহোম ও কাছাড়ি রাজ্য। আহোমে কোম্পানি শাসন চালু হয়েছিল ১৮২৬ সালে। আর কাছাড়ি রাজ্যে কোম্পানি শাসন চালু হয়েছিল ১৮৩২ সালে।

মণিপুর রাজ্যটিকে অবশ্য একটি ‘ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য’ হিসেবে রেখে দেয়া হয়। এরকম আরও দুটি ‘ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য’ ছিল কোচবিহার ও ত্রিপুরা।

আর জৈন্তিয়া রাজ্যটি তখনও আগের মতোই ব্রিটিশদের একটি মিত্র রাজ্য হিসেবে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের তখন আর জৈন্তিয়ার কৌশলগত সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না; জৈন্তিয়া পাহাড়ের অপর (উত্তর) পাশে তখন তাদেরই শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। জৈন্তিয়া তখন কোম্পানিশাসিত অঞ্চলের মধ্যেই অবরুদ্ধ একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নিজেদের মানচিত্রের ভেতরে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দুর্বল রাজ্যকে স্বাধীন অবস্থায় রেখে দেওয়ার কোন সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তবে রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তির কারণে তারা হুট করে কোন পদক্ষেপও নিচ্ছিলেন না।

ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পরে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জৈন্তিয়া রাজ্যকে একটি 'ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য' বা করদ রাজ্য বানানোর ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়ো করেননি। রাজা রামসিংহের এতে রাজি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, ব্রিটিশরা রাজ্যটিকে কোন তৃতীয়পক্ষের হাত থেকে উদ্ধার করেনি; উল্টো তারা এই রাজ্যের সহায়তা নিয়েছিল। কোম্পানি কর্তৃপক্ষও তখন নিজেদের চুক্তি ভেঙ্গে একজন মিত্র রাজাকে 'করদ রাজা' বানাতে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সম্পদে ভরপুর একটি রাজ্য থেকে অর্থনৈতিক ফায়দা লুটের ক্ষেত্রে রাজা রামসিংহ তখন কার্যত তাদের 'গলার কাঁটা' হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৩২ সালে রামসিংহের মৃত্যুর পর তাদের সকল অস্বস্তি দূর হল। এবার তারা জৈন্তিয়া থেকে আর্থিক ফায়দা নিতে আর দ্বিধা করলেন না। অল্পবয়সী রাজা রাজেন্দ্র সিংহের কাছে তারা বার্ষিক দশ হজার টাকা কর দাবি করলেন।

এটি ছিল ১৮২৪ সালের রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। জৈন্তিয়ার কাছে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কর দাবির পেছনে কোন যৌক্তিকতা ছিল না। তাই রাজেন্দ্র সিংহ তাদেরকে কর দিতে অস্বীকার করলেন। কর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এবার রাজাকে চাপে ফেলার জন্য নতুন কায়দা বের করলেন। তারা রামসিংহের সময়কার একটি ঘটনাকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসলেন এবং এটিকে কেন্দ্র করে রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ঘটনাটি ছিল একটি সাধারণ ফৌজদারী অপরাধের ঘটনা এবং এর সাথে রাজার কোন সংশ্লিষ্টতাই ছিল না। কিন্তু কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রাজাকে তাদের দাবি পূরণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ওই ঘটনাটির জন্য তাকেই দায়ী করলেন এবং এর প্রতিকারের জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন।

পাঁচ. ব্রিটিশ প্রজা অপহরণ ও হত্যার ঘটনা (১৮৩২ সাল)

জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যবর্তী একটি সরদার শাসিত অঞ্চলকে জৈন্তিয়ার অংশ বলে বিবেচনা করা হতো। এই অঞ্চলটির নাম ছিল গোভা (বর্তমানে আসামের নগাঁও জেলার অন্তর্ভুক্ত)। তৎকালীন সময়ে স্বাধীন সরদার কিংবা সামন্ত ভূস্বামী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছোট ছোট অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এগুলো অনেক সময় দুটি শক্তিশালী রাজ্যের মধ্যবর্তী 'বাফার এলাকা' হিসেবে কাজ করতো। এজাতীয় বাফার এলাকার সরদার বা ভূস্বামীরা তাদের প্রতিবেশী কোন একজন রাজার মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করে নিতেন। এতে অপর প্রতিবেশী রাজার কোন আপত্তি থাকতো না। গোভা ছিল এমনই একটি স্বাধীন অঞ্চল। গোভার অধিপতি মৌখিকভাবে জৈন্তিয়ার রাজার আনুগত্য স্বীকার করলেও রাজাকে কোন কর দিতেন না; কেবল শারদীয় উৎসবের সময়ে আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে রাজার কাছে একটি বলির পাঠা উপহার পাঠাতেন। গোভার উপরে জৈন্তিয়ার কর্তৃত্ব এমন একটি প্রতিকী সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৮৩২ সালে গোভার কিছু দুষ্কৃতিকারী ব্রিটিশ অধিকৃত আহোমের কয়েকজন প্রজাকে হত্যা করে। এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। শুধু এটুকুই জানা যায় যে, গোভার কিছু দুষ্কৃতিকারী আহোমের চারজন নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ করেছিল। গোভার ভেতর দিয়ে জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যে যে রাস্তাটি প্রচলিত ছিল সেখান থেকেই তাদেরকে অপহরণ করা হয়েছিল। অপহরণকারীরা তাদের তিনজনকে হত্যা বা বলিদান করে এবং একজন তাদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে আহোমের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সবকিছু খুলে বলে। জৈন্তিয়ায় তখনও রাজা রামসিংহ জীবিত ছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে এই ঘটনার কথা জানালে তিনি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। এরপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। এর কিছুদিন পরে রাজার মৃত্যু হয় এবং ক্ষমতায় আসেন তরুণ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ।

তাঁর কাছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর দাবি করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গোভার ঘটনা নিয়ে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তারা দাবি

জানালেন, ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকার প্রজা হত্যার ঘটনায় জড়িত অপরাধীদেরকে যেন তাদের হাতে তোলে দেওয়া হয়। রাজেন্দ্র সিংহ তাদের এই দাবি পূরণের ব্যবস্থা করলেন। অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিলেটস্থ পলিটিক্যাল এজেন্টের হাতে তোলে দিলেন। সিলেটের পলিটিক্যাল এজেন্ট ঐ অপরাধীদেরকে সমঝে পেয়েছেন বলে রাজাকে চিঠিও দিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনাটি নিয়ে আর কিছুই বলার ছিল না। রাজেন্দ্র সিংহের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া ছাড়া ব্রিটিশদের আর কিছুই করার ছিল না। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল তা ছিল এর বিপরীত।

ছয়. জৈন্তিয়া দখলের চূড়ান্ত পরিকল্পনা (১৮৩৫ সাল)

১৮৩২ সালে রাজেন্দ্র সিংহের কাছ থেকে কর আদায়ে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জৈন্তিয়ার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু রাজ্যটিকে কোনভাবেই 'করদ রাজ্য' বানানো যায়নি সেহেতু তারা আহোম ও কাছাড়ি রাজ্যের মতোই জৈন্তিয়াকেও সরাসরি কোম্পানি শাসনের অধীনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেলের অগোচরেই কোম্পানির ঢাকা ও সিলেট কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাদেরকে প্রথমেই যা করতে হয়েছিল তা হল, রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তিটিকে অকার্যকর প্রমাণ করা। দুই-আড়াই বছরের মধ্যে তারা অত্যন্ত নিপুণভাবে এই কাজটি করে ফেলেছিলেন। এক্ষেত্রে তারা গোভার ঘটনাটিকে পুঁজি করেছিলেন। ১৮৩৩-৩৪ সালে তারা গোভার ঘটনার জন্য রাজেন্দ্র সিংহকে দায়ী করে কোম্পানির কলকাতা বোর্ডের কাছে অনেকগুলো রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন।

এসব রিপোর্টে যেসব তথ্য উঠে এসেছিল তার সারমর্ম হল- গোভার অধিপতি ছত্রসিংহের (মতান্তরে শোভাসিংহ) নির্দেশেই ১৮৩২ সালের হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত হয়েছিল এবং গোভাধিপতিকে এই অপকর্মে প্ররোচিত করেছিলেন রামসিংহের উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্র সিংহ! রাজেন্দ্র সিংহ নারতিয়াং পুঞ্জির সরদার মারফত গোভাধিপতিকে এই অপকর্মের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি ধর্মীয় কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কালীদেবীকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তেই

গোভাধিপতির মাধ্যমে ওই নরবলির ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন। এরপর (১৮৩৩-৩৪ সালে) সিলেটের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বার বার রাজেন্দ্র সিংহের কাছে এই ঘটনার প্রতিকার দাবি করলে তিনি কোন সাঁড়া দেননি। অপহরণ ও হত্যার সাথে জড়িত কোন ব্যক্তিকে তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তোলে দেননি।

এতে রামসিংহ-ডেভিড স্কট চুক্তির গুরুতর লজ্ঘন হয়েছে। কারণ চুক্তিতে বলা ছিল যে, জৈন্তিয়ার অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে তা সম্পূর্ণ রাজার এখতিয়ারভুক্ত হলেও রাজা তাঁর শাসনক্ষমতার কোন অপব্যবহার করতে পারবেন না (The internal government of the country shall be conducted by the Rajah and the jurisdiction of the British Courts of Justice shall not extend there. The Rajah will always attend to the welfare of his subjects, and observe the ancient customs of government, but should any unforseen abuse arise in the administration of affairs, he agrees to rectify the same agreeably to the advice of the Governor-General in Council.)

প্রকৃত তথ্যকে আড়াল করে এবং বিভিন্ন ভুল তথ্য দিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (মূলত সিলেটের পলিটিকাল এজেন্ট) এভাবেই কলকাতা বোর্ডের কাছে জৈন্তিয়া দখলের বিষয়টিকে 'বৈধ' করে ফেলেছিলেন। কলকাতা বোর্ডও অবশ্য কখনোই প্রকৃত ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাননি। যেহেতু জৈন্তিয়া দখলের বিষয়টি কোম্পানির জন্য লাভজনক ছিল সেহেতু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এর ন্যায্যতার (কোম্পানির আইন অনুসারে) দিকটি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। জৈন্তিয়ার ব্যাপারে সিলেট ও ঢাকা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত। তবে সিলেটের পলিটিক্যাল এজেন্ট জানতেন যে, জৈন্তিয়া দখল করতে গিয়ে কোম্পানি পক্ষের কেউ নিহত হলে কিংবা বড় ধরণের খরচের ব্যাপার চলে আসলে তাকে কলকাতা বোর্ডের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই তিনি রাজ্যটি দখলের জন্য একটি সহজ উপায় খুঁজে বের করলেন।

সাত. জৈন্তিয়ায় ব্রিটিশ আগ্রাসন (১৬ মার্চ, ১৮৩৫ সাল)

সিলেটের ব্রিটিশদের মধ্যে জৈন্তিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে ভালোভাবে জানতেন ছাতকের ইংলিশ কোম্পানির ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশ। তাঁর পিতা জর্জ ইংলিশের

মতো তিনি নিজেও একজন চুনাপাথর ব্যবসায়ী ছিলেন (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা সরাসরি ব্যবসায় যুক্ত হতে পারতেন)। চুনাপাথরের ব্যবসায় জড়িত থাকার সুবাধে তিনি খসিয়া ও সিন্টেংদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেছিলেন। তিনি প্রায়ই খাসিয়া সরদারদের এলাকায় ঘুরতেন এবং জৈন্তিয়া রাজ্যে যাতায়াত করতেন। জৈন্তিয়ার রাজা রাজেন্দ্র সিংহের সাথে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। রাজেন্দ্র সিংহও তাকে বন্ধুই মনে করতেন। তাই জৈন্তিয়া রাজ্যে হ্যারি ইংলিশের আগমন ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিছু ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হ্যারি ইংলিশ কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে মানুষ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বে-আইনীভাবে মানুষ হত্যার অভিযোগ ছিল। সিলেটের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট তাঁর এই দুর্বলতাকে কাজে লাগালেন। তিনি শর্ত দিলেন, যদি হ্যারি জৈন্তিয়া দখল করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তোলে দিতে পারেন তাহলে তাকে হত্যা মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। হ্যারি এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

জৈন্তিয়ার তরুণ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ ছিলেন কোমল মনের অধিকারী একজন বৈষ্ণব কবি। রাজা হিসেবে তিনি খুবই অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কখনও বুঝতেই পারেননি যে, নরবলির অজুহাতে তাঁর রাজ্যটি দখল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তা একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা গুছিয়ে এনেছেন। ব্রিটিশরা একটি অতর্কিত অভিযান চালিয়ে তাঁর রাজ্যটি দখল করে নিতে পারে- এমন ভাবনা কখনো তাঁর মনেই আসেনি। ১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ তাঁর মোহভঙ্গ হয়। সেদিন হঠাৎ করেই সিলেট লাইট ইনফেনট্রির দুই কোম্পানি সৈন্য অতর্কিতভাবে জৈন্তিয়ায় প্রবেশ করে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশ।[105] হ্যারির সৈন্যরা সম্পূর্ণ বিনা বাঁধায় জৈন্তিয়ার রাজধানীতে প্রবেশ করে রাজাকে বন্দী করে। ব্রিটিশ দলিলপত্রে এই অভিযানের কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ দলিলপত্র থেকে শুধু এটুকুই জানা যায় যে, গোভা অঞ্চলে কিছু ব্রিটিশ প্রজা হত্যার দায়ে কোম্পানি সৈন্যরা জৈন্তিয়ার

---

[105] সিলেটের ব্রিটিশ সেনাপ্রধান কর্নেল লিস্টারের অধীনেই তিনি এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, হ্যারি ছিলেন লিস্টারের জামাতা।

রাজাকে বন্দী করেছিল এবং এরপর জৈন্তিয়ার সমতল অংশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসনের অধীনস্থ করা হয়েছিল।



চিত্রঃ জৈন্তিয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ (মৃত্যুঃ ১৮৬১ সাল)

অধ্যায় সাইত্রিশ
ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতন

১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ (১২৪১ বঙ্গাব্দের ৩ চৈত্র) ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যরা জৈন্তিয়া দখল করে। জৈন্তিয়ার তরুণ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ বা ইন্দ্র সিংহ তাদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। এই কিশোর বয়সী রাজাকে ব্রিটিশরা সিলেট শহরের উপকণ্ঠে জমিদার মুরারী চাঁদের বাড়িতে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। ব্রিটিশ দলিলপত্রে ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশের এই অভিযান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ হয়নি। তবে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এই অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐতিহাসিকরা নিজেদের প্রচেষ্টায় এই অভিযানের ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। তারা সকলেই জৈন্তিয়ার রাজাকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় ঐতিহাসিকদের এই দাবিকে সত্য বলেই মনে হয়। একইসাথে জৈন্তিয়ার রাজার বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভিযোগটিকে (নরবলির) অসত্য বলেই মনে হয়। ঐতিহাসিকরা এই অভিযোগের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও ত্রুটি তোলে ধরেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন যে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক স্যার এডওয়ার্ড গেইটও এই অভিযোগের অসত্যতা সম্পর্কে জানতেন; কিন্তু তিনি তা খোলাসা করেননি।

এক. ব্রিটিশ লেখকদের বক্তব্য

ব্রিটিশ লেখকদের মধ্যে জৈন্তিয়া রাজ্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন স্যার এডওয়ার্ড গেইট। অদ্ভূত ব্যাপার হল, জৈন্তিয়ার শেষ রাজার বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভিযোগের বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেছেন। *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থে তিনি ব্রিটিশদের জৈন্তিয়া দখলের কারণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। গ্রন্থটির *দ্য জৈন্তিয়া কিংস* অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন, "১৮৩২ সালে দ্বিতীয় রাম সিংহের মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন রাজেন্দ্র সিংহ। ১৮৩৫ সালে দেশটি ব্রিটিশদের অধিকারে চলে গেলে তিনি পদচ্যুত হন।"[106] এরপর

---

[106] "Ram Singh II died in 1832 and was succeeded by Rajendra Singh, who was deposed in 1835, on the annexation of the country by the British." – Sir Edward Albert Gait's *A HISTORY OF ASSAM*,

তিনি এ প্রসঙ্গে আর কিছু না বলেই অধ্যায়টি সমাপ্ত করেছেন। *হিস্টরি অভ আসাম* এর মতো একটি কালজয়ী গ্রন্থে জৈন্তিয়ার শেষ রাজার বিরুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভিযোগের বিষয়ে তাঁর নীরবতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওই অভিযোগের বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। অবশ্য *সাম নোটস অন জৈন্তিয়া হিস্টরি* প্রবন্ধে তিনি স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জির বরাতে ওই অভিযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধটি তিনি লিখেছিলেন আসামের চাকুরী জীবনের প্রথমদিকে, ১৮৯৫ সালে। আর *হিস্টরি অভ আসাম* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি চূড়ান্ত করেছিলেন ১৮২৬ সালে। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি জৈন্তিয়া সফর করেছিলেন এবং রাজ্যটির ইতিহাসের আরও অনেক তথ্য জোগাড় করেছিলেন। তাই ১৮২৬ সালে তিনি আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জির তথ্যটির উপর আস্থা হারিয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

ব্রিটিশদের জৈন্তিয়া দখলের কারণ সম্পর্কে স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি তাঁর *মেমোরেন্ডাম অন দ্য নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার অভ বেঙ্গল* গ্রন্থে লিখেছেন, "১৮৩২ সালে জৈন্তিয়ার ক্ষুদ্র সরদারদের অন্যতম, গোভার রাজা চুতার সিং ব্রিটিশ সরকারের চারজন প্রজাকে আটক করেন। তাদেরকে গোভার ভেতরের একটি মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের তিনজনকে কালীর উদ্দেশ্যে নৃশংসভাবে বলি দেওয়া হয়। চতুর্থজন দৈবক্রমে ব্রিটিশ অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে ভয়াবহ বলিদানের খবর পৌঁছে দেয়।"[107] এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯

Chapter-*The Jaintia Kings*,1926, Page-268

[107] "In 1832, four subjects of the British government were seized by Chutter Sing, the Raja of Goba, one of the petty chieftains dependent on the Jynteeah, they were carried to a temple within the boundaries of Goba where three were barbarously immolated at the shrine of Kali, the fourth providentially effected his escape into the British territories and gave intimation of the horrible sacrifice which had been accomplished." – Sir Alexander Mackenzie's *Memorandum on the North-East Frontier of Bengal*, 1869, Page-233 (later published as *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North-East Frontier of Bengal*)

সালে। এই বইতেই সর্বপ্রথম 'জৈন্তিয়ায়' ব্রিটিশ প্রজা হত্যার কথা উল্লিখিত হয়েছে। (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন দাপ্তরিক দলিলে অবশ্য একথা বহু আগেই উল্লিখিত হয়েছিল। স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি হয়তো সেসব দলিল থেকেই তথ্যটি নিয়েছিলেন।) ম্যাকেঞ্জির অনুকরণে স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টারও তাঁর বইতে একথা কথা উল্লেখ করেছেন।

স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার তাঁর *স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অভ আসাম* গ্রন্থে *(দ্বিতীয় ভলিউম)* লিখেছেন, "১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়া পাহাড় ব্রিটিশদের অধিকারে আসে। ওই বছর ... জৈন্তিয়ার শেষ রাজা ইন্দ্র সিংহকে তাঁর গোত্রের কিছু লোকের যোগসাজশে তিনজন ব্রিটিশ প্রজাকে অপহরণ করে কালী মন্দিরে নৃশংসভাবে বলি দেওয়ার অভিযোগে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর রাজ্যের সমতল অংশটিকে সিলেট জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়। রাজা স্বেচ্ছায় পার্বত্য অংশটি ত্যাগ করলে সেটিও আমাদের অধিকারে আসে। পদচ্যুত রাজাকে আজীবনের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা বা বার্ষিক ৬০০ পাউন্ডের পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছিল। তিনি ১৮৬১ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিলেটে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছিলেন।"[108]

দুই. শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরীর বিবরণ

---

108 "The Jaintia Hills came into British possession in 1835. In that year, as related in the Statistical Account of Sylhet District, the last Raja of Jaintia, Indra Singh, was deposed on the charge of complicity with certain of his tribesmen who had carried off three British subjects and barbarously immolated them at the shrine of Kali. The portion of his territory that lay in the plains was forth with annexed to the District of Sylhet; and the Raja voluntarily resigned the hill portion, of which we also took possession. A pension of Rs. 500 a month, or £600 a year, was granted to the deposed Raja for life, and he resided peaceably in Sylhet until his death in 1861." – Sir William Wilson Hunter's *A Statistical Account of Assam*, *Volume II*, 1879, Chapter- *The Khasi and Jaintia Hills*, Page-206

ঐতিহাসিক শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী জৈন্তিয়া রাজ্যের পতনের কারণ নিয়ে বেশ কৌতূহলী ছিলেন। তিনি যখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছিলেন তখন জৈন্তিয়ার রাজা রাজেন্দ্র সিংহের সমসাময়িক কিছু লোক জীবিত ছিলেন। এছাড়াও রাজেন্দ্র সিংহের উত্তরসূরীগণ অর্থাৎ রাজপরিবারের লোকজনও তখন জৈন্তিয়ায় বসবাস করতেন। ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের সময় প্রকৃতপক্ষে কী কী ঘটেছিল তা তাদের কাছ থেকে জানার জন্য অচ্যুতচরণ চৌধুরী জনৈক রাধাচরণ পালকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাধাচরণ জৈন্তিয়ার অনেক প্রবীণের সাথে কথা বলে জেনেছিলেন যে, জৈন্তিয়ার শেষ রাজা একজন বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে নরবলির কোন সম্পর্ক ছিল না। রাধাচরণ বহু লোকের সাথে কথা বলে প্রকৃত তথ্যসমূহ উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সকলের বক্তব্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে অচ্যুতচরণ চৌধুরীকে যে সারমর্ম জানিয়েছিলেন তা শ্রী চৌধুরীর *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ)* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। গ্রন্থটির *মুসলমান প্রভাব জয়ন্তীয়া* খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রী চৌধুরী লিখেছেন:

"রামসিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ঐ বৎসরেই কয়েকটি ব্রিটিশ প্রজাকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়ার কথা প্রচারিত হয়; ইহাতেই বিভ্রাট ঘটে। কিন্তু জানা যায় যে, রাজা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। ... জয়ন্তীয়াপুরের কোন ব্যক্তিই ব্যক্ত করে না যে, রাজা রাজেন্দ্রসিংহ এই হত্যা সংশ্রবে ছিলেন। আমাদের জয়ন্তীয়ার বিবরণ প্রদাতা শ্রীযুত রাধাচরণ পাল লিখিয়াছেন- 'আমরা গভীর অনুসন্ধানে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, রাজা কখনও নরবলি দিতেন না। রাজেন্দ্রসিংহের সমসাময়িক অনেক লোককে বাল্যকালে দেখিয়াছি। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এরূপ বলিতেন।'

রাজা রাজেন্দ্রসিংহ বৈষ্ণবধর্ম্মে গোঁড়া ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। 'জীবে দয়া' যে ধর্ম্মের সার উপদেশ, সেই ধর্ম্ম তিনি যাজন করিতেন। ... এই কবি ও ভক্ত রাজা হত্যা সংশ্রবে ছিলেন ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। রাজা হত্যা সংশ্রবে না থাকিলেও কুচক্রীর চক্রজালে তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

... শ্রুত হওয়া যায় যে, জয়ন্তীয়ারাজের জনৈক মন্ত্রী কোন গুরুতর অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কোনক্রমে কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবল তাড়নায় অধীর হইয়া কৌশলক্রমে পরম

যত্নে এইরূপ একটি ঘটনার সৃষ্টিক্রমে তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচরীভূত করেন। গোভার সামন্ত নৃপতি তাহার সহায় ছিলেন।

গোভা-পতি ছত্রসিংহ এই অনর্থের মূল। তাঁহার নিয়োজিত চরগণ বলির জন্য চারিটি বৃটিশপ্রজা ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ঐ ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনটিকে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়। চতুর্থ ব্যক্তি পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করে। এই নৃশংস ব্যাপারের সংবাদ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষীয়ের গোচরীভুক্ত হইলে গভর্নমেন্ট প্রকুপিত হন। হতাবশিষ্ট চতুর্থ ব্যক্তি গবর্ণমেন্টে এই সংবাদ প্রথম প্রচারিত করে বলিয়াও শুনা যায়।

... প্রায় আড়াই বৎসর কাল রাজা ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে এই বিষয় লইয়া লেখালেখি হইল। প্রকৃত হত্যাকারীকে বাহির করিয়া দিতে বলা হইল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তখন শাস্তিস্বরূপ জয়ন্তীয়ার সমতল ক্ষেত্র ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনাধীন করা হয়। ইহাই সরকারি বিবরণের মর্ম্ম।

লোকমুখে আরও কিঞ্চিৎ জানা যায়। ছাতকের ইংলিশ কোম্পানির হেরি সাহেব (Harry Inglis)- যিনি এসিষ্টান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে জয়ন্তীয়াপতির সহিত ব্যক্তিগতভাবে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। সরলহৃদয় রাজা, রাজনীতিবিদ এই ইংরেজ বন্ধুর কূটকৌশলে বিনা যুদ্ধে নিরস্ত্র ও শান্তভাবে ধৃত হন। তিনি স্বীয় সেনাপতি ও মন্ত্রীবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। শোনা যায় যে, তখন তিনি ষোলবর্ষ বয়সের বালকমাত্র ছিলেন। তখনও তাঁহার মুখে রেখা-গোপই উঠে নাই। তাহাকে শ্রীহট্টে আনয়ন করা এবং তত্রত্য বাবু মুরারি চন্দ্রের বাড়িতে রাখা হয়।

এইরূপে জয়ন্তীয়া রাজ্যের সমতলভাগ গৃহীত ও রাজা বন্দীদশাগ্রস্থ হইলেন। তাঁহার রাজ্যের পার্ব্বত্য অংশ তখনও গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু রাজ্যের লাভজনক সমতলাংশ গৃহীত হওয়ায় ক্ষোভ ও অভিমানে তিনি পার্ব্বত্য অংশও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন; তখন তাহাকে মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি দিয়া শ্রীহট্টেই রাখা হইল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। সরকারি কাগজপত্রেও এই বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাসিক এই সামান্য বৃত্তিতে তাঁহার কখন কখন অকুলান হইত। কেনই বা কুলাইবে? জানা যায় যে, তখনকার সহরবাসী বিখ্যাত ধনী কাঙ্গাল দাস

সাহাজীর নিকট রাজার সোনার থলি, কাঁদি সহিত স্বর্ণময় কলার থোড়, সোনার কুমড়া ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্যরাজি বাঁধা পড়িয়াছিল।

জয়ন্তীয়ার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইলে অধিবাসীবর্গ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছিল, কিছুই অবধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিগণ সহসা বশতাপন্ন হন নাই। প্রজাসাধারণ ক্রমে তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়াছিল।”

তিন. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজের বিবরণ

জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস পুস্তকের লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ জৈন্তিয়ার সারীঘাট এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৯২০ সালে জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে একত্র করে তিনি ১৯২৭ সালে *জৈন্তার ইতিহাস* নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৯৬৪ সালে *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস* নামে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ জৈন্তিয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। তিনি ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়া রাজ্যের পতনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

“রাজা রাজেন্দ্রসিংহ মাত্র তিন বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরই চারিটি ব্রিটিশ প্রজা জৈন্তাপতি কর্ত্তৃক বলী দেওয়ার কথা প্রচারিত হয়; কিন্তু রাজা ইহাতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। শুনা যায়, জনৈক মন্ত্রী কোনও কারণ বশতঃ রাজার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতঃ তাঁহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলে এই অমূলক ঘটনার সৃষ্টি করিয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন করিয়াছিল।

‘গোভা’ নামে জৈন্তাপতির একটি সামন্ত রাজ্য ছিল, যাহা বর্ত্তমানে নগাঁও জিলার অন্তর্ভুক্ত। এই গোভাপতির নাম ছিল ছত্রসিংহ। ইনিই উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডের মূল। তাঁহারই আদেশে তদীয় নিয়োজিত গুপ্তচরগণ চারিটি বৃটিশ প্রজাকে ধরিয়া নিয়া ‘বলী’ দিয়াছিল; কিন্তু বিদ্রোহী মন্ত্রী এই সংবাদই জৈন্তাপতির বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে। এই কারণে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট রাজা ইন্দ্রসিংহের প্রতি প্রকূপিত হন।

এই বিষয় লইয়া রাজা ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে প্রায় আড়াই বৎসর কাল অনেক লেখালেখি হয়; কিন্তু কোনও ক্রমে প্রকৃত হত্যাকারীর তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই।

অবশেষে গবর্ণমেন্ট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জৈন্তা রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ইহা সরকারী বিবরণের মর্ম্ম।

কিন্তু লোক মুখে শুনা যায়, 'হারি সাহেব' নামক জনৈক ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী খাসিয়া পাহাড়ে চূণার কারবার করিতেন এবং উক্ত পাহাড়ের সহকারী পলিটিকেল এজেন্টও ছিলেন। তিনি রাজেন্দ্র সিংহের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতঃ হঠাৎ একদিন সসৈন্য নিজপাট রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

রাজা তাঁহার এই আগমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কপটবন্ধু 'রাজধানী দর্শনের জন্য' আসিয়াছেন বলিয়া অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন সরল হৃদয় রাজা বন্ধুর যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অপরদিকে বন্ধু প্রবরের সৈন্যবর্গ নগরে লুট-পাট আরম্ভ করিয়া দিল। ইংরেজ সৈন্যের এবম্বিধ অন্যায় অত্যাচার দর্শনে রাজ-সেনাপতি ও সৈন্যগণ রাজ সমীপে আসিয়া এইসব বৃত্তান্ত অবগত করিলেন।

রাজা এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি চিন্তিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। নগরের চারিদিকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। মন্ত্রী ও সেনাপতি যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া সান্তনা বাক্যে কহিলেন, এখন যুদ্ধের আদেশ দেওয়া কোনও ক্রমে সমীচীন নহে। কেননা নগরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অযথা অনেক প্রজার প্রাণহানিরই সম্ভাবনা, ইশ্বরেচ্ছায়ই ইহা সংঘটিত হইয়াছে। নতুবা বন্ধু হইয়া এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে কেন? বোধ হয় আমার রাজত্বের অবসান হইয়াছে। অতএব যুদ্ধের প্রয়োজন নাই।

ইতোমধ্যে ইংরেজ সৈন্য অবাধে নগরের মধ্যে সমস্ত ধন-রত্নাদি লুণ্ঠন পুর্ব্বক রাজবাড়ী আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কপট বন্ধুর ইঙ্গিতে কালবিলম্ব না করিয়া রাজাকে বন্দী করতঃ রাজ অন্তপুর ও কোষাগার হইতে সোনার থুর, সোনার কুমড়া, সোনার পাকইড় ছড়া প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভার লুটিয়া লইল।

সরল হৃদয় রাজা রাজেন্দ্র সিংহ বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ বন্ধু 'হারি সাহেবের' কুট-কৌশলে বিনা যুদ্ধে নিরস্ত্র ও শান্তভাবে ধৃত হইলেন। হায়! বহুকালের পর আজ স্বাধীন জৈন্তিয়া রাজ্য পরাধীন হইল।

অতঃপর রাজাকে শ্রীহট্ট শহরে নিয়া তত্রত্য বাবু মুরারী চাঁদের বাড়ীতে বন্দী করিয়া রাখা হয়। হারি সাহেব যখন রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান তখনও

সৈন্য সেনাগণ ধরাব-লুণ্ঠীত হইয়া বলিয়াছিল যে, 'রাজন! এখনও আদেশ করুন, আমাদিগকে জীবিত রাখিয়া আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় কাহার সাধ্য? এই মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্যকে মুহুর্ত্ত মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করিব।' কিন্তু রাজা তখনও তাহাদিগকে ধীর ও গম্ভীরভাবে প্রবোধ দিতেছিলেন।

নিজপাটের সেই সময়কার দৃশ্য ও লোকের ভাব যে কিরূপ মর্ম্মভেদী ও আবেগপূর্ণ হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। এখনও জৈন্তায় হারি সাহেব সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য গীতি শুনিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর রাজা বন্দীদশায় শ্রীহট্টে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যের সমতল ভাগ অধিকৃত হইল, পার্ব্বত্য অংশ তখনও গৃহীত হয় নাই। কিন্তু রাজা ক্ষোভ ও অভিমানে সেই অংশও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহাকে মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন।"

চার. সৈয়দ মুর্তাজা আলীর বিবরণ

ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তাজা আলী ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়ার ইতিহাসের তথ্য জোগাড় করেছিলেন। তবে সময়ের অভাবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি রচনা থেকে বিরত ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালে তিনি এই পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শেষ করেন এবং একই বছর তা *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* নামে প্রকাশ করেন। তবে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের প্রতি তাঁর কৌতুহল এখানেই থেমে যায়নি। তিনি রাজ্যটির ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজটি অব্যাহত রেখেছিলেন। এর প্রমাণ *হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস* গ্রন্থ। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি জৈন্তিয়া রাজ্য সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। উভয় গ্রন্থেই তিনি জৈন্তিয়ার রাজার বিরুদ্ধে আনীত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অভিযোগটি অস্বীকার করেছেন। *হিস্টরি অভ জৈন্তিয়া* গ্রন্থে তিনি ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

"It is alleged that in 1832 four British subjects were kidnapped from the high road of Assam by Chatra Sinha, the chieftain of Gobah who was subordinate to Jaintia king, to whom the order was conveyed from the heir apparent Rajendra Sinha by the chief of Nartiang. One of the kidnapped persons escaped while

the other 3 are said to have been sacrificed in the temple of Kali within Gobah territory. British government wrote to the Raja to surrender the guilty persons but to no effect. Correspondence were carried on for some years. As the Raja did not surrender the guilty persons it was decided to take action against him. He had been reminded of the consequences of refusal and of the solemn warnings given before.

The tradition in Jaintia refers to a certain Mantri of Nijpat who had been imprisoned by the king and who in order to take revenge on the Raja invented the story of kidnapping of British subjects. On 15. 3. 35 Capt.Lister (buried at Cherrapunji in Khasi & Jaintia hills) commanding two companies of Sylhet Light Infantry Battalion in company of Harry Inglis, son of George Inglis of Chatak (1803-1860) then having local rank in the same corps, proceeded to Jaintipur with a strong detachment. Harry Inglis had been on friendly terms with the Raja and is said to have sent a message that he was coming on a friendly visit.

Tradition in Jaintia alleges that Harry Inglis was wanted by the British political agent on a charge of murder. Harry Inglis offered his services in subjugating Jaintia if he was absolved of the murder charge. Harry Inglis seems to have taken mean advantage of his friendship with the Raja of Jaintia and mislead him about the true motive of the invasion. The Raja, either because he lived in the friendly nature of the mission or thought it useless to offer opposition against the British, did not resist and was captured on 16. 3. 1835 (3rd Chait 1241 B.S.).

The intention to annex the territory was made known through a proclamation. After the capture of the Raja the Jaintia people wanted to give a fight but were desisted from doing so by the Raja. Raja's personal property to the value of about 1.5 lakh of

rupees including even his clothes and cooking pots were seized. The whole of the plains territory of the Raja was confiscated. The Raja was brought to sylhet and confined in a tilla near the bari (house) of Babu Murarichand. Government of India when informed however did not approve of the seizure of the personal property of the Raja and directed Col. Lister to restore to the Raja his personal property except arms and ammunition.

This seems to have been complied with as the Raja had mortgaged a number of gold utensils and other things in his days of poverty, the Raja was given the option of retaining his property in the hills. But the Raja refused the offer. British government then sanctioned a monthly pension of Rs. 500/- to the Raja in lieu of his property in the hills. Capt. Fisher, Superintendent of Kachar was placed in charge of Jaintia. The villagers were asked to meet Capt. Fisher and Commissioner Lowis at Mulagool on 27. 10. 1835. But not more then 4/5 persons turned up. They were asked to meet at Rajaganj, where Fisher and Lewis carried out a summery settlement with Chaudhuris, Sikdars and other actual occupiers of the soil. On 10. 1. 37 and 28. 2. 37 Governor of Bengal sanctioned transfer of Satbak and Jaintia respectively to Sylhet."

The pleas on which Jaintia was annexed is not well grounded. The Kidnapping, if any, took place in the highway of Assam which was under the control of chieftain of Gobah. In those uncertain times after Burmese invasion, the Jaintia king could not be expected to exercise sufficient authority at places so far from his capital. In any case, the annexation seems to have been a breach of the treaty executed between Ramsingh and Devid Scott. There is still great bitterness rankling in the minds of the people of Jaintia over this annexation on a plea the soundness of which they seriously challenge."

হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস গ্রন্থ গ্রন্থে সৈয়দ মুর্তাজা আলী ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

"বিজয়ী বর্মী সৈন্য যখন বিখ্যাত সেনাপতি মহাবান্দুলার নেতৃত্বে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয় তখন দায়ে পড়ে ইংরেজ সরকার যে সন্ধি করেন (জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহের সঙ্গে) এর শর্তসমূহ তাদের বিশেষ অনুকূল ছিল না। ইংরেজ সরকার এই সন্ধি বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজছিলেন। রামসিংহের মৃত্যু তাদেরকে সে সুযোগ এনে দিল।

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামসিংহের আমলে তাঁর অধীনস্থ গোভার সামন্ত রাজা শোভাসিংহ চারটি ব্রিটিশ প্রজাকে ধরে নিয়ে তাদের তিনজনকে কালী মন্দিরে বলী দেন। ইংরেজ সরকার এই ব্যাপারে রামসিংহের কাছে প্রতিকার প্রার্থী হন। রাজা তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা নিতে স্বীকৃত হন।

রামসিংহের জীবিতকালে ইংরেজ সরকার এই ব্যাপার নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি। অপরিণত বয়স্ক রাজেন্দ্র সিংহ রাজা হতেই তারা ঝোপ বুঝে কোপ দিলেন। তারা দাবি করলেন, যারা ব্রিটিশ প্রজা হরণ করেছিল তাদেরকে যেনো ধরে দেওয়া হয়। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের সন্ধির খেলাপ করে তারা রাজেন্দ্র সিংহের কাছে বার্ষিক দশ হাজার টাকা করও চাইলেন। সঙ্গত কারণেই রাজেন্দ্র সিংহ ইংরেজকে কর দিতে অস্বীকার করেন।

ইংরেজদের পীড়াপিড়িতে বাধ্য হয়ে রাজা রাজেন্দ্র সিংহ ব্রিটিশ প্রজা হরণে অভিযুক্ত অপরাধীদেরকে পলিটিক্যাল এজেন্টের হাতে সোপর্দ করেন। এজেন্ট অপরাধীদেরকে সমঝিয়ে পেয়েছেন বলে চিঠি লিখে জানান।

কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়। ... তারা ছলে বলে কৌশলে জৈন্তা দখল করা স্থির করলেন। ... ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ ইংরেজ সৈন্য বিনা যুদ্ধে জৈন্তা রাজ্য দখল করে ও রাজাকে বন্দী করে।

... মিথ্যা অজুহাতে জৈন্তা রাজ্য অধিকার ইংরেজ শাসনের দুরপনেয় কলঙ্ক। ব্রিটিশ প্রজা নাকি হরণ করেছিলেন গোভার সামন্ত রাজা। ব্রহ্মযুদ্ধের পরবর্তী অস্বস্তিপূর্ণ সময়ে ক্ষুদ্র জৈন্তা রাজ্যের রাজার পক্ষে রাজধানী থেকে দূরে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলে লুক্কায়িত অপরাধী ধরে দেওয়া সহজ ছিল না। সে সময়ে নিজপাট থেকে নওগাঁ জেলার গোভা পর্যন্ত যাতায়াত সুগম ছিল না। এমনকি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট-শিলং রাস্তা খোলার পূর্ব পর্যন্ত এই দুই দূরবর্তী স্থানের

যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। এতদসত্ত্বেও রাজা চারজন অপরাধীকে ধৃত করে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় *History of Assam*-এর লেখক স্যার এডোয়ার্ড গেইট কথা গোপন করেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ রামসিংহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সন্ধির শর্ত খেলাপ করে রাজেন্দ্র সিংহের কাছে করের দাবি করা সমর্থন করেননি। জৈন্তা অধিকারের খবর পেয়ে তারা স্থানীয় কর্মচারীদের জবরদস্তির তীব্র নিন্দা করেন ও রাজার বাজেয়াপ্ত করা ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রত্যার্পণের হুকুম দেন।"

পাঁচ. গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমানের বিবরণ

সিলেটের ইতিহাস গবেষক ফজলুর রহমান ছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি বিমান বাহিনীর একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পেশাগত পরিচয়ের চেয়ে লেখক পরিচয়টিই মূখ্য হয়ে উঠেছে। সিলেট অঞ্চলের ইতিহাস চর্চায় মৌলিক অবদানের কারণেই তিনি গবেষক মহলে সমাদৃত। এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন রাজ্য জৈন্তিয়ার ইতিহাসের প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল খুবই গভীর। ছোটবেলা থেকেই নিজের পিতার মুখে জৈন্তিয়ার বিভিন্ন গল্প শুনে তিনি এই রাজ্যটির ইতিহাসের প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। এই রাজ্যটি নিয়ে তাঁর পিতা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ *জৈন্তার ইতিহাস* নামে একটি ইংরেজি পুস্তক লিখেছিলেন যা ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে ফজলুর রহমান তাঁর পিতার সংগৃহীত আরও বিভিন্ন তথ্য যুক্ত করে এই বইটিকে বর্ধিত আকারে (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই বইটির নাম ছিল *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস*।

ফজলুর রহমান এখানেই থেকে থাকেননি। তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের ওপর বিভিন্ন লেখকের বইপত্র ও রচনাবলী সংগ্রহ করে *জৈন্তিয়া দর্পণ* নামে একটি সঙ্কলন প্রস্তুত করেছিলেন। ২০০১ সালে ঢাকাস্থ জৈন্তিয়া সমিতির পক্ষে এই সঙ্কলটি প্রকাশ করেছিলেন মোহাম্মদ শামসুজ্জামান। এই বইটি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গবেষক মহলে সমাদৃত। ফজলুর রহমান নিজেও জৈন্তিয়ার ইতিহাস নিয়ে কলম ধরেছেন। *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* গ্রন্থে তিনি রাজ্যটির ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোলে ধরেছেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯১ সালে। এটিই তাঁর সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে জৈন্তিয়ার ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব অধ্যায় রয়েছে তা হল- *জৈন্তাপতি কামদেব ও রাঘব পাণ্ডবীয় গ্রন্থ, জৈন্তা রাজ্যের কথা, সেনাপতি ফতেহ খাঁ* ও *হ্যারি ইনগলিস*। *হ্যারি ইনগলিস* অধ্যায়টিতে তিনি ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

"সিলেটের চূনা অতি প্রসিদ্ধ। ... সিলেটের বৃটিশ রেসিডেন্ট লিন্ডসে সাহেব এই চূনার কারবারে প্রভূত ধন উপার্জন করে লর্ড শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লিন্ডসে সিলেট ত্যাগ করেন। এর চার বৎসর পরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রেইট ও জর্জ ইংলিস নামে দুই ব্যক্তি চূনার ব্যবসায়ের জন্য ছাতক আগমন করেন। তাদের কোম্পানির নাম হয় রেইট ইংলিস এন্ড কোম্পানী। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রেইট সাহেবের মৃত্যু হয়। জর্জ ইংলিস সম্পূর্ণ কোম্পানীর মালিক হন। এর নূতন নাম হয় 'ইংলিস কোম্পানী'।

... জর্জ ইংলিসের দুই পুত্র- হ্যারি ইংলিস ও জন ইংলিস। ... হ্যারি জর্জের জেষ্ঠ্য পুত্র। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট তিনি হারি সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।

ডেভিড স্কট ১৮২৬ হতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খাসিয়া পাহাড়ে বৃটিশ এজেন্ট রূপে কাজ করেন। এই সময়ে খাসিয়া পাহাড়ে বৃটিশ প্রভূত্ব প্রবল হতে থাকে। তার পরে অল্প কাল রবার্টসন ও কর্ণেল জেঙ্কিনস এজেন্টের কাজ করেন। জেঙ্কিন্সের পরে কর্ণেল লিস্টার (১৮৩৫-১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ) এজেন্ট নিযুক্ত হন। ইনি Sylhet Light Infantry সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। চেরাপুঞ্জীর দেওয়ানী কার্য্যভারও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। হ্যারি সাহেব তাঁর পিতার জীবদ্দশায় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্ণেল লিস্টারের সহকারী রূপে কাজ করেন।

সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসাবে হ্যারি সাহেবের খাসিয়া সর্দার ও জৈন্তার রাজপরিবারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। হ্যারি ইনগলিস জৈন্তাপতি ইন্দ্রসিংহের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন।

এই সময়ে রাজা ইন্দ্রসিংহের কোন শত্রু প্রচার করে যে, ৪ জন বৃটিশ প্রজাকে ধরে কালীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জৈন্তার সামন্ত গোভারাজ্যের নৃপতি ছত্রসিংহ এই অনর্থের মূল। তাঁর নিয়োজিত চরগণ বলির

জন্য ৪ জন বৃটিশ প্রজা ধরে আনে। ৩ জনের বলি দেওয়া হয় ও ৪র্থ ব্যক্তি পলায়ন করে।

বৃটিশ সরকার এই ঘটনায় বিশেষ কূপিত হন। প্রকৃত হত্যাকারীকে জৈন্তারাজ ধরিয়ে দিতে অসমর্থ হওয়ায় শাস্তিস্বরূপ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জৈন্তার সমতল অংশ বৃটিশ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

হ্যারি ইনগলিস জৈন্তায় পৌঁছালে সরল হৃদয় যুবক রাজা তাঁর ইংরাজ বন্ধুর কুটকৌশলে বিনা বাঁধায় শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন। জৈন্তার সেনাপতি ও মন্ত্রীবর্গের নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী হন। জয়ন্তীয়ার একটি গ্রাম্য গীতিতে এই ঘটনার আভাস পাওয়া যায়।"

ছয়. ব্রিটিশদের জৈন্তিয়া দখলের কারণ

ইতিহাস থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক সুবিধার জন্যই ব্রিটিশরা ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দোলার রাজ্য দখল করেছিল। কিন্তু বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তারা নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামে মিথ্যাচার চালিয়েছে। কল্পিত 'অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডের' জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে দায়ী করেছে তারা। একই ব্যাপার ঘটেছে জৈন্তিয়ার ক্ষেত্রেও। জৈন্তিয়ার রাজার বিরুদ্ধে 'ব্রিটিশ প্রজা ধরে এনে বলী দেওয়ার' অভিযোগ তোলে তারা। কিন্তু ওই হত্যাকাণ্ডের সাথে জৈন্তিয়ার রাজার কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও ব্রিটিশরা এই অজুহাতে জৈন্তিয়া দখলের কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলে লিপিবদ্ধ করেছে। প্রকৃত সত্য হল, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি যখন ঘটে তখন রাজেন্দ্র সিংহ এ ঘটনার কিছুই জানতেন না। তখন তিনি জৈন্তিয়ার রাজাও ছিলেন না। তিনি রাজা হওয়ার পর এ ঘটনায় জড়িত অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তোলে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এখানেই শেষ হয়ে যায়। ব্রিটিশরাও এ বিষয়টি নিয়ে আর কোন কথা বাড়ায়নি।

হ্যারি ইংলিশ যখন সদলবলে জৈন্তিয়ার রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি বলেননি যে, ব্রিটিশ প্রজা হত্যার অভিযোগে জৈন্তিয়া দখল করতে এসেছেন। বরং তিনি জৈন্তিয়ার রাজধানীতে বেড়াতে এসেছেন বলে রাজাকে ধোঁকা দিয়েছিলেন। হ্যারির সৈন্যরা রাজাকে বন্দী করে সিলেট শহরে নিয়ে যাওয়ার পর সিলেটের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কলকাতা কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে রিপোর্ট করেন যে, জৈন্তিয়ার রাজা রাজেন্দ্র সিংহের আদেশেই আড়াই বছর

আগে তিন জন ব্রিটিশ প্রজাকে বলী দেওয়া হয়েছিল এবং এ ঘটনার কোন প্রতিকার না হওয়ায় রাজাকে বন্দী করা হয়েছে। জৈন্তিয়া দখলের বিষয়টিকে বৈধতা দানের উদ্দেশ্যেই তারা এই অভিযোগটিকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। প্রকৃত সত্য হল, আদৌ যদি ব্রিটিশ প্রজা বলীদানের অভিযোগে জৈন্তিয়া দখল করা হতো তবে তা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েই করা হতো। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটেনি। বরং জৈন্তিয়া দখলের জন্য চুপি চুপি একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয় জৈন্তিয়ার রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশকে!

ব্রিটিশরা রাজ্য দখল করত আর্থিক লাভের আশায়। বিজিত অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ কর আদায়ের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক উপায়েও প্রচুর অর্থ আয় করতো। দুটি ক্ষেত্রেই জৈন্তিয়া ছিল বেশ সম্ভাবনাময় এলাকা। জৈন্তিয়া দখলের পরবর্তীতে ব্রিটিশরা এই ভূখণ্ডের রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে দিতে থাকে। রাজাদের আমলে জৈন্তিয়ার রাজস্ব ছিল ৮,৮০০ টাকা। স্বাধীনতা হরণের পরের বছর, ১৮৩৬ সালে ব্রিটিশরা জৈন্তিয়ার রাজস্ব নির্ধারণ করে ৩৫,৯৮৮ টাকা। আর ১৯১৫ সালে এই রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২,৪৯,৭২২ টাকা। জৈন্তিয়ার গৃহবন্দী রাজার জন্য ব্রিটিশরা মাত্র পাঁচশো টাকার ভাতা নির্ধারণ করেছিল। এ ভূখণ্ড থেকে তারা যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতো সে তুলনায় এই অর্থ কিছুই নয়। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শোষণের একটি স্পষ্ট নমুনা এটি।

জৈন্তিয়া থেকে রাজস্ব ছাড়াও প্রচুর বাণিজ্যিক মুনাফা আয় হতো তাদের। চুনাপাথর, চা-শিল্প এবং হাতি ধরা থেকে এসব আয় আসতো। চুনাপাথর আহরণের জন্য ব্রিটিশরা যেসব পাথর কোয়ারী চালু করেছিল সেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা দেখলে আজও বিস্মিত হতে হয়। ব্রিটিশদের গড়ে তোলা অনেকগুলো চা বাগান এখনও চা উৎপাদন করে যাচ্ছে। তবে হাতি খেদার সেই লাভজনক ব্যবসাটি অনেক আগেই হারিয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ আমলে মুলাগুলের একেকটি হাতি খেদায় প্রচুর হাতি ধরা পড়তো। ব্রিটিশ বিনিয়োগকারিরাই সেসব খেদায় অর্থ বিনিয়োগ করতেন। একেকটি খেদায় ধরা পড়া হাতিগুলোকে বিক্রি করে তারা লগ্নিকৃত অর্থের কয়েকগুণ বেশি মুনাফা উঠিয়ে নিতেন। মুলাগুলের হাতি সারা ভারতেই বিক্রি হতো বলে জানা যায়। এই হাতির ব্যবসাটি ব্রিটিশদের জন্য ছিল খুবই লাভজনক। এছাড়াও জৈন্তিয়া ছিল

উন্নতমানের কাঠ, বেত, তেঁজপাতা এবং লেবুসহ বিভিন্ন সাইট্রাস উদ্ভিদের বিপুল ভাণ্ডার।

ব্রিটিশরা জানত, যতদিন জৈন্তিয়া স্বাধীন থাকবে ততদিন তাদেরকে এসব প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদন / আহরণের জন্য রাজাকে কর পরিশোধ করতে হবে। এই কর ফাঁকি দিতে হলে জৈন্তিয়া দখল করা ছাড়া তাদের আর কোন পথ তাদের সামনে ছিল না। এতে কোন সংশয় নেই যে, বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্য থেকে বিপুল আয়ের সম্ভাবনা এবং এর পাশাপাশি প্রচুর রাজস্ব আদায়ের লোভেই ব্রিটিশরা জৈন্তিয়া দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ লেখকরা তা স্বীকার করেননি। যেসব ব্রিটিশ লেখক সিলেট ও আসাম অঞ্চলের ইতিহাস রচনায় অবদান রেখেছেন তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতেই কর্মরত ছিলেন। তাই তাদের পক্ষে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। তাদের বক্তব্য অনুসরণ করতে গিয়ে পরবর্তী যুগের লেখকরাও অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

অধ্যায় আটত্রিশ
রাজপরিবারের পরিণতি

১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ। দখলদার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্ত সিলেট লাইট ইনফেনট্রির দুই কোম্পানি সৈন্য সেদিন হঠাৎ করেই দখল করে নেয় হাজার বছরের পুরানো সভ্যতার লীলাভূমি- জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশ। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ছাতকের ইংলিশ কোম্পানির ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশ। সিলেটের ব্রিটিশ সেনাপ্রধান লিস্টারের অধীনেই তিনি এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। হ্যারি ইংলিশ খাসিয়া পাহাড়ের চুনার কারবারের সাথে জড়িত থাকায় খাসিয়া-সিন্টেংদের সম্পর্কে তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল। জৈন্তিয়ার রাজা রাজেন্দ্র সিংহের সাথে তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। তিনি প্রায়ই জৈন্তিয়ায় যাতায়াত করতেন। এই পূর্বপরিচয়কে কাজে লাগিয়ে কৌশলে জৈন্তিয়া দখলের জন্যই তাকে অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এক. রাজেন্দ্র সিংহের বন্দীদশা

জৈন্তিয়ার রাজা রাজেন্দ্র সিংহ হ্যারি ইংলিশকে তাঁর বন্ধু মনে করতেন। তাই নিজ রাজধানীতে ব্রিটিশদের আগমনকে তিনি বেশ স্বাভাবিকভাবেই দেখেছিলেন। হ্যারি ইংলিশ রাজাকে জানালেন যে, তিনি সদলবলে জৈন্তিয়ার রাজধানীতে ভ্রমণ করতে এসেছেন। রাজাও তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং অতিথিদের সমাদরের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে হ্যারির সশস্ত্র সৈন্যরা রাজধানীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর দখল নিতে শুরু করেছে। সারা রাজধানীতে হুলুস্থূল পড়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে রাজার সেনাপতি এবং সৈন্যরা দৌড়ে এসে রাজাকে বিষয়টি অবহিত করল। সরল হৃদয় রাজা এই অভিনব বিশ্বাসঘাতকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং পরিস্থিতির মোকাবিলায় কোন সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষমতার পরিচয় দিলেন। এ ধরণের পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা তিনি বুঝেই উঠতে পারছিলেন না।

কোম্পানি সৈন্যরা তখন নগরীজুড়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালাচ্ছে। রাজার মন্ত্রী ও সেনাপতি যুদ্ধের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাজা এতে ব্যাপক প্রাণহানীর আশংকা করে যুদ্ধের আদেশ প্রদান থেকে বিরত রইলেন। রাজা সবকিছুকেই

তাঁর বিধিলিখন মনে করে এই অশুভ পরিণতিকেই মেনে নিলেন। রাজা তাঁর সৈন্যদেরকে প্রবোধ দিয়ে বললেন- এখন যুদ্ধ করা কোনভাবেই সমীচিন নয়। নগরীর ভিতরে যুদ্ধ হলে অনেক প্রজার প্রাণহানীর সম্ভাবনা রয়েছে। যা কিছু ঘটেছে তার সবই বিধাতার ইচ্ছায় ঘটেছে। তা না হলে বন্ধু হয়ে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে কেন? বোধ হয় আমার রাজত্বের অবসান হয়ে গিয়েছে। অতএব যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। এদিকে কোম্পানি সৈন্যরা সারা নগরীর মূল্যবান ধন-রত্ন লুণ্ঠন শেষে রাজবাড়িতে এসে ভিড় জমাল। রাজার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু হ্যারি ইংলিশের আদেশে তারা রাজাকে বন্দী করে ফেলল। লুটেরাদের হাতে রাজা বন্দী হওয়ার পর তাঁর প্রাসাদেও লুণ্ঠন চলল। রাজ-কোষাগার এবং রাজপরিবারের বিখ্যাত সোনার মোচা, সোনার কুমড়া, সোনার পাকইড় ছড়া- প্রভৃতি সম্পদ লুট হয়ে গেল।

সরল হৃদয় রাজা তাঁর বন্ধু হ্যারি সাহেবের এই বিশ্বাঘাতকতায় মুষড়ে পড়লেন। আত্মসমর্পণ ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। ব্রিটিশদের হাতে তাঁর অসহায় আত্মসমর্পণের ফলে জৈন্তিয়া রাজ্যের স্বাধীনতার সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়ে গেল। এরপর হ্যারি সাহেবের নির্দেশে কোম্পানি সৈন্যরা বন্দী রাজাকে নিয়ে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হল। তখন জৈন্তিয়ার রাজধানীতে যে মর্মভেদী দৃশ্যের অবতারণা হয় তা ভাষায় বর্ণনাতীত। কথিত আছে যে, বন্দী রাজাকে নিয়ে সিলেট শহরে যাওয়ার পথে হাজার হাজার জৈন্তিয়াবাসী ধূলায় লুটিয়ে শোক প্রকাশ করে এবং রাজার কাছে এসে অনুনয় করে বলে- হে রাজন! আমাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দিন। আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও আপনাকে মুক্ত করব। আমাদের প্রাণ থাকতে আপনাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া কার সাধ্য?

কিন্তু রাজা তখনও তাদেরকে শান্তভাবে প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজা জৈন্তিয়াবাসীকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর জন্য হাজার হাজার জৈন্তিয়াবাসীর রক্তক্ষয় হোক- এটা তিনি চাননি। তাই নিজের পরাজয়কেই তিনি মেনে নিলেন। ব্রিটিশরা তাকে সিলেটে এনে জমিদার মুরারী চাঁদের বাড়ীতে গৃহবন্দী করে রাখে এবং তাঁর সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। এই সম্পত্তির মূল্য ছিল তৎকালীন সময়ের দেড় লাখ টাকা। মুরারী চাঁদের বাড়ীর যে টিলার ওপরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানে এখন এম.সি. কলেজের অধ্যক্ষের বাংলো অবস্থিত। এই টিলাটিকে একসময় বলা হতো থেকারে টিলা।

সিলেটের প্রথম ব্রিটিশ কালেক্টর উইলিয়াম মেইকপিস থেকারের নামে এই টিলাটির এমন নামকরণ হয়েছিল। রাজেন্দ্র সিংহ তাঁর বাকি জীবন কাটিয়েছিলেন এখানেই (গৃহবন্দী অবস্থায় তিনি এখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন)।

ব্রিটিশরা রাজেন্দ্র সিংহকে জৈন্তিয়ার পার্বত্য ১২ পুঞ্জিতে রাজত্ব করার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষোভে ও অভিমানে রাজা এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ফলে ব্রিটিশরা জৈন্তিয়ার এই পার্বত্য অংশকেও তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে। ওই সময়ে পার্বত্য সিন্টেংরা তীর-ধনুক নিয়ে কিছুদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে তারা বেশিদিন টিকতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলেও উড়ল ব্রিটিশ পতাকা- ইউনিয়ন জ্যাক। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটল এক গৌরবময় সভ্যতার কয়েক হাজার বছরের সোনালী ইতিহাসের। জনশ্রুতি আছে যে, জৈন্তিয়া দখলের পূর্ববর্তী সময়ে ক্যাপ্টেন হ্যারি ইংলিশ কোম্পানি সরকারের কাছে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ছিলেন। জৈন্তিয়াকে কোম্পানি সরকারের স্থানীয় কর্মকর্তাদের হাতে তোলে দেওয়ার পরে তিনি ওই অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছিলেন।

দুই. ইন্দ্র সিংহ ও হ্যারি সাহেবকে নিয়ে গ্রাম্য গীতি

জৈন্তিয়া ছিল গ্রাম্য গীতিকবিতার এক উর্বর ভূমি। এই জনপদের সর্বত্রই গীতিকবিতার প্রচলন ছিল। এখানকার প্রতিটি গ্রামেই কিছু লোক গীতিকবিতা মুখস্থ করে রাখতো এবং অবসর সময়ে তারা এগুলো মানুষকে পাঠ করে শোনাতো। গীতের আসর ছিল জৈন্তিয়ার গ্রামীণ সংস্কৃতির সেরা উপাদান। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এই সংস্কৃতিটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। যারা বিরল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল তারা হাজার হাজার পঙতির গীত মুখস্থ রাখতে পারতো। এধরণের লোককে বলা হতো ‘খলিফা’। খলিফারা বিভিন্ন গ্রাম্য আসরে গীত পাঠ করতো। তারা নিজেরাও গীত রচনা করতো এবং প্রয়োজনে প্রচলিত গীতের মধ্যে নতুন পঙতি সংযোজন করতো। ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের পর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে দু-একজন খলিফা কিছু গ্রাম্য গীত রচনা করেছিলেন। এসব গীতের অংশবিশেষ মানুষের মুখে ঘুরে বেড়াতো। ঐতিহাসিকরা তাদের বইতে এমন কিছু পঙতি উল্লেখ করেছেন। এসব পঙতি কোন গীতের অংশ ছিল এবং এগুলোর প্রকৃত রচয়িতা কারা

ছিলেন তা কোন ঐতিহাসিকই খুঁজে পাননি। পঙতিগুলোতে জৈন্তিয়ার পতনের ঘটনাকে একটি আকস্মিক হৃদয়বিদারক ঘটনা হিসেবেই তোলে ধরা হয়েছে; একইসাথে জৈন্তিয়ার শেষ রাজার প্রতি গভীর সহানুভূতিও প্রকাশ পেয়েছে। পঙতিগুলো নিম্নরূপ:

(১)

মুই কই যাউমু রে – কোথায় গেলে তরি
হাকিম হইল হুকুমদার – পেদা প্রাণের বৈরী
রে মুই কই যাউমু রে –
বাট্টি রুট্টি ইন্দ্র সিংহ – মুখে রেখা দাড়ি
বন্দী করি থইল নিয়া – মুরারী চান্দর বাড়ী
রে মুই কই যাউমু রে –

(২)
হারি সাহেব বাহাদুর –
বেগর দোষে মাইলেরে সোনার জৈন্তাপুর
ছাতক তনে আইল হারি, যাইত বদরপুর
সিলেট গিয়া জিগার করে, জৈন্তা কতদূর?
হারি সাহেব বাহাদুর –

তিন. রাজেন্দ্র সিংহের নিষ্ফল আবেদন

কিছু সূত্র থেকে জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর মহলের কর্তারা (ডিরেক্টরগণ) বেআইনীভাবে জৈন্তিয়া দখলের বিষয়টি পছন্দ করেননি। রামসিংহের সাথে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তিটিকে এভাবে লঙ্ঘন করায় তারা বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। তারা স্থানীয় কর্তাদের জবরদস্তিমূলক আচরণের নিন্দা করেন এবং জৈন্তিয়ার রাজার যেসব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেগুলো ফেরত দেওয়ার আদেশ দেন। বন্দী রাজার জন্য কোম্পানি সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক পাঁচশত টাকার সরকারি ভাতাও নির্ধারণ করা হয়েছিল। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই ভাতা পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্র সিংহ কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে তাঁর হারানো রাজ্য ফেরত পাওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

কোম্পানি সরকার তাঁর হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার ন্যায্য দাবিটিকে পুরোপুরিভাবেই আগ্রাহ্য করেছিলেন। ১৮৩৬ সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্র সিংহ ব্রিটিশ ভারতের বড়লাটের কাছে জৈন্তিয়া রাজ্য ফিরিয়ে দেবার আনুরোধ জানান। বৈষ্ণব চন্দ্র মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তির মারফতে তিনি এই অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র সিহের যৌক্তিক আবেদনটি নামঞ্জুর করা হয়। পরের বছর রাজা স্বয়ং নিজে এ ব্যাপারে বড়লাটের সাথে দেখা করতে চান। কিন্তু তা আগ্রাহ্য করা হয়। শেষ পর্যন্ত এই গৃহবন্দী রাজা কলকাতায় গিয়ে গঙ্গাস্নান করার অনুমতি চান। হতভাগ্য রাজা এই অনুমতিটুকুও পেলেন না। রাজা এবার সিদ্ধান্ত নিলেন- রাজ্য ফেরত পাওয়ার ব্যাপারটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মাসিক ভাতা নিবেন না। এর ফলে রাজা বেশ আর্থিক সংকটে নিপতিত হন।

এসময় তাকে খুবই দৈন্যদশায় জীবন কাটাতে হয়। বাধ্য হয়ে তিনি নিজের সোনার দ্রব্যগুলো সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী জনৈক মহাজনের কাছে বন্ধক রাখেন। শেষ পর্যন্ত সকল আবেদন-নিবেদন আগ্রাহ্য হওয়ার পর, ১৮৩৮ সালের আগস্ট মাস থেকে রাজা আবারও মাসিক ভাতা গ্রহণ করতে সম্মত হন। এরপর তাঁর জীবন সম্পর্কে আর তেমন কিছু জানা যায় না। ইতিহাসের এক হতভাগ্য রাজা হিসেবে তিনি মুরারী চাঁদের বাড়ীতে গৃহবন্দী অবস্থায় নিভৃত জীবন কাটিয়েছিলেন। তাঁর সেই নিরানন্দ জীবনের অবসান হয় ১৮৬১ সালে। অত্যন্ত সজ্জন ও কোমল মনের এই রাজার মৃত্য জৈন্তিয়াবাসীর মনেগভীর বেদনার ছাপ রেখেছিল। জৈন্তিয়াবাসী তাকে ভুলতে পারে নাই। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদেকেও জৈন্তিয়াবাসী রাজার সম্মানই দিয়ে এসেছে।

চার. প্রতীকী রাজা নরেন্দ্র সিংহের কথা

১৮৬১ সালে জৈন্তিয়ার ক্ষমতাচ্যুত রাজা রাজেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী নরেন্দ্র সিংহকে জৈন্তিয়াবাসী তাদের 'প্রতীকী রাজা' হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি তাঁর মামার মতো গৃহবন্দী ছিলেন না। তাঁর মামা যখন সিলেট শহরের উপকণ্ঠে গৃহবন্দী ছিলেন তখন তিনি নিজের মায়ের সাথে জয়ন্তীপুরের (নিজপাট) রাজবাড়িতেই থাকতেন। ব্রিটিশ সরকার এই প্রতীকী রাজাকে কোন ভাতা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই তিনি খুবই আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে যান। তাঁর এই দৈন্যদশায় ব্যথিত হয়ে জৈন্তিয়ার

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিজপাটে একটি বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, নিজপাটের প্রত্যেক হাটি বা গলিতে পালাক্রমে যে সাপ্তাহিক হাট বসে তা এখন থেকে বসানো হবে রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে। আর এই হাটের আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ দেওয়া হবে রাজাকে।



চিত্রঃ জৈন্তিয়ার প্রতীকী রাজা নরেন্দ্র সিংহ (মৃত্যুঃ ১৮৮৫ সাল)

যথারীতি তা শুরু হল। প্রতি সপ্তাহে রাজবাড়ির দক্ষিণের খোলা জায়গায় হাট বসতে শুরু করল আর এই হাটের ব্যবসায়ীরা তাদের আয়ের খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ রাজপরিবারকে দিতে শুরু করলেন। রাজপরিবারকে প্রদত্ত এই মাশুলকে তখন 'দান' বলা হতো। যদিও হাটের নিমিত্তে রাজপরিবারের ভূমি ব্যবহারের বিনিময়ে এই মাশুল প্রদান করা হতো তবুও তা 'দান' হিসেবেই পরিচিত ছিল। যতদিন ধরে রাজপরিবারের উত্তরাধিকারীরা জৈন্তিয়ায় বসবাস করেছিলেন ততোদিন পর্যন্ত এই 'দান' দেওয়ার প্রথাও চালু ছিল। সম্ভবত নগদ অর্থেই এই দান দেওয়া হতো। তবে 'জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস' পুস্তিকার লেখক মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ লিখেছেন যে, দান হিসেবে বাজারের জিনিসপত্রই দেওয়া হতো। ওই লেখকের বর্ণনামতে, ক্ষমতাচ্যুত রাজা রাজেন্দ্র সিংহের সময়েই এই হাটটি চালু করা হয়েছিল।

তিনি আরও লিখেছেন যে, রাজেন্দ্র সিংহ গৃহবন্দী হওয়ার পর রাজপরিবারের সদস্যদের আর্থিক সংকট দূর করার জন্য রাজার দুই ভগ্নিপতি উখাট কুওর ও লংবর কুওর ওই হাটটি চালু করার উদ্যোগ নেন। তারা পাহাড় ও সমতলের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে রাজবাড়ির বড় উঠানে একটি সপ্তাহিক হাট বসানোর আয়োজন করেছিলেন। এই হাটটি 'জৈন্তাপুরী হাট' বা নিজপাট বাজার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই হাট-বাজারের 'দান' দেওয়ার প্রথা শতাব্দীকালেরও অধিক সময় ধরে টিকেছিল। জৈন্তিয়ার প্রতীকী রাজা নরেন্দ্র সিংহ ওই অস্থায়ী হাটের ক্ষুদ্র আয় দিয়ে খুবই কষ্টে পরিবার চালাতেন। অবশেষে তাঁর এই দূরবস্থার কথা জেনে সিলেটের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মিস্টার লমটন জনসন সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিলেন।

মিস্টার লমটন জনসন ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত সিলেটের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন (আগের 'কালেক্টর' পদটিকে ওই সময়ে বলা হতো 'ডেপুটি কমিশনার' এবং ব্রিটিশ আমলের শেষ পর্যন্ত এই শব্দদ্বয়ই ব্যবহৃত হতো)। ডেপুটি কমিশনার জনসন সাহেব নরেন্দ্র সিংহের দূরবস্থায় সহানুভূতিশীল হয়ে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের কাছে বিষয়টি তোলে ধরেন এবং অনেক লেখালেখির পর তিনি এই নিভৃতচারী রাজার জন্য মাসিক তিনশত টাকা ভাতার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। নরেন্দ্র সিংহ আজীবন এই ভাতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তিনি আরও কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছিলেন। নিজপাট থেকে সিলেট শহরে গমণের সময় তিনি দেহরক্ষী, পতাকাবাহী এবং কিছু অনুসঙ্গীও সাথে রাখতে পারতেন। অত্যন্ত সচ্চরিত্র, অমায়িক ও সাহসী মানুষ হওয়ায় তিনি সকলের কাছে বেশ সম্মানের পাত্র ছিলেন।

জৈন্তিয়ার বিভিন্ন বিনোদনমূলক উৎসবেও তাকে নিমন্ত্রণ করা হতো। তৎকালীন যুগে শিকার ছিল বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। 'গড়' বানিয়ে পশু শিকারের পদ্ধতিটি ছিল খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ খেলা ছিল। বিশেষ করে বাঘ শিকারের বেলায় তা আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। নরেন্দ্র সিংহের দুর্ভাগ্য যে, তিনি এই ঝুঁকিপূর্ণ খেলার আতিথ্য গ্রহণ করে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে ফেলেছিলেন। ১৮৮৫ সালে বাঘ শিকার দেখার জন্য তিনি একটি বাঘের গড়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঘের আক্রমণের শিকার হন এবং গুরুতর আহত হন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের

একপর্যায়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পুরো জৈন্তিয়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছিল।

পাঁচ. নরসিংহ নৃপ ও ছত্রসিংহ নৃপ

রাজা নরেন্দ্র সিংহ নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে দুটি নাবালক ভাগিনেয়কে রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এদের নাম ছিল- নরসিংহ নৃপ ও ছত্রসিংহ নৃপ। এদের পিতা-মাতা কেউই জীবিত ছিলেন না। তাই মামাই ছিলেন তাদের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন। মামার আকস্মিক মৃত্যুতে তারা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে। একটি বিখ্যাত রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী এই শিশুদের এমন অসহায়ত্ব কিছু মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়। এদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন সিলেট জেলার জজ বাহাদুর। তিনি এই শিশুদেরকে নিজপাট থেকে সিলেট শহরে নিয়ে যান এবং তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। সিলেট শহরে তাদেরকে ইংরেজি মাধ্যমের পড়ালেখায় ভর্তি করানো হয়েছিল। পড়ালেখা শেষে বড় হয়ে তারা আবার ফিরে এসেছিলেন নিজেদের মাতৃভূমি জৈন্তিয়ায়।

১৮৯৭ সালে তারা নিজপাটের ভগ্নপ্রায় রাজবাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন। দুর্ভাগ্যবশত তাদের ফিরে আসার কিছুদিন পূর্বে এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে রাজবাড়িটি খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ওই ভূমিকম্পে বৃহত্তর সিলেট ও কাছাড় অঞ্চলের অধিকাংশ প্রাচীন স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল (এসব অঞ্চলের প্রত্নসম্পদের এতোটা ক্ষয়ক্ষতি আর কোন ভূমিকম্পের ফলে হয়নি)। নরসিংহ নৃপ এবং ছত্রসিংহ নৃপ তাদের বাকি জীবন এই ভাঙ্গা রাজবাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। জৈন্তিয়াবাসীর কাছ থেকে তারা উভয়েই প্রতীকী রাজার সম্মান লাভ করেছিলেন। নরেন্দ্র সিংহের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে জৈন্তিয়াবাসী নরসিংহ নৃপকে তাদের প্রতীকী রাজার মর্যাদা দিয়েছিল। তিনি একজন চিরকুমার ছিলেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। ১৯১০-১১ সালের দিকে তাঁর জীবনাবসান হয়েছিল বলে জানা যায়।

তাঁর অনুজ ছত্রসিংহ নৃপ তখন জৈন্তিয়ার প্রতীকী রাজার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি তাঁর অগ্রজের মতো চিরকুমার ছিলেন না। বেশ সাড়ম্বরেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী-ও একটি প্রসিদ্ধ রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের নবদ্বীপ বাহাদুরের কন্যা। এই রাজকন্যার সাথে ছত্রসিংহের বিয়ের দিনে জৈন্তিয়াবাসী খুবই আনন্দ করেছিল। প্রতীকী রাজা

হিসেবে ছত্রসিংহ জৈন্তিয়ার সর্বস্তরের মানুষের কাছে সমানভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী, সদালাপী ও নিরহংকারী প্রকৃতির মানুষ। মোকামবাড়ির হযরত কাশিম শাহের পরিবারের সাথে তাঁর একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এই পরিবারের বিশিষ্ট সন্তান জনাব সিকান্দার আলী খন্দকার তাঁর অনুগ্রহধন্য ছিলেন।[109]

রাজা রাজেন্দ্র সিংহ ও নরেন্দ্র সিংহের মতো ছত্রসিংহও তাঁর জীবনের এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের কিছুটা আনুকূল্য পেয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁর জন্য মাসিক তিনশত টাকার ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন। ১৯২৩ সালে তা চারশত টাকায় উন্নীত হয়েছিল। ব্রিটিশদের কাছ থেকে তিনি আরও কিছুটা অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। সিলেটের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যাধিকারীর সম্মান দিয়েছিলে। তাঁর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি হয়েছিল ১৯৩৮ সালের ৩ জানুয়রি। জৈন্তিয়া রাজপরিবারের শেষ প্রতীকী রাজা ছিলেন তিনিই। তাঁর পরে আর কেউ প্রতীকী রাজা হননি কিংবা সরকারি পেনশন লাভ করেননি। তাঁর কন্যারা অবশ্য 'রাজকন্যা' হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে খুবই সম্মান ও মর্যাদার পাত্রী ছিলেন।

ছয়. ইরাদেবী ও মলীনা দেবী

রাজা ছত্রসিংহের জীবদ্দশায় জৈন্তাপুরী হাটের সামান্য আয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সামান্য ভাতা দিয়ে রাজপরিবার ব্যয় সংকুলান হতো না। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে আর্থিকভাবে দায়গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সরকার এসব ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে তাঁর সকল সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেছিলেন। এসব সম্পত্তি 'নৃপ ওয়ার্ড এস্টেট' নামে কোর্ট অভ ওয়ার্ডের অধীনস্ত ছিল। তাঁর কন্যারা এসব সম্পত্তির সুবধাভোগী হতে পারেননি। তবে

---

109 জনাব খন্দকার সাহেব শৈশব থেকেই রাজা ছত্রসিংহ নৃপের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। ছত্রসিংহের হাত ধরেই তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। এরপর তিনি নিজ যোগ্যতাবলে ব্রিটিশশাসিত সিলেট জেলার নর্থ সার্কেলের লোকাল বোর্ড মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯২১ সালে)। তাঁর এই সফলতায় খুশী হয়ে রাজা ছত্রসিংহ নৃপ তাকে একটি জার্মান ল্যাম্প উপহার দিয়েছিলেন। জার্মান কোম্পানি এইচ-কে-এস কর্তৃক নির্মিত সেই ল্যাম্পটি আজও মোকামবাড়ির বাসিন্দাদের কাছে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।

রাজবাড়িটিতে তাদের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বাড়ির বাসিন্দা দুই রাজকন্যার কথা আজও জৈন্তিয়ার প্রবীণদের মুখে শোনা যায়। এরা ছিলেন- ইরাদেবী ও মলীনা দেবী। মলীনা দেবী ছিলেন ছত্রসিংহের জ্যেষ্ঠকন্যা। তাঁর বিবাহ হয়েছিল রংপুরের এক উচ্চশিক্ষিত যুবকের সাথে (খুব সম্ভবত কোচ রজপরিবারের আত্মীয়)। তাঁর নাম ছিল বিনয়ভূষণ রায়। তাঁর বাড়ি ছিল রংপুর গ্রামের পাটিকা পাড়া গ্রামে।

বিয়ের পর মলীনা দেবী স্বামীর সাথেই বেশি থাকতেন। নিজপাটে তাঁর আসা-যাওয়া ছিল কদাচিৎ। তাই মলীনা সম্পর্কে নিজপাটের প্রবীণরা তেমন কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু ইরাদেবীর কথা আজও অনেকেই স্মৃতিচারণ করে থাকেন। এই রাজকন্যার বিয়ে হয়েছিল কাছাড়ের রাজপরিবারের সদস্য জন্মেজয় বর্মণের সাথে (জৈন্তিয়ার মতো কাছাড়ের রাজপরিবারটিও ছিল ক্ষমতাচ্যুত। তখনকার যুগে কাছাড় ছিল ব্রিটিশদের অধীনস্ত একটি জেলা)। জন্মেজয় বর্মণ ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক। তিনি বি.এ.বি.এল.এ. ডিগ্রির অধিকারী ছিলন। ইরাদেবীর সাথে যখন তার বিয়ে হয় তখন তিনি নিজ পরিবারেরর সাথে শিলচর শহরে থাকতেন। ইরাদেবী ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী।

প্রথম স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯৩৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১ মাঘ) তারিখে তিনি ইরাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন।এই বিয়ের দিনে নিজপাটের রাজবাড়িতে বিশাল জনসমাগম হয়েছিল। জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতলের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বিয়ের পর ইরাদেবী জন্মেজয় বর্মণের সাথে থাকার পাশাপাশি নিজপাটের রাজবাড়িতেও থাকতেন। জন্মেজয় আসাম সিভিল সার্ভিসে চাকরি করতেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের একজন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। কর্মজীবন শেষে তিনি সপরিবারে শিলং শহরে স্থায়ী হয়েছিলেন। ইরাদেবী তখন শিলং ও নিজপাট- উভয় স্থানেই থাকতেন। সর্বশেষ তিনি ১৯৬৫ সালে নিজপাটের রাজবাড়িতে বসবাস করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৮১ সালে। তাঁর কথা এখনও অনেকের মনে রয়েছে।

রাজা ছত্রসিংহ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সকল সম্পত্তি কনিষ্ঠ কন্যা ইরাদেবীর নামে উইল করে গিয়েছিলেন। ইরাদেবী ছত্রসিংহের ঋণ পরিশোধ করে এসব সম্পত্তি মুক্ত করতে পেরেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। বর্তমানে এসব সম্পত্তির ওপর ইরাদেবীর বংশধরদের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত নেই।

রাজপরিবারের বেশিরভাগ ভূ-সম্পত্তিই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দখলে চলে গিয়েছে। আর কিছু সম্পত্তি এখন বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এসব জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বিনষ্ট হচ্ছে। সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া গেলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই হয়তো এসব স্থাপনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।



চিত্রঃ রাজকন্যা ইরাদেবী (মৃত্যুঃ ১৯৮১ সাল)

পরিশিষ্ট-১

জৈন্তিয়ার সকল রাজা-রানীর বিবরণ

(আসিফ আযহার কর্তৃক প্রণীত তালিকা)

নারী শাসকদের যুগ (মহাভারতের যুগ — ৫৫০ সাল)

১) মহারানী জয়ন্তী: প্রাক-পৌরাণিক যুগে উত্তর সিলেট ও পূর্ব মেঘালয়ে বসবাসরত মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর নারী সরদার ছিলেন জয়ন্তী। নিজ জনগোষ্ঠীর নারী যোদ্ধাদেরকে নিয়ে তিনি সিলেট সমতল ও মেঘালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। জয়ন্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই নারী শাসিত রাজ্যটি পৌরাণিক যুগে 'জয়ন্তী রাজ্য' নামে পরিচিতি লাভ করে।

২) মহারানী প্রমীলা: জৈমিনি মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে নারী রাজ্য জয়ন্তীর অধিশ্বরী ছিলেন মহারানী প্রমীলা। তিনি যজ্ঞের ঘোড়া আটক করেছিলেন এবং তাঁর নারী যোদ্ধাদেরকে নিয়ে মহাবীর অর্জুনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩) মহারানী উর্মি: হট্টনাথের পাঁচালীর বর্ণনা এবং ঐতিহাসিকদের অনুমান অনুযায়ী, ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে কামরূপের কোন একটি খণ্ডরাজ্যের রাজা ছিলেন কামসিন্ধু। তাঁর মৃত্যুর পর একজন প্রতিবেশী রাজা তাঁর রাজ্যটি কেঁড়ে নেন। নিরুপায় হয়ে কামসিন্ধুর পত্নী রানি উর্মি তাঁর লোকজন নিয়ে রাজ্যের পশ্চিমদিকে চলে যান। সেখানকার নারী রাজ্যটি দখল করে তিনি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর কন্যা উর্বরার বিয়ে হয় তিব্বতের যুবরাজ কৃষকের সাথে। কৃষক ও উর্বরার পুত্রসন্তানের নাম ছিল হাটক।

কৃষক রাজবংশ (৬০০ — ১২৫০ সাল)

[কৃষক রাজবংশের শুরুর দিকে লাউড়, গৌড় ও জৈন্তিয়া পাহাড়- এই তিনটি অঞ্চল জৈন্তিয়া রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। রাজা জয়ন্তকের সময় থেকে উত্তর সিলেটের সমতলভূমির মধ্যেই জৈন্তিয়া রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল]

৪) রাজা হাটক: হাটক বড় হয়ে তাঁর মাতামহীর সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। এতে জৈন্তিয়া রাজ্যের দীর্ঘদিনের নারী শাসনের অবসান ঘটে এবং পুরুষ রাজবংশের সূচনা হয়। হাটকের পিতার নামানুসারে এই রাজবংশটিকে জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'কৃষক রাজবংশ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আনুমানিকভাবে ১২৫০ সাল পর্যন্ত এই রাজবংশের রাজারা জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। তবে এসব রাজাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অল্প কয়েকজন রাজা সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

৫) রাজা গুহক: হাটকের পরে তাঁর পুত্র গুহক জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। আনুমানিকভাবে ৬০০ সালের পরবর্তী কয়েক দশক ধরে তিনি জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। তাঁর আমলে জৈন্তিয়া সমতলের সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ, মৌলভীবাজার জেলার কিছু অংশ, সুনামগঞ্জ জেলার সম্পূর্ণ অংশ এবং হবিগঞ্জ জেলার উত্তরাংশ রাজা গুহকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে জৈন্তিয়া রাজ্য ভেঙ্গে লাউড় ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৬) জয়ন্তক: রাজা গুহকের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জৈন্তিয়া রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। তাঁর পুত্র জয়ন্তক ছিলেন জৈন্তিয়ার মূল ভূখণ্ডের শাসক। অপর দুই পুত্র ছিলেন লাউড় ও গৌড়ের শাসক। জৈন্তিয়া পাহাড়ের মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর ওপর রাজা জয়ন্তকের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই জনগোষ্ঠীর লোকজন কৃষক রাজবংশের রাজাদের আনুগত্য করতো না (নিজেদের জনগোষ্ঠীর রাজা না হওয়ায়)। তাই প্রকৃত অর্থে রাজা জয়ন্তকের আমলে আগের জৈন্তিয়া রাজ্যটি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জয়ন্তক আনুমানিকভাবে ৬৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর পরবর্তী কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া গেলেও তাদের শাসনকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

৭) মহাবল: জয়ন্তকের পরের রাজার নাম মহাবল।

৮) বানছারু: মহাবলের পরের রাজার নাম বানছারু।

৯) রংবীর: বানছারুর পরের রাজার নাম রংবীর।

১০) ভীমবল: রংবীরের পরের রাজার নাম ভীমবল।

১১) জয়মল্ল: তাঁর সময়কাল জানা যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি একজন মল্লবিদ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একটি হাতিকে তাঁর বুকে পাঁ রাখতে দিয়েছিলেন; তবুও তাঁর কিছুই হয়নি। কিন্তু একটি গন্ডারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন।

১২) বানচুড়দেবঃ বানচুড়দেব একজন কৃষিপ্রেমিক রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্যে প্রচুর বৃক্ষরোপণ হয়। এতে রাজ্যজুড়ে মধু, তেঁজপাতা, কমলা ও আগরের ফলন বেড়ে যায়। তাঁর সময়ে জৈন্তিয়ায় বৌদ্ধ বণিকদের আগমন ঘটেছিল। এই বণিকরা নৌ-পথে শিলাহাট হয়ে জৈন্তিয়ায় এসেছিলন। তারা জৈন্তিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাদের প্রভাবে রাজা বানচুড়দেব বৌদ্ধধর্মের প্রতি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

১৩) কামদেবঃ কৃষক রাজবংশের শেষের দিকের রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন রাজা কামদেব। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন। কামদেবের শাসনামলকে কৃষক রাজবংশের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ধরা হয়। যতদূর জানা যায়, রাজা কামদেব সংস্কৃতচর্চায় খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে মালব দেশের রাজধানী ধারানগর থেকে বিখ্যাত এক পণ্ডিত ও কবি জৈন্তিয়ায় আসেন। তাঁর নাম ছিল কবিরাজ। *রাঘব পান্ডবীয়* গ্রন্থ্ রচনার জন্য এই কবি বেশ বিখ্যাত। এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকেই রাজা কামদেবের কথা জানা যায়।

১৪) ভীমবলদেবঃ কামদেবের পর তাঁর ছেলে ভীমবলদেব রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু ভীমবলদেব ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। পার্বত্য গোত্রনেতারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়, ভীমবলদেব একটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হয় নিহত হয়েছিলেন অথবা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কৃষক রাজবংশের শেষ রাজা তিনিই। আনুমানিকভাবে, ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তিনি জৈন্তিয়ার রাজা ছিলেন।

পুরোহিত রাজবংশ (১২৫০ – ১৫০০ সাল)

[পুরোহিত রাজবংশের শাসনামলে জৈন্তিয়া রাজ্য বেশ সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর অঞ্চলত্রয় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সরদারদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। জৈন্তিয়া রাজ্য তখন কেবল জয়ন্তাপুরী রাজ বা পরগনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।]

১৫) কেদারেশ্বর রায়ঃ এই রাজার নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না।

১৬) ধনেশ্বর রায়ঃ এই রাজার নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না।

১৭) কন্দর্প রায়ঃ এই রাজার নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না।

১৮) জয়ন্ত রায়ঃ জয়ন্ত রায় ছিলেন পুরোহিত রাজবংশের শেষ রাজা। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের (১৪৫০ – ১৫০০ সাল) কিছু সময় তিনি জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। তাঁর আমলে জৈন্তিয়া রাজ্যটি কেবলমাত্র জয়ন্তাপুরী রাজ বা পরগনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনুমেয়। জয়ন্তাপুরী রাজের পার্শ্ববর্তী জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর অঞ্চলে তখন স্বাধীন পাহাড়ি সরদারদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (জৈন্তিয়ার অন্যান্য অংশে তখন জনবসতি ছিল না বললেই চলে। তাই সেসব অঞ্চলকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতো না।) কোন কোন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর খণ্ডরাজ্যের শাসকরা ছিলেন রাজা জয়ন্ত রায়ের পুত্রসন্তান। এই দাবির সত্যতা যাচাইয়ের কোন উপায় নেই।

১৯) জয়ন্তী দেবীঃ জয়ন্তী দেবী ছিলেন রাজা জয়ন্ত রায়ের কন্যা; পিতার মৃত্যুর পর তিনিই জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেছিলেন। তাকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, পাহাড়ি সরদার লন্ডবরের পুত্র বড়গোসাঁই বা মানগোসাঁইকে তিনি পালকপুত্র বানিয়েছিলেন। জয়ন্তী দেবীর পরে এই বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক দাবি করেছেন, জয়ন্তী দেবী জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর অঞ্চলত্রয়কে নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন (অঞ্চলত্রয়ের রাজাদেরকে হত্যা করে)।

সিন্টেং রাজবংশ (১৫০০ – ১৮৩৫ সাল)

২০) বড়গোসাঁই বা মানগোসাঁইঃ জয়ন্তী দেবীর পরে বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার ক্ষমতা লাভ করেন। একইসাথে তিনি পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে পাহাড়েরও সরদার হয়েছিলেন। জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতল এভাবে আবারও এক অভিন্ন শাসনের আওতায় চলে আসে। জৈন্তিয়া সমতলের রাজা আর জৈন্তিয়া পাহাড়ের সরদার বা সিয়েম একই ব্যক্তি হওয়ায় নারীশাসনের যুগের এক হাজার বছর পরে আবারও পাহাড় ও সমতল মিলে এক শক্তিশালী রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই নতুন রাজবংশটির নাম সিন্টেং বা জৈন্তিয়া রাজবংশ (যেহেতু বড়গোসাঁই ছিলেন পার্বত্য সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর সদস্য)।

২১) পর্বত রায় / বুড়া পর্বত রায়ঃ এই রাজা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

২২) বড়গোসাঁইঃ জৈন্তিয়ার ইতিহাসে এই রাজা ‘প্রথম বড়গোসাঁই’ নামে পরিচিত। সিন্টেং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বড়গোসাঁইকে ঐতিহাসিকরা

'মানগোসাঁই', 'মাঝগোসাঁই' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন; ইতিহাসে তাঁর 'বড়গোসাঁই' নামটি আলোচিত হয়নি। তাই জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'প্রথম বড়গোসাঁই' ও 'দ্বিতীয় বড়গোসাঁই' হিসেবে অন্য দুজন স্বীকৃত হয়েছেন। প্রথম বড়গোসাঁইয়ের আমলে জৈন্তিয়ার বামজঙ্ঘা মহাপীঠ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখানে নরবলি দেওয়া হতো। জৈন্তিয়ার রাজা যেসব অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন, প্রতি বছর এমন একজন অপরাধীকে বামজঙ্ঘা মহাপীঠে বলি দেওয়া হতো। ব্রিটিশ আমলে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

২৩) বিজয় মাণিক (? – ১৫৬৪ সাল): রাজা প্রথম বড়গোসাঁইয়ের পরে জৈন্তিয়ার সিংহাসন লাভ করেন রাজা বিজয় মাণিক। বিজয় মাণিক হলেন জৈন্তিয়ার প্রথম সিন্টেং রাজা যার কথা জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর ইতিহাসে পাওয়া যায়। শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ রচিত 'রাজমালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জৈন্তিয়াপতি বিজয় মাণিক তাঁর সমসাময়িক ত্রিপুরাধিপতির সাথে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর খণ্ডরাজ্যত্রয়কে জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন রাজা বিজয় মাণিক। এছাড়াও তিনি চতুল, খরিল, আড়াইখা, চাউরা ও পাঁচভাগ রাজসমূহকেও জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কোচ রাজাদের ইতিহাসের দলিল 'বংশাবলি'-র বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৫৬৪ সালে কামতা রাজ্যের সেনাপতি চিলারায় জৈন্তিয়ায় আক্রমণ করেছিলেন। চিলারায়ের ৪০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সাথে লড়াই করে বিজয় মাণিক বীরের মতোই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

২৪) প্রতাপ রায় / প্রতাপ নারায়ণ (১৫৬৪ সাল – ১৫৯৬ সাল): বিজয় মাণিকের মৃত্যুর পর কামতা রাজ্যের বিজয়ী সেনাবাহিনী তাঁর উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসার সুযোগ দেয়। দুর্গম জৈন্তিয়া রাজ্যকে স্থায়ীভাবে দখল করা সম্ভব নয় ভেবে বিজয়ীরা বেশ কিছু অর্থকড়ি ও উপহার নিয়ে জৈন্তিয়া ছেড়ে চলে যায়। নতুন রাজা প্রতাপ রায় বা প্রতাপ নারায়ণ তাদেরকে ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা ১০০টি ঘোড়া এবং ১০০টি খঙ্গা নামক জয়ন্তাপুরী তরবারি দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি কোচ রাজাকে প্রতি বছর ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা, ৭০টি ঘোড়া এবং ৩০০টি নকাইদাও (একটি বিশেষ ধরণের ছুরি) দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতিটি আদৌ রক্ষিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এর কারণ, কোচদের আধিপত্য বেশিদিন বজায় থাকেনি। তাদের রাজ্যটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল।

২৫) ধনমাণিক (১৫৯৬ সাল – ১৬০৫ সাল): ঐতিহাসিকদের মতে, জৈন্তিয়ার রাজা ধনমাণিকের সময়কাল ছিল ১৫৯৬ সাল থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত। এই সময়কার সবচেয়ে বড় ঘটনা হল জৈন্তিয়া-কাছাড়ি যুদ্ধের ঘটনা। আনুমানিক ১৬০৩ সালে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। স্যার এডওয়ার্ড গেইট লিখেছেন, জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের সীমান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য ডিমারুয়াকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

২৬) যশোমাণিক (১৬০৫ সাল – ১৬৪১ সাল): ধনমাণিকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাগিনেয় যশোমাণিক জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। তিনি জৈন্তিয়ার ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজা। তাঁর আমলে প্রতিবেশীদের সাথে জৈন্তিয়ার সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ। কথিত আছে, কোচবিহারের রাজকন্যাকে বিবাহের পর যশোমাণিক একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সময় পর্যন্ত সিন্টেং রাজপরিবারে সনাতন ও নিয়েমত্রে- উভয় ধর্মেরই চর্চা হতো বলে ধারণা করা হয়। যশোমাণিকই প্রথম পুরোপুরিভাবে হিন্দু ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর আমলে সিলেটের পাঠান শাসকরা মোগলদের হাতে পরাজিত হয়ে জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের পরিবার-পরিজন ও বংশধররা জৈন্তিয়ায় একটি মুসলমান সম্প্রদায় গড়ে তোলেছিলেন।

২৭) সুন্দর রায় (১৬৪১ সাল – ?): এই রাজার শাসনকাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়না।

২৮) ছোট পর্বত রায় (? – ১৬৪৮ সাল): এই রাজার শাসনকাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়না।

২৯) যশোমন্ত রায় (১৬৪৮ সাল – ১৬৬৮ সাল): যশোমন্ত রায় জৈন্তিয়ার ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজা। তাঁর আমলে আহোম রাজ্যের সাথে জৈন্তিয়ার অনেকগুলো পত্র বিনিময় হয়েছিল। এসব পত্র আহোমের ইতিহাস বা বুরুঞ্জীতে সংরক্ষিত হয়েছে। আহোমের ইতিহাসে এই রাজা খুবই প্রাসঙ্গিক। যশোমন্ত রায় জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসার পর আহোমরাজ সুতিংফা তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এতে উভয় রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। এর কয়েক বছর পরে উভয় রাজ্যের মধ্যে আবারও

সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের সময়কাল পর্যন্ত এই সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

৩০) প্রমথ রায় বা মানসিংহ (১৬৬৮ সাল – ১৬৬৯ সাল): যশোমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর নাতি প্রমথ রায়। প্রমথ রায় নিজের নাম পাল্টে 'মানসিংহ' নামে সিংহাসনে বসেছিলেন। সিংহাসনে আরোহনের মাত্র ছয় মাসের মাথায় মানসিংহ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাকে হত্যা করে জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় এসেছিলেন প্রতাপ সিংহ।

৩১) প্রতাপ সিংহ (১৬৬৯ সাল – ১৬৬৯ সাল): প্রতাপ সিংহ কে ছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। শুধু এটুকু জানা যায় যে, তিনি বাংলা থেকে জৈন্তিয়ায় ফিরে এসেছিলেন এবং রাজা মানসিংহকে সরিয়ে নিজে রাজা হয়েছিলেন। প্রতাপ সিংহ সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের কোন আত্মীয় ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনি মোগলানে (সিলেটে) নির্বাসিত ছিলেন। ১৬৬৯ সালে তিনি মানসিংহকে সরিয়ে জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন।

৩২) লক্ষ্মীনারায়ণ / লক্ষ্মী সিংহ (১৬৬৯ সাল – ১৭০১): প্রতাপ সিংহকে হত্যা করে জৈন্তিয়ার সিংহাসন দখল করেন লক্ষ্মীনারায়ণ বা লক্ষ্মী সিংহ। এই ঘটনা ১৬৬৯ সালের (এই বছরটিতে জৈন্তিয়ার সিংহাসনে তিনজন রাজা বসেছিলেন)। লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষমতায় এসেই আহোমদের কাছ থেকে ডিমারুয়া ফেরত দাবি করেন। কিন্তু আহোমরা তা ফেরত দেয়নি। আহোমদের সাথে জৈন্তিয়ার সম্পর্ক তখন থেকে দুর্বল হতে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণ রাজধানী জয়ন্তীপুরের অনেক উন্নয়ন করেছিলেন। জয়ন্তীপুরকে ৫২ হাটিতে ভাগ করেছিলেন তিনিই। বড়দেউল সম্ভবত তাঁর হাতেই তৈরী। ১৬৮২ সালে তিনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে সিলেট শহর দখল করেছিলেন। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন তখনকার সুবে বাংলার মোগল সুবাদার। তাঁর পুত্র ইরাদত খাঁ লক্ষ্মীনারায়ণের কাছ থেকে সিলেট শহর পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এরপর মোগলদের সাথে লক্ষ্মীনারায়ণের আর কোন বিরোধ হয়নি।

৩৩) রামসিংহ (১৭০১ সাল – ১৭০৮ সাল): ১৭০১ সালে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাগিনেয় রামসিংহ। এই রাজা জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'প্রথম রামসিংহ' নামে পরিচিত। তিনি ১৭০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। অতিদীর্ঘ না হলেও তাঁর সময়কাল জৈন্তিয়ার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, জৈন্তিয়া-আহোম

যুদ্ধের ঘটনা। উভয় রাজ্যের ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ১৭০৭ ও ১৭০৮ সালে। ১৭০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার নির্দেশে আহোমের বড়বড়ুয়ার নেতৃত্বে ৪৩,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী কপিলি উপত্যকা ধরে কাছাড়ি রাজ্যের ভেতর দিয়ে জৈন্তিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। বড়ফুকনের নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী উত্তর দিক থেকে গোভা হয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করে। দারাং এর রাজাও একদল সৈন্য নিয়ে এদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকনের বাহিনীদ্বয় ১৭০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জৈন্তিয়া বিজয় সম্পন্ন করেছিল। জৈন্তিয়াপতি রামসিংহ তাদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। তাকে আহোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আহোমরাজ ঘোষণা দিলেন যে, জৈন্তিয়া রাজ্যকে আহোমের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ঘোষণার পর জৈন্তিয়ার দলই বা সরদাররা প্রতিবেশী খাসিয়াদের সহায়তায় এক ভয়ংকর প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। এর ফলে আহোম সেনাপতি বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকন জৈন্তিয়া ছেড়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিরে যাওয়ার পূর্বে তারা জয়ন্তীপুর এবং এর চারপাশের গ্রামগুলোকে ধ্বংস করেন।

জৈন্তিয়াবাসীদের প্রতিরোধ যুদ্ধে আহোমদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের ২৩৬৬ জন সৈন্য নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে ১২ জন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাও ছিলেন। তাদের প্রতিপক্ষ দলের এতো যোদ্ধা নিহত হয়নি। তবে জৈন্তিয়ার প্রায় ৭০০ যোদ্ধা আহোমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। অভিযানের সময় ৩টি কামান, ২২৭৩টি বন্দুক, ১০৯টি হাতি এবং ১২,০০০ মুদ্রা আহোমদের হস্তগত হয়েছিল। মুদ্রাগুলো ছিল মোগল সাম্রাজ্য, আহোম, কোচবিহার এবং জৈন্তিয়া রাজ্যের। প্রচুর জীবনহানী ও ক্ষয়ক্ষতির পরে কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল ছাড়াই আহোমদের জৈন্তিয়া অভিযান সমাপ্তি লাভ করেছিল। আহোমদের জৈন্তিয়া অভিযান শেষ হলে আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফা জৈন্তিয়াপতিকে জানালেন যে, যদি তাঁর রাজ্যের সরদাররা আহোমরাজের কাছে নতি স্বীকার করেন তাহলে তাকে নিজ রাজ্যে ফিরতে দেওয়া হবে। জৈন্তিয়ার সরদারদের কাছে এই বার্তা পাঠানো হলে তারা পাল্টা বার্তায় জানালেন যে, আহোমরাজের কাছে তারা নতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু জৈন্তিয়াপতির আর দেশে ফেরা হল না। তিনি হঠাৎ করে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী (ভাগিনেয়) জয়নারায়ণও আহোমদের হাতে বন্দী

ছিলেন। আহোমরাজ তাকে মুক্তি দিলে তিনি জৈন্তিয়ায় ফিরে এসে সিংহাসনে বসেন। এরপর আর উভয় রাজ্যের মধ্যে কোন বৈরীতা থাকেনি।

৩৪) জয়নারায়ণ (১৭০৮ সাল – ১৭৩১ সাল): ১৭০৮ সালে জয়নারায়ণ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। আহোমরাজ রুদ্র সিংহ সুখরুংফার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য প্রতিবেশী যেমন মোগলান ও কাছাড়ি রাজ্যের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল না। জয়নারায়ণের কন্যা একটি নিষিদ্ধ প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে কাছাড়ি রাজ্যের রাজধানী মাইবং-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন। জয়নারায়ণ কাছাড়ি রাজার কাছে প্রেমিক-প্রেমিকাকে ফেরত চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কাছাড়ি রাজ্যে আক্রমণ করেন এবং রাজধানী মাইবং ধ্বংস করে দেন (নগরীটি অতীতে আহোদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এরপর নগরীটির যতটুকু পুনর্গঠন হয়েছিল সেটুকু জৈন্তিয়াপতির হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই পরাজয়ের পর কাছাড়ি রাজা শূরদর্প নারায়ণ সমতলের ব্রহ্মপুর বা খাসপুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন)।

মোগলানের ঢাকাদক্ষিণ পরগনার নায়েবে ফৌজদার দুর্লভ দাস জৈন্তিয়ার কিছু ভূমি দখল করেছিলেন। এ ঘটনার জের ধরে জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণে আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং পরগনাটিকে দখল করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মোগলানের চারখাই পরগনাটিকেও দখল করেছিলেন। চারখাই দখলের কারণ ছিল ধর্মীয়। সেখানকার সেনগ্রামের 'হাটকেশ্বর শিব'-কে রাজা তাঁর রাজধানীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দৈব কারণে (জনশ্রুতি অনুযায়ী) তিনি তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই 'হাটকেশ্বর শিব'-কে নিজের রাজ্যে রাখার জন্য তিনি চারখাই পরগনাটিকে নিজের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। জয়নারায়নের শাসনকালের গড় হিসেবে এসব ঘটনার আনুমানিক সময়কাল হচ্ছে **১৭১৯** সাল (১৭০৮ + ১৭৩১ = ৩৪৩৯, ৩৪৩৯ ÷ ২ = ১৭১৯.৫)। ঢাকাদক্ষিণ ও চারখাই পরগনাদ্বয় আনুমানিকভাবে **১৭৪০** সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ছিল।

৩৫) বড়গোসাঁই (১৭৩১ সাল – ১৭৭০ সাল): ১৭৩১ সালে জয়নারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর ভাগিনেয় বড়গোসাঁই জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। এই রাজা জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'দ্বিতীয় বড়গোসাঁই' নামে পরিচিত। তাকে জৈন্তিয়ার সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় রাজা বিবেচনা করা হয়। প্রায় চার দশক ধরে ক্ষমতায় থাকলেও তিনি কোন যুদ্ধে জড়াননি। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তিনি ঢাকার মোগল

শাসনকর্তা নওয়াজিশ মোহাম্মদ খাঁ কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যদলের হাতে ঢাকাদক্ষিণ পরগনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। একইভাবে চারখাই পরগনাও ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে অনুমেয়। রাজা বড়গোসাঁই মোগলদের সাথে শুধু সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিই করেননি; তাদের সাথে মৈত্রীসম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। এই মৈত্রীসম্পর্কের অংশ হিসেবে নওয়াজিশ রাজার বোন ভৈরবী কুয়ঁরীকে বিবাহ করেছিলেন। ব্রিটিশদের হাতে বাংলার পতনের পর সেখানকার অনেকেই মিত্ররাজ্য জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৭৬০ এর দশকে ভৈরবী কুয়ঁরী, কুয়ঁরীপুত্র ফতেহ খাঁ, হযরত কাশিম শাহ, সোনা খাঁ ও পহহার খাঁ-র নেতৃত্বে অনেক মোগল সৈন্য, রাজ-কর্মচারী ও সাধারণ মুসলমান জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রাজা বড়গোসাঁই তাদেরকে জায়গা-জমি দিয়ে পূণর্বাসন করেছিলেন এবং অনেককে রাজ-কর্মচারীর চাকুরীও দিয়েছিলেন। রাজা ফতেহ খাঁ-কে রাজ্যের সেনাপতি, পহহার খাঁ-কে সহ-সেনাপতি, হযরত কাশিম শাহকে রাজ দরবারের বিচারক এবং সোনা খাঁ-কে হওলাদার নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্যের পুরো ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন ফতেহ খাঁ। অত্যাধিক স্নেহের বশবর্তী হয়ে রাজা তাঁর হাতে পুরো রাজ্যক্ষমতাই তোলে দিয়েছিলেন। ঢাকার মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে বেড়ে ওঠা ফতেহ খাঁ জৈন্তিয়ার রাজ-ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিলেন না। তিনি নিজ হাতে পুরো রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এতে জৈন্তিয়ার রাজ-প্রতিনিধিরা গোপনে মিলিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। তাঁরা রাজাকে ভুল বুঝিয়ে ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার জেরে খাসিয়া পাহাড়ের খাইরম পুঞ্জির সিয়েম বড়মাণিক রাজাকে বন্দী করেন। ফতেহ খাঁ বিরোধী রাজ-প্রতিনিধিরা রাজাকে মুক্ত করেন।

মুক্ত হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারেন, ফতেহ খাঁ নির্দোষ ছিলেন। ফতেহ খাঁ-র প্রাণদণ্ডের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র বন্দরহাটিতে একটি বিশাল রাজকীয় মসজিদ নির্মাণ করেন এবং হযরত কাশিম শাহকে এই মসজিদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। কিন্তু এতেও রাজার অনুশোচনা দূর হচ্ছিল না। তিনি রাজ্য পরিচালনায় উদাসীন হয়ে পড়েন ও হযরত কাশিম শাহের কাছে কুরআন শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায় লীলাপুরী স্বামী নামক এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী জৈন্তিয়ায় এসে রাজাকে সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। রাজা তখন লীলাপুরী স্বামীকে একটি রাজকীয় কালীমন্দির বানিয়ে দেন ও ভাগিনেয় ছত্রসিংহের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস জীবনে চলে যান। বাকি জীবন তিনি লখডং পুঞ্জির বড়ঘাট গ্রামে সন্ন্যাসী হিসেবেই

কাটিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি দৃষ্টিনন্দন মঠ নির্মাণ করেছিলেন যা 'মঠ সিয়েম' নামে আজও পরিচিত। সেখানে তাঁর বাসস্থানের অবশেষও রয়েছে।

৩৬) ছত্রসিংহ (১৭৭০ সাল – ১৭৭৪ সাল): ১৭৭০ সালে রাজা বড়গোসাঁই তাঁর ভাগিনেয় ছত্রসিংহের হাতে সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে জৈন্তিয়া রাজ্য আবারও যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। তবে এবারের শত্রু ছিল একেবারেই নতুন একটি শক্তি- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমবারের মতো সিলেটে একজন ব্রিটিশ রাজস্ব কর্মকর্তা নিযুক্ত করে। তাঁর নাম ছিল উইলিয়াম মেইকপিস থেকারে। সিলেটে আসার পরপরই তিনি জৈন্তিয়া দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৭৪ সালে তাঁর অনুরোধে সাঁড়া দিয়ে কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তারা ক্যাপ্টেন এলিকারের নেতৃত্বে সিলেটে একদল সৈন্য পাঠান। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই দলটি ১৭৭৪ সালের মার্চ মাসে জৈন্তিয়া আক্রমণ করে। কিন্তু তাদের এই অভিযান চূড়ান্তভাবে সফল হয়নি। অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এই অভিযানটি প্রত্যাহার করেছিলেন। রাজার সাথে কোম্পানির একটি শান্তিচুক্তি হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী রাজা তাঁর রাজ্যের সমতল অংশ ফেরত লাভের বিনিময়ে কোম্পানিকে ১৫,০০০ টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন। তবে রাজ্য উদ্ধারের অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৩৭) যাত্রানারায়ণ (১৭৭৪ সাল – ১৭৮৫ সাল): রাজা ছত্রসিংহের আকস্মিক মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাগিনেয় যাত্রানারায়ণ। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে শান্তি বজায় রেখেছিলেন। এমনকি সিলেটের নতুন ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে তিনি জৈন্তিয়া সফরের আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। এই কর্মকর্তার নাম ছিল রবার্ট লিন্ডসে। তিনি রাজার আমন্ত্রণে সাঁড়া দিয়ে জৈন্তিয়ার একটি শিকার উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই জৈন্তিয়া-ব্রিটিশ স্বাভাবিক সম্পর্কের আড়ালে অন্য কিছু চলছিল। ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যত শান্তি বজায় রাখলেও যাত্রানারায়ণ গোপনে সিলেটের ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে সাহায্য করছিলেন। ১৭৮৩ সাল থেকে ১৭৮৫ সাল (তাঁর মৃত্যুর বছর) পর্যন্ত তিনি সিলেটের বিদ্রোহীদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছিলেন। এই ব্রিটিশবিরোধী পরিকল্পনার সাথে কাছাড়ি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণও জড়িত ছিলেন।

৩৮) বিজয়নারায়ণ (১৭৮৫ সাল – ১৭৮৮ সাল): ১৭৮৫ সালে যাত্রানারায়ণের মৃত্যুর পর জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাগিনেয় বিজয়নারায়ণ। তিনিও ব্রিটিশদের সাথে বাহ্যত স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখলেও গোপনে গোপনে সিলেটের বিদ্রোহীদেরকে মদদ দিয়েছিলেন। ১৭৮৬ সালে সিলেটের বিদ্রোহীরা কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে দেয়। তারা পূর্ব সিলেটের চাপঘাট পরগনার ভাঙ্গা বাজারে স্থাপিত একটি নীল কুঠি জ্বালিয়ে দেয়। এরপর তারা চরগোলা থানা আক্রমণ করে কোম্পানি সরকারের থানাদারকে পরাজিত করে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য রবার্ট লিন্ডসে লেফটেন্যান্ট ডেভিডসনের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একদল সৈন্য পাঠান। ২০ জন ছাড়া তাদের সকলেই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। এরপর ডেভিডসনের নেতৃত্বে আবারও সৈন্যদল পাঠানো হয়। এবার ডেভিডসনসহ সকলেই নিহত হন। তৃতীয়বার অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সামরিক বাহিনী বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করে পূর্ব সিলেটে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

এরপর সিলেটের বিদ্রোহীরা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল জৈন্তিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ। এই গোলযোগের মধ্যে রাজা বিজয়নারায়ণ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন নারতিয়াং পুঞ্জির সরদারপুত্র লক্ষ্মী সিংহ। এই লক্ষ্মীর পিতা উপাংদলই ছিলেন একজন প্রভাবশালী পাহাড়ি সরদার বা দলই। তাঁর আহ্বানে জৈন্তিয়া পাহাড়ের সকল সরদার (দলই) ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজা বিজয়নারায়ণকে বয়কট করেছিলেন। এক পর্যায়ে তারা সমতলের রাজ-প্রধানদের (রাজ মানে পরগনা) সাথে মিলে রাজা বিজয়নারায়ণকে হত্যা করে লক্ষ্মী সিংহকে জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় বসান। রাজা বিজয়নারায়ণকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে তাঁর সমাধিঘরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। পর্যটকদের কাছে এই জায়গাটি ‘শাপলা বিল’ নামে পরিচিত। রাজা বিজয়নারায়ণের হাতে নির্মিত একটি স্থাপনা আজও তাঁর উদার মনের পরিচয় বহন করে। এটি হচ্ছে হযরত শাহজি (রাহ.)-র মোকাম বা সমাধি।

৩৯) লক্ষ্মী সিংহ (১৭৮৮ সাল – ১৭৯০ সাল): রাজা বিজয়নারায়ণের আমলে লক্ষ্মী সিংহ ছিলেন রাজপরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক যুবক। তিনি রাজসভাতেও স্থান পেয়েছিলেন। রাজা তাঁর মতামতকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। লক্ষ্মীর এই ক্ষমতা অন্যদের মনে হিংসার জন্ম দিল। তারা রাজ-বাদুয়াকে (গোয়েন্দা প্রধান) হাত করে লক্ষ্মীর সাথে রাজকুয়ঁরীর গোপন সম্পর্কের কথা

রাজদরবারে তোলে ধরে। বিভিন্ন সাক্ষীর দ্বারা এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় রাজা তা বিশ্বাস করেন এবং লক্ষ্মীকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কিন্তু লক্ষ্মী চতুলের খাদনলস্করের গোপন সহায়তায় জয়ন্তীপুর থেকে পালিয়ে নারতিয়াং পুঞ্জিতে চলে যান। খাদনলস্কর ধরা পড়ে গেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মীর পিতা-মাতা খুবই ক্রুদ্ধ হন। তাদের আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা সমতলের সাথে বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। অবশেষে এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য পাহাড় ও সমতলের প্রধানরা এক হয়ে রাজাকে হত্যা করে লক্ষ্মীকেই ক্ষমতায় বসান। তিনি ক্ষমতায় এসেই চতুলের খাদনলস্করের পরিবারের জন্য একটি রাজকীয় বাড়ি বানিয়ে দেন। এই বাড়িটি আজও 'রাজপুত্র সোনাধনের বাড়ি' নামে পরিচিত। সোনাধন ছিলেন খাদনলস্করের একমাত্র পুত্র। রাজা লক্ষ্মীসিংহ তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

৪০) দ্বিতীয় রামসিংহ (১৭৯০ সাল – ১৮৩২ সাল): লক্ষ্মী সিংহ বেশিদিন জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় থাকেননি। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বছর। ১৭৯০ সালে তিনি সিংহাসন ছেড়ে নারতিয়াং পুঞ্জিতে চলে গিয়েছিলেন। তখন নতুন রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন প্রয়াত রাজা বিজয়নারায়ণের উত্তরাধিকারী (ভাগিনেয়) রামসিংহ। এই রাজা জৈন্তিয়ার ইতিহাসে 'দ্বিতীয় রামসিংহ' নামে পরিচিত। দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে তিনি রাজ্যটি শাসন করেছিলেন। তাঁর আমলে রাজ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। একক রাজা হিসেবে তিনিই জৈন্তিয়ায় সবচেয়ে বেশি স্থাপনা নির্মাণ করেছিলেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি রাজা বিজয়নারায়ণের সমাধিস্থলে একটি সমাধিঘর নির্মাণ করেন। এরপর তিনি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে মন দেন। রাজ্যের সবচেয়ে বড় নৌ-যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল সারীঘাট। নৌ-যাত্রীদের রাত্রিযাপনের সুবিধার্থে তিনি সেখানে তিনি একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। সারিঘাটের নিকটস্থ ঢুপির পাহাড়ের মাথায় তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এর নাম ছিল 'রামেশ্বর শিবমন্দির'। তবে লোকমুখে এটি 'ঢুপির মঠ' নামেই বেশি পরিচিত ছিল। এছাড়াও তিনি আরও দুটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এগুলো হচ্ছে- রাধা-গোবিন্দের মন্দির এবং সতনাথ সন্ন্যাসীর মন্দির।

রাজা রামসিংহের শাসনামলে রাজ্যের ভেতরের পরিস্থিতি বেশ শান্ত ছিল। কিন্তু বাইরের পরিস্থিতি ছিল খুবই ঘোলাটে। মণিপুরের রাজা চৌরজিৎ সিং তাঁর ভাইয়ের হাতে সিংহাসন হারিয়ে জৈন্তিয়া রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর

সাথে কিছু কুকী যোদ্ধাও জৈন্তিয়ায় এসেছিল। এর কয়েক বছর পরে বর্মীরা মণিপুরে আক্রমণ করে। মণিপুরের রাজা মারজিৎ সিং (চৌরজিৎ সিং-এর ছোটভাই) নিজ রাজ্য হারিয়ে কাছাড়ি রাজ্যে চলে যান। বর্মীরা শুধু মণিপুর দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা আহোম রাজ্যও দখল করে নিয়েছিল। এরপর তারা হাত বাড়ায় কাছাড়ি রাজ্যের দিকে। এমতাবস্থায় সেখানে অবস্থানরত মণিপুরী রাজা মারজিৎ সিং ব্রিটিশ শাসিত সিলেটে আশ্রয় নেন। কাছাড়ি রাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণও তখন ব্রিটিশদের আশ্রয়ে ছিলেন। ব্রিটিশরা বর্মী আধিপত্য ঠেকানোর জন্য কাছাড়ি রাজা, মণিপুরী রাজার ভাই গম্ভীর সিং এবং জৈন্তিয়ার রাজা রামসিংহকে নিয়ে একটি মৈত্রীজোট গঠন করে। এই জোটের মধ্যে রামসিংহ ছিলেন ব্রিটিশদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মিত্র। বর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুবিধা দিয়েছিলেন। এতে ব্রিটিশরা বেশ সহজেই বর্মীদের উপর আক্রমণ চালাতে পেরেছিল। ১৮২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই যুদ্ধটি শেষ হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিল। আহোম, মণিপুর ও কাছাড়ি রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ডসমূহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে জৈন্তিয়া তখন একা হয়ে পড়েছিল। রাজ্যটির স্বাধীনতা কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিল। এর কারণ, জৈন্তিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যগুলো ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ায় এর কৌশলগত শক্তি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। রাজ্যটি কার্যত ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাই এর স্বাধীনতা নির্ভর করছিল ব্রিটিশদের মর্জির ওপর। এক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে রামসিংহের মৈত্রীসম্পর্ক বা চুক্তিটি ছিল একমাত্র রক্ষাকবচ। এই চুক্তির কারণে রামসিংহের জীবদ্দশায় ব্রিটিশরা রাজ্যটি দখলের চেষ্টা থেকে বিরত ছিল (যদিও কৌশলগতভাবে রাজ্যটি তাদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিল)। রামসিংহের জীবদ্দশায় চুক্তি লঙ্ঘন করতে না চাইলেও পরবর্তীতে তারা ঠুনকো ও বানোয়াট অজুহাতে রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিল।

৪১) রাজেন্দ্র সিংহ বা ইন্দ্র সিংহ (১৮৩২ সাল – ১৮৩৫ সাল): জৈন্তিয়ার ইতিহাসের শেষ রাজার নাম রাজেন্দ্র সিংহ। লোকজন তাকে ইন্দ্র সিংহ নামেও ডাকতো। ব্রিটিশ দলিলপত্রেও এই নামটির উল্লেখ আছে। তাই দুটি নামই সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। ১৮৩২ সালে রাজা দ্বিতীয় রামসিংহের মৃত্যু হলে তাঁর

বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজেন্দ্র সিংহ জৈন্তিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র আড়াই বছর জৈন্তিয়ার ক্ষমতায় ছিলেন। ১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ ব্রিটিশরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে জৈন্তিয়া রাজ্যের সমতল অংশ দখল করে নেয়। এরপর তাকে গৃহবন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। সিলেট শহরের উপকণ্ঠে জমিদার মুরারী চাঁদের বাড়িতে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে গৃহবন্দী থাকার পর ১৮৬১ সালে এই দুর্ভাগা রাজা সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অল্পসময় ক্ষমতায় থাকায় তিনি কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে পারেননি। তাঁর সময়কার কোন মুদ্রাও পাওয়া যায়নি।

পরিশিষ্ট-২

জৈন্তিয়ার মূল ভূখণ্ড ও অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ

পৌরাণিক যুগে জৈন্তিয়া রাজ্য একটি 'নারী রাজ্য' হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে (১ সাল – ৫০০ সাল) এই রাজ্যের আয়তন ছিল অনেক বেশি। পূর্ব মেঘালয়, বৃহত্তর সিলেট এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিছু অঞ্চল তখন জৈন্তিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজ্যের উত্তর ও পূর্বদিকে ছিল কামরূপ, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল কিরাতদেশ বা ত্রিপুরা আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছিল গঙ্গারিদাই বা বঙ্গ। তবে রাজ্যের বেশিরভাগ অঞ্চলেই তখন জনবসতি গড়ে ওঠেনি। বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের সমতলভূমি তখন অনেক গভীর ছিল; স্থলভাগ ছিল খুবই অল্প। সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যবর্তী হাওর এলাকা তখন 'সাগর' হিসেবে বিবেচিত হতো। এই সাগরটি বঙ্গ ও নারী রাজ্যকে ভৌগলিকভাবে আলাদা করে রেখেছিল।

ষষ্ঠ শতকে (৫০১ – ৬০০ সাল) কামরূপের একটি খণ্ডরাজ্যের রানীর হাতে নারী রাজ্যের পতন হয়। কামরূপের এই রানীর বংশধররা নারী রাজ্য বা জৈন্তিয়ার সমতল অংশের শাসক হয়েছিলেন; পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব মেঘালয় ছিল মাতৃপ্রধান জনগোষ্ঠীর এলাকা (এদেরই নারীপ্রধান আগে বৃহত্তর জৈন্তিয়া রাজ্যের রানী বিবেচিত হতেন)। জৈন্তিয়ার এই আদি জনগোষ্ঠীটি খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে নিজেদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলেছিল। একসময় তারা খাসিয়া ও সিন্টেং নামে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে (সিন্টেং জনগোষ্ঠীর অপর নাম জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠী)। সময়ের পরিক্রমায় তাদের সামাজিক নিয়মে কিছু পরিবর্তনও এসেছিল। মূল মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তারা নারী সরদারদের স্থলে পুরুষ সরদারদের শাসন চালু করেছিল। ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সিন্টেং জনগোষ্ঠীর প্রধান সরদার বা সিয়েম জৈন্তিয়া সমতলের কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। তখন থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতল ছিল সিন্টেং রাজাদেরই অধীন।

সিন্টেং রাজাদের পূর্ববর্তী এক হাজার বছর জৈন্তিয়া সমতল তথা বৃহত্তর সিলেট কোন একক রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়নি। এই অঞ্চল বিভিন্ন ছোট-বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাঙ্গন হয় ৬০০ সাল থেকে ৬৫০ সালের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে। অখণ্ড নারী রাজ্য বা জৈন্তিয়া ভেঙ্গে তখন লাউড় ও গৌড় নামে

দুটি পৃথক রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। মধ্য সিলেট ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত আর পশ্চিম সিলেট ছিল লাউড়ের অন্তর্ভুক্ত। জৈন্তিয়া রাজ্য তখন উত্তর সিলেটের সমতল ভূমির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে রাজ্যটির আয়তন আর বাড়েনি, বরং এর আয়তন আরও কমেছে। উত্তর সিলেটের জৈন্তিয়া সমতল ভূমিতে একসময় কিছু স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ১০০০ সাল থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে জৈন্তিয়ার বিভিন্ন এলাকা স্বাধীন সিন্টেং সরদারদের হাতে শাসিত হয়েছে। ১৫০০ সালের আগে জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর ছিল সিন্টেং সরদারদের অধীনে তিনটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য। এগুলোর মধ্যে জাফলং ছিল আকারে সবচেয়ে বড়। এই রাজ্যটি 'মালনিয়াং' রাজ্য নামেও পরিচিত ছিল।

ওই সময়ে জৈন্তিয়া রাজ্য মূলত জয়ন্তাপুরী রাজ বা পরগনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রাজ্যটির সীমানা সংকোচনের সর্বোচ্চ পর্যায় ছিল এটিই। ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি সিন্টেং জনগোষ্ঠীর প্রধান সরদার বা সিয়েমের হস্তগত হয়। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ রাজ্যটির সীমানা বাড়িয়েছিলেন। সিন্টেং রাজবংশের প্রথমদিকের রাজা বিজয় মাণিক জাফলং, চারিকাটা ও ফালজুর রাজ্যকে নিজের শাসানাধীনে নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়াও তিনি চতুল, খরিল, আড়াইখা, চাউরা ও পাঁচভাগ অঞ্চলেও জৈন্তিয়ার 'রাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিন্টেং বা জৈন্তিয়া জনগোষ্ঠীর রাজাদের শাসনামলে জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রদেশগুলোকে বলা হতো 'রাজ'। আকৃতির বিচারে এগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এগুলো প্রদেশের মতোই ছিল। জৈন্তিয়া সমতলে এমন ১৮টি রাজের অস্তিত্ব ছিল।

তবে এগুলো সমমর্যাদাসম্পন্ন বা সমগুরুত্বসম্পন্ন ছিল না। মূলত দশটি রাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাকিগুলো এগুলোর অধীনেই ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দশটি রাজ আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা- খেলুরাজ ও হাজারকি রাজ। খেলুরাজের সংখ্যা ছিল চার। এগুলো হল- জয়ন্তাপুরী রাজ, জাফলং রাজ, চারিকাটা রাজ ও ফালজুর রাজ। জৈন্তিয়া সমভূমির সবচেয়ে প্রাচীন জনপদসমূহ ছিল এই চারটি খেলুরাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন জনপদসমূহ ছিল ছয়টি হাজারকি রাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হল- ধরগাম রাজ, চতুল রাজ, খরিল রাজ, পাঁচভাগ রাজ, আড়াইখা রাজ ও চাউরা রাজ। খেলুরাজ ও হাজারকি রাজগুলোতে সিন্টেং রাজবংশের উদ্ভবের আগে

থেকেই জনবসতি ছিল। সিন্টেং রাজাদের শাসনামলে জৈন্তিয়ার কিছু নিম্নভূমি বা হাওর এলাকা পলিমাটি দ্বারা ভরাট হয়ে জনবসতিতে রূপান্তরিত হয়।

রাজারা এসব জনপদকে বিভিন্ন হাজারকি রাজের অধীনে 'জুলাই রাজ' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এসব জুলাই রাজের সংখ্যা ছিল আট। এর মধ্যে সাতটির অবস্থান বর্তমান কানাইঘাট উপজেলায় এবং একটির অবস্থান কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায়। এগুলোর নাম হচ্ছে- মুলাগুল রাজ, সাতবাক রাজ, বাজেরাজ, পশ্চিমভাগ রাজ, বড়দেশ রাজ, বাউরভাগ রাজ, বর্ণফৌদ রাজ ও পিয়াইনগুল রাজ। এসব রাজের কোন প্রতিনিধি সরাসরি জৈন্তিয়ার রাজদরবারে অংশ নিতেন না। যেসব হাজারকি রাজের অধীনে এগুলো পরিচালিত হতো সেসব হাজারকি রাজের প্রধানরাই রাজদরবারে এগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতেন।

জৈন্তিয়া রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী মোট বাইশ জন 'রাজ-প্রতিনিধি' দরবারে অংশ নিতে পারতেন; সমতল থেকে অংশ নিতেন দশ জন (খেলুরাজ ও হাজারকি রাজের প্রতিনিধি) আর পার্বত্য অঞ্চল থেকে অংশ নিতেন বারো জন (পুঞ্জি বা এলাকা রাজের প্রতিনিধি)। ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়ায় ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে 'রাজ-ব্যবস্থা' বিলুপ্তি লাভ করে। ব্রিটিশরা এখানকার ১৮ রাজকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসনের আওতাধীন ১৮ পরগনায় রূপান্তরিত করে। ১৮৫৬ সালের চতুর্থ বন্দোবস্তের সময় পশ্চিমভাগ পরগনাটিকে বাজেরাজের সাথে যুক্ত করা হলে জৈন্তিয়ার পরগনার সংখ্যা হয়ে যায় ১৭।[110] তখন থেকে জৈন্তিয়া সমভূমি 'জৈন্তিয়া ১৭ পরগনা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আমলে 'পরগনা-ব্যবস্থা' বিলুপ্ত হলেও এখনও 'জৈন্তিয়া ১৭ পরগনা' নামটি বেশ প্রসিদ্ধ।

জৈন্তিয়া সমতলে যখন সিন্টেং রাজাদের শাসন শুরু হয় তখন জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা ১২ জন সরদারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ ছিল। এসব

---

[110] ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের চতুর্থ বন্দোবস্তের সময় ইংরেজরা পশ্চিমভাগ পরগনাকে বাজেরাজ পরগনার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। ফলে ইংরেজ-শাসিত জৈন্তিয়া সমতলের মোট পরগনার সংখ্যা ১৮টি থেকে হয়ে যায় ১৭টি। বিলুপ্তির আগে পশ্চিমভাগ পরগনাটি যে ৫টি মৌজা নিয়ে গঠিত ছিল, সেগুলো হলো ছোটদেশ, চটিগ্রাম, ভাটিদিহি, উমাগড় ও বাটইয়াইল। এ মৌজাগুলোর নাম আজও টিকে আছে। বর্তমানে এগুলো কানাইঘাট উপজেলার প্রসিদ্ধ কিছু গ্রাম।

সরদারের উপাধি ছিল ‘দলই’। দলইয়ের নিয়ন্ত্রিত এলাকাকে বলা হতো ‘পুঞ্জি’ বা ‘এলাকা’ (এলাকা একটি প্নার শব্দ)। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর লোকজন ১২টি পুঞ্জি বা এলাকায় বিভক্ত হয়ে জৈন্তিয়া পাহাড়ে বসবাস করতো। এই ১২টি পুঞ্জিকে একত্রে বলা হতো ‘হিমা’। দলইদের মধ্যে একজনকে হিমার প্রধান নির্বাচিত করা হতো। তাঁর উপাধি ছিল ‘সিয়েম’। সিয়েমের অধীনে বাকি দলইরা ঐক্যবদ্ধ থাকতেন। সাধারণত সুতংগা পুঞ্জির দলইকে হিমার সিয়েম নির্বাচিত করা হতো। জৈন্তিয়া সমতলের প্রথম সিন্টেং রাজা ছিলেন এই সুতংগা পুঞ্জিরই দলই ও সিয়েম।

তাঁর পরবর্তী রাজারাও ‘সিয়েম সুতংগা’ উপাধির অধিকারী ছিলেন। তবে তারা সুতংগায় বসবাস করতেন না; তারা জয়ন্তীপুরে বসবাস করতেন। তাই সুতংগা পুঞ্জিটিকে পরিচালনার জন্য তারা অন্য কাউকে দলই নিযুক্ত করতেন বলে ধারণা করা হয়। জৈন্তিয়ার রাজদরবারের সভ্য হিসেবে হিমা থেকে ১২ জন দলই অংশ নিতেন (১১ জন নয়)। যে ১২টি পুঞ্জি বা এলাকা থেকে দলইরা রাজদরবারে অংশ নিতেন সেগুলোর নাম নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক রাভি পুভাইয়ার মতে, জৈন্তিয়া রাজ্যের ১২টি এলাকার নাম হল- Sutnga, Nartiang, Nongtalang, Nangphyllut, Nongjngi, Nangbah, Lakadong, Shangpung, Mynso, Jowai, Raliang, Amwi. সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, জৈন্তিয়া রাজ্যের ১২টি এলাকার নাম হল- Suhtnga, Nartiang, Natelag, Norpu, Nongjhini, Nongbare, Lakhdong, Shangpung, Myuso, Jawai, Raliang, Rambhai.

জৈন্তিয়ার মূল ৩০টি রাজের (১৮ রাজ + ১২ রাজ) বাইরে রাজ্যটির কিছু অধীনস্থ অঞ্চলও ছিল। এসব অঞ্চলে সিন্টেং রাজাদের কোন স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ছিল না; নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ছিল সাময়িক। এরকম মোট ছয়টি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটি অঞ্চল ছিল মোগলানের; বাকি চারটি অঞ্চল ছিল জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যবর্তী সরদারশাসিত অঞ্চল। মোগলানের ঢাকাদক্ষিণ পরগনার নায়েবে ফৌজদার দুর্লভ দাস জৈন্তিয়ার কিছু ভূমি দখল করেছিলেন। এ ঘটনার জের ধরে জৈন্তিয়াপতি জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণে আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং পরগনাটিকে দখল করে নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মোগলানের চারখাই পরগনাটিকেও দখল করেছিলেন। চারখাই দখলের কারণ ছিল ধর্মীয়। সেখানকার সেনগ্রামের হাটকেশ্বর শিবমন্দিকে নিজ রাজ্যভুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি পরগনাটিকে দখল করে নিয়েছিলেন। উভয় পরগনা দখলের আনুমানিক

সময়কাল হচ্ছে ১৭১৯ সাল। আনুমানিকভাবে, ১৭৪০ সাল পর্যন্ত পরগনাদ্বয় জৈন্তিয়ার অধীনস্ত ছিল।

আনুমানিক ১৬০৩ সালে জৈন্তিয়া ও কাছাড়ি রাজ্যের মধ্যবর্তী ডিমারুয়াকে কেন্দ্র করে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের পরে এর নিয়ন্ত্রণ কাছাড়িদের হাতেই ছিল। পরে তা জৈন্তিয়ার হাতে আসে। আরও পরে তা আহোমদের হাতে চলে যায়। তবে কেউই এই অঞ্চলকে সরাসরি নিজস্ব প্রশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেননি। এটি একটি অর্ধ-স্বাধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। এমন আরেকটি সামন্ত রাজ্য ছিল গোভা। এটি কখনো জৈন্তিয়ার দ্বারা আবার কখনও আহোমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এটি মূলত জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যবর্তী একটি স্বায়ত্বশাসিত 'বাফার এলাকা' হিসেবে কাজ করতো। জৈন্তিয়ার পার্বত্য পথ অতিক্রম করে আহোমে যেতে হলে এর ভেতর দিয়েই যেতে হতো। কুফানলী এবং কাওবান নামে আরও দুটো অঞ্চলের কথা জানা যায় যেগুলো একসময় জৈন্তিয়ার অধীনস্থ অঞ্চল ছিল। জৈন্তিয়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হওয়ার পর এগুলো আহোমের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল।

জৈন্তিয়া সমতলের ১৮ রাজ ও এগুলোর বর্তমান অবস্থান --- খেলুরাজ (১-৪) হাজারকি রাজ (৫-১০) জুলাই রাজ (১১-১৮)	জৈন্তিয়া পাহাড়ের ১২ রাজ (পুঞ্জি বা এলাকা) তথ্যসূত্র: *Ka History ka Ri Jaintia ha shwa ki Phareng,* End News, Khliehriat, 26 August 2023	জৈন্তিয়ার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ (অস্থায়ী)
১) জয়ন্তাপুরী রাজ (জৈন্তাপুর) ২) জাফলং (গোয়াইনঘাট) ৩) চারিকাটা (জৈন্তাপুর) ৪) ফালজুর (কানাইঘাট) ৫) ধরগাম (গোয়াইনঘাট ও কোম্পানিগঞ্জ) ৬) চতুল (কানাইঘাট) ৭) খরিল (জৈন্তাপুর)	1) Sutnga 2) Nartiang 3) Nongtalang 4) Nangphyllut 5) Nongjngi 6) Nangbah 7) Lakadong 8) Shangpung 9) Mynso	১) ডিমারুয়া ২) গোভা ৩) কাওবান ৪) কুফানলী ৫) ঢাকাদক্ষিণ ৬) চারখাই

৮) পাঁচভাগ (গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর) ৯) আড়াইখা (গোয়াইনঘাট) ১০) চাউরা (কানাইঘাট) ১১) মুলাগুল (কানাইঘাট) ১২) সাতবাক (কানাইঘাট) ১৩) বাজেরাজ (কানাইঘাট) ১৪) পশ্চিমভাগ (কানাইঘাট) ১৫) বড়দেশ (কানাইঘাট) ১৬) বাউরভাগ (কানাইঘাট) ১৭) বর্ণফৌদ (কানাইঘাট) ১৮) পিয়াইনগুল (কোম্পানিগঞ্জ)	10) Jowai 11) Raliang 12) Amwi	

পরিশিষ্ট-৩

জৈন্তিয়ার রাজদপ্তর ও রাজকোষ

জৈন্তিয়ার রাজধানীতে যেসব স্থাপনার অবশেষ আজও টিকে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ‘জৈন্তেশ্বরী বাড়ি’ নামক একটি বিশাল রাজকীয় বাড়ি এবং এর সুউচ্চ ফটকের একাংশ। বাড়িটির প্রকৃত ইতিহাস অর্থাৎ এটি কীভাবে এবং কেন নির্মিত হয়েছিল তা কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়না। কোন তাম্রফলক বা শিলালিপিতেও এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা, স্থানীয় প্রবীণদের মত এবং জনশ্রুতি থেকে আঁচ করা যায় যে, বাড়িটি মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজেই ব্যবহার করা হতো। এর মধ্যে প্রথমেই আসে বলি বা মৃত্যুদণ্ডের কথা। জৈন্তিয়া রাজ্যের সকল বড় অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো এ বাড়িতেই। বাড়ির ঠিক মাঝখানে একটি গোল বেদির উপর আসামীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। বেলেপাথরে নির্মিত এই বেদিটি এখনও ‘বলির পাঠাতন’ নামে পরিচিত। বেদির উপরস্থ একটি কাঠামোর ওপর আসামীর মাথা রেখে বলি বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। এই কাঠামোটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির বলির পাঠাতন

জৈন্তিয়া রাজ্যের বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ছিল। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী অপরাধের জন্য শাস্তি ছিল অবধারিত। অপরাধ করে কেউ ছাড় পাবে- তা ছিল সিন্টেং রীতিবিরুদ্ধ। সমতলেও মোটামোটিভাবে একই নীতি কার্যকর ছিল। সমতলের হাওরাঞ্চলে ডাকাতদের প্রাদুর্ভাব রুখতে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লে রাজদরবারের বিচারে মৃত্যুদণ্ড ছিল নিশ্চিত ব্যাপার। জৈন্তিয়ার রাজদরবারে প্রতিনিয়তই অপরাধীদের বিচার চলতো। ছোট অপরাধের জন্য জরিমানা ও বেত্রাঘাতের মতো শাস্তি দেওয়া হলেও বড় অপরাধের জন্য বলি বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। প্রায় সকল বলিই কার্যকর করা হতো কথিত জৈন্তেশ্বরী বাড়িতে। কদাচিৎ দু-একজন অপরাধীকে ফালজুরের বামজঙ্ঘা পীঠ অথবা নারতিয়াং মন্দিরে বলির জন্য পাঠানো হতো। সনাতন ধর্মের রীতি অনুযায়ী দেবীর তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদেরকে সেসব স্থানে বলি দেওয়া হতো। এমন বলির ঘটনা বছরে একবারই ঘটতো। বাকি সময়ে জৈন্তেশ্বরী বাড়িতেই বলি দেওয়া হতো। যুগ যুগ ধরে জৈন্তেশ্বরী বাড়ির এই বলি নিয়ে নানান গুজব প্রচলিত আছে। এসব গুজবের বেশিরভাগই কাল্পনিক ও মিথ্যা।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটকের বাইরের চিত্র

কিছু ঐতিহাসিকও জৈন্তেশ্বরী বাড়ির এই বলি নিয়ে ভুল ধারণা পোষণ করতেন। বাড়িটিকে তারা একটি পীঠস্থান মনে করতেন এবং এখানে 'জয়ন্তেশ্বরী দেবীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই' বলি দেওয়া হতো বলে ধারণা করতেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণার কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই। সনাতন ধর্মের রীতি অনুযায়ী 'জয়ন্তেশ্বরী দেবীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে' বলি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত দুটি স্থান ছিল বামজঙ্ঘা মহাপীঠ ও নারতিয়াং মন্দির। এই দুটি স্থান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃত। উভয় পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়ন্তী বা জয়ন্তেশ্বরী। কথিত জৈন্তেশ্বরী বাড়িটির এমন কোন ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। জৈন্তেশ্বরী দেবীর নামে বাড়িটির নামকরণের কারণ একটি মূর্তি। জৈন্তিয়ার সিন্টেং রাজা যশোমাণিক (শাসনকাল: ১৬০৫ সাল - ১৬৪১ সাল) কোচবিহার থেকে জয়ন্তেশ্বরী দেবীর একটি ধাতব মূর্তি উপহার পেয়েছিলেন। তিনি এই মূর্তিটিকে এই বাড়ির ভেতরেই স্থাপন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। মূর্তির কারণেই বাড়িটির এমন নামকরণ হয়েছে বলেও ধারণা করা হয়।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটকের ভেতরের চিত্র

১৭০৮ সালের জৈন্তিয়া-আহোম যুদ্ধের সময়ে আহোম সৈন্যরা এই মূর্তিটিকে তাদের রাজধানী গড়গাঁওয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা প্রতিরোধের মুখে পড়ে এবং মূর্তিটি ফেলে চলে যায়। এরপর প্রতিরোধ যোদ্ধারা নারতিয়াং গ্রামে অবস্থান নেয় এবং সেখানকার মন্দিরেই মূর্তিটি স্থাপন করে। এটি আজও সেখানেই আছে। জৈন্তেশ্বরী বাড়ি থেকে মূর্তিটি উধাও হলেও এখানকার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজ স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকে। কিন্তু বাড়িটির নাম বদলায়নি। কোন কোন লেখক বাড়িটিকে একটি মন্দির বলে দাবি করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, পুরো বাড়িটি মন্দির নয়; অন্যান্য স্থাপনার পাশাপাশি বাড়ির ভেতরে একটি মন্দির ছিল। মূর্তি উধাও হওয়ার পরেও সম্ভবত বাড়িতে একটি নতুন মূর্তি বসিয়ে উপাসনা চলতো। বাড়ির ভেতরে ও বাইরে কর্মরত রাজ-কর্মচারীদের উপাসনার সুবিধার্তেই এই মন্দিরটি চালু রাখা হয়েছিল। এটি ছিল একটি সাধারণ মন্দির; এর সাথে নরবলির কোন সম্পর্ক ছিল না।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির ভেতরে নির্মিত একটি বেদি

বাড়িটি ছিল রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র তথা রাজদপ্তর। এর একাংশে (উত্তর পাশে) ছিল রাজ্যের প্রধান রাজস্ব দপ্তর; রাজস্ব সংক্রান্ত সকল কাজ এখানেই হতো বলে ধারণা করা হয়। রাজস্ব দপ্তরের কয়েক হাত উঁচু ভিটা এখনও টিকে আছে। ভিটার দক্ষিণ পাশে একটি ঘর দেখা যায়। এই ঘরের ভিটা রাজাদের আমলের হলেও ঘরটি নতুন। ঘরের ভিটায় একটি মঞ্চসদৃশ বেদি রয়েছে। এই বেদির গায়ে ফুল ও লতার নকশা রয়েছে। অপরাধীদেরকে যখন মৃত্যদণ্ডের জন্য বলির পাঠাতনে তোলা হতো, রাজা তখন এই বেদির উপরে বসতেন। রাজা সংকেত দেওয়া মাত্রই জল্লাদ অপরাধীর ঘাড়ে কোপ বসাতো। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য লোক এই হিমশীতল দৃশ্য দেখতো। এই বাড়িতে অপরাধীদেরকে আটকে রাখা হতো বলেও অনেকের ধারণা (শেষ রাজা ইন্দ্র সিংহের আমলে এখানে একজন মন্ত্রীকে বন্দী রাখা হয়েছিল বলে শোনা যায়)। বাড়িটির সুউচ্চ দেয়ালও এমন ইঙ্গিত দেয়। রাজারা অকারণে বাড়িটির চারপাশে এতো উঁচু দেয়াল নির্মাণ করেননি। বাড়ির ভেতরের দপ্তরসমূহের নিরাপত্তা এবং অস্থায়ী কারাগার হিসেবে এর ব্যবহারের জন্যই দেয়ালগুলো নির্মিত হয়েছিল।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির সুউচ্চ দেয়ালের একাংশ (ফটক সংলগ্ন)

বাড়িটির ফটকের উচ্চতাও বিস্ময়কর। এতো উঁচু ফটক জৈন্তিয়ার আর কোথাও নেই। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ফটকটি বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এর একপাশের স্তম্ভ প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। অপর পাশের স্তম্ভের প্রায় অর্ধেক টিকে আছে। ফটকের এই দুই অংশ থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যের নির্মাণশিল্পের চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। ফটকটিকে এতো উঁচু করে নির্মাণের মূল কারণ ছিল হাতি। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে রাজধানীর যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যম ছিল হাতি। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাতির পিঠে চড়ে রাজ-প্রতিনিধি বা রাজ-কর্মচারীগণ রাজধানীতে আসতেন। তারা হাতির পিঠে বসেই রাজদপ্তরে (জৈন্তেশ্বরী বাড়িতে) প্রবেশ করতেন। হাতির উচ্চতা এবং আরোহীর উচ্চতার যোগফলের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ফটকটি নির্মাণ করা হয়েছিল।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটক

এই ফটক এবং দেয়ালগুলো কোন রাজা নির্মাণ করেছিলেন তা নিশ্চিত হওয়া যায় না। হতে পারে, রাজা যশোমাণিক এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, যশোমাণিক এখানে একটি মন্দির বানিয়ে তাতে জয়ন্তেশ্বরী মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এর বহু পরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরসহ পুরো এলাকাটিকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে এর ভেতরে রাজ্যের দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। বাড়ির সামনের দেয়ালের গায়ের কিছু চিত্রকর্ম জৈন্তিয়ার রাজাদের শৈল্পিক মনের পরিচয় তোলে ধরে। চিত্রকর্মে হাতি ও ঘোড়ার উপস্থিতি বেশ লক্ষ্যণীয়। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, দুজন বর্শাধারী ও আরেক

ব্যক্তি মিলে একটি হাতিকে পোষ মানানোর চেষ্টা করছে। আরেকটি দৃশ্যে একটি বাঘকে হাতির সাথে লড়াই করতে দেখা যায়। আরেকটি দৃশ্যে দেখা যায়, হাতি পোষ মেনেছে এবং দুজন মাহুতকে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। একইভাবে পোষা ঘোড়া এবং মুক্ত ঘোড়ারও চিত্র রয়েছে।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালের গায়ের চিত্রকর্ম

জৈন্তেশ্বরী বাড়ি বা রাজদপ্তরের মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ইতিহাসও আজানা। এটি 'বড়দেউল' নামে পরিচিত। বড়দেউল মানে হল 'বড়মন্দির'। কিন্তু বড়দেউলের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকালে মনে হয় এটি একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এতো পুরু দেয়াল জৈন্তিয়ার আর কোন স্থাপনায় দেখা যায় না। উচ্চতার বিচারেও এটি অনন্য। এর ধ্বংসস্তুপের উচ্চতা জৈন্তিয়ার অক্ষত স্থাপনাগুলোর চেয়েও বেশি। ধ্বংসস্তুপ দেখে মনে হয়, যখন এটি অক্ষত ছিল তখন রাজধানীর বাইরে থেকেও এটি দেখা যেতো। ঐতিহাসিকদের মতে, জৈন্তিয়ায় যতো স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ছিল এটিই । জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি সাত তলার সমান উঁচু ছিল। কিন্তু সাত তলার সমান

উঁচু ভবন নির্মাণের প্রযুক্তি তখন জৈন্তিয়া বা সিলেটের কোথাও ছিল না। বড়দেউলের মূল ভবন হয়ত চারতলার সমান উঁচু ছিল এবং এর উপরে মিনারের মতো আরও তিন তলার সমান একটি বর্ধিত অংশ ছিল। স্থানীয়দের মতে, বড়দেউলে প্রবেশের জন্য কিছু সুড়ঙ্গ পথও ছিল। তাদের দাবি, এখনও খনন করলে এসব সুড়ঙ্গ পথের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে।



চিত্র: বড়দেউলের ধ্বংসাবশেষের একাংশ

তৎকালীন যুগে ধর্মীয় উপাসনার প্রয়োজনে এমন দুর্গের মতো মন্দির নির্মাণের কোন রীতি ছিল না (জৈন্তিয়ার অন্যান্য মন্দিরগুলো দেখলে তা বোঝা যায়)। মন্দিরে প্রবেশের জন্য কোন সুড়ঙ্গ পথেরও প্রয়োজন হতো না। বড়দেউলের এসব বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করা যায় যে, এটি কোন সাধারণ মন্দির ছিল না। এটি ছিল মূলত রাজ্যের মুদ্রাভাণ্ডার বা রাজকোষ। আগের যুগের রীতি অনুযায়ী রত্নভাণ্ডারে মূর্তি রাখার প্রচলন ছিল। তাই বড়দেউলের ভেতরেও হয়তো রাজারা মূর্তি রাখতেন। কিন্তু এই মূর্তির জন্যই যে বড়দেউল নির্মিত হয়েছিল তা নয়; মুদ্রা ও মূল্যবান দ্রব্য সংরক্ষণের জন্যই এটি নির্মিত হয়েছিল। যদি

কখনও রাজধানী শত্রুদের হাতে চলে যায় তাহলে বড়দেউলের সকল মুদ্রা ও ধনরত্ন নিয়ে যাতে গোপনে রাজধানী থেকে বের হওয়া যায় সেজন্য রাজারা সুড়ঙ্গ পথের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। স্থানীয়দের মতে, বড়দেউলের সুড়ঙ্গ পথ সংযুক্ত রয়েছে বড়গাং-এর সাথে। একসময় বড়গাং-এ এই সুড়ঙ্গ পথের মুখ দেখা যেত বলে তারা দাবি করে থাকেন।



চিত্র: বড়দেউলের ধ্বংসাবশেষ

১৭৭৪ সালে ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার রাজধানীর সাময়িক পতন হয়েছিল। রাজা ছত্রসিংহ এর আগেই বড়দেউলের সকল মুদ্রা ও ধনরত্ন জৈন্তিয়া পাহাড়ে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তাই ব্রিটিশরা জৈন্তিয়ার রাজধানীতে ঢুকে কোন মুদ্রা বা ধনরত্নের সন্ধান পায়নি। উল্টো রাজধানী নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থের অপচয় হচ্ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত রাজার সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে ১৫,০০০ মুদ্রার বিনিময়ে তারা জৈন্তিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু পরেরবার তা হয়নি। ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়া দখলের পর বড়দেউল ও রাজবাড়ির সকল ধন-সম্পদ ব্রিটিশদের হস্তগত হয়। বড়দেউলে শুধু একটি ধাতব ঘন্টা অবশিষ্ট ছিল। ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত এই ঘন্টাটি বাজানোর প্রচলন ছিল। ওই বছরের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের পর বড়দেউলের ঘন্টা এবং কিছু ছোট মূর্তি বিশাল ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে যায়। তখন থেকে এই বিশাল স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ একই অবস্থায় পড়ে আছে।

পরিশিষ্ট-৪

জৈন্তিয়া রাজবাড়ির কথা

সুপ্রাচীনকাল থেকে জৈন্তিয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল জয়ন্তীপুর (বর্তমান জৈন্তাপুর উপজেলা সদর)। দ্বাদশ শতক থেকে জৈন্তিয়ার রাজারা এখানে বসবাস করতেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। ১৫০০ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত রাজ্যটি সিন্টেং জনগোষ্ঠীর রাজাদের শাসনাধীন ছিল। তারাও জয়ন্তীপুরেই বসবাস করতেন (জৈন্তিয়া পাহাড়ের নারতিয়াং পুঞ্জিতে তাদের একটি উপ-রাজধানী থাকলেও তারা মূল রাজধানীতেই বসবাস করতেন)। নিজ জনগোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্থ হওয়ায় সিন্টেং রাজারা কোন জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ বা রাজবাড়ি নির্মাণের প্রয়োজন বোধ করেননি। আনুমানিক ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত রাজারা জয়ন্তীপুরের একটি সাধারণ বাড়িতেই বসবাস করতেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই বাড়িটি ছিল পাথরে নির্মিত একটি বসতবাড়ি। এর অবস্থান ছিল বর্তমান জৈন্তাপুর মডেল থানার পেছনে। ব্রিটিশ আমলে বাড়িটির স্থলে একটি থানা ও ডাক-বাংলো নির্মিত হওয়ায় সেটির কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির ইন্দারা

আনুমানিক ১৭৬৫ সালে জৈন্তিয়া রাজ্যের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন তৎকালীন রাজা দ্বিতীয় বড়গোসাঁইয়ের ভাগিনেয় ফতেহ খাঁ। রাজা বড়গোসাঁইয়ের অত্যাধিক স্নেহের পাত্র হওয়ায় এই তরুণ সেনাপতি পুরো রাজ্যেরই হর্তাকর্তা বনে গিয়েছিলেন। রাজা তাঁর হাতে পুরো রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তোলে দিয়েছিলেন। এই সুবাধে তিনি জয়ন্তীপুরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ নেন। তাঁর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আনুমানিক ১৭৬৫-৬৬ সালে জয়ন্তীপুরের কেন্দ্রস্থলে একটি নতুন রাজবাড়ি নির্মিত হয়। এই বাড়িটি ছিল অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও জাঁকজমকপূর্ণ। একটি অনুচ্চ টিলার উপরে বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছিল। টিলার উপরিভাগ কেটে বিস্তৃত সমতল জায়গা প্রস্তুত করে সেখানে বাড়ির বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছিল। স্থাপনাসমূহকে সুরক্ষিত করার জন্য বাড়ির চারপাশে একটি প্রাচীরও নির্মাণ করা হয়েছিল।

বাড়ির সদর দরজা বা প্রধান ফটক ছিল দক্ষিণপাশে। নিচের সমতলভূমির সাথে টিলার উপরের এই ফটকটিকে সংযুক্ত করেছিল একটি পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়িটি মোটেও খাড়া ছিল না। এটি বেশ আনুভূমিক ছিল। নিচ থেকে চৌদ্দটি প্রশস্ত ধাপ ক্রমশ উপরে উঠে গিয়ে প্রধান ফটকের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। নিচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ির প্রধান ফটক পার হলেই তিন কক্ষ বা কামরা বিশিষ্ট একটি প্রাসাদ চোখে পড়তো। প্রাসাদের প্রথম কক্ষটি মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যারা রাজবাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করতেন তারা এই কক্ষেই থাকতেন। পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন রাজের (পুঞ্জি ও পরগনা) প্রধানগণ এবং গোভা ও ডিমারুয়ার মতো সামন্ত রাজ্যের প্রধানগণ মাঝেমধ্যে রাজবাড়ির অতিথি হতেন। প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও কোন প্রয়োজনে জয়ন্তীপুরে আসলে রাজবাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করতেন। তাদের বিশ্রামের জন্য রাজবাড়ির প্রাসাদের প্রথম কক্ষটি ছেড়ে দেওয়া হতো।

প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষটি সদর মহল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে শুধু রাজা থাকতেন। যেসব রাজারা বিবাহিত ছিলেন তাদের সাথে রানীরাও সদর মহলে থাকতেন। প্রাসাদের তৃতীয় কক্ষটি অন্দর মহল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এতে সাধারণত রাজার বোন (রাজকুয়ঁরী) ও ভগ্নিপতি থাকতেন। এই তিনটি কক্ষ ছাড়াও রাজবাড়িতে বসবাসের জন্য আরও কিছু কক্ষ ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা নির্মিত এসব কক্ষ ছিল মূল প্রাসাদের বাইরে। বাড়ির অন্যান্য

স্থাপনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল একটি পারিবারিক মন্দির। কালের গ্রাসে বাড়ির মূল প্রাসাদ ও প্রাচীর হারিয়ে গেলেও এই মন্দিরটি আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা এই মন্দিরটি আজও রাজবাড়ির বাসিন্দাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজবাড়ির একটি পানির কূপ বা ইন্দারাও টিকে আছে। দক্ষিণের একটি ফটকও টিকে আছে। কয়েক বছর আগেও মন্দির ও ইন্দারার কাছে একটি ছোট ফটকের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে এটি নেই। এই ছোট ফটক সংলগ্ন অনুচ্চ দেয়ালের কিছুটা এখনও চোখে পড়ে।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির একটি ফটক

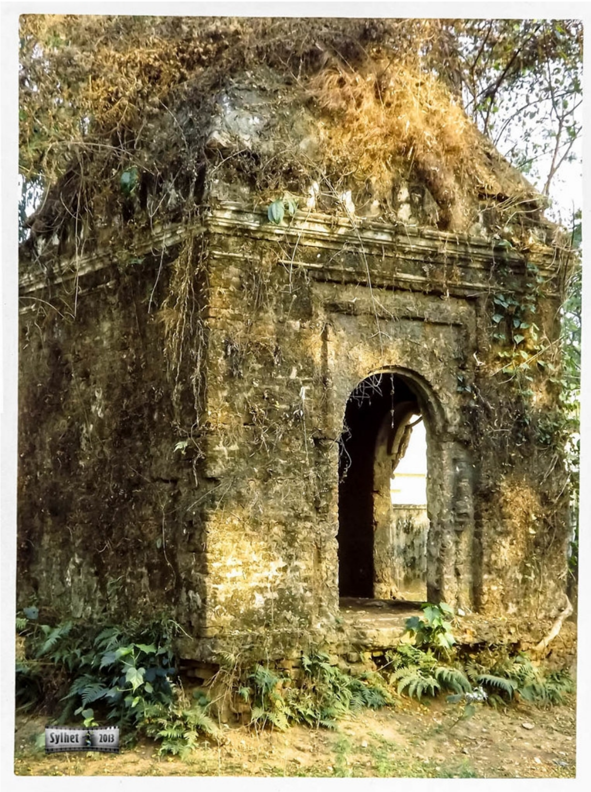
আপাতদৃষ্টিতে বিশেষত্বহীন এই বাড়িটি ছিল একসময়কার জয়ন্তীপুরের সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি। রক্ষীরা এই বাড়িটি পাহারা দিত। সবসময় এখানে লোকজনের আসা-যাওয়া লেগেই থাকতো। আনুমানিক ১৭৬৬-৬৭ সালের দিকে বাড়িটিতে রাজপরিবারের বসবাস শুরু হয়েছিল। জৈন্তিয়ার রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় বড়গোসাঁই ছিলেন এই বাড়ির প্রথম বাসিন্দা। বাড়িটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরপরই তিনি পুরানো রাজবাড়ি ছেড়ে সপরিবারে

এখানে পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তিনি এই বাড়িতেই ছিলেন। এরপর তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে জৈন্তিয়া পাহাড়ের লখডং পুঞ্জিতে চলে যান। নতুন রাজা হিসেবে তখন রাজ্যের ক্ষমতায় আসেন ছত্রসিংহ। তিনি ও তাঁর পরিবার ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত নতুন রাজবাড়িতে বসবাস করেন। ছত্রসিংহের পর ক্রমশ রাজা যাত্রানারায়ণ (১৭৭৪-১৭৮৫ সাল) ও বিজয়নারায়ণ (১৭৮৫-১৭৮৮ সাল) সপরিবারে এই বাড়িতে বসবাস করেছিলেন।

রাজা বিজয়নারায়ণের সময়ে নারতিয়াং পুঞ্জির দলইয়ের পুত্র লক্ষ্মীসিংহ এই বাড়িতে ঘন ঘন আসতেন। রাজপরিবারের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাধে তিনি রাজসভার অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। এরপর নানান নাটকীয়তার পর তিনি সীমিত সময়ের জন্য জৈন্তিয়ার রাজা হয়েছিলেন। তখন তিনি রাজবাড়িতেই বসবাস করতেন। এরপর রাজা হন দ্বিতীয় রামসিংহ। তিনি ১৭৯০ সাল থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত জৈন্তিয়া শাসন করেছিলেন। ফতেহ খাঁ নির্মিত রাজবাড়ির সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের (৪২ বছর) বাসিন্দা ছিলেন তিনিই। তাঁর পরের রাজা রাজেন্দ্র সিংহ ছিলেন জৈন্তিয়ার শেষ রাজা (তিনি ইন্দ্র সিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন)। ১৮৩৫ সালে তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। তখন থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত জমিদার মুরারী চাঁদের বাড়িতে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। এই হতভাগা রাজা যখন ব্রিটিশদের হাতে বন্দী ছিলেন তখন তাঁর পরিবারের লোকজন রাজবাড়িতেই বসবাস করতেন।

১৮৩৫ সালে রাজপরিবারটির আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা নিরূপায় হয়ে রাজবাড়ির দক্ষিণে (রাজবাড়িতে উঠার সিঁড়ির বিপরীতে) একটি হাট সৃষ্টি করেছিলেন। এটি আজও জৈন্তাপুর সদরের প্রধান হাট-বাজার হিসেবে প্রসিদ্ধ। আনুমানিক ১৮৩৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গৃহবন্দী রাজার ভগ্নিপতি উখাট কুওর ও লংবর কুওর এই হাট প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাহাড় ও সমতলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও এই হাট প্রতিষ্ঠায় রাজপরিবারকে প্রভূত সহায়তা করেছিলেন। হাটে পণ্য বিক্রি করে বিক্রেতারা যে আয় করতেন তার ক্ষুদ্র একটি অংশ রাজপরিবারকে দিতেন। সাধারণত সপ্তাহে একদিন এই হাট বসতো। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত রাজপরিবারটি হাটের আয় ও ব্রিটিশ সরকারের সামান্য ভাতার ওপর নির্ভর করে টিকেছিল। জৈন্তিয়া

দখলের পরে ব্রিটিশ সরকার রাজপরিবারের দূরবস্থার দিকটি বিবেচনা করে বন্দী রাজা ও তাঁর পরিবারের জন্য একটি মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন।



চিত্র: সেনাপতি ফতেহ খাঁ কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়ির মন্দির

১৮৬১ সালে বন্দী রাজার মৃত্যুর পর রাজপরিবারের অভিভাবক হন তাঁর ভাগিনেয় নরেন্দ্র সিংহ। তিনিও ব্রিটিশ সরকারের ভাতা পেতেন। একজন 'প্রতীকী রাজা' হিসেবে তিনি রাজবাড়িতেই বসবাস করতেন। তখন রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে তাঁর দুটি নাবালক ভাগিনেয় তাঁর সঙ্গে রাজবাড়িতে বসবাস করতো। এদের নাম ছিল নরসিংহ নৃপ ও ছত্রসিংহ নৃপ।

এছাড়া রাজপরিবারে আর কেউ ছিলেন না। নরেন্দ্র সিংহের বোন ও ভগ্নিপতি (শিশু দুটির মাতাপিতা) জীবিত ছিলেন না। তিনি নিজে ছিলেন অবিবাহিত। ১৮৮৫ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হলে শিশু দুটি অসহায় হয়ে পড়ে। তখন সিলেটের জজ বাহাদুর নিজ অভিভাবকত্বে তাদেরকে সিলেট শহরে নিয়ে যান। তারা সেখানে তাঁর আশ্রয়ে থেকে বড় হয় ও শিক্ষা গ্রহণ করে। সাবালক হওয়ার পর ১৮৯৭ সালে তারা রাজবাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু রাজবাড়িটি তখন আর অক্ষত ছিল না।

১৮৯৭ সালের ১২ জুন ছিল বৃহত্তর সিলেট ও আসাম অঞ্চলের ইতিহাসের এক ভয়ংকর দিন। ৮.৭ মাত্রার এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে সেদিন সিলেট ও আসাম অঞ্চলের বড় বড় প্রাচীন স্থাপনাসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জৈন্তিয়া অঞ্চল ছিল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের বেশ কাছাকাছি একটি অঞ্চল। জৈন্তিয়ার বেশিরভাগ পুরানো স্থাপনাই ভূমিকম্পের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়েছিল। রাজবাড়িটিরও একই দশা হয়েছিল। ভূমিকম্পে বাড়ির মূল প্রাসাদটির ছাদ ধ্বসে গিয়েছিল। মন্দিরসহ বাড়ির ছোট স্থাপনাসমূহ অবশ্য বেঁচে গিয়েছিল। নরসিংহ নৃপ ও ছত্রসিংহ নৃপ সিলেট শহর থেকে ফিরে আসার পর বাড়ির এক কোণায় একটি ঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৯১০ সালে নরসিংহ নৃপের মৃত্যু হলে রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাকি থাকেন শুধু ছত্রসিংহ নৃপ। তিনি নরসিংহ নৃপের মতো অবিবাহিত না থেকে ত্রিপুরা রাজপরিবারের এক কন্যাকে বিয়ে করেন।

এই বিয়েটি বেশ আড়ম্বরপূর্ণ হয়েছিল। জৈন্তিয়া পাহাড় ও সমতলের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিয়ের দিন রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। পাহাড় ও সমতলের লোকজন ছত্রসিংহ নৃপকে প্রতীকী রাজার মর্যাদা দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারও এর স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী বা প্রতীকী রাজা হিসেবে তিনি ১৯১৪ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকারের মাসিক ভাতা পেতে শুরু করেন। তাঁর দুই কন্যার নাম ছিল মলিনা দেবী ও ইরা দেবী। মলিনা দেবীর বিবাহ হয়েছিল রংপুরের বিনয়ভূষণ রায়ের সাথে। কনিষ্ঠ কন্যা ইরা দেবীর বিবাহ হয়েছিল শিলচর নিবাসী কাছাড়ি রাজপরিবারের জন্মজয় বর্মণের সাথে। পিতৃভূমির প্রতি এই রাজকন্যার খুবই টান ছিল। ১৯৩৮ সালে ছত্রসিংহ নৃপের মৃত্যুর পর রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী হিসেবে শুধু তিনিই রাজবাড়িতে

থাকতেন (মলিনা দেবী স্বামীর সঙ্গে থাকতেন)। এই বাড়ির শেষ বাসিন্দা তিনিই।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙ্গে দুই দেশের সৃষ্টি হলে ইরাদেবীর নিজের বাড়ি ও শশুরবাড়ি দুই দেশে পড়ে যায়। তাঁর স্বামী চাকুরিসূত্রে ভারতের শিলং শহরে অবস্থান করতেন। দেশভাগের পর ইরাদেবী শিলং ও জয়ন্তীপুর- উভয় স্থানেই থাকতেন। সর্বশেষ তিনি ১৯৬৫ সালে জয়ন্তীপুরের রাজবাড়িতে লম্বা সময় কাটিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এই রাজবাড়ির ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। এখানে আর কেউ কখনও বসবাস করেনি। বর্তমানে এই রাজবাড়ির মূল অংশ ছাড়া বেশিরভাগ অংশেই বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে উঠেছে। মূল অংশটি বেশ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। রাজবাড়ির পুকুরটিও একসময় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। সরকারি উদ্যোগে খননের পরে পুকুরটি আবারও ব্যবহারযোগ্য হয়েছে। পুকুরটির অবস্থান রাজবাড়ির দক্ষিণের হাট-বাজারের পূর্বপাশে। যতোদিন রাজবাড়িতে লোকজনের বসবাস ছিল ততোদিন তারা এই পুকুরটিই ব্যবহার করতেন।

পরিশিষ্ট-৫

জৈন্তিয়া রাজ্যের সামরিক উপকরণ

জৈন্তিয়া রাজ্য ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম রাজ্যের মধ্যে একটি। আনুমানিকভাবে প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এই রাজ্যটি পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। রাজ্যটি কখনো সরাসরি অন্য কোন রাজ্যের অংশ হয়নি (যদিও বার বার এর সীমানা পরিবর্তন হয়েছে)। ভারত উপমহাদেশের যে অল্প কয়টি রাজ্য মহাভারতের যুগ থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত টিকে গিয়েছিল তার মধ্যে জৈন্তিয়া অন্যতম। এতো দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজ্যের টিকে থাকার পেছনে মূল কারণ ছিল এর প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক সুরক্ষা এবং মাতৃতান্ত্রিক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীসমূহের প্রভাব বলয়। সামরিক শক্তির বিচারে জৈন্তিয়া ছিল আর দশটি রাজ্যের মতোই (জৈন্তিয়ার কোন বিশেষ সামরিক শক্তি ছিল না)। কিন্তু কোন প্রতিবেশী রাজাই রাজ্যটিকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, কামতাপুর, আহোম ও কাছাড়ি রাজ্যের সাথে জৈন্তিয়ার জয়-পরাজয়ের ইতিহাস থাকলেও কারও হাতে রাজ্যটির চূড়ান্ত পতনের কোন ইতিহাস নেই।



চিত্র: জৈন্তিয়ার পাহাড়ি যুবকদের ঐতিহ্যবাহী পোষাক ও অস্ত্র (তীর ধনুক)

জৈন্তিয়া সমতলে সাময়িক বিজয় অর্জন করলেও কোন বহিরাগত শাসক জৈন্তিয়া শাসন করতে পারেননি। ব্রিটিশদের আগ পর্যন্ত জৈন্তিয়া থেকে সকল বিজয়ী শক্তিকেই পিঁছু হটতে হয়েছে। এর পেছনে মূল কারণ হল, জৈন্তিয়া সমতল সর্বদাই পাহাড়িদের প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীরা সমতলের রাজাকে কোন কর বা রাজস্ব দিত না। কিন্তু সমতলের রাজার বিপদের সময়ে তারাই ঢাল হয়ে দাঁড়াত। পাহাড়িরা কখনোই চাইত না, বাইরের কেউ এসে জৈন্তিয়া সমতল শাসন করুক। এই অঞ্চলকে তারা নিজেদের অঞ্চল হিসেবেই গণ্য করতো। এখানে বাইরের কারও শাসনকে তারা কখনোই মেনে নেয়নি। পার্শ্ববর্তী খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যেও জৈন্তিয়া সমতলের ব্যাপারে এমন মনোভাব কাজ করতো। জৈন্তিয়া সমতলে বহিরাগতদের শাসন রুখতে তারা দু-একবার যুদ্ধেও জড়িয়েছিল। এই ভূখণ্ডের সাথে তাদের কোন স্বার্থসংশ্লিষ্টতা না থাকলেও তারা এখানে বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ পছন্দ করতো না। জৈন্তিয়া ও খাসিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের এমন মনোভাবই ছিল জৈন্তিয়ার রাজাদের আসল রক্ষাকবচ।

তবে রাজ্যের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে রাজারা পর্যাপ্ত সামরিক প্রস্তুতি রাখতেন। জৈন্তিয়ার রাজাদের সামরিক শক্তির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল হাতি। রাজারা বুনো হাতি ধরে পোষ মানাতেন এবং সামরিক প্রয়োজনে এগুলোকে ব্যবহার করতেন। মুলাগোল ছিল হাতি ধরার শ্রেষ্ঠ জায়গা। প্রতি বছরই মুলাগোলে বেশ কিছু বুনো হাতি ধরা পড়তো এবং সেগুলোকে পোষ মানিয়ে রাজধানীতে আনা হতো। রাজারা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য এসব হাতির বেশিরভাগই বাইরে রপ্তানী করতেন। সারা ভারতেই জৈন্তিয়ার হাতির বিশেষ কদর ছিল। মোগল শাসকরা প্রায়ই সামরিক প্রয়োজনে জৈন্তিয়ার হাতি কিনতেন। ব্রিটিশ আমলেও এই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রিটিশ আমলের প্রথমদিকে (যখন জৈন্তিয়া স্বাধীন ছিল) সিলেটের কালেক্টররা জৈন্তিয়ার হাতি কিনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় পাঠাতেন (অবশ্য তারা নিজেরাও 'খেদায়' হাতি ধরতেন)। জৈন্তিয়ার রাজধানী জয়ন্তীপুর ছিল হাতি ব্যবসার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। সারা ভারতের হাতির সওদাগররা ভালো মানের হাতি কেনার জন্য জয়ন্তীপুরে আসতেন। জৈন্তেশ্বরী বাড়িতে সওদাগরদের সামনে হাতি নিলাম করা হতো।



চিত্র: জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালের গায়ে অংকিত হাতির চিত্র

জৈন্তেশ্বরী বাড়ির প্রধান ফটকটির উচ্চতা এমনভাবে রাখা হয়েছিল যাতে হাতির পিঠে বসেই মাহুতরা এখানে প্রবেশ করতে পারে এবং এখান থেকে বের হতে পারে। বাড়িটির দেয়ালের উচ্চতাও এমন ছিল যে, এখানে সাময়িক সময়ের জন্য হাতিদেরকে আটকে রাখতে কোন সমস্যা হতো না। বাড়িটির দেয়ালের গায়ের হাতির চিত্রসমূহ আজও মনে করিয়ে দেয় যে, একদা এই বাড়িটিকে অস্থায়ী হাতির হাট হিসেবে ব্যবহার করা হতো। হাতির পরে ঘোড়া ছিল জৈন্তিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহন। জৈন্তিয়া পাহাড়ের ভেতরে সহজে চলাচলের ক্ষেত্রে ঘোড়ার প্রয়োজন হতো। জৈন্তিয়া ও আহোমের মধ্যে যেসব দূত চলাচল করতো তারা ঘোড়ায় চড়েই চলাচল করতো বলে অনুমেয়। জৈন্তেশ্বরী বাড়ি এবং বামজঙ্ঘা পীঠের দেয়ালে ঘোড়া ও আরোহীর কিছু চিত্র দেখা যায়। এসব চিত্র জৈন্তিয়া রাজ্যে ঘোড়ার ব্যবহারের প্রমাণ। ঘোড়ার পরে জৈন্তিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বাহন ছিল নৌকা। দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রাজা ও সৈন্যবাহিনীর লোকজন মাঝেমধ্যে নৌকা ব্যবহার করতেন। রাজা জয়নারায়ণ ঢাকাদক্ষিণ আক্রমণের সময় একটি নৌবহর নিয়ে বড়হাওর অতিক্রম করেছিলেন বলে শোনা যায়।

সামরিক বাহনের পাশাপাশি জৈন্তিয়ার রাজারা বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রও মজুদ রাখতেন। এসব যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ছিল তীর ধনুক, বর্শা, বল্লম, বুকিদা, খঙ্গা নামক জয়ন্তাপুরী তরবারি, নকাইদাও (একটি বিশেষ ধরণের ছুরি), কামান এবং বন্দুক। জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালে বর্শা ও বল্লমধারীর চিত্র দেখা যায়; তরবারি হাতে নিয়ে চলতে থাকা এক নারীর চিত্রও রয়েছে। কোচ রাজাদের ইতিহাস *বংশাবলি* থেকে জানা যায়, ১৫৬৪ সালে জৈন্তিয়ার রাজা প্রতাপ রায় বা প্রতাপ নারায়ণ কোচদেরকে কিছু সামরিক উপকরণ প্রদান করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল ১০০টি ঘোড়া এবং ১০০টি খঙ্গা নামক জয়ন্তাপুরী তরবারি। এছাড়াও তিনি কোচ রাজাকে প্রতি বছর ৭০টি ঘোড়া এবং ৩০০টি নকাইদাও দিতে সম্মত হয়েছিলেন। আহম বুরুঞ্জি থেকে জানা যায়, ১৭০৭-০৮ সালে জৈন্তিয়ায় আক্রমণের সময় আহোমরা ৩টি কামান, ২২৭৩টি বন্দুক এবং ১০৯টি হাতি হস্তগত করেছিল। রাজধানী জয়ন্তীপুরের প্রতিরক্ষার জন্য এর তিনটি প্রবেশদ্বার বা ফটকে মোট ছয়টি কামান বসানো ছিল। প্রতিটি ফটকে এক জোড়া করে কামান বসানো ছিল। এসব কামান আকারে অনেক বড় ও ভারী ছিল।



চিত্রঃ জৈন্তেশ্বরী বাড়ির দেয়ালের গায়ে অংকিত বর্শাধারীর চিত্র

ব্রিটিশদের হাতে জৈন্তিয়ার পতনের পরে এগুলো স্ব-স্থানেই পড়ে ছিল। দীর্ঘদিন এভাবে পড়ে থাকার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একজোড়া কামান সিলেট শহরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। বাকি দুই জোড়া কামান স্ব-স্থানেই ছিল। তবে অযত্নে পড়ে থাকার একপর্যায়ে এগুলো আবর্জনা ও মাটির নিচে আধা-চাপা পড়ে গিয়েছিল। ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ রাজমোহন নাথ জয়ন্তীপুরে (নিজপাট) এসে মাটির নিচ থেকে এক জোড়া কামান উঠিয়ে সেখানকার রাস্তার পাশে পেতে রেখেছিলেন। এগুলো ছিল জয়ন্তীপুর নগরীর দক্ষিণের ফটকের কামান। ১৯৫৩ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার কর্তৃপক্ষ এগুলো তোলে নিয়ে যান। বাকী এক জোড়া কামানের মধ্যে একটির কোন তথ্য মিলে না। অপর একটি দীর্ঘদিন ধরে জৈন্তেশ্বরী বাড়ীর সামনে পেতে রাখা ছিল। এই কামানটির সাথে বর্তমান নিজপাটবাসীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃপক্ষ কামানটিকে জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে তোলে নিয়ে যান। বর্তমানে এটি ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

জৈন্তিয়া রাজ্যের উপ-রাজধানী বা গ্রীষ্মকালীণ রাজধানী নারতিয়াং পল্লীর প্রতিরক্ষার জন্যও সেখানে কিছু কামান বসানো ছিল। বর্তমানে এগুলো নারতিয়াং মন্দিরে সংরক্ষিত আছে (মোট পাঁচটি)। এই কামানগুলো আকারে কিছুটা ছোট। এগুলোর মুখ সরু এবং এগুলোর সাথে হাতলও যুক্ত রয়েছে। আকৃতির বিচারে এগুলো কিছুটা বন্দুকের মতো (যেহেতু সরু মুখ বা নল যুক্ত রয়েছে)। আহম বুরুঞ্জিতে জৈন্তিয়ার যেসব বন্দুকের কথা বলা হয়েছে এগুলো তারই নমুনা কিনা তা স্পষ্ট নয়। জৈন্তিয়ার মুদ্রায় যে বন্দুকের ছবি দেখা যায় সেটির পিছনের অংশ (বাট) বাঁকানো। কিন্তু নারতিয়াং মন্দিরের কামানগুলো একদম সোজা। তাই এগুলোকে কামান হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। আকারে এগুলো সমান নয়। পাঁচটি কামানের দৈর্ঘ্য পাঁচরকম। ওজনেও এগুলো সমান নয়। বহনের সুবিধার্তেই বোধ হয় এগুলোর ওজন ও আকারে এই পার্থক্য রাখা হয়েছে (সকল মানুষের বহন ক্ষমতা সমান নয়)। তিনটি কামানের হাতলের কড়া রয়েছে ভরকেন্দ্রের কাছে। একটি কামানের হাতলের কড়া রয়েছে ভরকেন্দ্রের বেশ নিচে। বাকি কামানটিতে কোন হাতল যুক্ত নেই। কামানগুলোকে দেখে মনে হয়, এগুলোকে বন্দুকের মতো ব্যবহার করা যেতো। একটি কামান ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুজন লোকের প্রয়োজন হতো। একজন শক্তিশালী লোক কাঁধের ওপর কামান তোলে শরীরের সাথে হাতল চেপে রেখে

লক্ষ্যবস্তুর দিকে নল তাক করতো। আর পেছন থেকে কেউ কামানের ভেতরের বারুদে অগ্নিসংযোগ করতো। বারুদ বিস্ফোরিত হলে নলের ভেতরের ধাতব গুলি প্রচণ্ড বেগে লক্ষ্যবস্তুর দিকে বেরিয়ে যেতো। এগুলোর লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা গাদা বন্দুকের মতোই ছিল বলেই মনে হয়। প্রায়োগিক পদ্ধতির বিচারে এই কামানগুলোকে 'হাত কামান' বলা যেতে পারে।



চিত্র: নারতিয়াং মন্দিরে রক্ষিত পাঁচটি হাত কামান

পরিশিষ্ট-৬

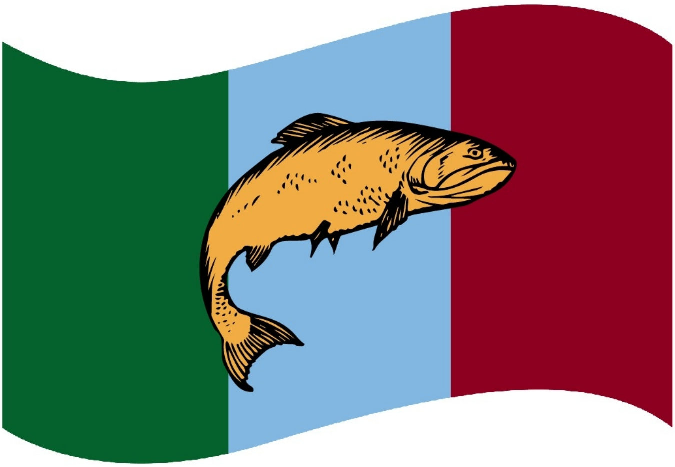
জৈন্তিয়ার রাজকীয় সীলমোহর ও পতাকা

জৈন্তিয়া রাজ্যের সরকারি দলিলসমূহে একটি রাজকীয় প্রতীক বা সীলমোহরের (Royal Seal) ছাপ থাকতো। ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়ার রাজাদের লেখা চিঠিপত্র, বিভিন্ন চুক্তিপত্র এবং ভূমিদানের দলিল বা তাম্রফলকসমূহে একটি রাজকীয় প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রফলক ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে সেগুলোতে দেখা যায়, একগুচ্ছ শাপলার ওপরে লম্ফমান একটি সিংহের ছবিকে রাজকীয় প্রতীক বা সীলমোহর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, সিংহটি বামদিকে তাকিয়ে রয়েছে। আবার কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, সিংহটি ডানদিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রায় সকল তাম্রফলকেই দেখা যায়, সিংহের নিচে একগুচ্ছ ভাসমান শাপলা রয়েছ। আরও দেখা যায় যে, লম্ফমান সিংহ এবং শাপলা গুচ্ছটি তিনটি পরপর বৃত্তের ভেতরে বন্দী রয়েছে। মাঝখানের বৃত্তটি হচ্ছে বিন্দুর বৃত্ত আর বাকি দুটো হচ্ছে সাধারণ রৈখিক বৃত্ত। তবে কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, তিনটি বৃত্তই বিন্দুর বৃত্ত। আবার কোন কোন তাম্রফলকে দেখা যায়, লম্ফমান সিংহ এবং শাপলা গুচ্ছটি একটিমাত্র বৃত্তের ভেতরে বন্দী রয়েছে। সকল তাম্রফলকের বৃত্তই প্রায় একই মাপের (১.৮৭৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট)।



চিত্র: জৈন্তিয়ার রাজকীয় প্রতীক বা সীলমোহর

জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রতীকের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলেও এর পতাকা কেমন ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। জৈন্তিয়ার পতাকার কোন ছবি বা বর্ণনা কোন মূল দলিলে নেই। জৈন্তিয়া সমতলের কিছু গবেষকের মতে, পতাকায় সিংহের ছাপ ছিল। কিন্তু জৈন্তিয়া পাহাড়ের গবেষকরা বলেছেন, পতাকায় একটি মাছের ছাপ ছিল। রাজ্যের পতাকা যে সবসবময় একইরকম ছিল তা না-ও হতে পারে। আবার, পাহাড় ও সমতলের পতাকা অভিন্ন না-ও হতে পারে। পাহাড়ি প্রবীণদের মুখে জৈন্তিয়ার পতাকার যে বর্ণনা শুনা যেতো তা প্রথমবারের মতো বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন জোয়াই শহরস্থ কিয়াং নাংবাহ সরকারি কলেজের প্রাক্তন ইংরেজি শিক্ষিকা কং ফিরিও পাসলেইন (Kong Phirio Paslein)। *The Jaintia Kings: Information Visualization of Jaintia History and Culture* শিরোনামের একটি গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদনেও জৈন্তিয়ার পতাকার একই বর্ণনা পাওয়া যায়। অধ্যাপক রবি পুভাইয়ার (Prof. Ravi Poovaiah) তত্ত্বাবধানে এই প্রতিবেদনটি রচনা করেছেন জোনাথান সাওইয়ান (Jonathan Sawian).



চিত্র: জৈন্তিয়া রাজ্যের পতাকা

কং ফিরিও পাসলেইন এবং জোনাথান সওইয়ান এর বর্ণনা অনুযায়ী, ব্রিটিশরা আসার আগে জৈন্তিয়া রাজ্যের যে নিজস্ব পতাকা ছিল তার জমিন ছিল তিনটি রং-এ বিভক্ত। এ তিনটি রং হল- সবুজ, আকাশী ও লাল। পতাকার বামের অংশ ছিল সবুজ, মাঝখানের অংশ ছিল আকাশী এবং ডানের অংশ ছিল লাল। পতাকাটি উলম্বভাবে এই তিনটি সমান অংশে বিভক্ত থাকতো। সবুজ রং ছিল কৃষি এবং সমতলের মুসলমানদের প্রতীক। আকাশী রং ছিল সত্য, সততা এবং পাহাড়ি মানুষদের নিয়েমত্রে ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক। আর লাল রং ছিল রাজ্যের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতীক। পতাকার মাঝখানে ডান দিকে মুখ করা একটি সোনালি মাছের ছাপ থাকতো। এই মাছটি জৈন্তিয়ার রাজাদের শেকড়ের প্রতীক হিসেবে কাজ করতো (সুতংগা পুঞ্জির কিংবদন্তী অনুযায়ী, জৈন্তিয়ার রাজাদের আদি মাতা মাছের রূপ ধারণ করেছিলেন)। জোনাথান সাওইয়ান পতাকার একটি নমুনাও প্রস্তুত করেছেন যা শিলং শহরের ডন বস্কো জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

পরিশিষ্ট-৭

জৈন্তিয়ার রাজ্যের ভাষা, লিপি ও সাহিত্য

ভাষা বৈচিত্রে জৈন্তিয়া ছিল বেশ সমৃদ্ধ একটি রাজ্য। এখানকার কথ্যভাষা ছিল প্নার (Pnar) ও সিলেটি ভাষা (সিলেটি ভাষা বাংলা নাকি স্বতন্ত্র ভাষা- এই বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এখানে তা নিষ্প্রয়োজন)। সিন্টেং জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ছিল প্নার ভাষা। রাজপরিবারের লোকজনও এই ভাষায় কথা বলতেন। পার্বত্য অঞ্চলে আরও কিছু ভাষার অস্তিত্ব ছিল। এগুলো হচ্ছে- ওয়ার (War), বিয়াট (Biate), ভোই (Bhoi), সাকাচেপ (Sakachep) প্রভৃতি। জৈন্তিয়া সমতলের লোকজনের মাতৃভাষা ছিল সিলেটি ভাষা। হাজং, কুকী, বাংলা ও অসমীয়া ভাষাভাষী কিছু লোকও জৈন্তিয়া সমতলে বসবাস করতেন। কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে সিলেটি, বাংলা ও অসমীয়া ভাষার বর্ণমালা ছিল; বাকিগুলোর কোন বর্ণমালা ছিল না। রাজপরিবারের মাতৃভাষা অর্থাৎ প্নার ভাষার কোন বর্ণমালা না থাকায় সিন্টেং রাজারা তাদের সময়কার ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখতে উৎসাহী হননি। এমনকি তারা কোন স্তুতিগাথাও লেখাননি। জৈন্তিয়ার ঐতিহাসিক দলিলের দুষ্প্রাপ্যতার মূল কারণ এটিই।

তবে বৈদেশিক সম্পর্কের প্রয়োজনে সিন্টেং রাজারা বেশ কিছু লিখিত দলিল সৃষ্টি করেছিলেন। আহোমের রাজাদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনে তারা অনেকগুলো পত্র লিখেছিলেন। এসব পত্রের ভাষা অসমীয়া ভাষা। এগুলো জৈন্তিয়ার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। মোগলানের সাথে জৈন্তিয়ার পত্র যোগাযোগের ভাষা ছিল বাংলা। জৈন্তিয়ার যেসব তাম্রলিপি ও শিলালিপি ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছে সেগুলোর ভাষা সংস্কৃত হলেও লিপি অত্যন্ত বিচিত্র। পূর্ব নাগরী লিপি (বাংলা ও অসমীয়া ভাষার লিপি) ও সিলেটি নাগরী লিপির (সিলেটি ভাষার লিপি) সংমিশ্রণে এগুলো রচিত হয়েছে। এই বিচিত্র লিপিতে বিভিন্ন তাম্রফলক ও শিলার গায়ে যেসব সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য লেখা হয়েছে সেগুলো জৈন্তিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। জৈন্তিয়ার মুদ্রার ভাষাও সংস্কৃত। তবে মুদ্রার লিপি বেশ স্পষ্ট। মুদ্রাগুলোতে শুধু পূর্ব নাগরী লিপিই ব্যবহৃত হয়েছে; সিলেটি নাগরী লিপির সংমিশ্রণ ঘটেনি।

বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে বহু মুসলমান পরিবার জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা নিজস্ব পরিসরে নিজেদের ভাষায়ই কথা বলতেন। মোগলদের হাতে সিলেটের পতনের পর জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নেওয়া পাঠান পরিবারসমূহের ভাষা ছিল পশতু। তবে একসময় তারা মূলধারার সাথে মিশে গিয়েছিলেন। ইংরেজদের হাতে বাংলার পতনের পর জৈন্তিয়ায় আশ্রয় নেওয়া মুসলমানরা বাংলা, ফারসী, তুর্কী ইত্যাদি ভাষায় কথা বলতেন। তারাও একসময় মূলধারায় মিশে গিয়েছিলেন। তবে ধর্মীয় শিক্ষার ভাষা হিসেবে মুসলমানরা আরবি ভাষার চর্চা করতেন। ১৭৬৯ সালে জৈন্তিয়ার রাজকীয় ধর্মগুরু হযরত কাশিম শাহ মোকামবাড়িতে একটি আরবি কিতাবের দরসখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটিই জৈন্তিয়ার ইতিহাসের প্রথম আরবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হযরত কাশিম শাহ 'সিরাজুল ক্বলব' ও 'জমজমা' নামে দুটি আরবি বইও লিখেছিলেন। জৈন্তিয়ার অন্যান্য ধর্মের গুরুরাও তাদের শিষ্যদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। সনাতন ও বৈষ্ণব ধর্মীয় শিক্ষার মূল ভাষা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত। তাই জৈন্তিয়ায় বাংলা ও সংস্কৃতের পণ্ডিতদের অভাব ছিল না। জৈন্তিয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিংহ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তিনি বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব ধর্মের কিছু 'ঝুলন সংগীত' রচনা করেছিলেন।

জৈন্তিয়ায় কিছু সাহিত্য উপাদানও রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রাঘবপাণ্ডবীয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'কবিরাজ' নামক একজন সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিত এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এটি একটি শ্লেষাত্মক ও দ্ব্যর্থবোধক মহাকাব্য (এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোক বা পঙ্ক্তি এমন চাতুর্যের সাথে রচিত যে, এগুলোর একই সাথে দুটি অর্থ বের হয়ে আসে)। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনন্য নিদর্শন এই সংস্কৃত দ্ব্যর্থক মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল জৈন্তিয়ার রাজা কামদেবের পৃষ্ঠপোষকতায়। তিনি মালব দেশের রাজধানী ধারানগরের অধিবাসী কবিরাজকে জৈন্তিয়া রাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবিরাজ বিদ্যাধনঞ্জয় বা ধনঞ্জয় নামেও পরিচিত ছিলেন। দ্বাদশ শতকের (১১০১ সাল থেকে ১২০০ সাল) কোন এক সময়ে রাজা কামদেবের আমন্ত্রণে সাঁড়া দিয়ে তিনি জৈন্তিয়ায় এসেছিলেন এবং রাজসভার কবি হয়েছিলেন। এরপর তিনি কামদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাঘবপাণ্ডবীয়' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থের সূত্র ধরেই রাজা কামদেবের রাজত্ব এবং মধ্যদেশ থেকে জৈন্তিয়ায় ব্রাহ্মণদের আগমনের ঐতিহাসিক তথ্য ও কালানুক্রম জানা যায়।

REFERENCE LIST

[এই পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত তথ্যসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এসেছে প্রাথমিক গবেষণা থেকে। যেহেতু এই পাণ্ডুলিপিটিকে থিসিস বা অভিসন্দর্ভের মতো বিন্যস্ত করা হয়নি সেহেতু এর Reference List বা তথ্যসূত্র তালিকায় প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তসমূহের উৎস যোগ করার সুযোগ নেই। নিচে শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির গৌণ তথ্যসমূহের (Secondary Information) উৎস বা সূত্রসমূহ তোলে ধরা হল। সূত্রসমূহের ক্রম নির্ধারিত হয়েছে প্রকাশকাল বা প্রাচীনত্বের বিচারে। প্রতিটি সূত্রে যেসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা হল: লেখক/ সম্পাদক/ তত্ত্বাবধায়কের নাম, আকর গ্রন্থ বা দলিলের নাম (প্রকাশনার স্থান ও কাল), খণ্ড/ উপ-খণ্ড/ অধ্যায়/ উপ-অধ্যায় প্রভৃতি, পৃষ্ঠা নম্বর প্রভৃতি]

DR. JOHN PETER WADE, F.R.A.S., *AN ACCOUNT ASSAM (1800), EDITED BY BENUDHAR SHARMA* (ASSAM 1927)

GEORGE LOCH, *JAINTIA SETTLEMENT REPORT 1839 (জৈন্তিয়া বন্দোবস্তের রিপোর্ট ১৮৩৯)*

ROBERT LINDSAY, *ANECDOTES OF AN INDIAN LIFE, ORIENTAL MISCELLANIES, LIVES OF THE LINDSAYS (VOLUME IV)* (WIGAN 1840), PAGE 48-55

THOMAS OLDHAM, A.M., F.R.S., G.S., *ON THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF PART OF THE KHASI HILLS WITH OBSERVATION ON THE METEOROLOGY AND ETHNOLOGY OF THAT DISTRICT* (CALCUTTA 1854)

W.J. ALLEN, *REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE COSSAYAH AND JYNTEAH HILL TERRITORY* (CALCUTTA 1858)

E.M. LEWIS, *PRINCIPAL HEADS OF THE HISTORY AND STATISTICS OF THE DACCA DIVISION* (1868), PART: *DISTRICT OF SYLHET*

SIR ALEXANDER MACKENZIE, *MEMORANDUM ON THE NORTH-EAST FRONTIER OF BENGLE* (CALCUTTA 1869), PAGE 233 OR *HISTORY OF THE RELATIONS OF THE GOVERNMENT WITH THE HILL TRIBES OF THE NORTH-EAST FRONTIER OF BENGAL* (CALCUTTA 1884)

শ্রীকৃষ্ণ দাস, *রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্য*, জ্ঞানাঙ্কুর (বৈশাখ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ)

SIR WILLIAM WILSON HUNTER B.A., L.L.B., C.I.E, *A STATISTICAL ACCOUNT OF ASSAM VOLUME II* (LONDON 1879), PART: THE KHASI AND JAINTIA HILLS, CHAPTER: PHYSICAL-HISTORY, PAGE 206-207

শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত, *ভারতের ইতিহাস (হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব)* (কলকাতা ১৮৮৭)

SIR JOSEPH DALTON HOOKER, K.C.S.I., C.B., M.D., D.C.L., F.R.S., *HIMALAYAN JOURNALS OR NOTES OF A NATURALIST* (LONDON, NEW YORK, MELBOURNE 1891)

SIR EDWARD ALBERT GAIT, K.C.S.I., C.I.E., *SOME NOTES ON JAINTIA HISTORY* (1895); *REPORT ON THE PROGRESS OF HISTORICAL RESEARCH IN ASSAM* (SHILLONG 1897); *A HISTORY OF ASSAM*, SECOND EDITION (CALCUTTA 1926), CHAPTER VII: *THE CLIMACTERIC OF AHOM RULE* (PAGE 172-180), CHAPTER X: *THE KACHARIS* (PAGE 252-253, 255-256), CHAPTER XI: *THE JAINTIA KINGS* (PAGE 259-268)

কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস (আগরতলা ১৮৯৬)

BABU CHANDRA KANTA SEN, *SETTLEMENT REPORT OF JAINTIA PARGANAS (1897)*

B.C. ALLEN, B.A. C.S., *CENSUS OF INDIA 1901 VOLUME IV: ASSAM* (SHILLONG 1902); *ASSAM DISTRICT GAZETTEER VOLUME I* (ALLAHABAD 1905); *ASSAM DISTRICT GAZETTEER VOLUME II: SYLHET* (CALCUTTA 1905)

REV. WILLIAM M. JENKINS, *LIFE AND WORK IN KHASIA* (NEWPORT, MONMOUTHSHIRE 1904)

শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ* (কলকাতা ১৯১০), প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়ঃ *তীর্থ স্থান (বামজঙ্ঘাপীঠ, পীঠপ্রকাশ, রূপনাথ গুহা, হাটকেশ্বর শিব, আগমবাগীশ ও হাটকেশ্বর);* দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ খণ্ডঃ *মোসলমান প্রভাব জয়ন্তীয়া* (প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়)

F.B. BRADLEY BIRT, *'SYLHET' THACKERAY* (LONDON 1911), CHAPTER VI: *FIRST COLLECTOR OF SYLHET* (PAGE 127-152), CHAPTER VII: *THE JAINTIA EXPEDITION* (PAGE 153-176)

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি.এ., *কাছাড়ের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা ১৯১২)

LIEUTENANT-COLONEL PHILIP RICHARD THORNHAGH GURDON, C.S.I., *THE KHASIS,* SECOND EDITON (LONDON 1914)

WALTER KELLY FIRMINGER, *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME I (1770–1785)* (SHILLONG 1913); *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME II (1786–1788)* (SHILLONG 1917); *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME III (1786–1788)* (SHILLONG 1917); *THE SYLHET DISTRICT RECORDS VOLUME IV (1788–1791)* (SHILLONG 1919)

PROF. KISHORI MOHAN GUPTA, M.A., Ph.D., *THE DHUPI COPPERPLATE INSCRIPTION OF RAMASIMHA, SAKABDA 1720 (A.D. 1798)*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 18, 1922, PAGE 73-79;

DAUDIG COPPER PLATE INSCRIPTION OF KASASATI, SAKABDA 1725 (A.D. 1803), JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 19, 1923, PAGE 323-329; *JAINTIAPUR COPPER PLATE INSCRIPTION OF BADAGOSAYI, A.D. 1770*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 19, 1923, PAGE 331-335; *JAINTIAPUR COPPER-PLATE OF INSCRIPTIONS OF MAHADEVI KASASATI, DATED SAKABDA 1710 (A.D. 1788), 1723 (A.D. 1801) AND 1735 (A.D. 1813),* THE JOURNAL OF THE ASSAM RESEARCH SOCIETY (KAMARUPA ANUSANDHAN SAMITI), VOLUME 1, NUMBER 1, APRIL 1933

J.H. HUTTON, *SOME MEGALITHIC WORK IN THE JAINTIA HILLS*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 22, 1926, PAGE 333-345

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, *জৈন্তা রাজ্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (সিলেট ১৯৬৪), *চতুলের সোনাধনের কবিতা* (সিলেট ১৯২৭)

KUNJA GOVINDA GOSWAMI, *THE SATAK COPPER PLATE GRANT OF KING RAMA SIMHA II OF JAINTIA OF 1809 A.D.*, JOURNAL AND PROCEEDINGS OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL (NEW SERIES), VOLUME 25, 1929, PAGE 165-169

A.W. BOTHAM, C.S.I., C.I.E., I.C.S., *CATALOGUE OF THE PROVINCIAL COIN CABINET ASSAM, SECOND EDITION* (ALLAHABAD 1930)

RAI SAHIB GOLAP CHANDRA BARUA, *AHOM-BURANJI (FROM THE EARLIEST TIME TO THE END OF AHOM RULE)* (CALCUTTA 1930)

ৰায় বাহাদুৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা (SURJYA KUMAR BHUYAN), *কামৰূপৰ বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩০), *দেওধাই অসম বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩২), *অসমৰ পদ্য বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৩), *কছাৰী বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৬), *জয়ন্তীয়া বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৭), *ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৩৮), *অসম বুৰঞ্জীৰ কথা* (গুৱাহাটী ১৯৩৯), *মীৰজুমলাৰ অসম আক্ৰমণ* (গুৱাহাটী ১৯৫৬), *সাতসৰী অসম বুৰঞ্জী* (গুৱাহাটী ১৯৬০), *AN ACCOUNT OF ASSAM* (GUWAHATI 1940)

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী, *পল্লীস্মৃতি*, বাংলার শক্তি (কলকাতা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)

KHAN CHOWDHURI AMANATULLA AHMED, *HISTORY OF COOCH BEHAR (IN BENGALI) PART I* (COOCH BEHAR 1936)

U HOMIWELL LYNGDOH, M.B.E., L.M.S., *KI SYIEM KHASI BAD SYNTENG* (SHILLONG 1938)

RAMANANDA CHATTERJEE, *DUTTA CHOWDHURY FAMILY RECORDS*, THE MODERN REVEIW (CALCUTTA 1940)

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম.এ., বি.লিট., পি.এইচ.ডি., *প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন* (কলকাতা ১৯৪২)

মৌলভী সিকান্দার আলী খন্দকার, *পারিবারিক ডায়েরি ও টালি খাতাসমূহ* (১৯৫৬)

SYED MURTAZA ALI, *THE HISTORY OF JAINTIA* (DACCA 1954); *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (ঢাকা ১৯৬৫), অধ্যায়ঃ *থেকারে, লিন্ডসে, জয়ন্তীয়া*

RAJMOHAN NATH, B.E., *ANTIQUITIES OF KACHAR* (1942), *THE BACKGROUND OF ASSAMESE CULTURE* (SHILLONG 1948), *GLORIOUS ASSAM* (1948), *সোনাধনের গীত* (সিলেট ১৯৪৭)

KAMALAKANTA GUPTA, M.Sc., B.L., *COPPER PLATES OF SYLHET, VOLUME I* (7TH—11TH CENTURY A.D.) (SYLHET 1967), *তাম্রশাসনে শ্রীহট্ট* (সিলেট ২০১৯), *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ পূর্ব শ্রীহট্টের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা* (ঢাকা ২০১৭), *শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস* (?)

DR. HAMLET BAREH, *MEGHALAYA* (SHILLONG 1974)

পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱা, অসমৰ বুৰঞ্জী (গুৱাহাটী ১৯৭৬)

JYOTIRINDRA NATH CHOWDHURY, *THE KHASI CANVAS: A CULTURAL AND POLITICAL HISTORY* (SHILLONG 1978), *KI KHUM KHASI-KHARA (THE KHASI PEOPLE)* (SHILLONG 1996)

A.J.M. MILLS *REPORT ON THE KHASI AND JAINTIA HILLS 1853* (SHILLONG 1985)

DR. D. NATH, *HISTORY OF THE KOCH KINGDOM (c.1515-1615)* (DELHI 1989)

গ্রুপ ক্যাপ্টেন ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* (ঢাকা ১৯৯১), প্রথম খণ্ড *(সিলেটের মাটি)*, অধ্যায়ঃ *প্রাচীন কাল (বামজঙ্ঘা পীঠ, মহাভারতের যুগে সিলেট, জৈন্তাপতি কামদেব ও রাঘবপাণ্ডবীয় গ্রন্থ, হট্টনাথের পাঁচালী ও সিলেট),* অধ্যায়ঃ *খণ্ডরাজ্যের ইতিকথা (গৌড় রাজ্য ও রাজা গৌড়গোবিন্দ, মগধ রাজ্য ও প্রতাপগড়, জৈন্তা রাজ্যের কথা);* দ্বিতীয় খণ্ড *(সিলেটের মানুষ),* অধ্যায়ঃ *সেনাপতি ফতেহ খাঁ, হ্যারী ইনগলিস* এবং *জৈন্তিয়া দর্পণ* (ঢাকা ২০০১)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুনিমল দত্ত চৌধুরী, অমলেন্দু ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, *শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির* রূপরেখা (শিলং ১৯৯৬)

H.M. BAREH, *ENCYCLOPEDIA OF NORTH EAST INDIA VOLUME II: ASSAM* (NEW DELHI 2001), *ENCYCLOPEDIA OF NORTH EAST INDIA VOLUME IV: MEGHALAYA* (NEW DELHI 2001)

SOUMEN SEN, *KHASI-JAINTIA FOLKLORE- CONTEXT, DISCOURSE AND HISTORY* (CHENNAI 2004)

রুশ পতাম, *খাসিয়া জনগোষ্ঠী: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা ২০০৫)

মো. খায়রুল ইসলাম, *নারতিয়াং মন্দিরের পুরোহিতের সাক্ষাৎকারের ভিডিও* (নারতিয়াং ২০১৮)

PROF. RAVI POOVAIAH AND **JONATHAN SAWIAN**, *THE JAINTIA KINGS: INFORMATION VISUALIZATION OF JAINTIA AND CULTURE*

PROF. RAVI POOVAIAH AND **JONATHAN SAWIAN,** *KA HISTORY KA RI JAINTIA HA SHWA KIPHARENG*, *RI JAINTIA*, END NEWS, KHLIEHRIAT, 26 AUGUST 2023

হাবিব আহমদ দত্তচৌধুরী, *বাংলার ইতিহাসের অনাঘ্রাত পাতা থেকে* (ঢাকা ২০২৪), *শ্রীহট্টের বীরশ্রী-মাইজডিহির রাজবংশের ইতিকথা* (সিলেট ২০২৫), *ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীহট্টের প্রতাপগড় রাজ্য* (ঢাকা ২০২৪)

আক্তার হোসেন অবিন, ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা জৈন্তিয়া রাজ্যের মুদ্রার সংগ্রহ